হৃষীকেশ-সিরিজ,—নং ৩

বর্ত্তমান ভারতের প্রাকৃতিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

[মূল্য ২৸৹]

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।"

জননী

ও

জন্মভূমিকে দিলাম।

প্রভাত

ভূমিকা

ভারত-পরিচয় আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিয়াছি। এতগুলি অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয়ের একত্র সমাবেশ প্রায় দেখা যায় না। ভারতবর্ষে জাতিভেদ, শিক্ষা, শাসনপ্রণালী, স্বায়ত্তশাসন, ধর্ম্মমত প্রভৃতি বিষয় অতি সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। আমি যতদূর জানি এ প্রকার গ্রন্থ বঙ্গভাষায় এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। আশা করি দ্বিতীয় সংস্করণে অন্যান্য বিষয় বর্দ্ধিতাকারে সন্নিবেশিত হইবে।

২৭শে সেপ্টেম্বর ১৯২১
সায়েন্স কলেজ
কলিকাতা।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়

নিবেদন

সমগ্র ভারতবর্ষকে সকল দিক হইতে জানিতে পারা যায় এমন কোনো গ্রন্থ বাংলা ভাষায় নাই; সেই অভাব দূর করিবার ইচ্ছায় প্রায় ছয় বৎসর পূর্বে আমরা কয়েক জন বন্ধুতে মিলিয়া এই গ্রন্থের সূচীপত্র খশড়া করি; তখন আমার উপর বোধ হয় তিন চারিটি পরিচ্ছেদের ভার অর্পিত হয়। কথা ছিল অবশিষ্টাংশ অন্যেরা লিখিবেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় পাঁচটী পরিচ্ছেদ ব্যতীত এ গ্রন্থের সমস্তই আমাকে একা করিতে হইয়াছে। একই ব্যক্তিকে ধর্ম-সংস্কার পর্য্যন্ত সকল বিষয় লিখিতে হইলে, ফল যে আশানুরূপ হইতে পারে না, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। এই গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে যে সব ভ্রম প্রমাদ সহৃদয় পাঠকগণের দৃষ্টিভূত হইবে—তাহা যদি আমাকে শুদ্ধ করিয়া জ্ঞাপন করেন তবে আমি কৃতজ্ঞহৃদয়ে দ্বিতীয় সংস্করণে সেগুলি সংশোধন করিব। এই শ্রেণীর গ্রন্থকে up to date করা অসম্ভব, কারণ ঘটনা (facts) ও তালিকা (figures) প্রতিদিন নূতন নূতন আকার গ্রহণ করিতেছে। ইহার মুদ্রণ কার্য্য দেড় বৎসর ধরিয়া চলিয়াছিল, সুতরাং কতকগুলি ঘটনা কিছু পুরাণো বলিয়া মনে হইতে পারে। অধিকাংশ ঘটনা ও তালিকা ১৯১৯ সাল পর্য্যন্ত আনিতে চেষ্টা করিয়াছি। জনসংখ্যা সংক্রান্ত তালিকা ১৯১১ সালের আদমসুমারী (Census) হইতে গ্রহণ করিয়াছি; কেননা ১৯২১ সালের জনগণনার ফল প্রতিবেদন আকারে (report) প্রকাশিত হইবার পূর্বে তাহা ব্যবহার করা সর্বদা নিরাপদ নয়। সরকারী চাকুরী, সৈনিক বিভাগ-গঠন, প্রবাসী ভারতবাসী সম্বন্ধে কতকগুলি ঘটনার বিশেষ পরিবর্ত্তন হইয়াছে ও হইতেছে। ঐতিহাসিক

ঘটনা ত প্রতিদিনই নূতন হইতেছে ; সুতরাং তাহার সহিত তাল রক্ষা করা এক মাত্র দৈনিক কাগজেরই পক্ষে সম্ভব, এ শ্রেণীর গ্রন্থের নয়।

এই গ্রন্থ রচনায় যাঁহাদের নিকট সাহায্য পাইয়াছি তাঁহাদিগকে বিশেষভাবে আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় মহাশয় 'উদ্ভিদ্' ও 'প্রাণী' পরিচ্ছেদ দুটি লিখিয়া, আমার বন্ধু সহাধ্যায়ী শ্রীযুক্ত হীরালাল রায় (বেঙ্গল টেক্নিক্যাল ইন্সটিটিউটের অধ্যক্ষ] 'ভারত শাসন' সম্বন্ধে পরিচ্ছেদটি লিখিয়া, ও আমার পত্নী শ্রীমতী সুধাময়ী দেবী 'ব্রাহ্ম সমাজ' ও 'আর্য্য সমাজ' প্রবন্ধ দুটি লিখিয়া দিয়া আমার বিশেষ উপকার করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় 'ভারতের ভাষা' সম্বন্ধে একটি সুন্দর প্রবন্ধ লিখিয়া দেন, কিন্তু তাহা সময়াভাবে ছাপা হইল না ; আগামী সংস্করণে সেটি থাকিবে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আমার বন্ধু ও সহাধ্যায়ী শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনারায়ণ মিত্র, ও বিজয় কুমার সরকার মহাশয় দ্বয়ের নিকট হইতে সাহায্য পাইয়াছি। Geological Survey বিভাগের ভূতত্ত্ববিদ্ শ্রীযুক্ত বরদাচরণ রায়, ঐ বিষয়ক প্রবন্ধটি পাঠ ও সংশোধন করিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে বাঁধিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মিণ্টো প্রফেসর শ্রীযুক্ত প্রমথ নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় 'নূতন শাসন সংস্কার' সম্বন্ধে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয় ও শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই গ্রন্থের খশড়া-সূচী অদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া ও টিপ্পনী লিখিয়া দিয়া আমার কি পর্য্যন্ত উপকার করিয়াছেন তাহা আমি বলিতে পারি না। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত রাধাকমল মুখোপাধ্যায় এই গ্রন্থ রচনায় ও মুদ্রাঙ্কণে আমায় যেরূপ উৎসাহ দান করিয়াছেন তাহা তাঁহারই উপযুক্ত।

এই গ্রন্থ প্রণয়নে যে সকল পুস্তক আবশ্যক হইয়াছে তাহার প্রায় সমস্তই আমি শান্তিনিকেতন-লাইব্রেরীর অধ্যক্ষতা করিবার সৌভাগ্য

লাভ করিয়াছি বলিয়া এইখানে বসিয়া ব্যবহার করিতে পারায় গ্রন্থ রচনা সম্ভব হইয়াছে। আমাদের মধ্যে জ্ঞানালোচনার দীপ যাহাতে ম্লান না হয় সেজন্য রবীন্দ্রনাথ নিয়ত গ্রন্থাগারের পুষ্টিসাধন করিয়া আমাদিগকে উৎসাহ দিয়া মনকে কতখানি সতেজ রাখিয়াছেন, তাহা বাহিরের কাহারও জানা সম্ভব নয়।

তারপর, ভগবান্ যাঁহাকে ধনে ও জ্ঞানে সমভাবে সম্পদবান্ করিয়াছেন—আমার বন্ধু কুমার নরেন্দ্রনাথ লাহা মহাশয়ের দান সাহায্য ও উৎসাহ ব্যতীত এই গ্রন্থ কখনো প্রকাশিত হইত না। এই গ্রন্থ "হৃষীকেশ সিরিজের" অন্তর্গত করিয়া তিনি আমাকে সম্মানিত করিয়াছেন; তাঁহাকে ধন্যবাদ দিবার মতো ভাষাও আমার নাই। ইতি

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম, শান্তিনিকেতন
আশ্বিন, ১৩২৮।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

নির্ঘণ্ট

ভ

ম

য

র

ল

শ

স

সংক্ষিপ্ত সূচী

প্রথম ভাগ—প্রাকৃতিক

দ্বিতীয় ভাগ—ঐতিহাসিক ও সামাজিক

তৃতীয় ভাগ—শাসনবিষয়ক

চতুর্থ ভাগ—অর্থ নৈতিক

বিস্তৃত সূচী।

প্রথম ভাগ—প্রাকৃতিক

দ্বিতীয় ভাগ—ঐতিহাসিক

তৃতীয় ভাগ—শাসনবিষয়ক

চতুর্থ ভাগ—অর্থনৈতিক

চতুর্থ ভাগ।

১। কৃষি।

ভারতবর্ষ কৃষি প্রধান দেশ একথা আমরা সর্বদাই শুনিয়া থাকি। কৃষির উপর সমগ্র জন সংখ্যার শতকরা ৭০ ভাগ লোকের জীবিকা নির্ভর করিতেছে; আর গ্রামের শতকরা ৯০ জনের উপর লোক কৃষিজীবি।

জনসংখ্যা ও কৃষির জমি

পৃথিবীর এমন আর একটি দেশ নাই যেখানকার অধিবাসীরা এমন করিয়া মাটি আঁকড়াইয়া পড়িয়া আছে। গত তিন আদমসুমারীর প্রতিবেদন হইতে দেখা যায় কৃষিজীবির সংখ্যা বাড়িতেছে। এ ছাড়া আর একটি বিষয় কিছুকাল হইতে দেখা যাইতেছে; ভূমিহীন লোকের সংখ্যা বাড়িয়া চলিতেছে। জমি অফুরন্ত নয়—অথচ জনসংখ্যা কিছু কিছু বাড়িতেছে; পতিত জমি আর পড়িয়া থাকিতেছে না। এমন কি পূর্বে প্রতি গ্রামের পাশে যে গোচারণ ভূমি ছিল তাহা এখন লোপ পাইয়াছে।

জমির উপর যে কেবল বংশগত কৃষিজীবিরা পড়িয়া রহিয়াছে তাহা নহে; শিল্পের প্রতিযোগিতায় হার মানিয়া তাঁতি কামার কুমার মুচি ধোপা সকলেই জমির দিকে ঝুঁকিয়াছে। ইহার কারণ তাঁতির তাঁত

শিল্পধ্বংসে ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা বৃদ্ধি

বুনিয়া লাভ নাই, বিদেশী কাপড়ের প্রতিযোগিতায় সে হারিয়াছে; কামার দেখিতেছে নিজ ব্যবসায় লাভজনক নয়, কারণ বিলাতী ছুরি কাঁচির আদর

---

* কৃষি জলসেচন ও গোধন সম্বন্ধে প্রবন্ধ কয়টির অধিকাংশই শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ গাঙ্গুলী মহাশয়ের ভারতবর্ষের কৃষি উন্নতি পুস্তক হইতে সংগৃহীত। এই বইখানি সকলের আদ্যোপান্ত পাঠ করা উচিত।

বেশী, সুতরাং তাহার ব্যবসায় চলে না। এইরূপে সকলেই কৃষিতে লাগিয়াছে। পূর্বে কৃষি ও শিল্পের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য ছিল—আর্থিক জীবনে কোনোটাই উৎকট আকার ধারণ করে নাই। লোকে শিল্প করিয়াও বাঁচিত, কৃষি করিয়াও চালাইত। এখন দেশের কুটীর শিল্পসমূহ নষ্ট হইয়াছে—কাজে কাজে জীবন যাত্রার একমাত্র অবলম্বন হইয়াছে কৃষি। তবে বর্ত্তমানে ভারতের বহু স্থানে বহুবিধ শিল্প ও কারখানা হওয়াতে ভূমিহীন লোকদের সুবিধা হইয়াছে। তবে তাঁতির ছেলের তাঁত নষ্ট করিয়া চটের কলে তাহাকে কাজ করিতে ঢুকাইলে তাহার মনুষ্যত্ব বিকাশ পাইবে না। কলে সে চাকর, পূর্বে সে গৃহী ছিল।

ভারতবর্ষে ঠিক জমির যে অভাব আছে তাহা নহে। যেখানে লোক বেশী সেখানে জমির অভাব—যেখানে জমি পড়িয়া আছে সেখানে লোক নাই। অথচ একস্থান হইতে অন্যস্থানে যে লোকে যাইবে সে সাহস তাহাদের হয় না। বর্ত্তমানে অনেক মরুসদৃশ স্থান জলসেচনের সুব্যবস্থা হওয়াতে লোকের বাসোপযোগী হইয়াছে।

ভারতবর্ষের সমগ্র জমিকে আমরা কয়েকটি ভাগে ভাগ করিতে পারি, যেমন চাষের জমি, পতিত জমি; চাষের যোগ্য, চাষের অনুপযোগী, জল সেচনের যোগ্য ও অযোগ্য; একফশলী ও দো-ফশলী। এ ছাড়া ভারতবর্ষকে প্রাকৃতিক দিক হইতে আমরা দুইটা ভাগ করিতে পারি যেমন (১) পলিমাটির দেশ অর্থাৎ সিন্ধু গঙ্গা ব্রহ্মপুত্রের অপবাহিকা ভূমি; (২) দাক্ষিণাত্যের মালভূমি। প্রাকৃতিক অবস্থা প্রথম পরিচ্ছেদে সবিস্তার আলোচনা হইয়াছে।

জমির শ্রেণীবিভাগ

ভারতবর্ষের কৃষি-উন্নতির জন্য কয়েকটি বিষয়ের বিশেষ প্রয়োজন। প্রথমতঃ জলের আবশ্যকতা। জমি হইতে পুরাফসল পাইতে হইলে জলের ব্যবহারও পুরাপুরি করা চাই। জলের জন্য আমাদের প্রধানতঃ

কৃষি ও জলবায়ু

নির্ভর করিতে হয় বৃষ্টির উপর। যে বায়ু বৃষ্টি বহন করিয়া আনে তাহাকে মৈসুম বায়ু বলে। জলবায়ু পরিচ্ছেদে এ বিষয়ে সবিশেষ আলোচনা হইয়াছে বলিয়া এখানে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। মৈসুম বায়ু খুবই খামখেয়ালী ধরণে চলা ফেরা করে। কোন বৎসর ইহা কমিলে চাষের অসুবিধা ঘটে। আবার ভারতবর্ষের সকল স্থানে সমান পরিমাণ বৃষ্টি হয় না তাহাও আমরা পূর্বে দেখিয়াছি। কৃষি কর্মের সুবিধার জন্য বারিপাতেরও একটা সামঞ্জস্য প্রয়োজন। এদিকে যেমন অবিশ্রান্ত বর্ষনে ফসল পচিয়া যাইতে পারে, আবার বিনাবর্ষণে ইহার রোদে পুড়িয়া যাইবার সম্ভবনা আছে। যেখানে অল্প বৃষ্টিপাত হয় সেখানে কৃষি কার্য্যেরও কোনো স্থিরতা নাই; যেঅঞ্চলে যখন যে পরিমাণ বৃষ্টি হয় তাহার উপর সেই অঞ্চলের ফসলের রকম নির্ভর করে। দক্ষিণ বর্মায় ১২৩ ইঞ্চি বৃষ্টি হয়, বাংলা দেশের গড়ে বৃষ্টি ৯০ ইঞ্চি; সুতরাং এই সব দেশে ধান উৎপন্ন হয়। রাজপুতানা ও সিন্ধুপ্রদেশে বার্ষিক বারিপাত ৬ ইঞ্চি হইতে ১১ ইঞ্চি মাত্র; সেখানকার ফসল জোয়ার, বজরী প্রভৃতি; এ সব জায়গায় একবার মাত্র ফসল হয়। ইহাকে বলে 'খরিফ'। বর্ষাকালেই ইহা জন্মে, কিন্তু জল সেচনের ব্যবস্থা না করিলে বৎসর-মধ্যে আর কোনো ফসল পাওয়া যায় না। শীতের সময়ে যে শস্য উৎপন্ন হয় তাহাকে রবিশস্য বলে। জলাভাবের দরুণ যে যে প্রদেশকে একটি ফসলের উপর নির্ভর করিতে হয়, সেখানকার কৃষিজীবির দারিদ্র্তা কখনও ঘুচে না।

ভারতবর্ষে বৃহৎ কৃষিক্ষেত্র নাই; অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ বিভক্ত। সেই জন্য কৃষিকার্য্য ছোট আকারে হয়। ভারতবর্ষের ন্যায় প্রকাণ্ড মহাদেশের কৃষি-প্রথা বর্ণনা করা এখানে অসম্ভব। বাংলাদেশের

কৃষকের শিক্ষার অভাব

ন্যায় নদীবহুল ও অধিকবৃষ্টির দেশের চাষ, রাজপুতনার মরুময় দেশের চাষ, পঞ্জাবের কঠিন মাটির

চাষ, দাক্ষিণাত্যের কালো মাটির অবস্থা যে সব সমান নয়—তা বলাই বাহুল্য। ভারতের চাষীদের অধিকাংশ লোকই বর্ণজ্ঞানহীন; কিন্তু তাহারা নিরক্ষর হইলেও নির্বোধ নয়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ প্রথম প্রথম এ দেশের কৃষি-সম্বন্ধে ভাসা-ভাসা রকমের অনুসন্ধান করিয়া ভারতবাসীদের চাষবাসকে অত্যন্ত আদিম ধরণের বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলেন; তাহাদের সম্বন্ধে আরও অভিযোগ শোনা যায় যে, তাহারা নূতন কিছু লইতে চায় না। এ কথা সম্পূর্ণ সত্য নহে। সকলেই জানেন আমাদের দেশে আখ-মাড়া কল একজন সাহেবের তৈয়ারী। লোকে যখন দেখিল যে এই কলে তাহাদের উপকার হইতেছে, তখন তাহারা উহা গ্রহণ করিল। কিন্তু কৃষি-বিভাগ যেরূপ ব্যয় করিয়া যেরূপ ফসল পাইয়া থাকেন তাহা করিতে হইলে চাষাকে দেউলা হইতে হইবে। ভারতীয় কৃষক দরিদ্র বলিয়া তাহার কাছে স্বল্প ব্যয়সাধ্য প্রণালী ব্যতীত আর কিছু গ্রহণীয় হইতে পারে না। আমাদের দেশের কৃষকেরা কেন বিলাতী-লাঙ্গল, কোদাল প্রভৃতি ব্যবহার করে না বলিয়া অভিযোগ শোনা যায়; কিন্তু যেখানে কলকব্জা মেরামত করিবার জন্য কথায় কথায় কলিকাতায় ছুটিতে হয়, যেখানে দেশ খুঁজিয়া একজন ভাল ইঞ্জিনীয়ার-মিস্ত্রি পাওয়া যায় না, সেখানে লোহালক্কড়ের জিনিষ ব্যবহার করিতে বলা বাতুলতা। টেক্‌নিক্যাল শিক্ষা, সহজে মেরামতের উপায়, স্বল্পব্যয়ে কিনিবার ব্যবস্থা না করিয়া বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাষের উন্নতি করিবার পথ নির্দ্দেশ করিয়া কোনো লাভ নাই। এখন গ্রামে গ্রামে কামার হাল তৈয়ারী করে, ছুতার গাড়ী মেরামত, লাঙল তৈয়ারী প্রভৃতি সব কাজ করে। বর্ত্তমানের অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা আছে। ইহার উন্নতি কিরূপে হইতে পারে, দেশের অবস্থার উপযোগী উন্নতির পথ সংস্কারককে বলিয়া দিতে হইবে, নিছক অনুকরণের পথ বলিয়া দিবার প্রয়োজন নাই। শিক্ষা বিস্তার বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফল প্রদর্শন প্রভৃতি করিতে পারিলে দেশের উন্নতি হইতে

পারে এবং ধান, তিল, তিসি প্রভৃতি শস্যের উৎপন্ন প্রায় দ্বিগুণ করা যায় ও পাট প্রায় শতকরা ৭০ হারে বাড়ানো যায়।

১৮৯৩ সালে ডাঃ ভোয়েলকার নামে য়ুরোপের একজন বিখ্যাত কৃষি-তত্ত্ববিদ্ ভারতের কৃষিসম্বন্ধে তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়া এক প্রতিবেদন প্রকাশ করেন। তাঁহার মহামূল্যবান্ গ্রন্থে তিনি যে কয়টি সুযুক্তিপূর্ণ প্রস্তাব করিয়াছিলেন নিম্নে তাহা প্রদত্ত হইল। (১) সাধারণ শিক্ষা ও বিশেষভাবে কৃষি-শিক্ষা প্রচার ও সেই উদ্দেশ্যে দেশীয় ভাষায় উপযুক্ত পুস্তক প্রকাশ,

ডাঃ ভোয়েলকারের প্রতিবেদন

(২) প্রয়োজনমত স্থানে খাল ও জল-সরবরাহের প্রণালী নির্ম্মাণ; (৩) সরকার হইতে টাকা অগ্রিম দিয়া কূপ খননাদি কার্য্যে উৎসাহ দান; (৪) সরকারী কৃষি-বিভাগ হইতে প্রত্যেক জেলার জলসেচনের ব্যবস্থা সম্বন্ধে তদারক; (৫) স্থানীয় বন যাহাতে কাটিয়া লোকে নষ্ট না করে সে বিষয়ে দৃষ্টি রক্ষা ও নূতন বনভূমি সৃষ্টি করা; গোচারণের ভূমি যাহাতে লোকে কৃষির জন্য আত্মসাৎ না করে; (৬) নূতন ফশল, অভিনব কৃষি পদ্ধতি নূতন সারের পরীক্ষা সরকারী কৃষিবিভাগে হইবে; (৭) নূতন যন্ত্রপাতি সরকারী ফার্ম্মে পরীক্ষিত হওয়া উচিত এবং তাহার মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট যন্ত্রপাতি চাষাদের মধ্যে প্রচার; (৮) ফার্ম হইতে ভাল বীজ প্রচার। ভাল ও মন্দ জাতের শস্য সর্বদাই এক সঙ্গে মাড়া হয় এবং বাজারে ক্রয়ের সময়ে তাহাদিগকে চিনিয়া পাওয়া যায় না। এই সমস্যা পুরণের চেষ্টা প্রয়োজন। (৯) সরকারী ফার্মে ভাল জাতের ষাঁড় রক্ষা করিয়া জেলার গোজাতির উন্নতি করা।

ডাঃ ভোয়েলকারের প্রত্যেকটি প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিলে ভাল হয়। আমরা দেশের জল-সেচন ও গোষ্ঠ-সমস্যা লইয়া সবিশেষ আলোচনা পরে করিব; এইখানে সার সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিব। শিল্প

সারের অভাব ও সারের রপ্তানী

পরিচ্ছেদে পাঠকগণ দেখিবেন যে আমাদের দেশ হইতে প্রচুর পরিমাণ তৈলশস্য প্রতি বৎসর রপ্তানী হইয়া যায়। এই তৈল-শস্যের খৈল খুব ভাল সার। দুঃখের বিষয় এ দেশে শস্য মাড়িয়া তৈল বাহির করিয়া রপ্তানী করিতে গেলে চাষীদের পোষায় না বলিয়া তাহারা বীজ সমেত শস্য বিক্রয় করিয়া ফেলে। জার্ম্মাণী ও অন্যান্য দেশ ছিল এই সব তৈল-শস্যের প্রধান খরিদ্দার। তাহারা সস্তায় কাঁচামাল পাইত, অধিকমূল্যে তৈল বিক্রয় করিত, এবং তা ছাড়া খৈলগুলি নিজ ক্ষেতের জন্য পাইত। আমাদের চাষীরা সস্তায় তৈল শস্য বিক্রয় করে সেই তৈলই অন্য আকারে এ দেশে দশগুণ দামে ফিরিয়া আসিলে কেনে, ফলে ক্ষেতগুলি সারের অভাবে ক্রমেই উৎপাদিক শক্তি হারাইতেছে। এ ছাড়া হাড় গুঁড়া খুব ভাল সার; অথচ প্রতিবৎসর এখানকার গরুর হাড় এদেশের সস্তা কলে পেশা হইয়া বিদেশের শস্য ক্ষেত্রের উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য রপ্তানী হইতেছে। ইহার উপর আবার ভারতবর্ষেই বিদেশী সার বিক্রয়ের জন্য প্রচণ্ড চেষ্টা করিতেছে। দক্ষিণ আমেরিকায় চিলি দেশের সাগর উপকূলে সামুদ্রিক গাছ পচিয়া একরূপ সার তৈয়ারী হইয়াছে; সেই সার আজ কাল ভারতে খুব আসিতেছে, এবং চিলি গবর্ণমেণ্ট তাহা প্রচারের জন্য খুবই চেষ্টা করিতেছেন। দেশের মধ্যে আরও অনেক রকম সার আছে; তাহা লোকের সংস্কারের জন্য নষ্ট হইতেছে। সহরের ময়লা, বিষ্ঠা, প্রস্রাব খুব ভাল সার; সেগুলির সদ্ব্যবহার হইলে দেশের জমির উৎপাদিকা শক্তি বাড়িবে। দুঃখের বিষয় দেশের কৃষিক্ষেত্রগুলি উপযুক্ত সারের অভাবে দিন দিন শক্তি হারাইতেছে। অন্যান্য দেশে উপযুক্ত সার দিয়া, নানা বৈজ্ঞানিক ক্রিয়ার সাহায্যে জমির উৎপাদিকা শক্তি চতুর্গুণ করিয়াছে।

কৃষিজাত বাণিজ্য। পাট

আমরা এইবার পাটের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। ভারতের প্রধান প্রধান কৃষিজাত সামগ্রীর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা শিল্প পরিচ্ছেদে প্রদত্ত হইয়াছে।

ভারতবর্ষ ভিন্ন অন্য কোনো দেশে এখনও পাটের চাষ বিস্তৃতভাবে আরম্ভ করা হয় নাই। ভারতবর্ষের মধ্যেও আসাম ও বঙ্গদেশেই ইহার চাষ বিশেষ প্রচলিত। বর্ত্তমানে বঙ্গদেশে ৮ কোটি বিঘা জমি চাষ হইয়া থাকে, এবং ৮ কোটি বিঘার মধ্যে প্রায় ১ কোটি বিঘা জমিতে পাট চাষ হয়। বৎসরে প্রায় ত্রিশ-কোটি টাকার পাট বিদেশে রপ্তানী হয়। এ ছাড়া পাটের চট, থলি প্রভৃতি ও বিদেশে পাঠান হয়।

পাটের জমির পরিমাণ

বাংলাদেশে পাটের ব্যবসা ও বাণিজ্যের সূত্রপাত ১৮৫৫ সালে। ঐ বৎসরে রিশড়া সহরে প্রথম পাটের কল চলিতে আরম্ভ করে। তখনকার দৈনিক ৮ টনের স্থলে বর্ত্তমান পাটের কলে প্রতিদিন (৩০০০) তিন হাজার টন পাট উৎপন্ন হইতেছে। জর্জ অক্‌ল্যাণ্ড নামক জনৈক স্কটল্যাণ্ডবাসী এই ব্যবসায়ের প্রথম উদ্‌যোক্তা; তাঁহারই চেষ্টায় মিঃ জন কার নামক জনৈক ধনী তাঁহাকে টাকা দিয়া সাহায্য করেন। তিনি ভারতে কলকব্জা লইয়া আসিয়া রিশড়াতে কারখানা খোলেন।

পাটের কলের ইতিহাস

ইহার পর হইতে পাটের কারবার দ্রুত আগাইয়া যাইতে থাকে। ১৮৮০ সাল হইতে ১৮৮৪ সালের মধ্যে পাটের কল ছিল ২১টি; ১৯১৪ সালে ৬৪টি—অর্থাৎ তিনগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯১৪ সালে পাটের কলে ৩৭ কোটি থলি এবং ১০৬ কোটি ২০ লক্ষ গজ পাটের চট কাপড় বোনা হইয়াছিল।

পাটের ব্যবসায় বৃদ্ধির কথা বলা হইল ; কিন্তু এক্ষণে পাটের চাষ সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলা প্রয়োজন। পাটের চাষ বহুদিন হইতে এ দেশে চলিয়া আসিতেছে। ১৮০২ সালে রংপুর অঞ্চলে নাকি ২০,০০০ একার (৬৫ হাজার বিঘায়) জমিতে পাটের আবাদ ছিল। পাটের সঙ্গে য়ুরোপের পরিচয় ১৮২৮ সালের কাছা-কাছি কোনো সময়ে। কিন্তু ১৮৭২ সালে সব প্রথম সরকার বাহাদুরের দৃষ্টি ইহার উপর পড়ে। তার পর ১৯০১ সালের পর হইতেই পাটের চাষের উন্নতি চেষ্টার প্রার্থনা লইয়া য়ুরোপীয় বণিকেরা বহুবার উপস্থিত হইলে গভর্ণমেণ্ট ১৯০৪ সালে একজন বিশেষজ্ঞকে এই বিভাগ তদারক করিবার জন্য নিযুক্ত করিলেন। কৃষিবিভাগ পাটের উন্নতির জন্য কৃষককে সময়ে সময়ে অনেক উপদেশ দিয়া থাকেন। ইহা ছাড়া আরো একটি কাজ কৃষিবিভাগকে করিতে হয়। তাহার নাম 'পাটের পূর্বাভাস'। ইহার তাৎপর্য্য এই যে কি পরিমাণ পাট জন্মিবে বলিয়া আশা করা যায় ফসল উঠিবার পূর্বেই তাহার কিছু আভাস দিতে পারিলে বিদেশী পাট বণিকের ব্যবসায় ও বাণিজ্যে সুবিধা হয়। এই সুবিধাটুকুর জন্য কৃষিবিভাগ যথেষ্ট করেন। আষাঢ় মাস হইতে 'পূর্বাভাস' প্রকাশিত হইতে থাকে এবং এই কাজ লইয়াই কৃষিবিভাগ ব্যস্ত থাকেন। কিন্তু পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ইতিহাসে বেশ দেখা যায় যে, সে সকল স্থানের কৃষি মহাসম্মিলনী হইতেই কত জমিতে কি কি ফসল উৎপন্ন করিতে হইবে তাহা কৃষকদিগকে জানাইয়া দেওয়া হয়। তদনুসারে তাহারা চাষ আবাদ করিয়া থাকে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে কৃষকদের উন্নতির জন্য সেরূপ কোনো ব্যবস্থাই নাই। কৃষকেরা কোন ফসলের কত প্রয়োজন তাহা না জানিয়াই আবাদ করে; তাহা না জানাই তাহাদের দুরবস্থার প্রধান কারণ। প্রয়োজনের অতিরিক্ত ফসল আমাদের কৃষকেরা উৎপন্ন

পাটের চাষের ইতিহাস

প্রয়োজনের অপেক্ষা অধিক পাট উৎপন্ন হয়

করে বলিয়া এত কম মূল্যে পাট তাহাদিগকে বিক্রয় করিতে হয়; কারণ গরজটা কৃষকদের বণিকদের নয়।

১৯২০ সালে প্রায় ৬২ লক্ষ গাইট অর্থাৎ ৩ কোটি ১০ লক্ষ মণ পাট মজুত ছিল; তার উপর এই বৎসরের সরকারী পূর্বভাস অনুসারে ৩ কোটি মণ পাট হইবে। এই মোট ৬, কোটি ১০ লক্ষ মণ পাট মজুত আছে বলিয়া অনুমান করা যায়। বিদেশে রপ্তানী এবং কলিকাতার মিলগুলির সাম্বৎসরিক মোট খরচ অনুমান ৪ কোটি ৩২ লক্ষ মণ। মোটামুটি ৩৫৷৷০ লক্ষ গাইট অর্থাৎ ১ কোটি ৭০ লক্ষ মণ পাট উদ্বৃত্ত থাকিয়া আগামী বৎসরে জের যাইবে। ইহা ছাড়া বিলাতের কারখানায় কিছু পাট গুদমজাত আছে। এখন প্রশ্ন এই উদ্বৃত্ত পাট লইয়া আমরা কি করিব! যেখানে প্রয়োজনের চেয়ে আমদানী বেশী সেখানে গরজ বিক্রেতার, ক্রেতার নহে। এ ছাড়া দাদন খাইয়া চাষা অল্প মূল্যে শস্য বিক্রয় করিয়া দিতে বাধ্য হয়। একই দিনে বাজারে যখন পাটের দাম ৮৷৷৴০-৯৲ মণ, তখন দাদন খাইয়া কৃষক ৫৷৷০-৬৲ টাকা মণে পাট মহাজনের কাছে বিক্রয় করিতেছে। আমাদের দেশের বিশেষভাবে বাংলাদেশে আখ, তামাক ও তুলার চাষ খুব কমই হয়; অথচ প্রয়োজনের অতিরিক্ত পাট বুনিয়া চাষারা চিরদিন দারিদ্র্য দুঃখে কষ্ট পাইতেছে। সরকার বাহাদুর এই দিকে যদি দৃষ্টি দেন তবে চাষীদের যথার্থ উন্নতি হয়।

এছাড়া বর্ষাকালে পাটের 'জাগের' জন্য জল দূষিত হইয়া যে মেলেরিয়ার সৃষ্টি করে বা প্রাদুর্ভাব হয় তা সকলেই স্বীকার করেন। পাটের ক্ষেতেও মেলেরিয়ার মশা বাস করে। পাটপচা দূষিত জলে মাছ পর্যান্ত মরিয়া যায়। তাহাতে যথেষ্ট মাছের অভাবে দেশের খাদ্যদ্রব্যের অভাব ঘটিয়া থাকে। অতএব পাটের বুনানী কম করিলে যে কৃষকের স্বাস্থ্যের যথেষ্ট উন্নতি

পাটের চাষ ও দেশের অবস্থা।

হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই; এবং প্রয়োজন অনুরূপ পাট উৎপাদন জন্য কৃষকের ও দেশের ধনাগমও বৃদ্ধি হইবে।

কোনো কোনো বৎসর পাটের দর ৫৲ মণেও নামে। কিন্তু এই পাট বিদেশে গিয়া ৫০৲ টাকা দরেও বিক্রয় হয়। এদেশের কোনো কোনো কল এক বৎসরে প্রতি ২০০৲ টাকার অংশে খরচপত্র সমুদয় বাদে অংশীদারগণকে ৩৭৫৲ টাকা হারে লাভ দিয়াছেন।

পাট কলের লাভ।

অথচ উপস্থিত দুর্মূল্যতার দিনে সর্বপ্রকার খরচ এবং বাজারদরে মজুরি ধরিয়া গৃহস্থ ৬৲ হইতে ৬।০ টাকার কমে একমণ পাট উৎপন্ন করিতে পারে না; কিন্তু বিক্রয়ের বেলায় সে ৫৲ টাকার বেশী এ বৎসর পায় নাই।

পৃথিবীর মধ্যে আর কোথাও পাট হয় না এবং বাংলাদেশের পাটের তৈয়ারী চট ও থলিতে পৃথিবীর অনেক জিনিষ বস্তাবন্দী হইয়া সমুদ্র পারাপার করে, পাশ্চাত্য জগতের অনেক প্রয়োজন লাগে বলিয়া ইহার বিষদ আলোচনা করিলাম।

কৃষি ভারতের প্রধান অবলম্বন একথা একাধিকবার পূর্বে বলিয়াছি। অন্যান্য দেশে কৃষির সহিত লোকে নানাবিধ শিল্প ও বাণিজ্য করে। আমাদের শতকরা ৭২ জন লোক চাষী বা চাষ সংক্রান্ত কর্মে লিপ্ত। কৃষিজাত দ্রব্য হইতে যদি আমরা শিল্পজাত সামগ্রী উৎপন্ন করিয়া নিজেরাই তাহার ব্যবসা চালাইতে পারিতাম তবে বোধ হয় দেশের অবস্থা এমন শোচনীয় হইত না। এখন আমাদের কাজ কোনো প্রকারে মাটি চষিয়া শস্যাদি উৎপন্ন করা এবং বিদেশী হাটে যেযে কৃষিজাত কাঁচা মালের

---

* ব্যারিষ্টার এচ. ডি. বসু মহাশয়ের লিখিত 'পাটের চাষ ও কৃষকের দুরবস্থা' শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি। মানসী, ৭ম বর্ষ ১১শ সংখ্যা ১৩২৭ দ্রষ্টব্য।

কাটতি হয় তাহা রপ্তানি করিবার জন্য বিদেশী বণিকের শরণাপন্ন হওয়া।

পৃথিবীর সর্বত্রই জীবিকার্জ্জনের যে সমস্যা উপস্থিত আমাদের সম্মুখেও তাহা দেখা দিয়াছে। আমাদের দেশে জনসংখ্যা বাড়িতেছে; আহার্য্য সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি পাইবার সঙ্গে সঙ্গে সেই অনুপাতে লোকের বেতন-হার বৃদ্ধি পাইতেছে না। বিদেশী বাণিজ্য হুহু করিয়া বাড়িয়া চলিয়াছে এবং সেই সঙ্গে দেশীয় কুটির-শিল্প ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতেছে। শিল্পীরা জীবিকা নির্বাহের অন্য পথ খুঁজিয়া না পাইয়া জমি চাষ করিয়া বা অপরের জমিতে 'কৃষানী' করিয়া অন্নবস্ত্রের সংস্থান করিতেছে। আবাদী জমির উপর জনসংখ্যার চাপ ক্রমেই বাড়িতেছে। যাহারা জীবনধারণের নিমিত্ত কেবলমাত্র চাষবাসের উপর নির্ভর করে, গড়ে হিসাব করিলে তাহাদের ভাগ জমির পরিমাণ বৃদ্ধি না পাইয়া বরং কমিতেছে; আবার আবাদী জমিতেও শস্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে না। ১৯০১-২ সালে গড়পড়তায় প্রত্যেক কৃষকের অংশে ৩ বিঘা ১৭ কাঠা করিয়া জমি পড়িত; ১৯১১-১২ সালে ৩ বিঘা ১৪ কাঠা করিয়া ও ১৯১৪-১৫ সালে ৩ বিঘা করিয়া পড়িয়াছিল বলিয়া প্রকাশ। পূর্বে আমরা দেখাইয়াছি যে ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা প্রতি বৎসর বাড়িয়া চলিয়াছে। সুতরাং কৃষির সমস্যা কিরূপ জটিল হইতেছে তাহা আমরা সহজেই বুঝিতে পারি।

কৃষকের সংখ্যা ও গড়পড়তায় জমির পরিমাণ।

ইহার উপর এদেশের শস্যক্ষেত্রে অন্য দেশের তুলনায় শস্য পরিমাণ ঠিক অল্প হয় তাহা দেখিলে সমস্যাটিকে স্পষ্টতর বুঝিতে পারিব। বোধ হয় সভ্যজগতে একার প্রতি ১২ বুশেল গম আর কোথাও হয় না। কানাডায় হয় ২৩·৭ বুশেল। ডেনমার্কে যেখানে হয় ১০ মণ ৩৫ সের, এদেশে সেখানে ২ মণ ৩০ সের; কিছুদিন পূর্বে একজন সরকারী উচ্চ কর্মচারী

এদেশের জমির উৎপাদিকা শক্তির হ্রাস

(K. L. Dutta—Prices & wages of India 1914) ভারতের বাজার দরের মহার্ঘতা বিষয়ে এক সরকারী প্রতিবেদন প্রকাশ করেন। তিনি বলেন ভারতবর্ষের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইলেও আবাদী জমির তেমন বিস্তার হয় নাই, এবং খাদ্যশস্যের প্রয়োজন যেমন বৃদ্ধি হইয়াছে ইহার উৎপন্ন শস্য তেমন বৃদ্ধি পায় নাই। আমরা পরিশিষ্ঠে তাঁহার হিসাবটি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

খাদ্য-শস্য জনসংখ্যার অনুপাতে কম।

এই প্রতিবেদন প্রকাশিত হইবার পর সম্প্রতি দুই একবৎসরের মধ্যে জলসেচনের সুব্যবস্থা করিয়া দেওয়ায় আবাদী জমি বিস্তার লাভ করিয়াছে এবং খাদ্যশস্যের জমিও বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু এখনো অবস্থা উন্নত করিবার অনেক রহিয়াছে; অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতবাসীর ন্যায় দরিদ্র কৃষক পৃথিবীতে আর কোথায় আছে কি না সন্দেহ। এই অপবাদ দূর করিবার জন্য সরকার বাহাদুরও কৃষিবিভাগের উন্নতির দিকে দৃষ্টি দিয়াছেন।

পরিশিষ্ট ১

কৃষিই প্রধান পেশা।

জনসংখ্যা (১৯১১)	৩১,৩৪,৭০,০০০
কৃষিকর্ম দ্বারা জীবিকা নির্বাহ	২২,৬৫,৫০,০০০
কৃষিকর্ম শতকরা	৭২ জন

(তন্মধ্যে ৬৯ জন চাষবাস ও তিনজন সব্‌জী বাগান ও হাঁস মুরগী পালন প্রভৃতি কর্মে লিপ্ত)

চাষের উপর নির্ভর	২১,৭০,০০,০০০
ভূস্বামী	৮০,০৯,০০০
কর্মচারী	১০,০০,০০০
কৃষি মজুর	৪,১০,০০,০০০
কৃষক	১৬,৭০,০০,০০০

পরিশিষ্ট ২

ভূমিহীন দিন-মজুরের সংখ্যা কিরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে।

১৮৯১	১,৮৬,৭৬,২০৬
১৯০১	৩,৩৫,২২,৬৮১
১৯১১	৪,১২,৪৬,৩৩৫

কৃষকের সংখ্যা ও জমির পরিমাণ।

	ঠিক যে পরিমাণ জমিতে শস্য উৎপন্ন হয় (একর)	কেবল মাত্র চাষবাসের উপর যাহাদের জীবিকা নির্ভর তাহাদের সংখ্যা	গড়পড়তায় প্রত্যেক কৃষকের অংশে কত জমি পড়ে
১৯০১-২	১৯৯,৭০৮,৪২২	১৫,৫৪, ৭৬,৭৮৮	১·২৮ একর অর্থাৎ ৩/৫২
১৯১১-১২	২১৫,৯৮৯,৬০৩	১৭,৩৯,৯৫০২২	১·২৪ „ „ ৩/॥৪
১৯১৪-১৫	২২৭,৬১১,১৩২	২২,৪৬,৯৫,৯০০	১·০১ „ „ ৩/০

পরিশিষ্ট ৩

ভারতবর্ষের জমির খতিয়ান।

(এক একার ৩/॥ তিন বিঘা আধ কাঠার সমান)

মোট জমি (বৃটিশ)	৬১,৯৩,১১, ১৯৮	একর
আবাদী জমির পরিমাণ	২৬,০৬,৪০, ৭৯৮	„
ঠিক যাহা আবাদ হইয়াছে	২২,৭৬,১১, ১৩২	„
আবাদের অযোগ্য জমি	১৪,৫৪,২৭, ২১৭	„

ধান, চাল প্রভৃতি খাদ্য

শস্যের জমি—২০,৪৫,০৪,৫৫০ একার অর্থাৎ শতকরা ৭৮-৭ ভাগ।

তৈল, শস্যের জমি	১,৫৩,৩৩,৫৯১	„	„	৫·৯%।
তুলা, পাট প্রভৃতি	১,৯৫,০৭.০০০	„	„	৭·৫%
গোখাদ্যের জমি	৬৩,৬২,৫১১	„	„	২·৫%
বিবিধ	১,৪৮,৩৩,১৪৬	„	„	৫·৫%

পরিশিষ্ট ৪

একারপ্রতি জমির উৎপন্ন শস্যের অনুপাত।

	বুসেল (প্রতি একারে) ১ বুসেল—৯৷৷০ সের	যে বৎসর এই পরিমাণ ফসল পাওয়া গিয়াছে।
ক্যানাডা	২৭০৭	১৯১৪-১৫
মার্কিণদেশ	১৬০৬	১৯১৩-১৪
অষ্ট্রেলিয়া	১৩০৭	১৯০৮-৯
রুষিয়া	১৩০৫	১৯১২-১৩
ভারতবর্ষ	১২০৮	১৯০৯-১০

আর একটি গমের হিসাব।

	প্রতি বিঘায়
ডেনমার্ক	১০৸৫ মণ
বেলজিয়াম	৮৷৷৮ মণ
জার্ম্মাণী	৭৷২ মণ
ফ্রান্স	৫৷১ মণ
জাপান*	৪৷৷৪ মণ
ইতালী	৩৷৷৪ মণ
ভারতবর্ষ	২৸০ মণ

* জাপানে ধানই অধিক জন্মে। প্রতি একারে গড়ে জাপানীরা ৩৭ বুসেল ধান জন্মাইতে পারে। বিশেষ বিশেষ স্থানে ৬০ বুশেল পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে।

পরিশিষ্ট ৫

[নিম্নে যে তালিকাটি প্রদত্ত হইল তাহা ১০০এর অনুপাতে দেওয়া হইল]

	১৮৯০ হইতে ১৮৯৬	১৮৯৫ হইতে ১৯০০	১৯০০ হইতে ১৯০৫	১৯০৫ হইতে ১৯১১	১৯১০ হইতে ১৯১১	১৯১১ হইতে ১৯১২
জনসংখ্যা	১০০	১০১·৬	১০৩·৭	১০৫·৭	১০৭·৮	১০৮·৪
আবাদী জমির বিস্তার	১০০	৯৮	১০৩	১০৫	১০৮	১০৬
যে পরিমাণ জমিতে খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয়	১০০	৯৬	১০১	১০২	১০৬	১০৩
যে পরিমাণ খাদ্য শস্য উৎপন্ন হয়।	১০০	৯৮	১০৫	৯৯	১০৩	১০৯

২। জলসেচন

আমরা 'কৃষি' অধ্যায়ে দেখিয়াছি যে ভারতের কৃষি-উন্নতি বহুল পরিমাণে কৃত্রিম জলসেচনের সুব্যবস্থার উপর নির্ভর করে। জলসেচনের জন্য যে জল প্রয়োজন হয় তাহা তিন উপায়ে মানুষ সংগ্রহ করে, যথা—(১) কূপ, (২) পুষ্করিণী (৩) খাল। আমাদের দেশে প্রতিবৎসর যে পরিমাণ বৃষ্টি হয় তাহা নিতান্ত কম নয়; পণ্ডিতেরা হিসাব করিয়া বলিয়াছেন যে এদেশে মোট ১২৫ লক্ষ কোটি ঘন-ফুট বৃষ্টিপাত হয়; কিন্তু মোট ৫১ লক্ষ কোটি ঘন-ফুট জল উপরে পাওয়া যায়। এই বৃষ্টিজল হইতে মাত্র ৬⅓ কোটি ঘন ফুট জল সেচনের জন্য ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ মোট বৃষ্টির ৫৯ ভাগ মাটি শুষিয়া লয়, ৩৫ ভাগ জল নদী বহিয়া সাগরে যায় ও ৬ ভাগ মাত্র কৃত্রিম উপায়ে রক্ষিত হইয়া সেচনের কাজে লাগে। যে পরিমাণ বৃষ্টি মাটিতে শুষিয়া লয় তাহার ১½ ভাগ মাত্র আমরা কূয়া খুঁড়িয়া উদ্ধার করিতে পারি এবং তাহাই শস্যোৎপন্নে ব্যবহার করি।

জলসেচনের ত্রিবিধ উপায়।

মোট বৃষ্টি-পাতের পরিমাণ।

(১) কূপ খনন করিয়া ভারতের কৃষিকার্য্য বহুকাল হইতে চলিতেছে। এই কার্য্যে পূর্ব্বেও কখনো সরকারী সাহায্য পাওয়া যায় নাই—এখনও প্রয়োজন করে না। বর্ত্তমানে ভারতের সমগ্র সিঞ্চিত-ক্ষেত্রের শতকরা ৩% ভাগ কূপের সাহায্যে জল পাইয়া থাকে। কূপের জলে যে সব ক্ষেত্র সিঞ্চিত হয় সেখান হইতে যে আয় হয় তাহা অনুপাতে অনেক বেশী। ভারতে কূপের জলে সিঞ্চিত ১ কোটি ৩০ লক্ষ একার ক্ষেত্রের মধ্যে ৯৫ লক্ষ একার জমিই পঞ্জাব ও

কূপ ও কৃষি।

যুক্ত-প্রদেশে। এই কূপ যে সর্বত্রই স্থায়ী তা নয়; অনেক সময়ে কাঁচা-কূয়া হইতে কয়েক বৎসর জল তুলিয়া লোকে সেটিকে ছাড়িয়া দেয়। যুক্ত-প্রদেশের সিকি কূয়া পাকা—আর অবশিষ্ট কাঁচা। কাঁচা কূয়ায় প্রচুর জল পাওয়া যায় না; একটা কূয়ায় ১২।১৪ বিঘার বেশী জল যোগাইতে পারে না। কিন্তু পঞ্জাবের অধিকাংশ কূয়া পাকা বলিয়া গড়ে প্রতি কূয়া প্রায় ৪০ বিঘা জমিতে জল যোগাইতে পারে। মান্দ্রাজের লম্বা আঁশের কাম্বোজী তুলার চাষ কূয়ার জলের উপর নির্ভর করে। যেখানে খাল, বিল, নদী, পুকুর কিছুই নাই সেখানে কূয়া ভিন্ন আর উপায় নাই। এইজন্য কয়েক বৎসর কূপ খননের দিকে বোম্বাই, মান্দ্রাজ, উত্তর-পশ্চিম ও পঞ্জাব গভর্ণমেণ্ট বিশেষ দৃষ্টি দিয়াছেন। কূপ খনন যাহাতে আরো প্রচলিত হয় গভর্ণমেণ্ট সেইজন্য টাকা কর্জ্জ দিবারও সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। এই 'তাকাভি' ধারের সুদও অল্প এবং জমি জল পাইয়া উর্ব্বরা হইলে যাহাতে খাজনা বৃদ্ধি না হয় তদ্রূপ ব্যবস্থাও হইয়াছে।

কিন্তু কূয়া হইতে জল তোলার কষ্ট ও ব্যয় দুইই অধিক। বিলাতী পাম্প ও এঞ্জিন বসাইয়া ক্ষেতে জল দিবার মত শিক্ষা ও অবস্থা এখনো আসে নাই। পঞ্জাবের ঘটিচক্র প্রথার উন্নতি ও প্রচলন করিতে পারিলে এই সমস্যা কিয়দপরিমাণে প্রশমিত হইতে পারে। সরকার বাহাদুর বোম্বাই ও যুক্ত-প্রদেশের কৃষি-বিভাগে একজন করিয়া ইঞ্জিনীয়ার বিশেষভাবে এইসব সমস্যা সমাধান করিবার ও উপদেশ দিবার জন্য নিযুক্ত করিয়াছেন।

(২) আমাদের দেশের শাস্ত্রে আছে যে পুষ্করিণী দান মহাপুণ্য কার্য্য। সেইজন্য ভারতবর্ষের সর্বত্রই ছোট বড় পুষ্করিণী দেখা যায়। বাংলাদেশে এমন গ্রাম নাই যেখানে পাঁচ দশটা পুকুর না আছে; অবশ্য সেগুলি অধিকাংশ স্থলেই অপরিষ্কার, পঙ্কিল ও শৈবালে পূর্ণ। বাংলাদেশের অনেক স্থলে এই সব পুকুর

দীঘি ও কৃষি।

হইতে সেচ দিয়া নানাপ্রকার শস্য উদ্ভিদ্ (যেমন ইক্ষু ও আলু) উৎপন্ন হয়। কিন্তু দাক্ষিণাত্যেই যথার্থভাবে কৃষি পুষ্করিণীর জলের উপর নির্ভর করে। মান্দ্রাজে ও মৈশূরে মোট পুষ্করিণীর সংখ্যা ৬০ হাজারের অধিক। মান্দ্রাজের চিঙ্গলিপুট জেলায় এক একটি দীঘি দৈর্ঘ্যে প্রস্থে ও গভীরতায় এত বৃহৎ যে ইহা হইতে দশ বার হাজার বিঘা জমিতে জল সেচন করা হয়। এখানকার অধিকাংশ পুকুর ও খাল হিন্দুরাজাদের সময়ে হয়। সিংহলের বাঁধগুলিকে দেখিলে তাহা কৃত্রিম বলিয়াই সন্দেহ হয়। দাক্ষিণাত্যে তুষারময় পর্বত নাই; সেইজন্য সেখানকার নদীগুলি গভীর বা নৌতার্য্য নহে। বৃষ্টিও প্রচুর হয় না। সুতরাং যে বৃষ্টি পড়ে তাহাই ধরিয়া রাখিবার সাধ্যমত চেষ্টা লোকে করিয়াছে। দাক্ষিণাত্যের পনের আনার উপর বাঁধ বা পুকুর—যা আজকাল দেখা যায়—প্রাচীন হিন্দু বা মুসলমান রাজা জমিদার ও গ্রাম্যমণ্ডলীর কীর্ত্তি।

কূপের ন্যায় ছোট ছোট পুকুর বা বাঁধ ব্যক্তি বিশেষের সম্পত্তি। কিন্তু বড় বড় দীঘি বর্ত্তমানে সবই সরকারের খাস অধীন; সরকার বাহাদুরই, এগুলির সংস্কার, তদারক ও জলসেচনের জন্য প্রণালী নির্মাণ করিয়া দেন; সুতরাং মুনফা তাঁহারই। সমগ্র বৃটীশ ভারতে প্রায় ৮০ লক্ষ একার জমি পুষ্করিণীর জলে সিঞ্চিত হয়। কিন্তু খুব অনাবৃষ্টির সময়ে অনেক পুকুরই শুকাইয়া যায়।

(৩) জলসেচনের তৃতীয় উপায় খাল। এই খাল নানা উপায়ে খোঁড়া হয়। প্রথমতঃ যখন বন্যার জল অকস্মাৎ পাহাড় হইতে বরফ গলিয়া আসিয়া পড়ে, সেই জলের সদ্ব্যবহারের জন্য লোকে খাল কাটিয়া দেয়; তখন বন্যার জল মরুময় দেশের ভিতরে প্রবেশ করে। পঞ্জাবে এই শ্রেণীর খাল বহুকাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে; বর্ত্তমান সেগুলির ভার জেলা ও লোক্যাল বোর্ডের উপর ন্যস্ত। আর একপ্রকারে লোকে ক্ষেতে জল লইয়া যায়। যে নদীর গতি ও মতির ঠিক

খাল ও কৃষি।

নাই—তাহাকে বাঁধ দিয়া বাঁধিয়া তাহার জল আলের মধ্য দিয়া বহাইয়া ক্ষেতে লইয়া যাইবার কৌশল মানুষ বহুকাল আবিষ্কার করিয়াছে। এ ছাড়া বড় বড় নদীর বক্ষ শুষিয়া যে খালগুলি পরিপুষ্ট তাহাদের জলের অভাব কখনো হয় না। আমরা এই তিন শ্রেণীর খালের তিনটি নাম দিলাম, যথা—বন্যাখাল, সাময়িক খাল, ও স্থায়ীখাল।

ইংরাজ আগমনের পূর্বে এদেশের বহুস্থানে খাল ছিল। দাক্ষিণাত্যে হিন্দুরাজগণ ও উত্তর-ভারতে পাঠান মোগল ও শিখ শাসনকর্ত্তাদের সময়ে খুব বড় বড় খাল কাটা হইয়াছিল এবং অধিকাংশ স্থলেই পূর্বের খাল খুঁড়িয়া গভীর ও প্রশস্ত করিতেই সরকার বহুকাল ব্যাপৃত ছিলেন।

খাল-খননের ইতিহাস।

বৃটীশ গভর্ণমেণ্ট ১৮৪০ সালে খাল কাটাইবার প্রথম আয়োজন করেন। ১৮৪৭ সালে মান্দ্রাজ অঞ্চলে একটি কোম্পানী খাল খনন করিবার অনুমতি পায়; কিন্তু কিছুকাল কাজ করিয়া তাহারা বুঝিল রাজশক্তি ব্যতীত একাজ সম্ভব নহে। ইহাদের জলের কর কিছু অধিক ছিল বলিয়াও নানা গোলযোগের সৃষ্টি হইয়াছিল; লর্ড লরেন্সের শাসনকালে গভর্ণমেণ্ট স্বয়ং এই কার্য্যের ভার গ্রহণ করিলেন। কিন্তু লর্ড কর্জ্জনের পূর্বে এ বিষয়ে শৃঙ্খলাবদ্ধ কার্য্যপ্রণালী অনুসৃত হয় নাই। ১৯০১-৩ সালে কৃষিক্ষেত্রে জল সরবরাহ করিবার জন্য এক কমিশন বা বৈঠক (Indian Irrigation Commission 1901-3) বসিয়াছিল। সেই বৈঠক ভারতের সর্বত্র জলের অবস্থা পরিদর্শন করিয়া এক অতি সুন্দর প্রতিবেদন পেশ করেন। বলিতে গেলে সেই সময় হইতেই ভারতের জলসেচন বিভাগের পত্তন। রিপোর্টে প্রকাশ ভারতের ২২ কোটি ৬০ লক্ষ একার ভূমির মধ্যে ৪ কোটি ৪০ লক্ষ অর্থাৎ মাত্র শতকরা ২০ ভাগ জমি যথার্থরূপে সেচন পাইয়া

জলসেচনে সরকারী ও ব্যক্তিগত চেষ্টা।

থাকে। ইহার মধ্যে সরকারের সাহায্যে জল পায় এমন ক্ষেতের অনুপাত শতকরা ৪২; অবশিষ্ট ৫৮ ভাগ ক্ষেত কৃষকদের ব্যক্তিগত চেষ্টায় সিঞ্চিত হয়। গত ২৫ বৎসরে প্রায় ৮০ লক্ষ একার ভূমি চাষের উপযোগী করা হইয়াছে; ইহার মধ্যে ব্যক্তিগত চেষ্টার ফলে প্রায় ৩০ লক্ষ একার ভূমিতে জলদানের ব্যবস্থা হইয়াছিল।

গভর্ণমেণ্ট জলসেচনের নিমিত্ত যে অর্থব্যয় করেন জলের ট্যাক্স বসাইয়া তাহা সুদসহ আদায় করেন। অতএব পয়োপ্রণালীর সুব্যবস্থা করিলে যে কেবল শস্যবৃদ্ধি পায় এবং প্রজার কল্যাণ হয় তাহা নহে রাজকোষেও বেশ অর্থাগম হইয়া থাকে। ১৯১৭-১৮ সাল পর্য্যন্ত

জলকর ও সরকারী আয়।

সরকার বাহাদুর পয়োপ্রণালীর জন্য প্রায় ৭২ কোটি ৭৯ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছেন; ইহা হইতে সরকারী আয় প্রায় শতকরা ৮½ হিসাবে হইয়াছিল। এইরূপ লাভ গভর্ণমেণ্টের প্রতিবৎসরই হইতেছে। ভারতবর্ষীয় নেতার ও অনেক ইংরাজ রাজপুরুষ পয়োপ্রণালীর বহুল বিস্তারের জন্য সরকারকে বহুকাল হইতে অনুরোধ করিয়া আসিতেছেন। ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ। এখানকার একবিঘা জমিও যদি জল বিনা শস্য উৎপন্ন করিতে না পারে তবে তাহা সরকার বাহাদুরের লোকসান। প্রজার শ্রীবৃদ্ধিই সরকারের মঙ্গল। সরকার বাহাদুর জলসেচনের সুব্যবস্থার জন্য যদিও ৭২ কোটি টাকা ব্যয় করিয়াছেন তাহা রেলপথের ব্যয়ের তুলনায় কিছুই নয়। অথচ রেলপথের জন্য সরকারকে বহুকাল লোকসান দিয়া আসিতে হইয়াছে;

রেলপথ ও জলপথ।

কয়েক বৎসর মাত্র রেলপথ হইতে লাভ হইতেছে। রেলওয়ে ও পয়োপ্রণালী বিভাগে গভর্ণমেণ্টের কত আয় তাহা তুলনা করিয়া নিম্নে দেখাইতেছি।

	১৯১৩-১৪	১৯১৪-১৫	১৯১৫-১৬	১৯১৭-১৮
রেলওয়ে	১.৩৬শতকরা	.৫৩ শতকরা	.৩২ শতকরা	
পয়োপ্রণালী	৫.৮৭ „	৫.৪৪ „	৫.৩০ „	৮.৪০শতকরা

অথচ প্রতিবৎসরই ভারতীয় বাজেটে রেলপথের জন্য প্রচুর ব্যয় করিবার ব্যবস্থা থাকে। যাহাই হউক এপর্য্যন্ত গভর্ণমেণ্ট যাহা করিয়াছেন তাহাও নিতান্ত কম নয়। পঞ্জাবে তাঁহাদের কাজ বিশেষ ভাবে প্রশংসনীয়। সেখানে বৃষ্টি কম; সুতরাং যদি খাল কাটিয়া জল ভিতরে না লইয়া যাওয়া হয় তবে নদীর ধার ছাড়া চাষ হওয়া অসম্ভব।

পূর্ব্বোক্ত কমিশনের সভ্যগণ বলিয়াছেন যে পঞ্জাব সিন্ধুপ্রদেশ ও মান্দ্রাজ প্রদেশের কোনো কোনো অংশে জলাভাবে দুর্ভিক্ষ হইবার সম্ভাবনা অধিক; সুতরাং এই সকল দেশে আশু ব্যবস্থা প্রয়োজন। গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদের উপদেশানুসারে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত-প্রদেশে এক বিরাট খাল কাটাইয়াছেন। সোয়াত নদী হইতে এই খাল উঠিয়া পর্ব্বতগুহা বা টানেলের ভিতর দিয়া আর এক ধারে গিয়াছে। সীমান্ত-প্রদেশের ৩ লক্ষ ৮২ হাজার একার ভূমি এই খালের জলের সাহায্যে উর্ব্বরা হইয়াছে। এই খাল খননে ভারত সরকারের প্রায় ১ কোটী ৮২ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। কিন্তু ইহার উপকারিতা অঙ্কপাতের হিসাবে দেখানো যাইবে না; যে পার্ব্বত্য দস্যুগণের অত্যাচারে সীমান্তবাসীদিগকে সর্ব্বদাই সশঙ্কিত থাকিতে হইত, তাহারা আজ শান্ত কৃষক হইয়া বাস করিতেছে।

খালখননে ইংরাজদের কীর্ত্তি

ইঞ্জিনিয়ারগণের আর একটি বিপুল কীর্ত্তি উল্লেখযোগ্য। পঞ্জাবে তাঁহারা এক অভিনব খাল নির্ম্মাণে মনোযোগ দিয়াছেন। ইহাকে বৈজ্ঞানিক ভাষায় Triple Project বলে। ব্যাপারটা এই:—চন্দ্রভাগা ও ইরাবতীর অধিকাংশ জলরাশি দুই দোয়াব বা উভয় নদীর মধ্যস্থিত প্রদেশে ব্যয়িত হইয়া যায়। ফলে বারিদোয়াবের দক্ষিণাংশটা মরুভূমির

স্থায় শুষ্ক থাকিয়া যায়। অথচ চিরস্রোতা ঝিলাম বা বিতস্তায় জলের অভাব নাই। ইঞ্জিনীয়ারগণ উত্তরের সেই জলরাশি ঝিলাম হইতে কাটিয়া চন্দ্রভাগা ও ইরাবতী পার করিয়া দক্ষিণ-পঞ্জাবে আনিতে কৃত সংকল্প। ঝিলামের জলের খাদ উচ্চ-ভূমি দিয়া প্রবাহিত; সুতরাং সেখানকার জল প্রথমে চন্দ্রভাগায় ও পরে ইরাবতীতে আনিয়া দক্ষিণ-পঞ্জাবে আনিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। অনুমান প্রায় দশ কোটী টাকা এই খাল-খননে ব্যয় হইবে; কিন্তু লাভও হইবে বাৎসরিক ৮০ লক্ষ টাকা। পঞ্জাবের খালের ধারে এখন লোকে লোকাকীর্ণ; কিন্তু কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সে সব জায়গায় কয়েক ঘর যাযাবর লোক ছাড়া আর কেহই বাস করিত না।

পূর্বেই বলিয়াছি গভর্ণমেণ্ট বিনা-শুল্কে প্রজাকে খাল হইতে জল লইতে দেন না। জলের দর নানা দিক হইতে বিচারিত হয়; কতখানি জলের প্রয়োজন, কত দিন জল সরবরাহ করিতে হইবে; জমির উৎপাদিকা শক্তি কিরূপ, কোন জাতীয় শস্য উৎপন্ন হইবে ইত্যাদি ভাবিয়া জলের দর ফেলা হয়। বোম্বাইএর কোনো অংশে এক একার (৩ বিঘা ✓।।০ আধ কাঠা) ইক্ষুর খেতের জন্য ৫০৲ পর্য্যন্ত কর দিতে হয়। এ ছাড়া বোম্বাইয়ের অন্যত্র ১০৲ হইতে ২৫৲ টাকা সাধারণ জলকর। মান্দ্রাজ প্রদেশে ২৲ টাকা হইতে ৫৲ এবং বাংলা দেশের কোনো কোনো স্থানে ১।।০ হইতে ২।।০ টাকা সেঁচের জন্য সরকার পাইয়া থাকেন। পঞ্জাবে সাধারণত একারে ৩৲।৪৲ টাকা লাগে। মোটের উপর উৎপন্ন শস্যের মূল্যর শতকরা ১০ বা ১২ হারে জলকর কৃষককে দিতে হয়। বাংলা ও বোম্বাইএ শতকরা ৬% হারে লাগে। প্রাচীনকালে হিন্দু বা মুসলমান শাসনের সময়ে জলকর ছিল না। সরকারের খাল হইতে যথেষ্ঠ আয় হয়, সুতরাং তাঁহারা ইচ্ছা করিলে জলকর কমাইয়া দিতে পারেন।

জলকরের হার

ভারতের দেশীয় রাজগণের রাজ্যে ইংরাজ আগমনের বহু পূর্ব্ব হইতেই জলসেচনের সুব্যবস্থা ছিল। তবে ইংরাজ সরকারের সুদৃষ্টান্ত দেখিয়া তাহাদের মধ্যেও উৎসাহ দেখা দিয়াছে। দেশীয় করদরাজ্যে ৫ কোটী ৩০ লক্ষ একার জমি প্রতি বৎসর কূপ, পুষ্করিণী ও খাল হইতে সিঞ্চিত হয়। করদ রাজ্যের মধ্যে মৈসুরেই জলসেচনের ব্যবস্থা সর্ব্বোৎকৃষ্ট। সেখানকার ভূপ্রকৃতি দীর্ঘখাল খননের মোটেই উপযুক্ত নহে। মৈশূরেই প্রায় ৩৯ হাজার জলাশয় আছে, অর্থাৎ প্রতি তিন বর্গ মাইল চারিটি করিয়া জলাশয় আছে। জলাশয় ছাড়াও প্রায় ১০০ মাইল পয়োপ্রণালী মৈশূরে আছে।

করদরাজ্যে সেচনের ব্যবস্থা

ভারত সরকার জলসেচনের জন্য যে ব্যয় করেন তাহা তিন প্রকারের। (১) ক্ষেত্রে জলসেচনের উদ্দেশ্যেই কতকগুলি খাল কাটা হয়; (২) দুর্ভিক্ষগ্রস্ত স্থানে সাময়িক ব্যবস্থা করিবার জন্য জলাশয়াদি খোঁড়া হয়; (৩) ছোট ছোট কাজ। ইহার মধ্যে প্রথমটিতেই সরকারের বেশী টাকা ব্যয় হয়।

তিন শ্রেণীর খাল

কেবল মাত্র কৃষি কার্য্যের সুবিধা করিবার জন্য যে খাল কাটিতে হয় এ ধারণা উত্তর-য়ুরোপের অধিবাসীদের নাই; তবে সেখানে রেলপথ নির্ম্মিত হইবার পূর্ব্বে স্বাভাবিক ও কৃত্রিম জলপথই ছিল, গমনাগমনের রাজপথ। ভারতবর্ষে নৌতার্য্য খালের সংখ্যা খুবই কম। বাংলা দেশের খালগুলি নৌতার্য্য; তা ছাড়া গোদাবরী, কৃষ্ণা ও সিন্ধুনদের কয়েকটি খালের অতি সামান্য দূর পর্য্যন্ত নৌকায় করিয়া যাওয়া যায়। এককালে নদীগুলিই উত্তর ভারতের প্রধান রাজপথ ছিল। এখন রেলপথই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে।

নৌতার্য্য খাল

পরিশিষ্ট—১

(১৯১৭-১৮ সালের হিসাব)

প্রদেশ	মোট কর্ষিত জমি	সরকারী জলসেচন বিভাগ হইতে সিঞ্চিত জমি	মোট কর্ষিত জমির সহিত সিঞ্চিত-জমির তুলনা	১৯১৭-১৮ পর্য্যন্ত মোট সরকারী ব্যয়	সিঞ্চিত জমিতে উৎপন্ন শস্যের আন্দাজী মূল্য
	একার হাজার	একার হাজার	শতকরা	লক্ষ টাকা	টাকা
বর্মাদেশ	১,৪৬,৬৮,		৯·৯	২,৭৮,	৪,৪২ লক্ষ
বঙ্গদেশ	২,৪৪,৫২,	১,১৩,	০·৯	২,৪৯,	৫৭ লক্ষ
বিহার-উড়িষ্যা	৮১,৩১,	৮,৬৬,০০	১০০	৬,২৯,	৩,৯৫ লক্ষ
যুক্তরাজ্য	৩,৫৮,০৮,	৩২,০৯ ০০	৯·০	১২,৫৯,	১৭,৬৮ „
আজমীর মাড়বার	৩,৫৬,	১৯,০	৫·২	৩৫,	৭ „
পঞ্জাব	২,৮২,৫৩,	৮৬,০০,০	৩০·৪	২২,৩৯,	৩৩,৩৭ „
উ-পঃ সীমান্ত প্রদেশ	২৯,৫৮,	৩,৬২,০	১২·২	২,৭৩,	১,৮০ „
সিন্ধু	৪০,০০,	৩৫,০৭,০	৮৭·৭	৩,২৮,	৮,৩৮ „
বোম্বাই	২,৫৭,০৫,	৩,০৫,০	১·২	৫,০৬,	২,৪২ „
মধ্যপ্রদেশ	১,৯২,৯০,	১,৪৫,০	০·৮	৩,২৭,	৬০ „
বেলুচিস্থান	২,৫৭,	১৭,০০	৬·৬	৪২,	৫ „
মোট	২০,২৭,০৮,	২,৫৯,৫০,	১২·৮	৭২,৭৯,	৯৭,৯৭ লক্ষ

পরিশিষ্ট ২

১৯১৭-১৮ সালের জলসেচনর আয় ব্যয়।

মোট সিঞ্চিত ভূমি—২,৬০ লক্ষ একার বা ৪০,৬২৫ বর্গ মাইল।

(১) Producttve Works (বড় বড় খাল)—১,৬৯,২২,০০০ একার জমি সিঞ্চিত হয়।

(২) Protective work (দুর্ভিক্ষাদি নিবারণের জন্য) ৪,৯৭,০০০ „

(৩) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্য ৮৪,৭৭,০০০ „

ব্যয়িত মূলধন	মোট আয়	কার্য্যনির্ব্বাহে ব্যয়	আশল আয়	শতকরা
(১) প্রথম দফায় ৫৭,৭৫ লক্ষ টাকা	৭,০১,৫০ হাজার	২,১৬,৩০, হাজার	৪,৮৫ লক্ষ	৮·৪
(২) দ্বিতীয় দফায় ১০,১২,৫০ হাজার			১ লক্ষ	১০
(৩) তৃতীয় দফায় ৪,৪৮ লক্ষ			৩৫,২৯ „	

৩। গো-পালন। *

আমাদের দেশের লোকের শতকরা ৭২ জন কৃষি করিয়া জীবন ধারণ করে; সেইজন্য গরুকে আমাদের দেশে ধন বলিত। কৃষি-প্রধান দেশে গোমহিষ ছাড়া লোকে বাঁচিতে পারে না।

আমাদের দেশে বর্ত্তমানে গোধনের সঠিক সংখ্যা বলা দুষ্কর; কারণ দেশের সর্বত্র একই সময়ে পশু গণনা হয় নাই। ১৯১৩-১৪ সালে ভাল করিয়া সর্ব প্রথমবার পশু গণা হয়। আমাদের হাতে সরকারী এমন কোনো কাগজ পত্র নাই যাহা হইতে আমরা বলিতে পারি যে এদেশে গোমহিষ বাড়িতেছে বা কমিতেছে। কিন্তু যতদূর আমরা দেখিতে পাই তাহাতে মনে হয় যে পশু দিন দিন কমিতেছে। দেশের জনসংখ্যার অনুপাতে আমাদের দেশে পশুর সংখ্যা নিতান্ত কম। আমরা নিম্নে পৃথিবীর কয়েকটি দেশের সহিত আমাদের পশু সংখ্যার তুলনা করিতেছি:—

দেশের নাম	১০০ জন অধিবাসীর জন্য	
উরগয় (দঃ আমেরিকা)	৫০০	গোমোহিষ।
আর্জেন্‌টাইন	৩২৯	,,
অষ্ট্রেলিয়া	২৫৯	,,
নিউ জিল্যাণ্ড	১৫০	,,

---

* Srijukta Nilananda Chatterji, M. A. B. L. Hon. Sec. Bengal Humanitarian Association, Howrah মহাশয়ের লিখিত The Cattle Problem of India (Modern Review 1921, April) ও শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র-গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের 'কৃষি সমস্যা' হইতে উপাদান সংগৃহীত।

কেপ কলোনী	১২০	,,
কানাডা	৮০	,,
মার্কিন রাজ্য	৭৯	,,
ডেনমার্ক	৭৪	,,
ভারতবর্ষ (বৃটীশ)	৬১	,,

এখন দেখা যাক্ ভারতবর্ষের এই পশু দেশের কৃষির পক্ষে প্রচুর কিনা। ভারতবর্ষের কৃষিক্ষেত্রের পরিমাণ ২২,৮০ লক্ষ একার। এদিকে দেশে মোট বলদ ও ষাঁড়ের সংখ্যা ৪ কোটি ৯০ লক্ষের অধিক নহে। ইহার মধ্যে শতকরা ২৫ ভাগ বাছুর আর ২৫ ভাগ বুড়ো, রুগ্ন, অকর্মণ্য। তাহা হইলে চাষের জন্য অবশিষ্ট থাকে ২ কোটি ৪০ লক্ষ বলদ। সুতরাং এক জোড়া বলদকে ৬০ বিঘা জমি চষিতে হয়। কিন্তু এদেশে কোথায়ও ২০ বিঘার বেশী একটা হালে চষিতে পারে না। ইহার ফলে দেশের কৃষি ভাল হইতেছে না।

দেশে গাভীর সংখ্যা ও নিতান্ত কম; দেশের লোক প্রচুর দুধ খাইতে পায় না, বিশুদ্ধ ঘৃত দুর্লভ। সরকারী মতে এদেশের প্রতি গাভীর দুধ দৈনিক গড়ে ২ পাঁইট হয়; গরু ৭ মাস দুধ দেয়। ৫ কোটি গাভীর দুধ দৈনিক ৬ কোটি পাঁইট; অতএব বৃটীশ ভারতের ২৫ কোটি লোকের প্রত্যেকের ভাগে গড়ে আধ পাঁইট করিয়া দুধ পড়ে, যেখানে প্রয়োজন দুই পাঁইট। আইনী আক্‌বরীতে দেখা যায় সে সময়ে গাই গরুতে দিনে প্রায় ২০ কোয়ার্ট দুধ দিত আর বলদ ঘোড়ার চেয়ে বেশী দৌড়াইতে পারিত। দুধের অভাবে ভারতের শিশু-মৃত্যু ভীষণরূপে বাড়িয়া চলিয়াছে তাহা আমরা পূর্বে দেখিয়াছি। যুক্ত-প্রদেশের স্যানীটরী কমিশনার বলিয়াছিলেন যে শিক্ষিত ধাত্রীর চেয়ে সস্তায় যাহাতে দুধ পাওয়া যায় তাহার ব্যবস্থার প্রয়োজন বেশী। গ্রামে পর্য্যন্ত শিশুর জন্য ভাল দুধ পাওয়া যায় না—কলিকাতার ত কথাই নাই। গত ষাট বৎসরে খাদ্য শস্যের

দাম ৫ হইতে ৭ গুণ বাড়িয়াছে কিন্তু দুধের দাম বাড়িয়াছে ৪০ গুণ। কিন্তু পাশ্চত্য দেশে দুধের দর পূর্বের চেয়ে তেমন বাড়ে নাই। আমাদের দেশে লোকে দুধে ঘিয়ে মানুষ হইত; এই পুষ্টিকর সামগ্রীর অভাব হওয়াতে লোকের জীবনীশক্তি কিরূপে হ্রাস পাইতেছে তাহা আমরা পূর্বে দেখিয়াছি (৫০ পৃঃ দেখুন)। সেই জীবনীশক্তি হ্রাস পাইতেছে বলিয়া সকল প্রকার রোগেই লোকে সহজে আক্রান্ত হয়।

ভারতবর্ষের গো-জাতির অবনতির কারণ এবং তাহা দুর কেমন করিয়া করা যাইতে পারে সংক্ষেপে তাহা নির্দেশের চেষ্টা করিতেছি।

(১) দেশে গোচারণের মাঠ ও গোখাদ্যের অত্যন্ত অভাব। আমাদের দেশে চিরকালই গ্রামের পার্শ্বে গোচারণে ভূমি রাখার নিয়ম ছিল; সেই জমিতে কেহ হাত দিত না। কিন্তু দুঃখের বিষয় বর্ত্তমানে আমরা এমন জায়গায় আসিয়াছি যেখানে প্রাচীনের ভালটুকুও রাখি নাই, বর্ত্তমানের ভালটুকুও গ্রহণ করিতেছি না।

গোচারণ ভূমির অভাবে পশুর স্বাস্থ্য দিন দিন নষ্ট হইতেছে। জনসংখ্যা কিছু কিছু বাড়িতেছে; অথচ তাহাদের উপযুক্ত শিল্প বাণিজ্য নাই; সুতরাং সকলেই কৃষির দিকে ঝুঁকিতেছে। জমিদার বা প্রজা কেহই গ্রামের পাশের পতিত জমিটুকুর লোভ ছাড়িতে পারিতেছে না। কিন্তু ইহাতে কি সত্যই উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ বাড়িতেছে? তাহাও নহে।

এছাড়া আমাদের দেশে গরুর খাদ্য শস্য উৎপন্ন করিবার জন্য কোন প্রকার চেষ্টাই হয় না। খড়ের দাম প্রতি বৎসর এত চড়িতেছে যে গ্রামে গরীব লোকে অধিকাংশ স্থলে নিজেরাও যেমন খায় গো মহিষকে তাহার চেয়ে অধিক খাদ্য সরবরাহ করিতে পারে না। দেশে রীতিমতভাবে পশু খাদ্য শস্য উৎপন্ন করিবার চেষ্টার প্রয়োজন।

(২) গরুর জাত দিন দিন খারাপ হইয়া আসিতেছে। খাদ্যাভাব ছাড়া আর একটি কারণে ভাল গরু ক্রমশঃই লোপ পাইতেছে। আমাদের

দেশে ভাল ষাঁড় ক্রমেই দুর্লভ হইয়া উঠিতেছে। পূর্বে হিন্দুরা পিতৃ-পিতামহের শ্রাদ্ধের সময়ে বৃষোৎসর্গ করিত; সেই 'ধর্মের' ষাঁড়কে কেহ বাঁধিতে মারিতে বা বধ করিতে পারিত না। সমাজের সকলেই তাহার যত্ন করিত; প্রত্যেক গ্রামেই এই শ্রেণীর অনেকগুলি করিয়া বলিষ্ঠ ষাঁড় থাকিত; সুতরাং ভাল জাতীয় গরু জন্মিত। কিন্তু বর্ত্তমানে লোকে প্রায়ই বৃষোৎসর্গ করে না; এখন বৃষ-কাঠ খানি নদীর ধারে পুঁতিয়া আচার রক্ষা করে, ধর্ম্মের যথার্থ অর্থ লোক ভুলিয়াছে। তা ছাড়া কলিকাতা, মাদ্রাস ও এলাহাবাদ হাইকোর্ট ধর্ম্মের ষাঁড় সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে ইহা কাহারও সম্পত্তি নহে, সুতরাং কেহ হত্যা বা বিক্রয় করিলে অপরাধী হইবে না। এই সর্ব্বনেশে রায় প্রকাশ হওয়াতে ধর্ম্মের ষাঁড়গুলিকে ম্যুন্সিপালটির গাড়ী বহিতে নিযুক্ত করা হইতে লাগিল, কসাইরা নির্বিচারে মারিতে লাগিল, কেহ কিছু বলিতে পারিল না। এদিকে ত' সমাজের শাসন ও বন্ধন এমনি শিথিল, তারপর রাজবিধি ইহার অনুকূল নহে। সমগ্র ভারতে সরকারী ষাঁড় ৭৫টি ও জেলা বোর্ডের ৯৭৩টি ষাঁড় আছে। ভারতের গোধনকে রক্ষা করিতে হইলে সমাজকেও এদিকে দৃষ্টি দিতে হইবে—সরকারকেও সাহায্য করিতে হইবে।

(৩) গো-মৃত্যু। পশুর মৃত্যু দুই প্রকারে হয়, এক রোগে আর এক কশাইএর হাতে। এ ছাড়া অনাহারে, বন্যায় নিতান্ত কম মরে না। এক একবার দুর্ভিক্ষে বহু লক্ষ করিয়া গরু মরে। ১৯০০ সালে রাজপুতনায় প্রায় ৭০ লক্ষ ও গুজরাটে ৫ লক্ষ পশু মরিয়াছিল। ১৮৯৭ ও ১৯০০ সালের দুর্ভিক্ষে এদেশ হইতে অনেক ভাল জাতের গরু একেবারে নির্বংশ হইয়া গিয়াছে। তারপর হইতে জনসংখ্যা যে পরিমাণে বাড়িয়াছে, গরু মহিষের সংখ্যা সেরূপ বাড়িতে পারে নাই। অনাহারে, বন্যায় ও বার্দ্ধক্যহেতু বহু সংখ্যক গরু বাছুর ত মরিয়াই থাকে—তাহার হিসাব জানা সম্ভব নহে; কিন্তু সংক্রামক ব্যাধিতে ১৯১২-১৩ সালে ১,৮৭,২৩১ এবং

১৯১৩-১৪ সালে ১,৯৩,৭১১ গরু মরিয়াছিল। গো-মড়কে মাঝে মাঝে দেশ উৎসন্ন যায়।

গো-মহিষ তিন কারণে বধ হয়। (১) খাদ্যের জন্য, (২) বিদেশে শুক্‌নো মাংস রপ্তানির জন্য, (৩) চামড়ার জন্য। এই তিন দফাতেই গো-হত্যার সংখ্যা বাড়িতেছে। গো-হত্যা বাবদ ভারতের ম্যুন্সিপ্যালটির আয় গত দশ বৎসরে শতকরা ৭০ হারে বাড়িয়াছে; আর চামড়ার রপ্তানী ৫০ বৎসরে ২০ গুণ বাড়িয়াছে। প্রতি বৎসর বৃটীশ ভারতে এক কোটি গরু খাদ্যের জন্য মারা হয়। শুক্‌নো মাংস রপ্তানীর জন্য যে গরু বধ হয় তাহার সংখ্যা প্রায় বৎসরে ১০ লক্ষ। ভারতবর্ষের ন্যায় কৃষি প্রধান দেশে গো-হত্যা নিবারণ করা প্রয়োজন। কিন্তু তাই বলিয়া বৎসরে ৩৬৪ দিন উদাসীন থাকিয়া একটি দিনে মুসলমানেরা গো-হত্যা করে বলে তাহাদের উপর জুলুম করিতে হইবে তাহার কোনো অর্থ নাই। ৩৬৪ দিনের হত্যা বন্ধ করা হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রত্যেকের স্বার্থ।

দুধ দেওয়া শেষ হইলে বহু সংখ্যক গরু আমাদের গ্রাম হইতে কশাই এর হাতে গিয়া পড়ে। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী টাঙ্গরায় বৎসরে প্রায় ৯০,০০০ এবং সোনাডাঙ্গাতে প্রায় ১০,০০০ গাইগরু নিহত হয়। এই সংখ্যার মধ্যে ৩,০০০ গাইগরুর বয়স সাত বছরের নীচে। বোম্বাই সহরে ১৯১৪-১৫ সালে বান্দরা হত্যাশালায় ৪৪,১৭৭ গাইগরু ও ৮,৫৭৫ মহিষ নিহত হইয়াছিল। দুধ দেওয়া হইলে বোম্বাই প্রদেশে শতকরা ৭৫টা গরু মহিষ নাকি হত্যাশালায় প্রেরিত হয়।

কলিকাতার কর্পোরেশনের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি স্যার চার্লস পেইন বলিয়াছেন, গোয়ালারা সাধারণতঃ দুই বিয়ানের সময়ে গাইগরু কেনে। তার পর বাছুর বিক্রয় করিয়া দেয় ও কৃত্রিম 'ফুকা' দিয়া দুধ দুহিতে থাকে; এই পৈশাচিক কাণ্ড ছয় হইতে আট মাস পর্য্যন্ত চলে। তার পর আর দুই তিন বৎসর এই গাভী পাল ধরে না। এদিকে কশাই দুয়ার গোড়ায়

হাজির—সামান্য মূল্যে তাহাকে বিক্রয় করিয়া যাহা পাওয়া যায় তাহাই লাভ। (৪) ভারতবর্ষ হইতে গরু প্রতিবৎসরই রপ্তানী হইয়া যাইতেছে। পৃথিবীর মধ্যে ভারতের গরুই এককালে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া লোকে জানিত। এখনো কয়েকটি জাতের গরুর খুব নাম আছে। এই রপ্তানী শতাব্দীকাল ধরিয়া সামান্যাকারে চলিতেছিল, কিন্তু বর্ত্তমানে যে ভাবে বাড়িয়া উঠিয়াছে তাহা পূর্ব্বে কখনো হয় নাই। সরকারী কৃষি বিভাগের প্রতিবেদনে প্রকাশ যে রপ্তানীর ফলে ভাল ভাল জাতের গরু প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে ; যবদ্বীপে গরু খুব চালান হইতেছে এবং শোনা যাইতেছে এই রপ্তানী আরও বাড়িবে। যেসব গরু যবদ্বীপে যাইতেছে সেগুলি অল্প-বয়সের ষাঁড় ও গাই; মাংসের জন্য গরুর চাষ হইবে ওলন্দাজ সরকারের ইহাই অভিপ্রায়। যুদ্ধের সময়ে রপ্তানী কিছু কমিয়াছিল, কিন্তু বর্ত্তমানে আবার বাড়িতে সুরু হইয়াছে। দক্ষিণ আমেরিকার ব্রেজিল হইতে দশ জন ব্যবসায়ী আসিয়া বোম্বাই হইতে সর্বোৎকৃষ্ট জাতের গরু-গুলিকে চালান দিতেছে। আমাদের দেশে যদি গরু উৎপন্ন করিবার ফার্ম্ম থাকিত তবে ত আমরা রপ্তানী করিয়া লাভবান হইতাম ; দুঃখের ত কোনোই কারণ ছিল না বরং বিদেশে ভাল জাতের গরু পাঠাইবার গৌরবই হইত। কিন্তু বর্ত্তমানে আমাদের ত সে অবস্থা নয়, গরুর রপ্তানী কিরূপ হইতেছে নিম্নে তাহা দিতেছি ;—

	১৯০১	১৯০৬	১৯১১	১৯১২	১৯১৬
সংখ্যা	৩,২০,৮৩৫	৩,১৬,৯৯৬	৫,২৭,৭০৬	৫,৪৪,৭৮৮	৩,৩৪,৩১০
মূল্য পাঃ	১,৪২,৬৩৪	১,৫০,৮৭৮	১,৮২,৭৮৭	২,২২,২৮০	১,৫৯,৩৮৭পাঃ

ভারতবর্ষের গো-সমস্যা অন্যান্য সমস্যার চেয়ে কোনো অংশে কম নহে। গোজাতির উন্নতির জন্য কোনো কালেই আমরা রাজদরবারে উপস্থিত হই নাই। প্রাচীন সমাজের ভালগুলি বজায় রাখিয়া পশ্চিমের পরীক্ষালব্ধ সত্যগুলি লইতে হইবে। দেশে গোচারণ ভূমি রাখা, গরুর খাদ্য-শস্য

ক্ষেতে উৎপন্ন করা, ধর্ম্মের ষাঁড়গুলিকে রক্ষা ও যত্ন করা, একত্রে গ্রামের চাষ বাস দেখা, একত্রে ভাল বীজ ক্রয় করা, এক সঙ্গে শস্য বিক্রয় করা ইত্যাদি অনেক কাজ নিজেরা আমরা করিতে পারি। দুধ ও ছানা বিক্রয়ের ব্যবস্থা, মাখম তোলা, ঘি করা ইত্যাদি কাহারও সাহায্য না লইয়াও নিজেরা করিতে পারি। চাষীদের মধ্যে সেই বোধ জাগ্রত করাই সরকার বাহাদুর ও দেশসেবকদের কাজ।

৪। শিল্প ও বাণিজ্য

বর্ত্তমানে ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ ও এখানকার শত করা ৭২ জন লোক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষি-উপজীবি। কিন্তু চিরকাল ভারতবর্ষ এমনভাবে কৃষিগত প্রাণ ছিল না। শিল্প ও কৃষির মধ্যে এককালে একটা সামঞ্জস্য ছিল। কিন্তু তাহার ভিত্তি দৃঢ় ছিল না বলিয়াই হউক, অথবা রাজনৈতিক অবস্থা অনুকূল ছিল না বলিয়াই হউক, বাহিরের সহিত সংঘর্ষ ও প্রতিযোগিতায় উহা দাঁড়াইতে পারিল না।

শিল্প ও কৃষি

বন-বিভাগ

সামগ্রী মাত্রকেই তিন ভাবে পাওয়া যায়; উদ্ভিজ্জ, প্রাণীজ ও খনিজ। আবার প্রত্যেক দেশেই উদ্ভিদ্ দুই প্রকারে দেখিতে পাওয়া যায় (১) আরণ্য উদ্ভিদ্ ও (২) কৃষিজাত উদ্ভিদ্। প্রথমতঃ আমরা ভারতবর্ষের আরণ্য উদ্ভিদ্ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। কৃষিজাত উদ্ভিদ্ যেরূপ আমাদের নানাবিধ উপকারে আসে, সেইরূপ আরণ্য-উদ্ভিদ্ হইতেও আমরা বহু প্রকার উপকার পাই। এ দেশের অরণ্যে এত প্রকার কাঠ আছে যে তার ধারণা সাধারণের

ভারতের আরণ্য উদ্ভিদ

নাই। বড় বড় গাছ প্রায় ২,৫০০ জাতের আছে, এবং ছোট ছোট উদ্ভিদের সংখ্যাও প্রায় তদ্রূপ।

ভারতের প্রকাণ্ড বনভূমিগুলির রক্ষাভার গভর্ণমেণ্ট স্বয়ং লইয়াছেন। সুবৃহৎ স্থানগুলিকে আয়ত্তের মধ্যে আনিয়া তাহার সংরক্ষণ ও উন্নতি সাধন সহজ ব্যাপার নহে। স্থানীয় লোকেরা যদৃচ্ছাক্রমে গাছ কাটিয়া লইত এবং সামান্ত প্রয়োজন সাধনের জন্ম ঘাসে বা পাতার আগুণ লাগাইয়া অনেক সময়ে দাবানল সৃষ্টি করিত। ইহার ফলে অনেক অরণ্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

১৮৫৪ সালে লর্ড ডালহৌসী প্রথমে এদিকে দৃষ্টি দেন; কিন্তু তখনকার দিনে সরকারী কল এত মন্দ চলিত যে কোনো কাজ সহজে ও শীঘ্র হইয়া উঠিত না। অবশেষে ঠিক হইল ভারতের এই মূল্যবান বনভূমি মূর্খ গ্রামবাসী বা পাহাড়ীদের হাত হইতে রক্ষা করিতে হইবে। কিন্তু এদিকে ইংলণ্ডে আরণ্যবিজ্ঞান সম্বন্ধে কেহই কিছু জানিতেন না। এইজন্য ভারত গভর্ণমেণ্ট তিন জন জার্ম্মেন পণ্ডিতকে সর্ব্বপ্রথমে এই বিভাগের কর্ত্তা করিয়া আনয়ন করিলেন। ইহাদের মধ্যে স্যার ডেটরিক্ ব্রাণ্ডিস খুবই নাম করিয়া গিয়াছেন, 'ভারতীয় বৃক্ষ' নামে তাঁহার পুস্তক পৃথিবী বিখ্যাত। এই জার্মেন বন-বিজ্ঞানবিদের চেষ্টায় বনভূমি সুবন্দোবস্তে আসিল।

বনবিভাগে সরকারী ব্যবস্থা

১৮৬৯ সালে ইংরাজ বৈজ্ঞানিকগণ জারমেনী ও ফ্রান্সে শিক্ষালাভ করিয়া প্রথমে এদেশে আসিলেন; এইরূপভাবে কাজ ১৮৭৬ পর্য্যন্ত চলিল। সেই বৎসরে ইংলণ্ডে "জাতীয় আরণ্য-বিজ্ঞান বিদ্যালয়" স্থাপিত হইল। এই বিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্রদল ১৮৮৭ সালে ও শেষ দল ১৯০৭ সালে আসেন। ইহার পর অক্সফার্ড, কেম্ব্রিজ, এডিনবারা, ডাবলিন বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে এই আরণ্য-বিজ্ঞান বিভাগ খোলা হয়। এইরূপে ভারতগভর্ণমেণ্ট উচ্চশিক্ষিত

আরণ্য-বিজ্ঞানের আলোচনা

ছাত্রদের বিশেষভাবে শিক্ষা দিয়া এদেশের বন-বিভাগের জন্য আনিতে লাগিলেন। বর্ত্তমান বনবিভাগে ইম্পিরিয়াল কাজে ২৩৭ জন কর্ম্মচারী নিযুক্ত আছেন।

ভারতীয় বনবিভাগে উচ্চকর্ম্মচারীর সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি এ দেশীয় অল্পবেতনের কর্ম্মচারীর প্রয়োজন। এই অভাব পূরণ করিবার জন্য

দেরাহুনের কলেজ

দেরাহুনে ১৮৭৮ সালে বনবিভাগের একটি বিদ্যালয় খোলা হয়। অল্পকাল হইল এই বিদ্যালয়টি কলেজে পরিণত হইয়াছে। বর্ম্মাতে ও মাদ্রাস প্রদেশে দুইটি বিদ্যালয়েও আরণ্য-বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয়। এ ছাড়া প্রায় প্রত্যেক প্রদেশেই নিম্নস্তরের কর্ম্মচারী তৈয়ারী করিবার জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তবে এখনো প্রধান কর্ম্মচারীরা বিলাত হইতেই বাছাই হইয়া আসে।

১৯১৬-১৭ সালে ভারত সাম্রাজ্যের সমগ্র বর্গফলের এক পঞ্চমাংশ

বনভূমির পরিমান ও আয়

বন-ভূমির অন্তর্গত (২৪৬,৫৭৯ বর্গ মাইল) ছিল। বনভূমির ১৯১৬-১৭ সালে আয় ৩,৭০,৬১,০০০ টাকা, ব্যয় হয় ১,৮,৭,৪৩,০০০ টাকা। সরকারের মোট লাভ হয় ১,৮৩,১৮০০০ টাকা।

গঁদ জাতীয় সামগ্রী

বৃক্ষের কাষ্ঠ ও ছালের মধ্যে একরূপ তরল ও পিচ্ছিল রস উৎপন্ন হয়। এই রস শুষ্ক করিয়া অথবা অন্য উপায়ে জমাইয়া নানাবিধ আটা বা গঁদ ও

গঁদ বা বৃক্ষনির্য্যাসাদি

তজ্জাতীয় অন্যান্য দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। বসন্ত-কালে উক্ত নির্য্যাস প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয় এবং ছাল ও কাষ্ঠচক্রের মধ্যে থাকিয়া বৃক্ষের কাষ্ঠাংশের পরিপুষ্টি সাধন করে। এই নির্য্যাসের সাহায্যেই আম্রাদি বৃক্ষের জোড় বা কলম লাগিয়া থাকে। সজিনা, জিওল ও আমড়া-গাছের ছাল কাটিয়া দিলে অনতি-

বিলম্বেই আটা বাহির হইয়া পড়ে। বট ও অশ্বত্থের দুধ ঘনীভূত হইলে আটায় পরিণত হয়। নিম্নে নির্য্যাসজাত কতিপয় দ্রব্যের উল্লেখ করা যাইতেছে।

বঙ্গদেশে নদীতীরে ও চরাজমিতে বহুসংখ্যক বাবলাগাছ জন্মিয়া থাকে। সাধারণতঃ বালুকাপ্রধান স্থানেই বাবলাগাছ দেখিতে পাওয়া যায়। বাবলা নানা জাতীয় হইয়া থাকে। বঙ্গদেশের পল্লীগ্রামের পার্শ্ববর্ত্তী বনজঙ্গলে গুয়ে-বাবলা, সাঁই বাবলা ও লাল-বাবলা প্রায়ই দৃষ্টি গোচর হইয়া থাকে।

বাবলার আটা বা আরবী গঁদ

টৈইরিনামক এক প্রকার ফল হইতে পল্লীগ্রামের ছেলেরা "কষের কালী" প্রস্তুত করিয়া থাকে। এই টৈইরিবৃক্ষও এক জাতীয় বাবলা। পার্ব্বত্য প্রদেশে ইহা প্রচুর পরিমাণে জন্মে।

বাবলা গাছ একটু কাটিয়া দিলেই তাহা হইতে "আটা" বাহির হয়। এই নির্য্যাস জলে গলিয়া যায়; য়্যাল্‌কহল কিংবা ইথারে গলে না। রাসায়নিক হিসাবে বাবলার আটাকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যত প্রকার "আটা" আছে তাহাতে য়্যারাবিন্ (Arabin), ব্যাসোরিণ (Bassorin) ও সেরাসিন (Cerasin) এই তিন প্রকার পদার্থের যে কোন একটি প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান থাকে। বাবলার আটায় যথেষ্ট য়্যারাবিন্ আছে। এই পদার্থ জলে সম্পূর্ণ রূপেই গলিয়া যায়, সুতরাং কাগজাদি আটিবার জন্য বাবলার আটাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

বাবলা ব্যতীত আরও অনেক গাছ হইতেই আটা বাহির হয়; যেমন জিওল্, নিম, সজিনা, আম ইত্যাদি। কিন্তু বাণিজ্যে ইহাদের মূল্য খুব কম।

রজনও বৃক্ষনির্য্যাস বিশেষ। ব্যবসায়ীরা গাছের বহির্ত্বক একটু একটু করিয়া কাটিয়া দেয়। নির্য্যাস বাহির হইলে পরে তাহা সংগ্রহ

সর্জ্জরস বা রজন

করিয়া আনে। কাষ্ঠাদি বার্ণিশ করিবার জন্য আমরা যে রজন ব্যবহার করিয়া থাকি তাহা পাইন্ নামক বৃক্ষের নির্য্যাস। এই গাছ দেখিতে প্রায় ঝাউগাছের ন্যায়। এই জাতীয় উদ্ভিদ প্রধানত শীতপ্রধান দেশে জন্মে। আমাদের দেশে হিমালয় অঞ্চলে এই উদ্ভিদ অরণ্য সৃষ্টি করিয়াছে। পাইন বৃক্ষের নির্য্যাস পরিশ্রুত (Distilled) করিয়া লইলে অর্থাৎ চুয়াইয়া লইলে যে কঠিন অংশ পাওয়া যায় তাহাই রজন এবং তরলাংশ বল্সাম (Balsam oil) তৈল নামে পরিচিত।

শালবৃক্ষের ছালের ভিতর যে সকল কোষ আছে তাহারা ধুনার আধার। ধুনা পরিপুষ্ট হইলে ঐ সকল কোষ ফাটিয়া যায় এবং ধুনা বাহির হইয়া থাকে।

কুচুক (Coautchouc)

এরূপ অনেক উদ্ভিদ আছে যাহাদের "দুগ্ধে" কুচুক নামক পদার্থ থাকে, এই সকল উদ্ভিদের ত্বক্ একটু কাটিয়া দিলেই ক্ষত-স্থান হইতে দুগ্ধ নির্গত হইতে থাকে। এই দুগ্ধান্তর্গত কুচুক কণিকাসমূহ জমিয়া রবারে পরিণত হয়। ব্যবসায়ীরা উক্ত দুগ্ধ শুকাইয়া রবার প্রস্তুত করে। ঐ দুধের সহিত য়্যাসেটিক্ য়্যাসিড (Acetic acid) মিশাইলেও রবার জমিয়া যায়। আমরা সাধারণতঃ যে রবার বৃক্ষ দেখিতে পাই তাহা অনেকটা বটবৃক্ষের ন্যায়।

রবার

বন-বিভাগের অন্তর্গত 'রবার' গাছের কথা বিশেষ করিয়া উল্লেখ যোগ্য। ভারতবর্ষে দিন দিন রবারের জিনিষের প্রয়োজন বাড়িতেছে; সাইকেল, মোটর, কলকজ্জায় প্রচুর পরিমাণে রবার লাগে; নানা প্রকার জলসহা জিনিষ করিতেও রবারের প্রয়োজন। এই সমস্ত রবার বিদেশ হইতে আসে। অথচ ভারতবর্ষে এই গাছ হয় এবং আরও বিস্তৃতভাবে ইহার চাষ করিলে এই শিল্প খুবই লাভজনক হইয়া উঠিবে তাহাও নিশ্চয়। বর্ত্তমানে আসামের অন্তর্গত

তেজপুরে, মাদ্রাসে ও বর্মায় ৪৬ হাজার একার ভূমিতে ৬৬ লক্ষ ৮৫ হাজার গাছ আছে। প্রতি গাছে বৎসরে গড়ে তিন পোয়া হইতে দেড় সের রবারের আটা নির্গত হয়। বিঘাপ্রতি গাছ করিতে শতাধিক টাকার বেশী পড়ে না। গাছপ্রতি বৎসরে ২৷৩ টাকার রবার পাওয়া যায়। বিঘা প্রতি ৩০৷৪০ টী গাছ হইলে গাছ পোঁতার ৫৷৭ বছরের মধ্যে ১০০৲ টাকার ব্যয়ে বাৎসরিক ১০০৲৷২২৫৲ টাকার আয় হইতে পারে। ১৯১৭-১৮ সালে ৮৪,৩০,০০০ পাউণ্ড রবার বিদেশে রপ্তানী হয়। যুদ্ধের পূর্বে যে পরিমাণে রপ্তানী হইত তাহার প্রায় আট গুণ ঐ বৎসরে বিদেশে চালান হয়।

লাক্ষা

উপর্য্যুক্ত গঁদ জাতীয় সকল সামগ্রীই উদ্ভিদ্ হইতে উৎপন্ন; গঁদ জাতীয় সামগ্রীর মধ্যে লাক্ষা ও মোম প্রাণীজ। সাধারণতঃ আমরা গালার চুড়ি, খেলনা দেখিতে পাই। তা ছাড়া ছুতার কাঠের ফাঁক ভরিতে, কুমার 'বর্ণ' দিতে, শেক্‌রা সোনা রূপার গহনার মধ্যে 'পান' দিতে গালা ব্যবহার করে। এ ছাড়াও যে শিল্পীর যা কিছু জুড়িতে হয়—সেই গালা ব্যবহার করে। বার্ণিশ তৈয়ারীর প্রধান উপাদান লাক্ষা; আসবাব পত্র, ঘোড়াগাড়ী রেলগাড়ী বার্ণিসে লাক্ষার প্রয়োজন নিতান্ত সামান্য লাগে না। শীল মোহরের জন্য, লিথোগ্রাফী ছাপার কালীর জন্য, গ্রামোফনের রেকর্ড তৈয়ারী করিতে গালা লাগে। ইলেক্‌ট্রিক কলকজার insulating পদার্থ হিসাবে বিদেশে লাক্ষার আদর ও দর খুব বাড়িয়া গিয়াছে।

লাক্ষার প্রয়োজনীয়তা।

য়ুরোপে ১৭৯০ সালে প্রথমে লাক্ষা রপ্তানী হয়। তখন হইতে বহুদিন ইহার প্রসার খুব ধীরে ধীরে হইয়াছিল। ১৮৬৮

সালে ২২১ লক্ষ টাকার গালার বাণিজ্য হইয়াছিল; ইহার মধ্যে ৮ লক্ষ টাকার গালার রঙও ছিল; কিন্তু জার্মানীতে আনালিন রঙের আবিষ্কার হওয়াতে অন্যান্য রঙের অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে গালার রঙ লোপ পায়। ১৯০৮ সালে গালার আদর পশ্চিমে হঠাৎ বাড়িয়া যাওয়ায় ইহার দর ৮৲ টাকা মণ হইতে ৪০৲ টাকা মণ চড়িয়া যায়; কিন্তু পরে পুনরায় ২০৲ টাকায় নামিয়া যায়। ১৯১৮ সালে ৩ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকার গালা বিদেশে রপ্তানী হইয়াছিল।

লাক্ষা বাণিজ্যের ইতিহাস।

পৃথিবীর মধ্যে লাক্ষার বাজারে ভারতবর্ষের একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী ইন্দো-চীন; কিন্তু সেখানকার গালা তেমন ভাল নয়। সুতরাং ভারতের শিল্পোন্নতি হইলে লাক্ষার শত প্রকারের সামগ্রী একদিন এখানেই প্রস্তুত হইবে।

বর্মার গালার বার্ণিস দিয়া বাক্স, ধামা,গহনা প্রভৃতি জিনিষ তৈয়ারী হয়। এ ছাড়া বড় বড় কাজ গালার দ্বারা হইয়া থাকে; এমন কি সিংহাসন চেয়ার প্রভৃতি এই লাক্ষায় প্রস্তুত হয়। যাদুঘরে বর্মার রাজা থীঅবর যে সিংহাসন আছে তাহার প্রধান উপাদান লাক্ষা। আজকাল জাপান হইতে গালায় বার্ণিস করা পাতলা কাঠ বা পোষ্টকার্ডের তৈয়ারী থালা বাটি রেকাবী গেলাস প্রভৃতিও এদেশে আমদানী হইতেছে। লাক্ষাকীট ঢাক, পলাশ, বাবুল, কুসুমফুলের গাছ, অড়হর গাছে বাড়িতে থাকে। এই কীটের মুখ নিসৃত লালা গাছের রসের সহিত মিশ্রিত হইয়া গালা তৈয়ারী হয়। ইহা সাফ করিয়া নানা শ্রেণীর গালা প্রস্তুত হয়। বাংলা ও যুক্তপ্রদেশেই লাক্ষার প্রধান কেন্দ্র। এই শিল্পের মধ্যে অনেকগুলি পৃথক কর্ম আছে। যাহারা লাক্ষা গাছ হইতে সংগ্রহ করে তাহারা পৃথক জাতিয় লোক,—আবার যাহারা লাক্ষার সামগ্রী প্রস্তুত করে তাহারা অন্য জাতিয় লোক।

বর্মায় লাক্ষার কাজ

মোম

মৌমাছির চাষ পার্বত্য প্রদেশে বন্য জাতির মধ্যে আবদ্ধ। সেখানে অত্যন্ত আদিম প্রথানুসারে মধু ও মোম সংগৃহীত হয়। আমরা যে মধু খাই তাহার মধ্যে যথার্থ মধুর অংশ সামান্যই থাকে। অধিকাংশ স্থলে চিনির রসের সঙ্গে আলুসিদ্ধ দেওয়া মধু বাজারে বিক্রয় হয়। সেইরূপ মোমবাতি বলিতে আমরা যে জিনিষ বাজার হইতে কিনিয়া আনি তাহার সহিত মোমের সম্পর্ক নাই; সেগুলি পারাফিন নামে পেট্রোলিয়মের একটি উপসামগ্রী হইতে প্রস্তুত। বর্ত্তমানে মধু ও মোম পশ্চিম হিমালয়, কাশ্মীর, মধ্যপ্রদেশ ও দাক্ষিণাত্যের পার্বত্যজাতিরাই এই ব্যবসা চালা- ইতেছে। দাক্ষিণাত্যে মোম ও রঙের সাহায্যে বিচিত্র বর্ণের কাপড় ছোপানো হয়। বর্মাদেশে রেশমের কাপড় রঙে চুপাইবার পূর্বে মোমের মধ্যে চুপাইয়া লয়। পাশ্চত্য দেশসমূহে মধু মক্ষিকার চাষ রীতিমত ভাবে হইতেছে। আমাদের দেশে ইহা করা খুবই সহজ গ্রামে গ্রামে লোকে সামান্য চেষ্টা করিলে মক্ষিকাপালন করিতে পারে এবং দুই পয়সায় সংস্থান করিতে পারে।

মোমের বিচিত্র ব্যবহার।

স্নেহপদার্থ

স্নেহপদার্থ বলিতে তৈল ও ঘৃতাদি সামগ্রী বুঝায়। তৈল সাধারণতঃ তিন শ্রেণীর হয় যথা—প্রাণীজ, উদ্ভিজ্জ ও খণিজ। ঘৃত চর্বি প্রাণীজ তৈলের মধ্যে পড়ে। কেরোসিন খণিজ তৈল। অবশিষ্ট সকল প্রকার তৈলই প্রায় উদ্ভিজ্জ।

আমাদের রঙ ও চামড়ার কাজে বহুকাল হইতে তৈল ব্যবহার হইয়া আসতেছে। দৈনিক জীবনে তৈলের প্রয়োজনের ব্যবহার বহুবিধ; আহার করিতে, গায়ে মাখিতে, পোড়াইতে বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন উপাদানের তৈল ব্যবহৃত হয়। বাংলাদেশে নারিকেল ও তিলের তেল লোকে মাথায় মাখে, মান্দ্রাজে

তৈলের প্রয়োজন।

ও বঙ্গে উভয় তেল লোকে খায়। সাবান যদিও পূর্বে এদেশে প্রচলিত ছিল না—আজকাল ইহার প্রচলন খুবই বাড়িয়া গিয়াছে এবং সাবানের কাজে চর্বি ও তেলের প্রয়োজন খুব বেশী।

পূর্বে আলো জ্বালাইবার জন্য দেশীয় উদ্ভিজ্জ তৈলই ব্যবহৃত হইত। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে সর্বসাধারণের গৃহের ত কথাই নাই বড় লোকের বৈঠকখানায় এমন কি সাহেবদের তোষাখানায় রেড়ী বা সরিষা তেলের সেজ আলো জ্বলিত। আমেরিকা ও রুশ হইতে সস্তায় কেরোসিন তৈল আমদানী হইতে আরম্ভ হইলে ভারতের উদ্ভিজ্জ তেলের প্রচলন :কমিয়া আসে। বর্মার কেরোসিন খনি আবিষ্কৃত হইবার পর ইহার প্রচলন আরও বাড়িয়াছে। কেরোসিন ভারতে মহা পরিবর্ত্তন সংঘটিত করিয়াছে।

উদ্ভিজ্জ তৈল।

ভারত সাম্রাজ্যের তৈল-বীজের সম্পদ ও মূল্য কয়লা ও অন্যান্য খনিজ ধাতুর চেয়ে কিছু কম নহে। সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সাবান মানুষের জীবনের নানা কাজে লাগিতেছে; উদ্ভিজ তৈল বা চর্ব্বিই ইহার প্রধান উপাদান। দামী ভাল তৈল রান্নার কাজে লাগে। এক সময়ে য়ুরোপে জলপাইএর তেল রান্নায় লাগিত। এখন চীনেবাদামের তেলই লোকের বেশী প্রিয়। ধুমহীন বারুদ ও ডিনেমাইট প্রস্তুত করিতে প্রচুর পরিমাণে গ্লিসেরিনের প্রয়োজন এবং ইহার অধিকাংশই সাবান বা মোমবাতির কারখানা হইতে পাওয়া যায়।

তৈলের ব্যবহার

মাখমের পরিবর্ত্তে য়ুরোপ ও আমেরিকায় উদ্ভিজ তৈল ব্যবহারের প্রথা প্রচলিত হওয়ায় তৈলবীজের বিক্রয় খুবই বাড়িয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান রাসায়নিক পদ্ধতি অনুসারে চীনেবাদামের তৈল ঘৃতের মত জমাট বাঁধিয়া ফেলা যায়। গাড়ীর চাকা ও কলে 'তেল' দিবার জন্য প্রচুর পরিমাণে তৈল লাগে। ঔষধাদি প্রস্তুত করিতে তেলের প্রয়োজন কম নহে।

ভারতের প্রধান প্রধান তৈলবীজ এইগুলি ঃ—মসিনা, তুলা, নারিকেল সরিষা, চীনেবাদাম, রেড়ী, তিল, মহুয়া। পরিশিষ্টের তালিকায় কি পরিমাণ তৈলবীজ, তৈল ও তৈল খৈল বিদেশে রপ্তানী হয় তাহা প্রদত্ত হইয়াছে। পাঠকগণ ইহা দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন যে ভারতবর্ষ কাঁচামালই বিদেশে প্রেরণ করিতেছে; পরিষ্কার তৈল প্রেরণ না করিয়া কেবলমাত্র তৈলবীজ পাঠাইয়া নানাদিকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে।

প্রধান প্রধান তৈল।

য়ুরোপ ও আমেরিকায় এই শিল্পের খুবই উন্নতি সাধন হইয়াছে। আধুনিক যন্ত্রপাতি কলকব্জা ও রাসায়নিক বিদ্যার সাহায্যে বীজের খোসা ছাড়াইয়া পেষা হওয়ায় নির্ম্মল তৈল বাহির হইতেছে। খৈলও একটা খুব দামী জিনিষ। রেড়ীর খৈলের মধ্যে বিষাক্ত পদার্থ থাকায় সেগুলি ক্ষেতের সারে লাগানো হয়; অপর বীজের খৈল গরু ভেড়ার খুবই উত্তম আহার্য্য বলিয়া ব্যবহৃত হয়।

কয়েকটি কল ছাড়া ভারতের অধিকাংশ তৈল বীজ দেশীয় ঘানিতে মাড়া হয়। ইহার ফল সন্তোষজনক নহে। খৈলের মধ্যে শতকরা ১২ ভাগ হইতে ৩০ পর্য্যন্ত তৈল থাকিয়া যায়। এই খৈল না গরুর ভাল আহার্য্য, না উপকারী সারের পক্ষে। এ ছাড়া বীজের খোসা ছাড়ানো হয় না বলিয়া তৈল নির্ম্মল হয় না। ইহার মধ্যে অম্লরস থাকিয়া যায় এবং সহজে নষ্ট হইয়া যায়।

তৈল ও খৈল

ভারতবর্ষ এখন বাণিজ্যের দরবারে কেবলমাত্র কাঠ কাটিবার ও জল টানিবার অধিকার পাইয়াছে; এই শোচনীয় দশা হইতে তাহাকে উঠাইতে হইলে ভবিষ্যতের শিল্পী ও ব্যবসায়ীগণকে কতকগুলি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে।

তৈল শিল্পের স্থবিধা অস্থবিধা

১। ভারতের বাহিরে যেসব স্থানে কাঁচা মাল যায় কোথায়ও

বীজ ও তৈলের উপর বিভিন্ন শুল্ক

তাহার জন্য শুল্ক লাগে না। কিন্তু তৈয়ারী সামগ্রীর উপর রীতিমত শুল্ক আছে। জারমেনী বিনা শুল্কে নারিকেল লইত কিন্তু নারিকেল তৈল দেশে প্রবেশ করিতে দিতে অনিচ্ছুক বলিয়া উচ্চ শুল্ক বসাইয়া দিয়াছিল। এরূপ সব দেশেই।

ভাড়ার তারতম্য

২। বিদেশে কাঁচামাল চালানের ভাড়া কম। ভারতবাসীদের নিজেদের জাহাজ নাই। এমন কি খৈল পাঠানোর ভাড়া সাধারণ কাঁচামাল হইতে অধিক—তৈলাদির ভাড়া ত খুবই বেশী, সুতরাং বর্ত্তমান অবস্থা শিল্পোন্নতির মোটেই অনুকূল নহে।

বিদেশের চেষ্টা

৩। যুদ্ধের পূর্ব্বে জারমেনী ভারতের বড় খরিদ্দার ছিল। ১৯১৪ সাল হইতে ফরাসী সেই কাজ করিতেছে; ফ্রান্সের দক্ষিণে মার্শেল বন্দরে এই তৈল বীজ যাইতেছে এবং দক্ষিণ ফ্রান্সে তৈলবীজ পেশা হইয়া য়ুরোপে ও ইংলণ্ডে প্রেরিত হইতেছে। কিন্তু ফ্রান্স জানে যুদ্ধের পরে ইংলণ্ড তাহার সাম্রাজ্যের তৈলবীজ স্বয়ং সংগ্রহ করিয়া নিজ দেশেই তৈল উৎপন্ন করিবে। সেই জন্য ফরাসীসরকার তাহার উপনিবেশের নানাস্থানে তৈলবীজ উৎপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছে। আমেরিকাও এ বিষয়ে মন দিয়াছে; সুতরাং ভারতের অনেকগুলি তৈলবীজ সম্বন্ধে এক চেটিয়া বাণিজ্য কমিয়া যাইবে।

৪। ঘানির অসুবিধার কথা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক উপায়ে তৈল বাহির করিতে না পারিলে বিদেশে এ প্রকার জঘন্য জিনিষের আদর হইবে না।

৫। ভারতীয় তৈলের মধ্যে অম্ল বা অ্যাসিড থাকায় ইহা শীঘ্র নষ্ট হইয়া যায়।

ভারতবর্ষের সমক্ষে এইরূপ আরও অনেক সমস্যা আসিবে। ভারতের কৃষিক্ষেত্রগুলির উৎপাদিকাশক্তি কমিয়া আসিতেছে অথচ খৈলের ন্যায় এমন উত্তম সার বিদেশে চালান হইতেছে; তৈলবীজ চলিয়া যাওয়াতে বিদেশের কৃষক ব্যবসায়ীরা লাভবান্ হইতেছে।

মসিনা

মসিনা ভারতে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। ১৯১৬-১৭ সালে ৩৫,৩২ হাজার একার জমিতে মসিনার চাষ হইতেছিল; ৩ লক্ষ ৯৪ হাজার টন্ মসিনার বীজ ৪৭, ৫৯ হাজার পাউণ্ডে বিক্রীত হয়। ভারতবর্ষে এখন ভাল মসিনার তেল পাওয়া যায়; পূর্ব্বে এই মসিনার তৈল বিলাত হইতে আসিত। মষিনার তেল শুকাইয়া শক্ত হইয়া যায় বলিয়া রঙের কাজে ইহা খুব প্রয়োজনে লাগে।

তুলাবীজ

তুলা বীজ হইতে তৈল করিবার ব্যবসায় এখনও তেমন করিয়া উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। বম্বেতে সামান্য চেষ্টা হইয়াছে। বিলাতে তুলাবীজের তৈল হয় বটে, কিন্তু আমেরিকায় ইহার উন্নতি খুবই হইয়াছে। ভারতে যে পরিমাণ তুলা হয় তাহা হইতে প্রতি বৎসর .২ লক্ষ টন তৈল হইতে পারে; কিন্তু ব্যবস্থার অভাবে এদেশে সামান্য লাভ হয়। ভারতীয় তুলাবীজ হইতে শতকরা ১৮ ভাগ তৈল নির্গত হয়—আমেরিকান বীজ হইতে ২০ ভাগ বাহির হয়। য়ুরোপে ও আমেরিকায় পরিষ্কার তৈল লোকে জলপাইএর তৈলের বদলে রান্নায় ব্যবহার করিতেছে। খৈলের একাংশ গরুতে খায় অপরাংশ ময়দার বদলে ব্যবহৃত হইতেছে।

সরিষা

সরিষার বীজ ভারতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে জন্মায়। সরিষার মধ্যে ৪০।৪৫ ভাগ তৈল থাকে। ইহার কি কি ব্যবহার হয় তাহা আমরা ভাল করিয়া জানি।

তিল কেবল যে ভারতেই হয় তাহা নহে; যবদ্বীপ, চীন, জাপান, আফ্রিকা ও দক্ষিণ-আমেরিকায় জন্মায়। ইহার মধ্যে ৪৪ ভাগ

তৈল আছে। কিন্তু ভারতীয় প্রথানুসারে সমস্ত তৈল নির্গত হয় না। এই তৈল রান্নায় ও মাখিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। তিলের তৈল বাহিরে রপ্তানী হয় না; তবে তিলবীজ প্রচুর পরিমাণে বাহিরে চলিয়া যায়। ফ্রান্সে নিকৃষ্ট শ্রেণীর তৈল সাবানে ও কলে ব্যবহৃত হয়। খৈল গরুতে খায়।

চীনাবাদামের তেল পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্রই তৈয়ারী হয়। ভারতবর্ষের মধ্যে মাদ্রাজ, বম্বে ও বর্ম্মাতে ইহা প্রধানতঃ হয়। বাংলা দেশে চীনাবাদাম অপেক্ষাকৃত উষর ভূমিতে উৎপন্ন হয়। খুব ভাল তেল করিতে হইলে প্রথমে খোলা ভাঙ্গিয়া লাল খোসা উঠাইয়া লইতে হয়। ভারতবর্ষ হইতে যে-তেল বিদেশে রপ্তানী হয় তাহা মোটেই খাদ্যাদিতে ব্যবহৃত হইতে পারে না। সাধারণত সাবানে এই তেল লাগে। পিষ্ট খৈল গরু ছাগলের খুব ভাল খাদ্য, ময়দার সঙ্গে মিশাইলে ইহা খুবই উত্তম মনুষ্যখাদ্য হয়।

চীনাবাদাম

রেঢ়ীর তেল আকাশ যানের ইঞ্জিনের কলে লাগে বলিয়া য়ুরোপে ইহার দাম খুব চড়িয়াছে। ১৯১৪ সালে ইংলণ্ডে ১৫ হাজার টন্ তেল তৈয়ারী হয়। ১৯১৮ সালে ইহার তিন গুণ তেল তৈয়ারী হইয়াছিল। বলিতে গেলে একমাত্র ভারতবর্ষেই রেঢ়ীবীজ উৎপন্ন হয়। অথচ ভারতের বাহিরেই অধিকাংশ বীজ রপ্তানী হইয়া যায়। রেঢ়ীর তেল কলে দিবার জন্য, ঔষধে, সাবানে এবং চামড়ার কাজেও লাগিয়া থাকে। রেঢ়ীর খৈল খুব ভাল সার কিন্তু বিষাক্ত বলিয়া গোরুর আহারের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী।

রেঢ়ী

নারিকেল তেল সম্বন্ধে বিশেষভাবে অন্যত্র আলোচনা হইয়াছে।

মহুয়াবীজ—মহুয়া গাছ হইতে পাওয়া যায়। ছোট নাগপুর ও উত্তর পশ্চিম প্রদেশে এই গাছ প্রচুর পরিমাণে আছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে ফ্রান্সে মহুয়া রপ্তানী হইত, ইহারও

মহুয়া

খৈল বিষাক্ত এবং সার ছাড়া আর কোনো উপায়ে ব্যবহার করা যায় না। এদেশে চর্বির বদলে মহুয়ার তেল ব্যবহৃত হয়।

এগুলি ছাড়া ভারতবর্ষে আর অনেক রকমের বীজ পাওয়া যায়, যেমন সূর্য্যমুখী বীজ, রাবার বীজ, কোকাম, নিম্, চালমুগরা প্রভৃতি; ইহাদের প্রত্যেকটি বাণিজ্য হিসাবে লাভজনক করা যাইতে পারে।

উদ্বায়ী তৈল।

ভারতবর্ষ ও পূর্ব্বদেশ সমূহ বহুকাল হইতে নানা প্রকার উদ্বায়ী তৈলের জন্য বিখ্যাত। যে-তেল খোলা রাখিলে 'উপিয়া' যায়, তাহাকে উদ্বায়ী তেল বলে। ভারতবর্ষে এই শ্রেণীর প্রায় ১৪ রকমের তেল পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে দারুচিনি, এলাইচির তেল, চন্দন, এলাইচি পাতার তেল, লেবুর তেল, খশখসের তেল, লেবুঘাসের তেল, মোতিয়া তেল ধনের তেল, জোয়ান ও আদার তেল প্রধান। ইহার মধ্যে দারুচিনি, চন্দন, জোয়ান, মোতিয়া কেবলমাত্র ভারতবর্ষ ও সিংহলেই উৎপন্ন হয়; অন্য তেলগুলির উপাদান পৃথিবীর অন্য অন্য স্থানেও পাওয়া যায়।

যুদ্ধের পূর্ব্বে লিমনঘাস, মোতিয়া, আদাপাতা (Ginger grass) লেবুর তেল এ দেশ হইতে রপ্তানী হইত। কিন্তু আর সমস্তই কাঁচা অবস্থায় বিদেশে যাইত। উপর্য্যুক্ত তেলগুলি যে এ দেশে চোলাই করা হইত—তাহার বিশেষ কারণ আছে। ঘাস বিলাত ও আমেরিকা পর্য্যন্ত লইয়া যাওয়ার খরচে পোষায় না এবং অতদূর যাইতে যাইতে শুকাইয়া নষ্ট হইয়া যায়। ১৯১৪ সালের পর হইতে উদ্বায়ী তৈলের চোলাই আরম্ভ হইয়াছে।

চন্দন তৈল ইহার মধ্যে খুব দামী; ইহার ব্যবহার ও প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী। চন্দন গাছ শিকড় বিস্তার করিয়া অন্যান্য গাছ হইতে তাহার রস সংগ্রহ করে। শিকড়ে ও গুঁড়িতে চন্দনের গন্ধকোষ থাকে। ত্রিশ,

চন্দনতৈল

চল্লিশ বৎসরের কম চন্দনের গাছ কাটিয়া তৈল করিবার উপযুক্ত হয় না। দেড় হইতে চারি হাজার ফিট উচ্চ ভূমিতে যে গাছ হয় তাহার গন্ধ ভাল। মাদ্রাস প্রদেশের দুইটি জেলায় ও মহীশূরে এবং কুর্গে চন্দন প্রধানত পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে মহীশূর সরকারের চন্দন বন অধিক। যুদ্ধের পূর্ব্বে সরকার বনভূমি নিলামে বিক্রয় করিতেন। ১৯১১ পর্য্যন্ত প্রতি বৎসর প্রায় ২॥—৩ হাজার টন কাঠ ৫০০৲ টাকা টন্ হিসাবে বিক্রয় হইয়াছিল। তারপরে দুই বৎসর জারমেন বণিকদের এই ব্যবসায় এক চেটিয়া করিয়া লইবার চেষ্টার ফলে দাম প্রায় দ্বিগুণ হইয়া যায়। যুদ্ধারম্ভের পরেও দুই বৎসর বাজার দর খুব চড়া থাকিল।

চন্দনের তৈল চোলাইএর ব্যবসায় বহুকাল হইতে এদেশে চলিয়া আসিতেছে; কিন্তু দেশীয় প্রথানুসারে প্রায় সম্পূর্ণ তৈলাংশের ১০।১২ ভাগ কাঠের মধ্যে থাকিয়া যায়। মহীশূরে এযাবৎকাল চোলাই করা নিষেধ ছিল। মাদ্রাসের দুই এক জায়গায় মাত্র হইত। যুক্তপ্রদেশে কনৌজে চন্দনের তেল আতরে ব্যবহার করিবার জন্য চোলাই করা হয়।

১৯১৬ সালে মহীশূর সরকার চন্দন চোলাইএর কল স্থাপন করেন। এবং মাসিক দুই হাজার পাউণ্ড তেল তৈয়ারী করিবার ব্যবস্থা করিলেন।

মহীশূরের চেষ্টা

দুই বৎসরের মধ্যে মাসিক উৎপন্ন ৬ হাজার পাউণ্ড হইতে লাগিল। দ্বিতীয় আর একটি কল তৈয়ারী হইতেছে। সেখানে মাসিক ২০ হাজার পাউণ্ড তেল তৈয়ারী হইবে।

চন্দনতেলের দর বিলাতে যুদ্ধের পূর্ব্বে ছিল ৩০৲ টাকা সের। ১৯১৫ সালে ৫০৲ টাকা, ১৯১৭ সালে ৮০৲ টাকা, এবং আরও পরে ১০০৲ টাকা সের। এই তেল সমস্তই বিলাতে চোলাই হইত। ইতিমধ্যে মহীশূর সরকার স্বয়ং এই ব্যবসায়ে নামিলেন। এই বিরাট কারখানার ভার এক জন দেশীয় রসায়নবিদের উপর ন্যস্ত আছে; তাঁহার অধীনের কর্ম্মচারী

ও বৈজ্ঞানিকগণ সকলেই ভারতবাসী। বিলাতের ডাক্তার ও রাসায়নিকগণ সকলেই মহীশূর সরকারের চন্দন-তৈল প্রস্তুতের প্রণালীর প্রশংসা করেন। সরকার দশ বৎসর পূর্ব্বে কাষ্ঠ নিলামে বিক্রয় করিয়া ১৩ লক্ষ টাকা, ১৯১২-১৩ সালে ২৬৷৷ লক্ষ টাকা লাভ করেন; গত দুই বৎসর কাঠ ও তেল বিক্রয় করিয়া সরকারের ৩৯ লক্ষ টাকা লাভ হয়। চন্দন তৈল হইতে যে সকল ঔষধ হয় তাহা কেমন করিয়া এ দেশেই প্রস্তুত করা যায় সে বিষয়ে মহীশূর সরকার গবেষণা করাইবেন ভাবিতেছেন।

জোয়ান হইতে থাইমল নামে এক প্রকার ঔষধ তৈয়ারী হয়। ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা ব্যারামে এই ঔষধের খুব প্রয়োজন। যুদ্ধের পূর্ব্বে এদেশ হইতে অধিকাংশ জোয়ান জারমেনীতে রপ্তানী হইত। বর্ত্তমানে অনেকগুলি থাইমলের কারখানা হইয়াছে। জোয়ান হইতে থাইমল ছাড়া আরও অনেক প্রকার সামগ্রী হয়। এই শিল্প ও বাণিজ্য দেশ মধ্যে আরও বিস্তৃত হওয়া উচিত। বিদেশে যাহাতে এই বীজ প্রেরণ করিয়া আমরা ক্ষতিগ্রস্ত না হই সেবিষয়ে দেশের ধনী বণিকদের দৃষ্টি দেওয়া উচিত।

জোয়ান

দাক্ষিণাত্যের দারুচিনি তৈল ও যুক্যালিপ্টাস তৈল উল্লেখ যোগ্য। উটাকামণ্ডে প্রকাণ্ড একটি কারখানাতে যুক্যালিপ্টাস তৈল চোলাইএর আয়োজন হইতেছে।

রঙের জন্য বহুপ্রকারের তেল প্রয়োজন হয়। ইহার মধ্যে মসিনার তেল ব্যবহারের প্রচলন সব চেয়ে বেশী। মসিনা ও তিসির অধিকাংশ বীজ বিদেশ রপ্তানী হইয়া যায়। এ ছাড়া পাইন গাছ হইতে যে ধুনা বাহির হয় তাহা চোয়াইয়া তারপিন তেল প্রস্তুত হয়। ব্যথামালিস প্রভৃতি কাজে তারপিনের প্রয়োজনের কথা আমরা সকলেই জানি। অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে এই শিল্প খুব উন্নতি

রঙের তেল

লাভ করিয়াছে। ভবালী, যুক্ত-প্রদেশ, জাল্লো ও পঞ্জাবে তারপিন তেল চুয়াই করিবার কারখানা আছে। আমেরিকা হইতেও এই তেল আসিয়া থাকে। কিন্তু দেশের ভিতর এই শিল্পের উন্নতি হইতেছে বলিয়া আমেরিকার চালান কমিতেছে। ১৯০০ সালে ১,৬০০ গ্যালন ১৯১০ সালে প্রায় ৩০ হাজার গ্যালন ও ১৯১৭ সালে ১ লক্ষ ৩৬ হাজার গ্যালন তারপিন তেল এ দেশে তৈয়ারী হয়। কিন্তু ইহা দেশের প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয় বলিয়া আমেরিকা হইতে ১ লক্ষ ৪০ হাজার গ্যালন তারপিন তৈল আমদানী করা হয়। রোজিন নামে একটি ধুনাজাতীয় সামগ্রী পাইন হইতে নিষ্কাশিত হয়; রংএর কাজে ইহার প্রয়োজনে লাগে।

তারপিন তেল

ভারতবর্ষের নানা স্থানে মোমযান নামক একপ্রকার কাগজ পাওয়া যায়। Safflower এর তেল বহু ঘণ্টা ফুটাইয়া হঠাৎ ঠাণ্ডা জলে ফেলিয়া দিলে রোগান নামে এক সামগ্রী পাওয়া যায়। অন্যান্য খনিজ রঙের সহিত মিশ্রিত করিয়া বহুবিধ কাজে ইহাকে লাগানো হয়। ভারতে অয়েল-ক্লথ বা জলসহা সামগ্রী প্রস্তুত করা যায় তাহার নিদর্শন দেখা যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের বুদ্ধি ও শক্তি এ সব জিনিষের উন্নতির দিকে নিয়োজিত হয় নাই।

মোমযান

ভারতবর্ষ ও প্রাচ্য দেশসমূহ এককালে নানা প্রকার সুগন্ধি নির্য্যাস, তৈল, আতরের জন্য জগৎবিখ্যাত ছিল। মোগল শাসন সময়ে এই সকল সামগ্রীর আদর ও প্রচলন দুই দেশব্যাপী ছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে দেশীয় সামগ্রীর আদর কি পরিমাণ কমিয়াছে তাহা বিদেশ হইতে আমদানী নির্য্যাসে তালিকা দেখিলেই বুঝা যায়। বর্ত্তমানে জৌনপুর, কনৌজ, গাজিপুর এই শিল্পের প্রধান কেন্দ্র। দিল্লী, অমৃতসর, লাহোর এই ব্যবসায়ের জন্য বিখ্যাত। বর্ত্তমানে বম্বে ও কলিকাতা বিদেশী এসেন্স আমদানীর প্রধান কেন্দ্র। ভারতবর্ষ হইতে

সুগন্ধি নির্য্যাস

প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ টাকার নির্য্যাস পূর্ণ বীজ বিদেশে রপ্তানী হইতেছে। এবং তাহারই নির্য্যাস নানা বিলাতী ও ফরাসী নামে ফিরিয়া আসিয়া শত গুণ দামে বিক্রয় হইতেছে।

প্রাণীজ তৈলাদি পদার্থের মধ্যে চর্বি, মাছের তেল, মাখম, ঘি প্রভৃতির বাণিজ্য ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে।

তৈলবীজ, তৈল এবং খৈলের রপ্তানী।

বৎসর	তৈল বীজ		তৈল		খৈল	
	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য
	হাজারটন্	পাউণ্ড	হাজার গ্যালেন	হাজারপাঃ	হাজারটন্	হাজারপাঃ
১৯১২-১৩	১২,১৭,	১,৫০,২২,	২,৪৪,৪৯,	৫,৭১,	১,৬১,	৮,১১,
১৯১৩-১৪	১৫,৭২	১,৭০,০০,	২,৫৯,৯১,	৬,৫৭,	৭৫,	৯,২০,
১৯১৭-১৮	৪,৩১,	৫০,৫২,	৫০,৫২	১৩,২৬,	৮৬,	৪,৭১,

রঙরেজ্ ও ছিপিকর্ম

বাংলাদেশ ছাড়া ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই ছোপানো বা রঙীন কাপড়ের প্রচলন দেখা যায়। কাপড় রঙ করিবার ব্যবসায় বহুকাল হইতে এদেশে চলিয়া আসিতেছে; কিন্তু গত কয়েক বৎসরের মধ্যে বিদেশী ও বিশেষ ভাবে জার্ম্মণীর (আনালিন) কৃত্রিম রঙের আমদানীর ফলে এই শিল্পের অধঃপতন খুবই হইয়াছে। ছিপিকর্ম যে ক্রমেই ধ্বংস পাইতেছে একথা

রঙের কারবারের অবনতি

সরকারও স্বীকার করেন। বিদেশী রঙের যে এত প্রচলন হইয়াছে তাহার কারণ সেগুলি সহজে করা ও সস্তায় পাওয়া যায়। এছাড়া দেশী অনেক রঙ পাকা নয়—এই সব কারণে দেশী রঙের শিল্পের অবনতি। কিন্তু ইহার দ্বারা যে কেবল আর্থিক ক্ষতি হইতেছে তাহা নহে—দেশের শিল্পীদের রুচি ও সৌন্দর্য্যবোধ নষ্ট হইতেছে। নষ্ট শিল্প বাণিজ্য উদ্ধার হইতে পারে কিন্তু বিকৃত রুচিকে সুন্দর করা দুঃসাধ্য। রঙরেজ ও ছিপিকারগণ এক্ষণে দেশের রঙ খুবই কম ব্যবহার করে, এবং প্রাচীন রঙে রঙে মিলাইবার কায়দাও তাহারা প্রায় ভুলিয়া আসিয়াছে।

বিদেশের সহিত প্রতিযোগীতা করিয়াও এখন নিম্নলিখিত রঙগুলি দেশের মধ্যে চলিতেছে। ১। নীলরঙ এককালে বাংলাদেশে খুব উৎপন্ন হইত। বিদেশে এই নীল রপ্তানী হইত—কারণ তখনো কৃত্রিম নীল জার্ম্মানীতে আবিস্কৃত হয় নাই।

নীল রঙ

এই নীল উৎপন্ন করিবার জন্য নীলকরদের উপদ্রবের ইতিহাস 'নীলদর্পণে' স্বর্গীয় দীনবন্ধুমিত্র অমর করিয়া রাখিয়াছেন। বর্ত্তমানে বিহারে কয়েকটি জিলায় এখনো নীল উৎপন্ন হয়; সেগুলি সাহেবদেরই অধীন। ছিপিকারগণ নীল রঙের সঙ্গে সাজিমাটি, চুণ ও কিয়দ পরিমাণ গুড় মিশাইয়া গুলিয়া তিন চারিবার কাপড় ডুবাইয়া ডুবাইয়া তোলে।

নীল রঙ প্রায় ৩০০ রকম গাছ হইতে পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে ভারতে প্রায় ৪০ রকমের গাছ আছে। পশ্চিম ভারতেই ২৫ রকমের গাছ দেখা যায়, কিন্তু বাঙ্গালা বিহারের দিকে নানা জাতের নীল না থাকিলেও উৎপন্ন এই দিকেই বেশী হয়।

য়ুরোপীয়দের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে নীল পশ্চিম ভারত হইতে রপ্তানী হইতে থাকে। তারপর কিছুকাল মাঝে নানা কারণে ইহার বাণিজ্য

নীলকারবারের ইতিহাস

মন্দা পড়ে। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝ হইতে পূর্ব্বদ্বীপ হইতে নীলের চাষ উঠিয়া যায়—তখন এক মাত্র ভারতবর্ষের উপর পৃথিবীর নীল রঙের সরবরাহের ভার পড়ে। বাংলাদেশের নরম মাটীতে নীলের চাষ সহজে হইবে ভাবিয়া এখানে নীলকুঠি স্থাপিত হয়। কিছু দিনের মধ্যে কুঠিয়াল ও সরকারের মধ্যে যে বিবাদ বাঁধে তাঁহার ইতিহাস বাঙ্গালীর অজানা নাই। চাষীরা নীল-বুনিতে অস্বীকৃত হইল—সরকারও কুটিয়ালদের ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইলেন না। তখন এই শিল্প বাংলা হইতে উঠিয়া বিহার ও যুক্ত প্রদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু সেখানে ইহা অন্য কারণে টিকিতে পারিল না। জার্ম্মেণী হইতে আনালিন রঙ আসিয়া প্রতিযোগীতা করিতে লাগিল এবং সে প্রতিযোগীতায় নীল ও অন্যান্য রঙের কারবার টিকিতে পারিল না। যুদ্ধের সময়ে বিদেশী রঙের আমদানী বন্ধ হইলে নীলের কারবারের উন্নতি কেমন করিয়া হইতে পারে এই লইয়া দিল্লীতে বিশেষজ্ঞদের এক অধিবেশন হয় এবং তাহাতে কৃষির বৈজ্ঞানিক গবেষণার ও কারবারের দিক হইতে উহার উন্নতি বিষয়ে আলোচনা হয়।

১৮৯৭ সালে জার্ম্মাণীর রঙ বাজারে নামে—সেই হইতে নীলের চাষ ও শিল্পের সর্ব্বনাশ সুরু হইয়াছে।

নিম্নের তালিকা হইতে দেখা যাইবে যে যুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বরাবর নীলের চাষ রপ্তানী ও তাহার মূল্য সর্ব্বত্রই কমিয়াছিল; কিন্তু যুদ্ধারম্ভে নীলের চাষ বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

অন্যান্য রঙ

২। লাক্ষার রঙ—সাজিমাটির সঙ্গে লাক্ষা গুঁড়া মিশাইয়া জলে ফুটাইয়া ফুটন্ত রঙে কাপড় ছোপানো হয়। ইহাতে পাকা লাল রঙ হয়।

৩। হলুদ গুঁড়া করিয়া সাজিমাটির সঙ্গে মিশাইয়া ফিটকারী দিয়া হলুদে রঙ তৈয়ারী হয়।

৪। কুসুম ফুলের রঙ।—ছোট ছোট ফুল ভাল করিয়া প্রথমে শুকানো হয়; পরে ঝুড়ির মধ্যে রাখিয়া ঠাণ্ডা জল ঢালিয়া হল্‌দী ছোপটা দুর করিয়া দেওয়া হয়। ইহাতেও সাজিমাটি দিয়া লাল রঙ বাহির করা হয়।

৫। বিলাতি হল্‌দি নামে একবার হল্‌দে রঙ্‌ পাওয়া যায়—রেশম রঙ করিতে এই হল্‌দী ব্যবহৃত হয়।

৬। পলাশ, অল হরিতকী হইতেও রঙ হয়।

দেশী রঙের প্রধান দোষ হইতেছে যে সেগুলি পাকা নয়—বিলাতী রঙ পাকা; সেই জন্য বাজারে দেশী রঙ টিকিতে পারে নাই।

এ দেশের প্রাচীন বস্ত্রের নমুনা দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে এক কালে রঙের কার্য্য কি প্রকার উন্নতি লাভ করিয়াছিল। মাদ্রাজের 'কালিকো' কাপড়ের ছাপা এককালে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছিল। দাক্ষিণাত্য হইতে এককালে সুন্দর সুন্দর রঙীন রুমাল বিদেশে রপ্তানী হইত, কিন্তু এখন সে শিল্প ধ্বংসমুখ। মোটের উপর ভারতের রঙের অবস্থা খুবই শোচনীয়; কেমন করিয়া এই শিল্প পুনরায় দেশে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে—সে বিষয়ে বৈজ্ঞানিকগণ চিন্তা করুন।

	নীলের চাষ একার	রপ্তানীর মূল্য হন্দর	রপ্তানীর মূল্য পাউণ্ড
১৯০১-০২	৭৯১,০০০	৮৯,৭০০	১২,৩৪,৮০০
১৯১০-১১	২৭৬,০০০	১৬,৯০০	২,২৩,৫০০
১৯১৩-১৫ যুদ্ধের পূর্ব্বে	১৭৬,০০০	১০,৯০০	১,৪২,০০০
১৯১৫-১৬	৩১৪,০০০	৪১,৯০০	১৩,৮৫,০০০
১৯১৭-১৮	৭৫৬,০০০	৩৩,৫০০	১৩,৮৩,০০০

প্রাণীজ শিল্প সামগ্রী

প্রাণীজ শিল্প-সামগ্রীর মধ্যে চামড়া, হাড় ও শিঙের কাজ পড়ে। ইহার মধ্যে চামড়া প্রধান।

চামড়া

সরকারী আন্দাজ অনুসারে ভারতে গো-মহিষ প্রায় ১৮ কোটী ও ছাগ মেষ প্রায় ৯ কোটী আছে। কৃষিপ্রধান দেশের পক্ষে উক্ত সংখ্যা বেশী না হইলেও চামড়া ও ছালের ব্যবসায়ের পক্ষে ইহা নিতান্ত কম নয়। চামড়া ব্যবসায় দুটি পৃথক শিল্প; একটি হইতেছে কাঁচা চামড়া ও ছাল তৈয়ারী করিয়া পাকানোর কাজ; অপরটি হইতেছে পাকা চামড়া হইতে সামগ্রী প্রস্তুত। আমাদের দেশে চামড়ার কাজ চামার ও মুচীরা করে; ইহারা হিন্দু সমাজের প্রায় সর্ব্বনিম্ন স্তরে পড়িয়া আছে। গ্রামের ভাগাড় হইতে মরাগরুর চামড়া পাইবার জন্য চামারেরা জমিদারদের কাছ হইতে জমি ইজারা লইয়া থাকে। সেখান হইতে চামড়া সংগ্রহ করিয়া তাহারা অত্যন্ত আদিম প্রথানুসারে সেগুলিকে সাফ করে। চামড়া সাফের প্রধান উপাদান বাব্‌লা গাছের ছালের কৎ ও চুণ। কিন্তু দেশীয় প্রথানুসারে যে চামড়া হয় তাহা আদৌ ভাল নহে, ইহাতে চুণ বেশী হয়, লোম ভালরূপ সাফ হয় না। অনেক সময়ে দেশী মুচিরা কলিকাতা, আগ্রা বা কাণপুর হইতে বিলাতী চামড়া কিনিয়া সামগ্রী বানায়।

দেশী চামড়ার কাজ

দেশী মুচিরা নাগরা ও সাধারণ জুতা, বুট, চটি; জলের মোট, ভিস্তি, ঘোড়ার সাজ ও জিন লাগাম বানায়। এছাড়া ডুগি তবলা, খোল, ঢোল, মাদল, মৃদঙ্গ, ঢাক, মন্দার প্রভৃতি বাদ্য যন্ত্রও ইহারা নির্ম্মাণ করে। কলিকাতা, ঢাকা, মুর্শিদাবাদ ও বিষ্ণুপুর বাদ্যযন্ত্র নির্ম্মাণের প্রধান কেন্দ্র। দেশী জুতার প্রাধন কেন্দ্র কটক, প্যাটনা ও সারন। এছাড়া অনেক স্থানে দেশীয় মুচিদের জুতা,

চটির নামডাক আছে। কলিকাতার মুচিরা আজকাল বিলাতী জুতার ন্যায় সুন্দর সুন্দর জুতা বানাইতেছে। তবে মুচিরা সর্ব্বত্র মহাজনদের হাতের মধ্যে। তাহারা ৫০৲ টাকা দাদন দিয়া মাসে মাসে ২০ জোড়া জুতা আদায় করে। অধিকাংশ জায়গায় মুচিরা মহাজনের হাতে থাকাতে তাহাদের নিজেদের উন্নতি হয় না। জেলেদের মধ্যে একটা কথা আছে—

মুচিদের দুর্দ্দশা

"জেলেদের পরোনে ত্যানা, লণ্ডনের কাণে সোনা" এ কথাটা মুচিদের সম্বন্ধেও খাটে। কলিকাতায় মেছুয়া বাজারে মুচিদের সমবায় হইয়াছে,—আশা হইতেছে ইহাতে তাহারা রক্ষা পাইবে।

য়ুরোপীয় প্রথানুসারে চামড়া তৈয়ারী মিলিটারী-বিভাগের দ্বারা প্রথমে আরম্ভ হয়। সৈনিকদের জন্য জুতা, বুট, বেণ্ট, গুলি রাখিবার ব্যাগ, অশ্বের জিন লাগাম প্রভৃতি নানাবিধ সামগ্রী প্রয়োজন হয়। এই সমস্ত প্রস্তুত করিবার জন্য ১৮৬০ সালে গভর্ণমেণ্ট কানপুরে চামড়ার এক কারখানা স্থাপন করেন; কিছুকাল পরেই কুপার ও আলেন কোম্পানী আর একটি কারখানা স্থাপন করে ও গভর্ণমেণ্ট প্রচুর অর্থ সাহায্য করিয়া তাহাদিগকে জাঁকাইয়া তোলেন। বর্ত্তমানে তাহারাই সৈনিক বিভাগের চামড়ার জিনিষ সরবরাহ করে।

বিলাতী ধরণে চামড়া তৈয়ারী

ভারতবর্ষের চামড়া ও ছাল কাঁচা বা আধপাকা অবস্থায় অধিকাংশই বিদেশে চালান হইয়া যায় ও সেখান হইতে পাকা চামড়া হইয়া এদেশে আমদানী হয়। ১৮৪৬ সালে ৪৮ হাজার চামড়া রপ্তানী হইয়াছিল—প্রতি চামড়ার মূল্য ছিল ৶৫ পাই ও ছালের দাম ছিল ৴২ পাই; যুদ্ধের পূর্ব্বে ১ কোটী ৩৪½ লক্ষ চামড়া বিদেশে যায়—তখন চামড়ার দাম ছিল ৬৲ টাকা ও ছালের দাম ১৷৶৬।

চামড়ার দাম

সুতরাং গত সত্তর (৭০) বৎসরে রপ্তানী চামড়ার পরিমাণ ২৫০ গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে, দাম ১২ গুণের উপর বাড়িয়াছে।

যুদ্ধের পূর্ব্বে জারমেনী ও অষ্ট্রীয়াতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে ভারতীয় চামড়া রপ্তানী হইত। এদেশেও চামড়ার বাণিজ্য এক প্রকার জার্ম্মাণ বণিকদের হাতে ছিল। ১৯১৩-১৪ সালে একা জার্ম্মানী ভারতীয় চামড়ার শতকরা ৩৫% ভাগ নিজ দেশে লইয়াছিল।

চামড়ার বাজার

যুদ্ধ আরম্ভ হওয়াতে শত্রুদের সহিত বাণিজ্য বন্ধ হইল এবং সমগ্র ব্যবসায় দেউলা হইবার উপক্রম হইল। তখন স্বয়ং সরকার বণিকরূপে আসিয়া চামড়ার ব্যবসায় গ্রহণ করিলেন – নতুবা বণিকদের সর্ব্বনাশ। এ ছাড়া যুদ্ধের জন্য শত প্রকারের চামড়ার জিনিষ নিয়ত প্রেরণ করা সরকারের তখন নিতান্ত প্রয়োজন। সেই জন্য যাবতীয় চামড়া সরকার স্বয়ং ক্রয় করিতে লাগিলেন, এবং এখান হইতে নানা প্রকার সামগ্রী প্রস্তুত করাইতে লাগিলেন।

যুদ্ধের ফলে ভারত সরকারকে যেসব শিক্ষা শিখিতে হইয়াছে তাহার মধ্যে প্রধান হইতেছে ভারতীয় কাঁচামাল হইতে ভারতের মধ্যেই সামগ্রী প্রস্তুত করার উপায় উদ্ভাবন। সেই জন্য চামড়ার কাজ যাহাতে এ দেশে ভাল হয়—সে সম্বন্ধে সরকার মনোযোগ দিয়াছেন।

চামড়া তৈয়ারীর প্রতিকূল অবস্থা

যুদ্ধের পূর্ব্বে শোনা যাইত ভাল চামড়া এদেশের কারখানাতে করা যায় না। কলিকাতার জল ভাল নয়। সেখানকার আবহাওয়া চামড়া বানাইবার পক্ষে অনুকূল নয়, মাল মশলা এখানে দুর্লভ ইত্যাদি অনেক কথা শুনিয়া দেশের লোক সেদিকে কখনো দৃষ্টি দেয় না। যুদ্ধের পূর্ব্বে এসব যুক্তি অকাট্য বলিয়া মনে হইত—কিন্তু সরকারী গবেষণার ফলে তাহা অপ্রমাণিত হইয়াছে।

বাংলা দেশে স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে ন্যাশন্যাল ট্যানারী, বহরমপুর ট্যানারী, উৎকল ট্যানারী প্রভৃতি স্থাপিত হয়। এ ছাড়া ডেভিড সেম্যুন,

চামড়ার ব্যবসায়।

গ্রেহাম কোম্পানী, বার্ড কোং ও গ্রেস ব্রাদার্স প্রভৃতি বিদেশী কোম্পানী প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কারখানা কলিকাতায় খুলিয়াছে; সেখানে চামড়া সাফ করিয়া বিদেশে চালান হয়। পূর্ব্বে অনেক কোম্পানী দেশী প্রথানুসারে* সাফকরা চামড়া কিনিয়া রপ্তানী করিত। কিন্তু ওসব জিনিষ সাধারণত এমন জঘন্য যে তাহা পুনরায় না পাকাইলে কাজ চলে না। দেশী প্রথামতে চামড়া পরিষ্কার করিতে এক মাস হইতে দেড় বৎসর পর্য্যন্ত লাগে। কিন্তু বর্ত্তমানের বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে মহিষের চামড়া ৭ দিনে, গোরুর চামড়া এক দিনে ও ছাল ৬।৭ ঘণ্টায় পাকা হইয়া যায়।

ভারতবর্ষে চামড়া পাকাইবার বহুবিধ উদ্ভিজ্জ সামগ্রী পাওয়া যায়; সেসব জিনিষ খুব সস্তা, আমাদের দেশে মুচিরা ইহার ব্যবহারও জানে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক উপায়ে সব কাজ করিতে পারে না বলিয়া ভাল চামড়া হয় না। চামড়ার শিল্প ও ব্যবসায় যে বিদেশী বণিকদের হাতে চলিয়া গিয়াছে ইহার প্রধান কারণ,—আমাদের দেশের মুচিদের সামাজিক অবস্থা। তাহারা সমাজের সর্ব্বনিম্ন স্তরে আছে বলিয়া ভদ্রলোক মূলধন ও উচ্চশিক্ষা লইয়া তাহাদের সহিত যোগদান করেন নাই। সাহেবদের সে অভিমান নাই—তাই চামড়ার কারবারে তাহারা লক্ষপতি হইয়া উঠিয়াছে। এবং মধ্যবিত্ত সব কাজই মুসললামদের একচেটিয়া।

অন্যান্য প্রাণীজ শিল্পের মধ্যে হাতীর দাঁতের কাজ খুব বিখ্যাত। হাতীর দাঁত বা হাড় আফ্রিকা হইতে আমদানী হয়। প্রাচীনকালে এই হাড় সুদূর গ্রীনল্যাণ্ড সাইবেরিয়া হইতে এ দেশে আসিত।

হাতীর দাঁতের কাজ

এই শিল্প প্রধান পাঁচটি জায়গায় উন্নতি লাভ করিয়াছে—দিল্লী, মুর্শিদাবাদ, মহীশূর, ত্রিবঙ্কুর, ও বর্ম্মার মৌলমনে। এই কয়টি স্থানের মধ্যে মহীশূরের কারুকার্য্য বিখ্যাত। মুর্শিদাবাদ ছাড়া ত্রিপুরা ও ঢাকার কাজ বাংলাদেশের মধ্যে খুব খ্যাত। এ শিল্প এখনো

কুটীরের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া আছে; কারীকরগণ সকলেই প্রায় নিরক্ষর।

মহিষের শিংএর কাজ

মহিষের শিংএর চিরুণী, কলম প্রভৃতি সামগ্রী প্রস্তুত হয়। কটক, মুঙ্গের, সাতখিরা, যশোহর, হুগলী ও শ্রীরামপুরের চিরুণী, ব্রুচ, হার, চুড়ী প্রভৃতি ছোট ছোট জিনিষ তৈয়ারী হয়। এ ছাড়া আসামের শিবসাগর, জয়পুর, রাজকোট, বড়োদা, কাথিবার, মহীশূর প্রভৃতি স্থানে মহিষের শিংএর নানারূপ সামগ্রী হয়।

শাঁখার কাজের জন্য ঢাকার শাঁখারীদের নাম সর্ব্বত্র বিখ্যাত।

আঁশাল জিনিষ

আঁশাল সামগ্রী

ভারতবর্ষে প্রায় ৩০০ প্রকারের আঁশাল গাছ ও উদ্ভিদ্ আছে। ইহার মধ্যে প্রায় শতাধিক প্রকারের গাছ লোকে নানা ভাবে ব্যবহার করে; এবং তাহারও মধ্যে ১০।১২ রকম বাণিজ্যের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আমাদের কাছে তুলা, পাট, শন খুব সুপরিচিত—নারিকেলের কাতা নিতান্ত অজানা নয়। উদ্ভিজ্জ আঁশাল সামগ্রী ছাড়া রেশম ও পশম প্রাণীজ আঁশালের মধ্যে বিখ্যাত।

তুলা।

ভারতবর্ষে তুলার চাষ ও সুতার কাপড় বহুকাল হইতে হইতেছে। ইংলণ্ডে সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে লোকে সুতার কাপড় বুনিতে জানিত না। ইহাকে লোকে সাদা পশম বলিত; সমুদ্রপথে বাণিজ্য চলিবার পূর্ব্বেও ইহা য়ুরোপে চালান হইত।

যুদ্ধের পূর্ব্বে ১৯১৩-১৪ সালে সমস্ত ভারতে ২ কোটি ৪৬ লক্ষ একার

জমিতে তুলার চাষ হইত। যুদ্ধের পর কর্ষিত ভূমির পরিমাণ কমিয়াছে।

উৎপন্ন তুলার হিসাব

যুদ্ধের পূর্বে পাঁচমণে বস্তার ৫২ লক্ষ বস্তা তুলা ভারতে উৎপন্ন হইয়াছিল; কিন্তু কোনো বার বেশী কোনো বার কম হয় বলিয়া গড়ে বাৎসরিক ৪০লক্ষ বস্তা তুলা উৎপন্ন হয় ধরা হয়। ইহার মধ্যে গড়ে প্রায় ১৭½ লক্ষ বস্তা বিদেশে রপ্তানী হয়, প্রায় ১৮ লক্ষ বস্তা দেশী কাপড়ের কলে ব্যবহৃত হয় ও প্রায় ৪॥ লক্ষ অন্যান্য কাজে লাগে।

ভারতবর্ষের সমগ্র উৎপন্ন তুলার এক তৃতীয়াংশ বিদেশে রপ্তানী হইয়া যায়। যুদ্ধের পূর্ব্বে জাপান, জার্ম্মানী, বেলজিয়াম, ইতালী, অষ্ট্রীয়া,

তুলার ইতিহাস

ফ্রান্স, ইংলণ্ড, চীন ও জাপান ভারত হইতে তুলা আমদানী করিত। এশিয়ার মধ্যে জাপান, ও য়ুরোপের মধ্যে জার্ম্মানী ছিল ইহার বড় খরিদ্দার। ইংলণ্ডে ভারতীয় তুলা বেশী যাইত না। ম্যানচেষ্টারের কলের জন্য তুলা প্রধানত মার্কিণ ও মিশর হইতে আমদানী হয়। ভারতবর্ষ হইতে গড়ে ৫০ হাজার বস্তার বেশী ইংলণ্ডে রপ্তানী হইত না। ১৮৬০ সালে আমেরিকায় ঘরাও যুদ্ধ বাঁধিলে কয়েক বৎসর বাণিজ্যের খুব গোলযোগ ঘটে। সেই সময়ে ভারতের তুলার উপর ম্যানচেষ্টারের কলওয়ালাদের দৃষ্টি কিছু কালের জন্য পড়িয়াছিল; সেই হইতে তুলার চাষ ও চালান দুইই বাড়িয়া চলিয়াছিল।

তারপর কয়েক বৎসর হইতে তুলার রপ্তানী কিছু মন্দা পড়িয়াছে। ইহার দুইটি কারণ। প্রথমত—দেশীয় কাপড়ের কলের শ্রীবৃদ্ধি হওয়াতে তুলার টান সেদিকে বাড়িয়াছে; দ্বিতীয়—ভারতের তুলা ভাল জাতের নয় বলিয়া বিলাতী কলওয়ালারা ইহা লইতে অনিচ্ছুক। আমেরিকা হইতে সুবিধাদরে ভাল তুলা পাওয়া যায় বলিয়া তাঁহারা সেখান হইতে তুলা আমদানী করিতেছেন। ম্যানচেষ্টার কলওয়ালারা যখন এ দেশ হইতে তুলার আমদানী কমাইয়া দিল—জাপান হইতে খরিদ্দার

আসিয়া তুলা কিনিতে লাগিল। বর্ত্তমানে জাপান ভারতীয় তুলার প্রধান খরিদ্দার সে কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তুলার এই টান শীঘ্রই কমিবে। জাপান কোরিয়াতে আমেরিকার ভাল জাতের তুলার চাষ সুরু করিয়াছে। এবং অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে জাপান হয় ত' ভারতের তুলা ক্রয় করা বন্ধ করিয়া দিবে।

ভারতবর্ষের মধ্যে বম্বে ও বেরার প্রদেশে তুলা সব চেয়ে অধিক উৎপন্ন হয়।

কাপড়ের কল

বম্বেতে ১৮৫১ সালে প্রথম কাপড়ের কল স্থাপিত হয়। তারপর দশ বৎসরের মধ্যে প্রায় ১২টি কল ও তাহার সঙ্গে ৩ লক্ষ ৩৮ হাজার চরকার কাজ আরম্ভ হয়। চল্লিশ বৎসর পরে ১৯০১ সালে ১৯৪টি কল ছিল। যুদ্ধের পূর্ব্বে কাপড়ের ও সুতার কলের সংখ্যা ছিল ২৭২টি; কিন্তু যুদ্ধের সময়ে যখন কাপড় চোপড়ের ভীষণ টানাটানি সেই সময়ে ভারতে একটিও নূতন কল স্থাপিত হয় নাই; বরং ছয়টি কল সুতার অভাবে উঠিয়া গিয়াছিল। সরু সুতার জন্য আমাদের কলওয়ালাদের বিদেশে তাকাইয়া থাকিতে হয়। এ ছাড়া কল কব্জার প্রত্যেকটি অংশ বিলাত হইতে আসে; যুদ্ধের সময়ে সে সব বন্ধ ছিল—তা ছাড়া জাহাজও ছিল না। ১৯০৫ সালের 'বয়কট' ও স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে দেশী কলওয়ালাদের সুদিন আরম্ভ হইয়াছে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশ বৎসরে পূর্ব্বাপেক্ষা কাপড় প্রায় দ্বিগুণ উৎপন্ন হইয়াছিল। ভারতের মিলের যে শ্রেণীর কাপড় তৈয়ারী করিলে কলওয়ালাদের পোষায় তাহা অত্যন্ত মোটা, ভারতে সাধারণত তাহা ব্যবহৃত হয় না। এই জন্য মিলের উৎপন্ন সামগ্রীর প্রায় শতকরা ১৫ আনা বিদেশে রপ্তানী হইয়া যায়।

বিদেশী আমদানীর মধ্যে সুতা ও কাপড় সব চেয়ে বেশী টাকার আসে—এক-পঞ্চমাংশের বেশী; কিন্তু দেশীয় রপ্তানীর বিশ ভাগের এক

সুতা ও কাপড়ের আমদানী ও রপ্তানী

অংশ মাত্র দেশীয় সুতা ও কাপড়ের মূল্য। বিদেশ হইতে আমাদের দেশে সুতা আসে মিলের জন্য,—ও কাপড় আসে লোকদের জন্য। আমরাও যেমন প্রত্যক্ষভাবে কাপড়ের জন্য বিলাতের মুখাপেক্ষী—দেশীয় মিলওয়ালাদের অনেকে সুতার জন্য বিলাতের মুখাপেক্ষী। যুদ্ধের পূর্ব্বে দেশী কলে কাপড় কম প্রস্তুত হইতেছিল। কারণ পূর্ব্বদিকে জাপান ভারতের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়াছে। চীন ভারতবর্ষ হইতে প্রচুর পরিমাণে মোটা কাপড় ও মোটা সুতা আমদানী করিত; কিন্তু সে এখন জাপান হইতে কাপড় পাইতেছে।

ভারতীয় সুতা ও কাপড়ের প্রধান খরিদ্দার মিশর, তুর্কী, জাপান এখন সকলেই আমদানী কমাইয়া দিয়াছে। জাপান ১৮৮৮ সালে ২ কোটী ৩১ লক্ষ পাউণ্ড ওজনের সুতা ভারত হইতে আমদানী করিয়াছিল;—১৮৯৯-১৯০০ সালে সেই স্থানে ১ লক্ষ ৮০ হাজার পাউণ্ড দাঁড়ায়। বর্ত্তমানে সে ভারতে সুতা ও কাপড় রপ্তানী করিতেছে। *

নিম্নে ভারতের বস্ত্র শিল্পের অবস্থা কিরূপ তাহা অন্য দুটি দেশের পাশাপাশি রাখিয়া তুলনা করিতেছি :—

	কল	চরকা	তাঁত	শ্রমজীবি	মজুরী (পাঃ)বার্ষিক	কত অংশ দেশে রাখে
বিলাত	২,০১১	৫,৯৩লক্ষ	৮,০৫হাজার	৬,২৭হাজার	৪৮,৯০ লক্ষ	২০ %
মার্কিণ	১,৪৪৯	৩,২২ ”	৬,৯৬ ”	৩,১৮ ”	৩০,৪০ ”	৯৪ %
ভারতবর্ষ	২৭২	৬৬ ”	৯৪ ”	২,৫৩ ”	৬,৫৩ ”	৭৯ %

* বিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতে এ পর্য্যন্ত আমদানী জাপানী সুতা ও কাপড়ের মূল্য প্রায় ২০ গুণ বাড়িয়াছে!

১৯০১ সালে—১৩ লক্ষ টাকা,—১৯১০ সালে—৭৫ লক্ষ টাকা,

১৯১৩ সালে—১ কোটী ২০ লক্ষ টাকা,—১৯১৩-১৭ সালে ২ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকা।

ইংল্যাণ্ডে যে পরিমাণ কাপড় বা সুতা উৎপন্ন হয় তাহার মাত্র শতকরা ২০ ভাগ দেশে থাকে, অবশিষ্ট সমস্তই বিদেশে চালান দেয়; ইহার প্রধান খরিদ্দার ভারতবর্ষ।

বর্ত্তমানে বস্ত্রশিল্পে ইংলণ্ডের সহিত ভারতের যে-প্রতিযোগীতা তাহা কলের সঙ্গে কলের। নানা কারণে এই প্রতিযোগীতায় ভারতীয় মিল-সমূহ তাহাদের বিলাতী প্রতিদ্বন্দ্বীদের সহিত পারিয়া উঠিতেছে না। কিন্তু বাণিজ্য ইতিহাসের গোড়া হইতে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত হাতে-চলা তাঁতের সঙ্গে—বিলাতের হাতে-চলা তাঁত পারিয়া উঠে নাই—এমন কি নানা অনুকূল ঘটনার সংযোগ না হইলে বিলাতের মিলও পারিয়া উঠিত কি না সন্দেহ।

বস্ত্রশিল্পের ইতিহাস

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইংলণ্ডের শিল্প-ইতিহাসে মহাপরিবর্ত্তন ঘটে। বিলাতে অনেকগুলি কলকব্জা ও ষ্টীম-এঞ্জিন আবিস্কৃত হইল। এই সকল আবিষ্কারের ফলে বিলাতের ও পরে সমগ্র য়ুরোপের সামাজিক জীবন যাত্রার মধ্যে যে পরিবর্ত্তন ও বিপ্লব সাধিত হয় তাহা এখানে বিবৃত করিবার বিষয় নয়। ষ্টীম এঞ্জিনের সাহায্যে হাতের তাঁত কলে চলিতে লাগিল। একটা জিনিষের জায়গায় দশটা জিনিষ প্রস্তুত হইতে লাগিল ও ভারতে বিলাতীমাল চালান সুরু হইল। ভারতীয় শিল্পের অধোগতি আরম্ভ হইল। ১৮১৩ সালেও কলিকাতা হইতে লণ্ডনে প্রায় ২০ লক্ষ পাউণ্ড ওজনের সুতার জিনিষ রপ্তানী হইয়াছিল। ১৮৩০ সালে বাণিজ্যের আকৃতি সম্পূর্ণরূপে বদলাইয়া গিয়াছে—কলিকাতায় লণ্ডন হইতে ২০ লক্ষ পাউণ্ডের সুতার মাল আমদানী হইল। ১৮২৩ সালে প্রথম এ দেশে বিলাতী সুতা আমদানী হয়; ইহার পূর্ব্বে ভারতবর্ষ কখনো বিলাতী সুতার মুখ দেখে নাই; এখন মিলের

জন্য মিহি সুতা অধিকাংশ বিলাত হইতে আসে। গত এক শত বৎসরের মধ্যে বাণিজ্যে এই যুগান্তর সাধিত হইয়াছে।

ইংলণ্ডের লোকে কোম্পানীর আমলে বিশ্বাস করিতেন নিজেদের বাণিজ্যের উন্নতির জন্য বাহিরের প্রতিযোগীতা সহ্য করা অন্যায়। সেইজন্য বিলাতের কোনো শিশু-শিল্প বাড়িতে চেষ্টা করিলে আমদানী জিনিষের উপর তাঁহারা অত্যন্ত বেশী শুল্ক বসাইয়া দিতেন; বিদেশী বণিকেরা বেগতিক দেখিয়া তখন নূতন বাজারের চেষ্টায় চলিয়া যাইতেন। তখনো ইংলণ্ডে বাণিজ্য বিষয়ে অবাধ নীতি প্রচারিত হয় নাই;—যে যেমন ভাবে যেখানে সেখানে স্বাধীনভাবে বাণিজ্য করিবে—এই নীতির নাম অবাধ বাণিজ্য নীতি (Free Trade)। ইংলণ্ড সংরক্ষণ নীতি অবলম্বন করিয়া স্বদেশের বাণিজ্যের উন্নতি কল্পে ভারতীয় শিল্পজাত সামগ্রীর উপর শুল্ক বসাইলেন। কলিকাতার আমদানী বিলাতী মালের উপর শুল্ক ছিল শতকরা ২½ টাকা, কিন্তু বিলাতে ভারতীয় কাপড় চোপড়ের উপর এত বেশী শুল্ক চাপানো হইল যে ব্যবসায় করা কোনো রকমে পোশাইল্ না। ফলে কয়েক বৎসরের মধ্যে বিলাতে ভারতীয় কাপড়ের রপ্তানী প্রথমে কমিতে লাগিল ও আরও কিছু কালের মধ্যে লুপ্ত হইয়া গেল। এই প্রতিযোগীতার ফল কি হইল তাহা নিম্নের আমদানী রপ্তানীর হিসাব হইতে দেখা যাইবে।

ইংলণ্ডের সংরক্ষণনীতি

শতাব্দী পূর্ব্বের প্রতিযোগীতার ফল

	ভারত হইতে রপ্তানী কাপড়	ভারতে আমদানী কাপড়
১৮১৪	১২,৬৬,০০০ খণ্ড	৮,১৮,০০০ গজ
১৮২১	৫,৩৪,০০০ ”	১,৯১,৩৮,০০০ ”
১৮২৮	৪,২২,০০০ ”	৪,২৮,২২,০০০ ”
১৮৩৪	৩,০০,০০০ ”	৫,১৭,৭৭,০০০ ”

এইরূপ প্রতিযোগীতা উভয় দেশের মধ্যে বহু দিন চলিতে পারে না। এ দেশীয় তাঁতিরা তাঁত বন্ধ করিয়া কৃষি আরম্ভ করিল, রেশমের কারিগরও তাহার সমব্যবসায়ীর পথ অনুসরণ করিল। দিন যতই যাইতেছে এই প্রতিদ্বন্দ্বীতা একা ইংরাজ বণিক ছাড়িয়া জার্ম্মান ফরাশী প্রভৃতি শত জাতির সঙ্গে হইতেছে—দেশীয় শিল্পীরা এক কোটা হইতে আর এক কোটা এবং সেখান হইতে ধাক্কা খাইয়া মৃত্তিকার শরণাপন্ন হইতেছে।

ইংল্যাণ্ডের অবাধ বাণিজ্য-নীতি

কোম্পানীর হাত হইতে যখন ভারত শাসনের ভার পার্লামেন্টের হাতে পড়িল—তখন ইংলণ্ডে সংরক্ষণ-নীতির দিন চলিয়া গিয়াছে। অবাধ বাণিজ্য নীতি তখনকার দিনের অর্থনীতিজ্ঞদের মূলমন্ত্র। ভারতেও সেই অবাধ বাণিজ্য-নীতি প্রবর্ত্তিত হইল। সিপাহী বিদ্রোহের পূর্ব্বে কোম্পানীর রাজত্ব-কালেই আমদানী সামগ্রীর উপর শতকরা ৫% টাকা হারে শুল্ক ছিল। বিলাতে সে সময়ে পূর্ব্বের যুগের অসম্ভব বাণিজ্য শুল্ক উঠিয়া গিয়াছিল; তখন আর সেখানে শিল্পজাত সামগ্রী লইয়া বড় কেহ উপস্থিতও হইত না। ভারতবর্ষ বহু পূর্ব্বেই প্রতিযোগীতায় হার মানিয়াছিল।

ভারতের বাণিজ্য শুল্ক (Custom Duties)

সিপাহী বিদ্রোহের পর ভারত সরকারের অর্থাভাব হইল—নূতন বিলি-বন্দোবস্তে অনেক টাকার ব্যয়। সেই জন্য নূতন অর্থাগমের উপায় স্বরূপ ১৮৬০ সালে বাণিজ্য শুল্ক বৃদ্ধি করা হইল। সাধারণত শতকরা ১০ টাকা হারে ও কোনো কোনো সামগ্রীর উপর ২০ টাকাও শুল্ক বসানো হইল। ১৮৭৫ সালে সমগ্র আমদানী মালের মূল্যের উপর শুল্ক কমাইয়া ৫% করা হইল।

ইতিমধ্যে ভারতের দেশীয় কাপড়ের কল স্থাপিত হইয়াছিল এবং সেগুলি ধীরে ধীরে মাথা খাড়া করিয়া তুলিয়াছিল। ম্যানচেষ্টারের কল-ওয়ালারা ভারতবর্ষ ও আমেরিকা হইতে তুলা জাহাজে করিয়া লইয়া গিয়া সেখানে বস্ত্র বয়ন করিয়া পুনরায় ভারতে আনিয়া বিক্রয় করিত।

ও দেশীয় বস্ত্রশিল্পের উপর শুল্ক

তাঁহারা দেখিলেন ভারতের কলওয়ালাদের তুলা ঘরের কাছে বম্বেতে পাওয়া যায়; তাহাদের জাহাজ ভাড়া করিয়া তুলা আনিতে হয় না। দ্বিতীয়তঃ ভারতের শ্রমজীবিদের মজুরী বিলাতের আন্দাজে খুব কম। তৃতীয়তঃ কাপড় তৈয়ারী হওয়ার পর পুনরায় বিলাত হইতে আনিবার ব্যয় ভারতীয় মিলগুলির লাগে না। এই সব কারণে ম্যানচেষ্টারের কলওয়ালারা আমদানী মালের উপর যে ৫্ হারে শুল্ক ছিল তাহাকে সংরক্ষণ নীতির সহায়ক বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন ও তাহাও উঠাইয়া দিয়া ভারতে যাহাতে বিনাশুল্কে সুতা কাপড় আসে তদ্রূপ আদর্শ অবাধ-নীতি স্থাপন করিবার জন্য জিদ করিতে লাগিলেন। ১৮৭৯ সালে অনেকগুলি জিনিষের উপর হইতে বাণিজ্য-শুল্ক রদ হয়। কিন্তু ইহার ফলে ভারত সরকারের রাজস্ব প্রায় ৮০ লক্ষ টাকা কমে। এই সঙ্গে অনেকগুলি জিনিষের উপর রপ্তানী-শুল্ক উঠিয়া গেল ও বিদেশে ভারতীয় কাঁচা মাল পূর্ব্বাপেক্ষা আরও সস্তায় চালান হইতে থাকিল।

১৮৭৯ আমদানী শুল্ক ও রপ্তানী শুল্ক

১৮৮২ সালে লর্ড রিপণের শাসনকালে লবণ ও মদ্যাদি ব্যতীত বাদ-বাঁকি সামগ্রীর উপর লইলে শুল্ক উঠাইয়া দেওয়া হয়। তার পর বারো বৎসর আর কোনো সামগ্রীর উপর বিশেষ ভাবে শুল্ক ধার্য্য করা হয় নাই, সে কয়েক বৎসর ভারত সরকারের আর্থিক অবস্থা খুব ভাল ছিল বলিয়া প্রকাশ।

১৮৮২ শুল্ক রদ

১৮৯৪ সালে রূপার দাম কমিয়া সোনারূপার বাজারে একটা ভীষণ বিপ্লব হইয়া গেল। টাকার দাম কমিয়া যাওয়াতে সরকারের খুব অর্থের টানাটানি হইল—এ ছাড়া নানা কারণে সৈনিক-বিভাগের খরচ বাড়িয়া চলিয়াছিল। ১৮৯৪-৯৫ সালের বাজেট বা আয় ব্যয়ের খসড়া করিতে গিয়া দেখা গেল ১ কোটী ১৮ লক্ষ

১৮৯৪ অর্থাভাব ও শুল্ক স্থাপন

টাকার অভাব। এই অভাব দূর করিবার জন্ত পুনরায় আমদানী-শুল্ক বসানো হইল। সাধারণ সামগ্রীর উপর ৫৲ টাকা হারে ও ইস্পাত লোহার উপর এক টাকা হারে শুল্ক ধার্য্য হইল। বই, সোনা, কল-কজা, কাঁচামাল ও শস্য সামগ্রী ও সেই সঙ্গে বিলাতী সুতা ও কাপড় বিনা শুল্কে আসিবে ঠিক হইল। কিন্তু দেখা গেল যে ইহাতে বজেটের টাকা পুরিবে না। তখন পূর্ব্বের আইন সংশোধিত করিয়া বিলাতী কাপড়ের উপর পুনরায় ৫৲ টাকা হারে শুল্ক স্থির হইল। কিন্তু বিলাতের কাপড়ওয়ালারা বলিল যে তাহাদের কাপড়ের উপর ভারতে শুল্ক বসিবে আর ভারতের কাপড় বিনা শুল্কে বাজারে চলিবে ভারত সরকারের এ প্রকার অন্যায় সংরক্ষণ-নীতি আদর্শ অবাধ বাণিজ্য-নীতির সম্পূর্ণ বিরোধী। সুতরাং ভারতের কলে ২০ নম্বরী সুতার কাপড়ের উপর ৫৲ টাকা হারে শুল্ক সাব্যস্ত হইল। ২০ নম্বরী সুতার নীচে কাপড় বিলাতের কলে তৈয়ারী হইত না বলিয়া তাহার উপর কোনো কর বসানো হইল না। তৎকালীন ভারতের রাজস্বসচিব এই বিল প্রবর্ত্তিত করিতে গিয়া বলেন যে ইহার মূল কথা-গুলি পার্লামেন্ট ভারতগবর্ণমেণ্টের উপর চাপাইয়াছেন—তাহা না হইলে হাউস অব কমন্স কিছুতেই ক্ষান্ত হইতেন না। ইহার পর এযাবৎকাল এ বিষয়ে অনেক লেখালেখি হইয়াছে। অনেক অপ্রিয় কথার আলোচনা, অনেক বাদবিবাদ চলিয়াছে। ১৮৯৬ সালে ঠিক হইল ভারতে সকল প্রকার সুতা—তাহা বিলাতী হউক বা দেশী মিলে প্রস্তুত হউক—বিনা শুল্কে বাজারে চলিবে। আর বিদেশী আমদানী কাপড় ও দেশী কলের তৈয়ারী কাপড়ের উপর ৩½ টাকা হারে শুল্ক দিতে হইবে। বিলাতী সুতার শুল্ক বন্ধ হওয়াতে সরকারী আয় প্রায় ৫১ লক্ষ টাকা কমিল, কিন্তু দেশী কাপড়ের উপর নূতন শুল্ক হইতে ১৯১১ সালে সরকারের প্রায় ৪৮ লক্ষ টাকা লাভ হয়।

১৮৯৬ দেশী কাপড়ের উপর শুল্ক

এই শুল্ক স্থাপনের পর দেশী কলওয়ালাদের খুব অসুবিধা হইতে লাগিল এবং কয়েক বৎসরের মধ্যে তাহাদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় দাঁড়াইল। ইতিমধ্যে চীনে বিদ্রোহ হওয়াতে এবং নানারূপ গোলযোগ বাঁধাতে সেখানে ভারতীয় কাপড় রপ্তানী হ্রাস পাইল; তা ছাড়া জাপান আসিয়া কাপড়ের বাজারে পূর্বসাগরে ভারতের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বীতা সুরু করিল। এমন সময়ে ১৯০৫ সালে বঙ্গচ্ছেদের ব্যপদেশে বঙ্গদেশে স্বদেশী-আন্দোলন দেখা দিল। প্রথমে 'বয়কট' বা বিলাতী জিনিষ বর্জ্জনের জন্য লোকের উৎসাহ হয়; কিন্তু ক্রমে উহা স্বদেশী-আন্দোলনে পরিণত হইল এবং সেই হইতে দেশীয় কাপড়ের কলের শুভ দিন দেখা দিল। ১৯০৫ সালে ভারতে ১৯৭ টি কল ছিল—পর বৎসরের মধ্যে আর ২০টি নূতন কল স্থাপিত হইয়াছিল। তারপর যুদ্ধের পূর্ব পর্য্যন্ত নূতন নূতন কাপড়ের কল প্রায় প্রতি বৎসরেই স্থাপিত হইয়াছে। আট বৎসরে ৭৫টি নূতন কল হইয়াছিল। যুদ্ধের সময়ে ২৭২ স্থানে ২৬০টি কল হইয়াছিল—অর্থাৎ ৯টি কল কমিয়াছিল।

বঙ্গচ্ছেদ ও বস্ত্রশিল্পের রক্ষা

যুদ্ধের সময়ে রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য যখন যাবতীয় আমদানী মালের উপর ৭½% হারে শুল্ক ধার্য্য করা হইল, তখন দেশীয় কাপড়ের উপর পূর্বের ৩½% হারে শুল্কই ধার্য্য থাকিল।

ভারতের তাঁতের কাপড়ের ইতিহাস না বলিলে বস্ত্র-শিল্পের কথা অসমাপ্ত থাকিয়া যাইবে। সূক্ষ্মকাজে ভারতবর্ষ এককালে খুবই উন্নতি লাভ করিয়াছিল। ঢাকার মসলিন সম্বন্ধে যাহা শোনা যায় তাহাই উহার বড় নিদর্শন। সেখানে এক সময়ে ৩৬ রকমের কাপড় তৈয়ারী হইত। মসলিন সম্বন্ধে শোনা যায় যে ঘাসের উপর উহা রাখিলে দেখা যাইত না—জলের মধ্যে ধরিলে আছে কি না সন্দেহ হইত। জাহাঙ্গীরের সময়ে ৩০ হাত লম্বা

তাঁতের কাপড় ও মসলিন

১২ হাত প্রস্থ একখানি ঢাকাই মসলিনের ওজন ছিল (৯০০ গ্রেণ) দুই ছটাক। পারস্যের রাজার কাছে উপঢৌকনের মধ্যে সাহজাহান একখানি মসলিন পাঠাইয়া ছিলেন—সেটি ৬০ হাত লম্বা একটি পাগ্ড়ী—মণিমুক্তা খচিত একটি নারিকেলের খোলের মধ্যে পুরিয়া পাঠাইয়াছিলেন। বর্ত্তমানে এসব জিনিষের আদর ও ব্যবহার নাই। সেইরূপ শিল্পীও আর দেখা যায় না। এইরূপ সূক্ষ্ম ও দামী কাজের জন্য ভারতের আরও অনেক জায়গা বিখ্যাত ছিল।

এ ছাড়া প্রত্যেক গ্রামেই তাঁতি ছিল। তাহারা বাড়ী বাড়ী তুলা দিয়া আসিত; মেয়েরা বিশেষতঃ বিধবারা চরকা কাটিয়া সুতা করিতেন। এখনো ভারতের বহুস্থানে তাঁতি বা জোলাদের একপ্রকার কাপড় তৈয়ারী হয়; তবে তাহাদের আদর কমিয়াছে বটে - কিন্তু দর নানা কারণে কমে নাই। তথাচ বিদেশী কাপড় সম্পূর্ণরূপে তাহাদের স্থান গ্রহণ করিতে পারে নাই। বাংলাদেশের ফরাসডাঙ্গা, শান্তিপুর, ঢাকা, শিমলা প্রভৃতি অনেক জায়গার ধুতি, চাদর, সাড়ী—ময়নামতী, কুষ্ঠে ও পাবনার ছিট এখনও বাঙ্গালীর ঘরে আদর পায়। তা ছাড়া বাংলার চারিপার্শে কতক গুলি আদিম জাতি আছে যাহাদের বস্ত্রশিল্প ও বয়ন-প্রণালী সত্যই মুগ্ধকর। ইহাদের মধ্যে মণিপুরের খেস, টিপরাদের লাইছাম্‌পী, নেপালীদের চাদর খুবই সুন্দর। এ ছাড়া কাপড়ে সুতার বা রেশমের বা সোনার ফুল তোলায় বাংলার কোনো কোনো স্থান এখনো বিখ্যাত।

নারিকেল।

নারিকেল যে কত রকম কাজে লাগে তাহা আমরা সহজে ধারণা করিতে পারি না। আমরা কেবল ইহার ফলের জল ও শাঁস খাই—ছোবড়া পোড়াই; পাতার কাঠিতে ঝাঁটা তৈয়ারী করি এবং অবশিষ্ট

অংশগুলি রান্নাঘরে লাগাই। নারিকেলের তৈল মেয়েরা মাথায় মাখেন বটে তবে সে তেল বাংলাদেশে খুব কমই হয়।

দক্ষিণ ভারতের মালাবার উপকূলে লোকদের প্রধান উপজীব্য নারিকেল গাছ। পল্লীবাসীরা ছোট ছোট নৌকায় করিয়া সমুদ্র দিয়া কোচিনের বন্দরে নারিকেলের শাঁস ছোবড়া দড়ি বা কাতা প্রভৃতি লইয়া যায়। আমাদের গ্রামে যেমন ধান বা পাট দিয়া লোকে অনেক সময়ে গ্রামের দোকানীর কাছ হইতে তাহার সংসারের খরচের জিনিষপত্র পায়—মালাবারে তেমনি নারিকেলের সুতা বা দড়ি দিয়া গ্রামবাসীরা সব রকম জিনিষ বিনিময়ে সংগ্রহ করে। মালাবারে কি পরিমাণ নারিকেল গাছ আছে এবং কি পরিমাণ নারিকেল উৎপন্ন হয়, তাহার কোন সংখ্যা পাওয়া যায় না। মোটামুটি প্রতি একারে প্রায় দেড় হাজারের উপর ফল হয়। এবং বৎসরে প্রায় ৮০ কোটী নারিকেল হয় বলিয়া অনুমান করা হয়। যুদ্ধের পূর্বে ইহার মূল্য ৪ কোটী টাকা ছিল।

মালাবারে নারিকেল

নারিকেলের শাঁস বৈদেশিক বাণিজ্যের দিক হইতে খুবই প্রয়োজনীয়। নারিকেলের ছোবড়া ছাড়াইয়া মালা ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়। জলটা লোকে শুধুই খায় বা গাঁজাইয়া মাদকরূপে পান করে। শাঁসগুলি কাটিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া বন্দরে চালান দেয়। যুদ্ধের পূর্বে জার্মানী একা শতকরা ৭৩ ভাগ শাঁস এবং তৈলের মাত্র ৩৩ ভাগ লইত। হামবুর্গ ছিল এই বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র; জার্মানীর এলবে নদীর ধারে অনেক গুলি নারিকেল তেলের কল চলিত। তেল বাহির করার পর যে খৈল থাকে তাহা গোরু, ছাগলের উপাদেয় খাদ্য এবং ক্ষেতের খুব ভাল সার। জার্মানী এই সারটি পাইবার জন্য কাঁচামাল আমদানী করিত এবং সেই জন্য নারিকেল তৈলের উপর উচ্চহারে শুল্ক বসাইয়া নারিকেলের শাঁস বিনা শুল্কে দেশ

নারিকেলের বিচিত্র ব্যবহার

মধ্যে আসিতে দিত। এই তৈল ১৯১৩ সালে ইংলণ্ডেই ৩০ হাজার টন রপ্তানী হয়।

যুদ্ধ আরম্ভ হইলে এই বাণিজ্য সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হইয়া যায়। কিন্তু যুদ্ধের সময়ে আহার্য্য তৈল ও ঘৃতের প্রয়োজন বাড়িয়া গেল—অথচ বাণিজ্য বন্ধ। তখন ইংলণ্ডে এই শিল্পের সৃষ্টি হইল। বর্ত্তমানে এই বাণিজ্য জার্ম্মানীর হাত হইতে ফ্রান্সের হাতে গিয়াছে। নারিকেল তৈল সাবানে ও নানাপ্রকার ঔষধে মিশ্রিত হইয়া পুনরায় আমাদের দেশে ফিরিয়া আসে।

নারিকেলের ছোবড়ার প্রয়োজনীয়তা

নারিকেলের ছোবড়া হইতে সুতা ও দড়ি হয়। ইহা এখনো কুটীর শিল্প। ছোবড়া সমুদ্রের ধারে মাটিতে ৮।৯ মাস কখনো কখনো দেড় বৎসর পুঁতিয়া রাখা হয়। তার পর কাঠের উপর ইহা থ্যাতলাইয়া মেয়েরা চরকায় দিয়া সুতা কাটে। এই সুতা বেনিয়া, দোকানী, কোম্পানীর লোক ইত্যাদি নানা হাত ফিরিয়া জাহাজে উঠে। বর্ত্তমানে কোচীনে কাছি, ম্যাটিং, পাপোষ প্রভৃতি তৈয়ারী হইতেছে। অধিকাংশ দড়ি ও সুতা বিদেশে চালান হইয়া যায়। অথচ নারিকেল তেল, নারিকেলের দড়ি বা কাছি, ম্যাটিং সমস্তই এ দেশে তৈয়ারী হইতে পারে। ভারতবর্ষের কৃষিক্ষেত্রগুলি প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ মণ নারিকেলের সার হইতে বঞ্চিত হইতেছে এবং বিদেশ হইতে বহুপ্রকারের সার কিনিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে।

কাগজ তৈয়ারী।

প্রাচীনকালে আমাদের দেশে তালপত্রে ও ভূর্জ্জপত্রে পুঁথি লেখা হইত; এই সকল পুঁথিপত্র কীট দংশন হইতে বাঁচাইবার উপায় সেকালের পণ্ডিতগণ জানিতেন; বর্ত্তমানে সে শিল্প একপ্রকার উঠিয়া গিয়াছে। কাগজের

চলন এদেশে খুব প্রাচীন; তুলোট কাগজের খুব প্রাচীন পুঁথি এদেশে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ভারতের অধিকাংশ স্থলেই এই শিল্প প্রতিষ্ঠিত ছিল; বড় বড় সহরে এক এক মহল্লার নাম এই কারিগরদের শিল্পানুযায়ী হইত। হাতে তৈয়ারী কাগজ এখনো বহু স্থানে প্রচলিত; অনেক স্থলে গ্রামের দোকানী ও জমিদারগণ এই কাগজ ব্যবহার করাকে পসার ও পবিত্রতার পরিচায়ক মনে করেন। বর্ত্তমানে অনেক জেলখানাতে এই কাগজ তৈয়ারীর শিল্প পুনর্প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। দেশীয় কারিকরগণ কোনো প্রকার কলকব্জার সাহায্যে ইহা প্রস্তুত করে না; ছেঁড়া কাগজ পচাইয়া, চটকাইয়া, বাঁটিয়া, কাই বানাইয়া এবং বারকোশে ফেলিয়া কাগজ করে। বর্ত্তমানে কাগজের যে বিপুল প্রয়োজন তাহা এই হাতে-করা কাগজ কখনো পূরণ করিতে পারিবে না। স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে কিছু কিছু দেশী কাগজ দেখা গিয়াছিল, কিন্তু বর্ত্তমানে তাহা কিছুমাত্র দেখা যায় না।

দেশী তুলোট কাগজ।

বিলাতী ধরণে কাগজ বানাইবার কলের ইতিহাস খুব পুরাণো। মাদ্রাজের তাঞ্জোর জিলায় দিনেমারদের রাজ্যে ১৭১৬ সালে এক খৃষ্টান পত্রিকা প্রকাশিত হয়; সেই পত্রিকার কাগজ বানাইবার জন্য এক কল স্থাপিত হয়। যে মুদ্রাযন্ত্রে সেই কাগজ ছাপা হইত সেটি নাকি এখনো আছে তবে কাগজের কলটি বহুকাল যাবৎ উঠিয়া গিয়াছে। বিলাতী ধরণে ইহাই প্রথম চেষ্টা।

বিদেশী প্রথার কাগজ প্রস্তুত।

বাংলা দেশে প্রথম চেষ্টা ১৮১১ সালে। শ্রীরামপুরে এই কাগজের কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া এখনো আমারা "শ্রীরামপুরী কাগজ" বলি কিন্তু যথার্থ শ্রীরামপুরে কোনো কাগজের কল বর্ত্তমানে নাই।

"শ্রীরামপুরী কাগজ।"

১৮৭০ সালের পূর্বে কাগজ বানাইবার বড় কল এদেশে প্রতি-

ষ্ঠিত হয় নাই। এই বৎসরে প্রথম বিলাতের এক কোম্পানী কলিকাতার নিকটে বালিতে কাগজের কল খুলিলেন। ১৯০৫ সালে এই কল উঠিয়া যায় এবং ইহার কলকব্জা টিটাগড় কাগজের কলওয়ালারা কিনিয়া লয়। বর্ত্তমানে আমারা যাহাকে "বালির কাগজ" বলি—তাহাও যথার্থ পক্ষে এখন নাই।

"বালির কাগজ।"

ইহার পর লক্ষ্ণৌতে Upper India Couper Paper mill ১৮৭৯ সালে স্থাপিত হয়। বর্ত্তমানে প্রতিবৎসর প্রায় ৩,৩০০ টন্ কাগজ তৈয়ারী হয়। মহারাজা সিন্ধিয়া গবালিয়ারে একটি কাগজের কল স্থাপন করেন; কিন্তু কয়েক বৎসর কাজের পর তাহা আর না চলায়, বামার লরী কোম্পানী ইহার ভার লইয়া চালাইতেছে। এখানে বাৎসরিক ১,২০০ টন কাগজ সেই কলে তৈয়ারী হয়।

গবালিয়ারের কল।

টিটাগড় কাগজের মিলের মূলধন ভারতেই তোলা হয়। কাঁকিনাড়ার, বালির কাগজের কলের অনেক অংশ কিনিয়া লওয়ায় ইহাদের কারবার খুব জাঁকাইয়া চলিতেছে। বর্ত্তমানে ৮টি কলে ১৮,০০০ টন্ কাগজ প্রতিবৎসর হইতেছে। রাণীগঞ্জের কাগজের কল ১৮৯০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহাদের তিনটি কলে ৭,০০০ টন কাগজ হয়। এছাড়া বম্বেতে দুটি কল, সুরাটে একটি ছোট কল, ত্রিবঙ্কুরে একটি কল আছে। ভারতের কাগজের প্রয়োজন প্রতিবৎসর ৭৫,০০০ টন্; ইহার মধ্যে দেশীয় কলে মাত্র ৩০,০০০ টন্ তৈয়ারী হয়। সুতরাং অবশিষ্ট ৪৫,০০০ টনের জন্য আমরা বিদেশের মুখাপেক্ষী। এই কলগুলির অবস্থা খুবই শোচনীয়, দুই একটি কল ছাড়া অধিকাংশই কোনো লাভ দেখাইতে পারে না।

অন্যান্য স্থানের কাগজের কল।

ভারতে যে কাগজের কল ভালরূপে চলে না তাহার প্রধান কারণ হইতেছে যে এখানকার কলওয়ালারা বিদেশ হইতে কাগজ বানাইবার

বিদেশী আমদানী
'কাই' বা pulp

'কাই' আমদানী করেন। আমেরিকা ও য়ুরোপের কোনো কোনো দেশে এই 'কাই' বা পাল্প কাঠ ও ঘাস হইতে প্রস্তুত হয়। সেখান হইতে 'কাই' আনাইয়া কাগজ বানাইয়া, বিদেশী আমদানী কাগজের সহিত প্রতিযোগীতা করা খুব শক্ত ব্যাপার। অথচ ভারতের বহু প্রকারের আঁশাল ও ঘাস জাতীয় উদ্ভিদ্ আছে যাহা হইতে কাগজের এই 'কাই' বানান্ যায়। বাঁশও প্রায় আঠীর রকমের ঘাস হইতে এই 'কাই' তৈয়ারী হইতে পারে।

অপর্য্যাপ্ত ভারতীয়
উপাদান।

দুঃখের বিষয় এপর্য্যন্ত তেমন কোনো চেষ্টা হয় নাই। যুদ্ধের সময়ে য়ুরোপ হইতে কাঠের 'কাই' আসা যখন বন্ধ হইল, তখনই দেশীয় উপাদান সংগ্রহের দিকে ভারতীয় কলগুলির দৃষ্টি গেল। সাহেবগঞ্জ 'সবাই' ঘাসের একটা প্রকাণ্ড বাজার; এখান হইতে প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ মণ ঘাস কলিকাতায় চালান হয়। কিন্তু যুদ্ধের পর এখন পুনরায় আমেরিকা ও জাপানের সহিত প্রতিযোগীতা আরম্ভ হইয়াছে; এবং দেশীয় কাগজ এইবার টিঁকিতে পারিবে কিনা তাহা সন্দেহ। কারণ 'কাই' একমাত্র জিনিষ নয়; ঘাসের কাই, কাঠের কাই অথবা ছেঁড়া কাপড় হইতে যে কাই বানানো হয় উহাকে শোধন করিতে যে সকল রাসায়নিক দ্রব্য লাগে তাহাও বিদেশ হইতে আসে। বর্ত্তমানে কিছু কিছু জিনিষ হইতেছে। কাগজ চক্‌চকে করিতে চীনমাটি লাগে; সেই মাটি এখন অধিক পরিমাণে পাওয়া যাইবার সম্ভাবনা হইতেছে।

কাগজ ছাড়া পেষ্ট বোর্ড এদেশে সহজেই তৈয়ারী করা যায়; অথচ ইংলণ্ড ও অন্যান্য য়ুরোপীয় দেশ হইতে এই সামান্য জিনিষও লক্ষ লক্ষ টাকার আমদানী হয়।

বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে সর্বসমেত ১১টি কাগজের কল আছে; ইহাদের

ইহাদের মূলধন প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা। ১৯১৬-১৭ সালে ৩১,৯০০ টন্ কাগজ এই কলগুলি হইতে তৈয়ারী হইয়াছিল।

রেশম।

রেশম শিল্পের ইতিহাস।

প্রাণীজ আঁশাল-সুতার মধ্যে রেশমই প্রধান। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আধিপত্যের সময়ে প্রথম প্রথম রেশমের শিল্প ও বাণিজ্য দুইই উন্নতি লাভ করিয়াছিল এবং বহু প্রকারের রেশমের গুটি এদেশে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে চীন ও জাপান হইতে ভাল জাতের গুটি পোকা আমদানী করিয়া য়ুরোপের দক্ষিণে সেগুলিকে তদ্দেশোপযোগী করিবার জন্য চেষ্টা সুরু হইল। ফ্রান্স ও ইতালীতে এই নূতন শিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় রেশমের অধোগতি আরম্ভ।

তসর, মুগা, ও এণ্ডী।

এদেশে তিন প্রকার রেশমের গুটি পাওয়া যায়। তসর, মুগা ও এঁড়ী পোকা নিম্ন পার্ব্বত্য ভুমিতে পাওয়া যায়; সকল প্রকার গাছপালা খাইয়া এই পোকা বাড়িতে থাকে। মুগা আসাম ও পূর্ব বঙ্গ ছাড়া আর কোথায় ও পাওয়া যায় না। আসামের ঘরে ঘরে মেয়েরা তাঁতে মুগার কাপড় তৈয়ারী করেন। এঁড়ী পোকা সরিষার গাছ খাইয়া জীবিত থাকে। শিল্পের ও সৌন্দর্য্যের দিক হইতে মুগার দাম ও আদর সব চেয়ে বেশী।

ভারতবর্ষের রেশমের উন্নতির জন্য বহু প্রকারের পরীক্ষা করা হইয়াছে। য়ুরোপীয় বিশেষজ্ঞেরা বলেন যে ভারতের রেশমের অধোগতির কারণ পোকার ব্যাধি ও পরগাছার উপদ্রব। কাশ্মীরে য়ুরোপীয়

প্রথানুসরণ করিয়া ফল খুব ভাল হইয়াছে। মহীশূরে জাপানী প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। বিখ্যাত তাতা কোম্পানী মহীশূরে বড় একটা ফার্ম খুলিয়াছেন; মহীশূর সরকার স্বীয় প্রজাদের রেশম ও গুটি সম্বন্ধে উপদেশ দিবার জন্য তাতা কোম্পানীকে বাৎসরিক তিন হাজার করিয়া টাকা দান করেন।

বিভিন্ন স্থানে রেশমের উন্নতির চেষ্টা।

রেশমের উন্নতির জন্য খৃষ্টীয় মুক্তি-ফৌজের দল অনেক কাজ করিয়াছেন। তাঁহারা বিদেশ হইতে বিশেষজ্ঞ আনাইয়া তুঁত গাছ চাষে লোককে উৎসাহ দিতেছেন এবং তাঁহাদের পরিচালিত বিদ্যালয় সমূহে রেশমের চাষ ও কাজ শিখাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। পঞ্জাবে তাঁহাদের এ কাজ খুব আগাইয়াছে। বাংলাদেশে বরহমপুরে গভর্ণমেণ্টের একটি রেশমের কুটি আছে।

বঙ্গদেশে মুর্সিদাবাদ, মালদহ, রাজসাহী ও বর্দ্ধমান জেলায় তুঁত পোকার রেশমগুটি বিখ্যাত। রংপুর, জলপাইগুড়ী, বগুড়াতে এঁড়ী রেশম প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। বাংলাদেশেই সব চেয়ে অধিক পরিমাণে রেশম উৎপন্ন হয় এবং বর্মা ও পঞ্জাবের লোকেরা ইহার সদ্ব্যবহার সব চেয়ে বেশী করে। শিল্পের কাজ এখনো গ্রামের কুটীরের মধ্যে আবদ্ধ; কার-বারী আকারে ইহার আয়তন প্রসারিত হয় নাই। কেবল কলিকাতায় ১টি ও বম্বেতে দুইটি কল আছে। এককালে বাংলাদেশের নানাস্থানে রেশমের কুটি ছিল, এখন সেই সমস্ত বাড়ী চামচিকার বাসা।

বাংলাদেশের রেশমের চাষ

রেশমের মিহি কাজের জন্য এককালে আমাদের দেশ পৃথিবীর সর্বত্রই সুপরিচিত ছিল। কিংখাব নামে রেশম ও সোনারূপার কাজ করা এক প্রকার মূল্যবান কাপড় হয়। কাশী, আহমদাবাদ ও মুর্শিদাবাদের কিংখাব, বাফ্‌তা বহু প্রাচীনকাল হইতেই বিখ্যাত। বুটাদার বা ফুলতোলা কাপড়ের

অন্যান্য স্থানের রেশমের কাজ

কাজের জন্য মুর্শিদাবাদ, কাশী, মুলতান, বহাবলপুর, আহমদাবাদ, সুরাট, পুণা, রৈচুর, তাঞ্জোর প্রভৃতিস্থান প্রসিদ্ধ; এ ছাড়া সাঙ্গী, গুল-বদন, মশরু, গরদ, মটকা, কেটে, কোরা, সাটিন প্রভৃতি নানা প্রকার বস্ত্রের জন্য ভারতের বিভিন্ন স্থান খ্যাত। এ সমস্ত শিল্প এখনো কুটীরের মধ্যে আবদ্ধ।

পশমের কারবার

পশমের কাজ উত্তর ভারতে ও হিমালয়ের পাদমূলে বহু সহস্র বৎসর হইতে চলিয়া আসিতেছে। কাশ্মীরের শাল, আলোয়ান, লুই, ধোসা, পট্টু প্রভৃতি গরম কাপড় সবদেশেই সুপরিচিত। বর্ত্তমানে লুধিয়ানা, ধারবাল ও কানপুরে বিপুল আয়োজন সহকারে পশমের কাজ কারবারী ফাঁদে চলিতেছে। কাণপুরের লালিমলি মিল খুব বিখ্যাত; তবে ইহা সম্পূর্ণ বিদেশী মূলধনে চলিতেছে।

ঔষধাদি শিল্প

ঔষধাদিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়—একটি উদ্ভিজ্জ, অপরটি খণিজ। এককালে ঔষধের শিল্প একটা বড় রকমের ব্যবসায় ছিল। কিন্তু দেশে আয়ুর্ব্বেদ ও হাকিমী চিকিৎসার অনাদর ও অধঃপতনের সঙ্গে ঔষধাদি

দেশীয় চিকিৎসার অধঃপতন

সংগ্রহে লোকের উৎসাহ কমিয়া গিয়াছে। আজকাল বিদেশীভাবে চিকিৎসার চলন হইয়াছে বলিয়াই ঔষধ পথ্য সবই বিদেশ হইতে আসিতেছে। ভারতে প্রায় দেড় হাজার রকমের গাছপালায় ঔষধাদি হয় বলিয়া ধরা হয়; কিন্তু ৫০।৬০ প্রকারের গাছপালা ছাড়া আরগুলি সম্বন্ধে কোন তথ্যই অনু-সন্ধান হয় নাই। এ দেশের অধিকাংশ ভেষজ-গাছপালা ও শিকড়, পাতা

প্রতি বৎসর বিদেশে চালান যায়। যুদ্ধের পূর্ব্বে জারমেনী ইহার প্রধান খরিদ্দার ছিল ; অনেক ঔষধ জারমেনীতে তৈয়ারী হইয়া ইংল্যাণ্ডে আসিত, ও সেখান হইতে পুনরায় ভারতে আসিত। ভারতবর্ষে এই সকল ঔষধ তৈয়ারী করার অনেক বাধা। হিমালয়ের পাদমূল হইতে কাঁচা সামগ্রী আনিয়া বম্বে বা কলিকাতায় ঔষধ করিতে যে রেল পড়ে তাহা জারমেনী হইতে লণ্ডন ঘুরিয়া কলিকাতায় আসিতে পড়ে না। এখন গভর্ণমেণ্টের ইচ্ছা যে দেশের লোক কোম্পানী খুলিয়া এই সকল ঔষধ এখানে প্রস্তুত করেন। যুদ্ধের সময়ে কোনো কোনো ঔষধের দাম পাঁচ দশগুণ হইয়াছিল। সরকার স্বয়ং দার্জ্জিলিং ও নীলগিরি পাহাড়ে সিনকোনা গাছ পুঁতিয়া কুইনাইনের নির্যাস বাহির করিতেছেন।

উদ্ভিদাদির বিদেশে রপ্তানী

রসায়ন শাস্ত্র আমাদের দেশে এখনো তেমন উন্নতিলাভ করিতে পারে নাই। কলিকাতায় বেঙ্গল কেমিক্যাল ওয়ার্কস ছাড়া নাম উল্লেখ করিবার মত আর কোনো দেশীয় কারখানা ভারতবর্ষে নাই। এ দেশে সামগ্রার অভাব নাই। দেশের আয়ুর্ব্বেদ ও হাকিমি চিকিৎসা পুনর্জ্জীবিত না হইলে এবং বর্ত্তমান সময় ও বিজ্ঞানোচিত ভাবে পরীক্ষাদি না করিলে লোকের শ্রদ্ধা বিশ্বাস ফিরিবে না। আমাদের দেশের টোটকা ঔষধ অসংখ্য, সেগুলিকেও বৈজ্ঞানিকভাবে পরীক্ষা করিয়া য়ুরোপীয় আদর্শে তাহার প্রচলন করা প্রয়োজন।

খাদ্য সামগ্রী

খাদ্য সামগ্রী সাধারণতঃ কৃষি-বিভাগের অন্তর্গত বলিয়া এখানে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কেবল মাত্র চা ও কফি বিশেষ ভাবে এখানে দেওয়া হইল।

চা

চাএর ব্যবসায় ইংরাজ রাজত্বের পূর্বে এ দেশে ছিল না। আমাদের দেশে ধানের মত চা ছিল চীনের লোকের ধন। ধান দিয়া যেমন এককালে সব জিনিষ বিনিময়ে পাওয়া যাইত তেমনি চীনে চা দিয়া সব জিনিষ পাওয়া যাইত। হিমালয়ের দক্ষিণে চা-এর বাগান অতি প্রাচীন কাল হইতে ছিল। কিন্তু কারবারী আকারে চা উৎপন্ন করিবার ইতিহাস খুব পুরাণো নয়।

চায়ের উৎপত্তিস্থল

চা সাধারণতঃ আসামে, বাংলাদেশে, দক্ষিণ-ভারতে ও সিংহলে উৎপন্ন হয়। এই চা-বাগিচায় উত্তর-পশ্চিম, বিহার, বাংলা, মাদ্রাস, মধ্যপ্রদেশের লক্ষ লক্ষ লোক কাজ করিতেছে; এসব প্রদেশে আর চাষের জমি নাই ও উদ্বৃত্ত লোক ভূমি না পাইয়া কুলিগিরি করিবার জন্য চা-বাগানে যায়। আসামে লোক সংখ্যা খুবই কম, সেখানে এই কুলীদের সংমিশ্রণে এক নূতন জাতি সৃষ্ট হইয়া উঠিতেছে এবং লোকসংখ্যা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাইতেছে। এই ব্যবসায়ে দেশীয়দের উৎসাহ প্রথম প্রথম তেমন দেখা যায় নাই, কিন্তু ইদানীং বাঙ্গালীদের অনেকগুলি চা-বাগিচা খুব ভালরূপ চলিতেছে। ১৯১৬-১৭ সালে সমগ্র ভারতে ৬॥০ লক্ষ একার জমিতে চা-বাগান ছিল।

নিম্নে কোথায় কতখানি চা হয় তাহার একটি তালিকা প্রদত্ত হইতেছে :—

	একার	পাউণ্ড (হাজার)
আসাম-ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা	২,৪২,৪১০	
সুরমা (কাছাড় শ্রীহট্ট)	২,৪৬,৭০২	২৪,২১,৪৪
মোট	৩,৮৯,১১২	
বাংলা	১,৬৫,৭০৯	৯,২৬,৪৪
বিহার উড়িষ্যা	২,১৬০	৩,৯৯
যুক্তপ্রদেশ	৭,৯৭৮	২৩,৫২
পঞ্জাব	৯,৮৭৯	১৫,৩০
মাদ্রাস	৩০,৯১৯	১,১৩,৬৪
ত্রিবঙ্কুর, কোচিন	৪২,১০৫	১,৭৯,৫৯
বর্ম্মা	২,৮৪১	১,৪৬
মোট	৬,৫০,৮২৩ একার	৩৬,৮৫,৮২,০০০পাঃ

চায়ের ব্যবসা

চায়ের ব্যবসা দেখিতে দেখিতে খুব উন্নতি হইতেছে; যুদ্ধের পূর্ব্বে ব্রিটীশ সাম্রাজ্যের নানাঅংশে ভারতবর্ষ হইতে ৮২,২৫ হাজার পাউণ্ড দামের চা রপ্তানী হইয়াছিল ও অন্যান্য দেশে ১৭,৩৫ হাজার পাউণ্ড। ১৯১৭-১৮ সালে উহা যথাক্রমে এক কোটী দুই লক্ষ ও ১৫,৮২ হাজার হইয়াছিল। গত বৎসর চাএর হিসাবে ১,১৬,৮২ হাজার পাউণ্ড অর্থাৎ ঐ বৎসরে ১৭ কোটী ৬৭ লক্ষ টাকা এ দেশে আসে। কিন্তু এই চা-বাগিচায় অধিকাংশে মূলধন বিদেশী বলিয়া এই লাভের অংশ ভারতবাসীর ভাগে খুব কম পড়ে।

আরব দেশ হইতে একজন মুসলমান হাজি মহীশূরে প্রায় দুইশ বৎসর পূর্ব্বে কফি আনিয়াছিল বলিয়া দাক্ষিণাত্যে প্রবাদ আছে। কফি লইয়া গত শতাব্দীতে কিছু কিছু পরীক্ষা ও চেষ্টা হইয়াছিল; কারবারী ধরণে কফি-বাগিচা ১৮৪৬ সালে নীলগিরিতে স্থাপিত হয়! ১৮৯৬ সাল হইতে কফি বাগিচার ক্ষেত্র ধীরে ধীরে কমিতেছে, চা ও রবার গাছ কফির স্থান লইতেছে; সস্তা ব্রেজিলিয়ান্ কফি য়ুরোপে চালান হইতে আরম্ভ করায় ভারতীয় কফির আদর ও চালান কমিয়া গিয়াছে।

কফি

৫। খণিজ শিল্প

ভারতের খণি ও ধাতু সম্বন্ধে যথাস্থানে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এখানে খণিজ সামগ্রী সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ বলিয়া আমরা শিল্প পরিচ্ছেদ শেষ করিব।

এদেশের ধাতুর সামগ্রী বহুকাল হইতে বিখ্যাত। খৃষ্ট পূর্ব তিন শত বৎসর পূর্বে মেগেস্থানীস লিখিয়াছিলেন যে ভারতের মাটির নীচে সকল প্রকার ধাতু পাওয়া যায়। সোণা, রূপা, তামা, লোহা নিতান্ত কম পাওয়া যাইত না; এ ছাড়া যুদ্ধের বর্ম ও অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণের জন্য ও অলঙ্কারাদি গঠনের জন্য টিন ও অন্যান্য বহুপ্রকারের ধাতু পাওয়া যাইত। একথা আজকাল স্বপ্নের ন্যায় অলীক বলিয়া বোধ হয়।

প্রাচীন কালের খণিজ সামগ্রী।

পিত্তল কাঁসা ও তামার জিনিষ তৈয়ারী করা ভারতের একটি পুরাতন বিদ্যা। অথচ এই সকলের জন্য বর্ত্তমানে আমাদের সম্পূর্ণরূপে বিদেশী চাদর ও পাতের অপেক্ষায় থাকিতে হয়। ইহার কারণ ভারতবর্ষ এখন সমগ্র পৃথিবীর সহিত বাণিজ্য ব্যবসায়ে সমান পাল্লা দিতে নামিয়াছে অথচ তাহার পুঁজি, বিদ্যা ও যোগ্যত

বর্ত্তমানের দুর্দশা।

অল্প। ভারতবর্ষ আপনার মধ্যে আপনি আবদ্ধ থাকিলে তাহার আদিম উপায়ে লোহা গলানো, তামা নিষ্কাশন, ঢালাই পিটাই সবই যেমন-তেমন ভাবে চলিতে পারিত। য়ুরোপের তুলনায় আমাদের দেশের ধাতুনিষ্কাশনের পদ্ধতি এমন সেকেলে ও আদিম যে বর্ত্তমানে তাহা টিঁকিতে পারে না। এখনো মধ্যপ্রদেশ ও উড়িষ্যার গড়জাত মহলে আদিম জাতীয় লোকেরা লোহা বাহির করে—কোথায় কোথায় সোণাও সংগ্রহ করে; কিন্তু তাহাতে তাহাদের দারিদ্র্য ঘোচে না।

আদিম প্রণালী ও য়ুরোপীয় বিজ্ঞানের প্রতিযোগিতা।

কারুকার্য্য করা তামার পিতলের জিনিষ কাশ্মীর, নেপাল ও সিকিমে, পঞ্জাবের লাহোর অমৃতসরে, যুক্তপ্রদেশের লক্ষ্ণৌ (তামা) কাশীতে (কাঁশা, পিতল), জয়পুর, বিকানীর, ঢোলপুর, উজ্জয়িনী, ইন্দোর, বম্বে, নাসিক, বড়োদা, কাথিবর, মহীশূর, মাদ্রাজ, মদুরা, ভেলোর বিখ্যাত। বাংলার মধ্যে মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত খাগড়ার বাসন ও উড়িষ্যার শ্রীক্ষেত্রী বাসন খুব প্রসিদ্ধ।

কারবারের স্থান।

এছাড়া আরও নানারূপ ধাতুর শিল্প নানাস্থানে আছে; তবে সেগুলির স্থানীয় প্রসিদ্ধিই অধিক। সুতরাং এখানে উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

কাঁচ ও কাঁচের জিনিষ

প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ মাটি খুঁড়িতে খুঁড়িতে ভারতের নানা স্থানে কাঁচের চিহ্ন পাইয়াছেন। সে সকল জিনিষ শিল্পের দিক হইতে প্রশংসনীয় নহে। ভারতের কাঁচের জিনিষ কোনো যুগেই য়ুরোপীয় সামগ্রীর সহিত কোনো অংশে তুলনীয় নহে। স্ত্রীলোকদের জন্য চুড়ি বহুকাল হইতে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে নির্ম্মিত হইয়া আসিতেছে; এ ছাড়া আতর গোলাপজল প্রভৃতি

কাঁচের শিল্পের ইতিহাস।

রাখিবার জন্য শিশি বোতল তৈয়ারী হইত। এইরূপ শিল্প দক্ষিণ-ভারতেও ছিল তাহার প্রমাণ আছে।

প্রাচীনকালেরকাঁচ।

ভারতের কাঁচ-শিল্পের আরম্ভ ১৮৯০ সাল হইতে ক্রমে গত শতাব্দীর শেষ বৎসরের মধ্যে পাঁচটি কারখানা স্থাপিত হয়; তাহার মধ্যে দেশীয়দের দ্বারা পরিচালিত দুটি শীঘ্রই উঠিয়া যায়। অবশিষ্ট তিনটির য়ুরোপীয় মূলধন ছিল। য়ুরোপের কাঁচের কারখানা হইতে লোক আনাইয়া এগুলি একপ্রকার চলিতেছিল, কিন্তু এ তিনটিও ৫ হইতে ৭ বৎসরের মধ্যে উঠিয়া যাইতে বাধ্য হইল।

স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের নানা স্থানে যেরূপ অন্যান্য শিল্পের উন্নতির জন্য লোকের চেষ্টা হইয়াছিল—কাঁচের কারখানা সম্বন্ধেও লোকের উৎসাহ কিছু কম প্রকাশিত হয় নাই। ১৯০৬ হইতে ১৯১৩ সালের মধ্যে ১৬টি কাঁচের কারখানা খোলা হইয়াছিল; ইহাদের অধিকাংশ গুলির না ছিল অর্থবল, না ছিল বুদ্ধিবল। কেবল উৎসাহের জোরে তাঁহারা কল চালাইয়াছিলেন; কিন্তু বেশী দিন এমন কারখানা ও কারবার চলিতে পারে না। এই সব কারখানাতে য়ুরোপীয়ান ও জাপানী কারীগর কাজ করিত। কিন্তু পূর্বের য়ুরোপীয় কারখানাগুলি কেন উঠিল, তাহাদের বাধা কোথায় এ সমস্ত জটিল সমস্যার কোনো প্রকার সমাধানের চেষ্টা না করিয়া এগুলিতে হাত দেওয়া হইয়াছিল। ফলে ১৯১৪ সালে যখন যুদ্ধ আরম্ভ হইল তখন তিনটি মাত্র কারখানা অত্যন্ত কষ্টে কাজ চালাইয়া কেবল বাঁচিয়া থাকিবার জন্য বাঁচিয়া ছিল, ব্যবসায় বা লাভের জন্য নয়। ইহার মধ্যে একটি বঙ্গের 'পয়সা ফাণ্ড' কর্তৃক স্থাপিত। পঞ্জাবের আম্বালায় কাঁচের কারখানা এখানে উল্লেখযোগ্য।

যুদ্ধ আরম্ভ হওয়াতে এই কারখানাগুলির সুবিধা হইয়াছে। যুদ্ধের পূর্বে ১৯১৩-১৪ সালে অষ্ট্রিয়া ও জারমেনী হইতে ১ কোটি ১৬ লক্ষ টাকার কাঁচের চুড়ি, পুঁথি, বোতল, ফানেল, প্রভৃতি মনোহারী সামগ্রী

এদেশে আসিয়াছিল। যুদ্ধের পূর্বে কাঁচের বাণিজ্যের শতকরা ৫৭ ভাগ অষ্ট্রিয়া-জারমেনীর হাতে ছিল। এই আমদানী বন্ধ হওয়াতে জাপান আসিয়া তাহার স্থান গ্রহণ করিয়া যেখানে সে যুদ্ধের পূর্বে শতকরা ৮ ভাগ মাত্র রপ্তানী করিত, ১৯১৮ সালে সেইখানে ৭১ ভাগ করিয়াছিল। যুদ্ধের পূর্বে বেলজিয়াম হইতে শার্শি ও বাসনপত্র এদেশে আমদানী হইত। বেলজিয়াম ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়াতে ইংল্যাণ্ড এখন সেসব প্রেরণ করিতেছে। ১৯১৭-১৮ সালে ১৬২ লক্ষ টাকার কাঁচের সামগ্রী এদেশে আসে।

কাঁচের ব্যবসা।

যুদ্ধের ফলে ভারতে অনেকগুলি কাঁচের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে —সব শুদ্ধ প্রায় ২০টি। ইহার মধ্যে ৭টি ফিরোজাবাদে স্থাপিত। এগুলিতে চুড়ির কাঁচ নির্ম্মিত হয়। এখান হইতে সংযুক্ত প্রদেশ ও পঞ্জাবের চুড়ি নির্মাতারা কাঁচ কিনিয়া লইয়া চুড়ি তৈয়ারী করে। পূর্বে এই চুড়ির কাঁচ স্থানীয় সামগ্রী হইতে হইত; কিন্তু বর্ত্তমানে বহুদূর দূর স্থান হইতে কাঁচের প্রধান প্রধান উপাদান গুলি আমদানী করা হয়। সোডা বিদেশ হইতে আসে, চূণ মধ্যপ্রদেশের কাটনী হইতে আনীত হয়, বালি এলাহাবাদের দক্ষিণ হইতে আসে, আর কয়লা বিহার বা বাংলা হইতে আসে। ফিরোজাবাদ যে এই শিল্পের প্রধান কেন্দ্র হইয়াছে তাহার কারণ এখানে অনেকগুলি কারিগর আছে, তা ছাড়া ব্যবসায়ের দিক হইতে কোনই সুবিধা নাই। ফিরোজাবাদে ৫০।৬০টি চুড়ি করিবার কারখানা আছে। চুড়ির কাঁচ তৈয়ারীর কারখানাগুলি সবই হিন্দু মহাজনদের হাতে; তাঁহাদের প্রায় চারি লক্ষ টাকা এখানে খাটিতেছে। প্রতিদিন প্রায় ২০।৩০ টন্ কাঁচ তৈয়ারী হয়। যুদ্ধের জন্য বিদেশী প্রতিযোগীতা না থাকায় ফিরোজাবাদের এই শিল্প ও বাণিজ্য এখন

সংযুক্ত প্রদেশের কাঁচের চুড়ির কারখানা।

উন্নতি লাভ করিতে পারিয়াছে—কিন্তু পুনরায় অবস্থা কি হয় তাহা কেহ বলিতে পারে না।

চুড়ি করা ছাড়া কারখানাগুলি আরো অনেক প্রকার জিনিষ করিতে আরম্ভ করিয়াছে; ১২টি কারখানা আলোর সরঞ্জাম, শিশিবোতল প্রভৃতি তৈয়ারী করিতেছে।

এদেশে কাঁচের কারখানা যে তেমনভাবে জাগিয়া উঠিতেছে না তাহার কারণ দেশীয় কোম্পানীগুলির মূলধন নিতান্ত কম; এই মূলধনের কারবারে আজ কাল বাহিরের প্রতিযোগিতায় দাঁড়ানো কঠিন; তা ছাড়া বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুযায়ী করিতে বিস্তর অর্থের প্রয়োজন। দ্বিতীয় কারণ হইতেছে যে যাঁহারা এই ব্যবসায় আরম্ভ করেন তাঁহাদের এ সব বিষয়ে কোনো প্রকার জ্ঞান নাই বলিলে চলে। এ ছাড়া আরও কতকগুলি বাধা আছে। (১) ফুঁকো কাঁচের কাজের জন্য দক্ষ লোকের একান্ত অভাব; যাহারা কাজ করে তাহারাও ভাল করিয়া জানে না। তবে আশা করা যায় এ অসুবিধা বেশী দিন থাকিবে না। কাঁচের কাজের মধ্যে অনেক জিনিষ ব্যবসায়ী ছাড়া আর কেহ জানে না। বিদেশে এই সকল কারখানায় প্রবেশ লাভ করা দুঃসাধ্য ব্যাপার ও সেখান হইতে কিছু শিখিয়া আসা অসম্ভব। (২) শিল্প-কেন্দ্রগুলিতে কয়লা লইয়া যাইতে যে পরিমাণ খরচ পড়ে তাহাতে ব্যবসায় পোষায় না। (৩) জাপানের সহিত প্রতিযোগীতা।

কারবার না জাগিবার অন্তরায়।

ভারতে কাঁচের আমদানী

সামগ্রী	মূল্য (লক্ষ টাকা)		
	১৯১৩-১৪	১৯১৬-১৭	১৯১৭-১৮
	টাকা	টাকা	লক্ষ টাকা
চুড়ি	৮০	৮৩	৩৫
পুঁথি ঝুটামুক্ত	২৪	২১	২৪
শার্শি, চাদ্দর	২২	২৮	২৩
বাতিদান, চিমনী	১৭	১১	১৮
বোতল, শিশি	১৪	১৬	৩৭
সোডার বোতল	৬	৯	
বাসন পত্র, ইত্যাদি	৮	৭	১০
বিবিধ	১৯	১৫	১৫
	১৯০	১৫০	১৬২

১৯১৩ সালে যুদ্ধের পূর্ব্বে ভারতে নিম্নলিখিত রূপে ব্যবসায় ও শিল্প-কার্য্য চলিত।

সম্পূর্ণ য়ুরোপীয় মূলধন

ব্যবসায়, শিল্প	মূলধন	শ্রমজীবি	বাৎসরিক আয়
রেলওয়ে	৪৯৫ কোটি	৬১/৩ লক্ষ	৩৪,৬৫৬ মাইল রেল পথ ; ৪৫ কোটি যাত্রী
ট্রাম, ক্ষুদ্ররেল	৭ কোটি	×	×
পাটের কল	১১,৬ লক্ষ	২ লক্ষ ১৬ হা	২৮১/২ কোটি
সোণার খনি	৪,১৫ ,,	×	৩ ক্রোটি ৪ লক্ষ
পশমের কল	৫৩ ,,	৪০৫৩	৬১ লক্ষ
কাগজের কল	৭১ লক্ষ ৩ হাজার	৪৬০০	৮০ লক্ষ
মাদক দ্রব্য	২১ ,,	১৩২৮	

অধিকাংশ য়ুরোপীয় মূলধন

কয়লার খনি	৭ কোটি ৬০ লক্ষ	১ লক্ষ ৪৫ হাঃ	৫ কোটি ৭০ লক্ষ
পেট্রোলিয়ম		৯,১৮০	১ কোটি ৫০ লক্ষ
চা-বাগান	২৮ কোটি	৬,৬০, হাঃ	৩০ কো ৭০ লল পাউণ্ড
ব্যাঙ্ক—			
১২ ব্যাঙ্ক : বিদেশে প্রধান আপিস	৫৬ কোটি		
৩ প্রেসিডিন্সি ব্যাঙ্ক ও ১৫টি চৌথ ব্যাঙ্ক	১৬ কোটি ৬৮ লক্ষ		
ধানের কল	৪,৫০ লক্ষ	২২,১৯৯	
কাঠের কারখানা	৫৫ লক্ষ	১১,১২১	
ময়দার কল	৭২ ,,		
চিনির কারখানা	১ কোটি ৪০ লক্ষ	৭,৮২০	
লৌহ তামার কারখানা		১৭,৬২২ (?)	
নীলের কারখানা			৩৮,৫০০ হন্দর

প্রধানতঃ দেশীয় মূলধন

১৯১৩	মূলধন	শ্রমজীবি
সুতা ও কাপড়ের কল	২১ কোটি	২৪৪,০০০
বরফের কল	২৯ লক্ষ	
তুলা বাছা ও চাপার কল	৩ কোটি	১, লক্ষ
ছাপাখানা		২৭,৮৮৬

কাপড়ের কলের হিসাব (০০০ হাজার)

মিলের সংখ্যা	মিলের সংখ্যা	চরকার সংখ্যা	তাঁত	শ্রমজীবি	তুলার পরিমাণ	উৎপন্ন স্থতা	উৎপন্ন কাপড়	মূলধন	সরকারী বাণিজ্য শুল্ক
১৮৯৭	১৭৩	৪০,৬৫,	৩৭	১,৪৪,	৪৫,৫৩			×	১২,১৪০০০
১৯০১	১৯৩	৫০,০৬	৪১	১,৭২,	৪৭,৩১			১৬ কো	১৮৩১ „
১৯০৫	১৯৭	৫১,৬৩	৪৪	১,৮১,	৬০,৮৭				২৭,৯০,..
	স্বদেশী	আন্দোলনে	সূত্র	পাত					
							পাউণ্ড		
১৯০৬	২১৭	৫২,৭৯	৫২						
				২,০৮	৭০,৮২		৩৮,১৪,০৪,		২৯,৮২, ..
১৯১৪	২৭১	৬৭,৭৮	১০৪						
				২.৬০	৭৫,০০		১৬১,৪১,২৬		৫৬,৭৭, ...
	যুদ্ধের	পূর্বের	অবস্থা				গজ		
১৯১৭	২৬৩	৬৭,৩৮	১,১৪,	২,৭৬,	৭৬,৯৩	৬৬,০৫,৭৫, গজ	১৯,২১;.. গজ	৪৯ কো	৮১,৮৪, ..

পাটের কলের হিসাব

পাঁচ বৎসরের গড়	কলের সংখ্যা	মূলধন	লোক	তাঁত	চরকা	বস্তা প্রতি দাম
		লক্ষ				
১৮৮০—১৮৮৪	২১ (১০০)	২,৭০, (১০০)	৩৮,৮০০(১০০)	৫,৫০০ (১০০)	৮৮,০০০ (১০০)	২৩৷৹
১৮৯০—৯৪	২৬ (১২৪)	৪,০২, (১৪৯)	৬৪,৩০০ (১৬৬)	৮,৩০০ (১৫১)	১৭২,৬০০(১৯৬)	৩২৷৵০
১৯০০—১৯০৪	৩৬ (১৭১)	৬,৮০, (২৫১)	১,১৪,২০০০(২৯৪)	১৬,২০০ (২৯৫)	৩৩৪,৬০০(৩৮০)	৩২/৭
১৯১০—১১	৫৮ (২৭৬)	১১,৫০, (৪২৫)	২,১৬,৪০০ (৫৫৮)	৩৩,১০০ (৬০২)	৬৮২,০০০(৭৭৬)	৪১৷৷০
১৯১৩—১৪	৬৪ (৩০৫)	১৩,০৯, (৪৮৬)	২,১৬,৩০০ (৫০০)	৩৬,০০০ (৫০০)	৭৪৪০০০(৮৪৬)	৭৬৸৵০
১৯১৮						

পাট রপ্তানী

	যুদ্ধের পূর্বে গড় ৫ বৎসরের রপ্তানী টাকা	১৯১৬—১৭ লক্ষ টাকা	১৯১৭—১৮ লক্ষ টাকা	১৯১১—১৯ লক্ষ টাকা
কাঁচা পাট	২২,২০, লক্ষ	১৬,২৯	৬,৪৫	
তৈয়ারী মাল	২০,২৫, „	৪১,৬৭	৪২,৮৪	
মোট	৪২,৪৫ লক্ষ	৫৭,৯৬ লক্ষ	৪৯,২৯ লক্ষ	

পাটের কলের লাভ

(ভারতের আয়কর ও অতিরিক্ত কর ও বিলাতে উদ্বৃত্ত কর দিবার পর)

	১৯১৪ পাঃ	১৯১৫ পাঃ	১৯১৬ পাঃ	১৯১৭ পাঃ
১ মোট লাভ	৯৮২,০০০	৪,৮২০,০০০	৬,১৫৫,০০০	৪,৪৪৭,০০০
২ ডিবেন স্থদ	১৫৯,০০০	১৫৯,০০০	১৫৪,০০০	১৪২,০০০
৩ খাঁটি লাভ	৮২৩,০০০	৪,৬৬১,০০০	৬,১৫৫,০০০	৪,৩০৫,০০০
৪ খাটি আয়ের অনুপাত	১০	৪৮	৭৫	৪৯

৬। খণি ও ধাতু

ভারতবর্ষের প্রতি বহিশত্রুর আক্রমণ ও দৃষ্টি যে এত ঘন ঘন পড়িত তাহার কারণ ভারতবর্ষ স্বর্ণপ্রসূ এই প্রবাদটি সত্যের ও সভ্যতার সকল সীমানা ছাড়াইয়া বহুদূর ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। গ্রীকদের মধ্যে প্রবাদ ছিল ভারতবর্ষের সোনার খনিতে পিপীলিকারা কাজ করিত। পারস্যরাজ দরায়ুসের সাম্রাজ্যের অন্তর্গত বিশটি প্রদেশের মধ্যে সিন্ধুতীরস্থ প্রদেশ হইতে যে পরিমাণ রাজস্ব আদায় হইত অন্য কোনটি হইতে সেরূপ হইত না। ভারতের প্রতি লোভ করেন নাই এমন সভ্য অসভ্য জাতি নাই বলিলেই হয়; কেহ বা লুণ্ঠন করিতে কেহ বা দেশ জয় করিতে, কেহ বা কেবল মাত্র বাণিজ্য করিতে কেহ বা বাণিজ্য ও শাসন উভয় হস্তে নিয়ন্ত্রিত করিয়া দেশে শান্তি স্থাপন ও সমৃদ্ধি সাধন করিতে আসিয়াছেন।

ভারতের ঐশ্বর্য্যের প্রতি লোভ।

একশত বৎসর পূর্বেও ভারতবর্ষ খণিজ ধাতু ও ঐশ্বর্য্যে পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দেশ ছিল। কিন্তু শতাব্দীর মধ্যে শিল্পরাজ্যে যুগান্তর সাধিত হইয়াছে। শতাব্দীর মধ্যে দেশের সকল প্রকার ধাতুশিল্প লোপ পাইয়াছে; আমাদের এই অধঃপতনের কারণ বাহিরের প্রতিযোগীতা ও য়ুরোপীয় রসায়ন শাস্ত্রের উন্নতি। রাসয়নিক উন্নতির সহিত সহজে ও সস্তায় ধাতুর সামগ্রী নির্মাণের উপায় উদ্ভাবিত হইল, ভারতে রেলপথের বিস্তার লাভের সঙ্গে সঙ্গে সেই সব মাল দেশের মধ্যে সহজে ও অনায়াসে প্রবেশ করিতে লাগিল। ভারতবর্ষ এককালে যে ধাতু-রসায়নে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছিল তাহার নিদর্শন মধ্যযুগের লৌহ সামগ্রীর চিহ্ন। প্রাচীন দিল্লীতে একটি লৌহ স্তম্ভ আছে;—সেটি সহস্রবর্ষাধিক নির্মিত হইয়াছে।

প্রাচীন ভারতের ধাতু শিল্প।

কিন্তু এতকাল বাহিরে পড়িয়া থাকা সত্ত্বেও তাহার গায়ে মরিচা পড়ে নাই ; এটা একটি আশ্চর্য্য ব্যাপার। এ ছাড়া ভারতের নানা স্থানে লৌহ নির্ম্মিত অনেক কামান পাওয়া যায়। পিতল, কাঁসা ও তামার সামগ্রী এককালে ভারতে তৈয়ারী হইত ; এবং সে সমস্ত চাদর বা পাত ও এদেশে প্রস্তুত করিবার প্রণালী শিল্পীদের নিকট অজ্ঞাত ছিল না। বর্ত্তমানে এ সমস্তই বিদেশ হইতে আমদানী হইতেছে। আমরা এখন বর্ত্তমান ভারতের খণিজ ও ধাতু শিল্পের অবস্থা কিরূপ তাহারই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

সমগ্র খণিজ পদার্থকে আমরা সুবিধার জন্য কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করিতেছি :—

খণিজের শ্রেণী-বিভাগ।

(১) অঙ্গার-জাতীয় খণিজ—কয়লা, পেট্রোলিয়াম, গ্রাফাইট্। (২) খণিজ ধাতু—স্বর্ণ, রৌপ্য, টিন্, তাম্র, জিঙ্ক বা দস্তা, শীশা, লৌহ, মাঙ্গানিস, নিকেল, আলুমিনিয়াম। (৩) প্রস্তর—গৃহাদি নির্ম্মাণ করিবার উপযুক্ত পাথর, শ্লেট্, চুণ, সিমেণ্ট. কর্দ্দম, বালি ইত্যাদি (৪) নানা শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় খনিজ পদার্থ, যেমন খণিজ রঙ, চীনা মাটি (৫) মণি মাণিক্য।

কয়লা।

কয়লার প্রয়োজন।

বর্ত্তমানে আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় সামগ্রী কয়লা। আমাদের গৃহকর্ম্মে, রন্ধন শালায় যে কয়লা নিত্য লাগে তাহা সমগ্র প্রয়োজনের তুলনায় সামান্যই। পৃথিবীর প্রায় সমস্ত রেল, ষ্টিমার প্রভৃতি যান ও অধিকাংশ কল কারখানা কয়লায় চলিতেছে। ভারতের কয়লা প্রধানতঃ রেলওয়ে ও কলকারখানায় ব্যবহৃত হয়।

পৃথিবীতে কত কয়লা আছে এবং ভবিষ্যতে খোঁজ খবর লইলে আরও কত কয়লা পাওয়া যাইতে পারে সেবিষয়ে পণ্ডিতগণ গবেষণা করিতে ছাড়েন নাই। তাঁহারা অনুমান করেন এখনো ৩০ হাজার কোটি টন্ কয়লা মজুত আছে এবং আরও ৪ লক্ষ ৩ হাজার কোটি টন্ কয়লা চেষ্টা করিলে পাওয়া যাইতে পারে। প্রতি বৎসরে পৃথিবীতে যে পরিমাণ কয়লা উঠে তাহাতে আমেরিকার যুক্ত-রাজ্য প্রথম। গ্রেটবৃটেন দ্বিতীয়, ভারতবর্ষ অষ্টম।

পৃথিবীর মজুত কয়লা।

ভারতের ভূতত্ত্ব অনুসারে দাক্ষিণাত্য ও ছোটনাগপুর অতি প্রাচীন দেশ। এই ভূভাগ স্তরেস্তরে গঠিত, শিলাময় ও খণিজ ধাতুতে সমৃদ্ধ। এই ভূখণ্ডকে ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ গণ্ডোয়ানা ক্ষেত্র বলিয়া থাকেন। এই গণ্ডোয়ানা ভূখণ্ডের অন্তর্গত পাঁচটি বিভাগ বঙ্গদেশেই, একটি মধ্যভারতে, তিনটি মধ্যপ্রদেশে ও একটি হায়দ্রাবাদে আছে।

গণ্ডোয়ানী ক্ষেত্র।

ভারতবর্ষ খণিজ সামগ্রীতে কি প্রকার সমৃদ্ধ তাহাই দেখাইবার জন্য নিম্নে আমরা কয়েকটি বড় বড় খণিজ পদার্থের একটু বিস্তৃত আলোচনা করিলাম। ভারতের এই সকল খণি অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইংরাজ-মূলধনে চলিতেছে; আমাদের দেশে ধনী লোকের অভাব নাই, অথচ দেশে মূলধন তুলিয়া খণিগুলিতে খাটাইবার মতো উৎসাহ আমাদের নাই। অসুবিধা যতই থাকুক আমরা যদি বুঝিতাম যে দেশের খণিজ সামগ্রী আমরা তুলিয়া বিক্রয় করিলেই দেশের মঙ্গল তবে সকল প্রকার জড়তা দূর করিতাম।

বাংলাদেশের কয়লার খণি রাণীগঞ্জ হইতে আরম্ভ; কলিকাতা হইতে পঞ্চাশ ক্রোশের মধ্যেই ঐখানকার খণিগুলি পড়ে। এখানকার কয়লা শতাব্দীকাল ব্যবহৃত হইতেছে

রাণীগঞ্জের কয়লা।

বটে, কিন্তু ১৮৫৪ সালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী (E. I. Ry.) এইখানে প্রবেশ করিয়া কারবারী ধরণে খনি চালাইতে আরম্ভ করেন। মোটামুটি ভাবে বলা যাইতে পারে বাংলাদেশের কয়লার খনি দামোদর নদীর ধারেই অবস্থিত। রাণীগঞ্জের পশ্চিমে ঝরিয়ার বিখ্যাত কয়লা-ক্ষেত্র। ঝরিয়ার কয়লার ক্ষেত্র দৈর্ঘ্যে ২৭ মাইল ও প্রস্থে ১০ মাইল মাত্র, কিন্তু খুব গভীর স্তরেও কয়লা আছে জানা গিয়াছে। অনুমান ৫ হাজার ফিট্ নীচেও কয়লা আছে। কিন্তু বর্ত্তমানে অতি সামান্য অংশই খোঁড়া হইয়াছে।

ঝরিয়ার কয়লা খনি।

এখানে ১৮টি স্তর পাওয়া গিয়াছে, স্তরগুলির গভীরতা ৫ হইতে ৩০ ফিট্; সুতরাং কি পরিমাণ কয়লা আছে তাহা আমরা সহজেই হিসাব করিতে পারি। এখানকার কয়লা খনি ১৮৯৪ সাল হইতে খোঁড়া সুরু হইয়াছে। ঝরিয়ার পশ্চিমে বোকারোর কয়লার খনির আয়তন প্রায় ২২০ বর্গ মাইল; সেখানে অনেকগুলি গভীর স্তর আছে। ভূতত্ত্ব-বিদেরা অনুমান করেন এখানে প্রায় ১৫০ কোটী টন্ কয়লা মজুত আছে। হাজারীবাগ সহরে কয়লা সরবরাহের জন্য বোকারোর কয়লার উপরিতন স্তরে স্থানে স্থানে কাজ সূচিত হইয়াছে। ১৯১০ সালে ৪টি কোলিয়ারীতে এখানে ২১৬৬ টন্ কয়লা উঠিয়াছিল। অল্প দিন হইল বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ে, এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানীদ্বয়ের সমবেত চেষ্টায়, আর বোকারো-রামগড় কোলিয়ারী কোম্পানীর যত্নে বোকারোর কয়লার কাজ দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। ১৯১৬ সালে এখানে প্রায় ২ লক্ষ টন্ ও ১৯১৭ সালে ৩½ লক্ষ টনেরও অধিক কয়লা তোলা হইয়াছে। হাজারীবাগ জিলার রামগড় ইলাকায় প্রায় ৪০ বর্গ মাইল স্থানে কয়লা আছে; কিন্তু কয়লা তত ভাল নয়। হাজারীবাগের দক্ষিণে দামোদর

বোকারো ও রামগড়।

করণপুরার কয়লাক্ষেত্র।

নদীর ধারে করণপুরা নামে একটি স্থানের দুই জায়গায় কয়লা পাওয়া যায়; ইহাদের মধ্যে একটি ৭২ বর্গ মাইল, অপরটি ৪৭২ বর্গ মাইল; সুতরাং নিতান্ত কম নয়। উভয় স্থানে অনুমান প্রায় ৮৮২ কোটি ৫০ লক্ষ টন্ কয়লা আছে। পালামৌ জিলার অন্তর্গত ডালটনগঞ্জের কয়লার খনি ১৯০১ সালে মাত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। গিরিধির কয়লার খনিগুলি খুব বিখ্যাত। এখানকার কয়লা-ক্ষেত্রের পরিমাণ ফল যদিও ১১ মাইলের অধিক নয় তথাচ গুণের জন্য এখানকার কয়লার নাম ও দাম দুইই অধিক। বঙ্গ-বিহারের খনি হইতে যে পরিমাণে কয়লা উৎপন্ন হয় সমগ্র ভারতে তাহা হয় না। সমগ্র ভারতের উৎপন্ন কয়লার শতকরা ৯১ ভাগ বঙ্গ-বিহারের গণ্ডোয়ানা পর্য্যায়ে উত্তোলিত হয়। ১৯১৭ সালে প্রায় ১ কোটি ৬৫ লক্ষ টন্ কয়লা বঙ্গ-বিহারে তোলা হইয়াছে।

বঙ্গ-বিহারের খনির শ্রেষ্ঠত্ব।

বঙ্গদেশের বাহিরে মধ্য-প্রদেশে সাতপুরা পাহাড়ের শাখা মহাদেও শৈল অঞ্চলে নরসিংহপুর, বিটাল ও চিন্দবরা জেলায় কয়লা পাওয়া যায়। এ প্রদেশের মোহাপানী কয়লার খনিতে ১৮৬২ সাল হইতে কাজ আরম্ভ হয়। মধ্যপ্রদেশে মোহপানী, বল্লরপুর এবং পেঞ্চ্‌ডেলীর কয়লা খনি প্রসিদ্ধ; ১৯১৭ সালে এই তিন স্থানে মোট ৩ লক্ষ ৭১ হাজার টন্ কয়লা উৎপন্ন হইয়াছিল।

মধ্যপ্রদেশের কয়লা খনি।

দাক্ষিণাত্যে কয়লা খুব কম পাওয়া যায়। নিজামের হায়দ্রাবাদে সিঙ্গারণী কয়লা খনি ব্যতীত উল্লেখ যোগ্য খনি আর নাই। এই খানাকার পরিমাণ ফল ১৯ বর্গ মাইল। খনির কাজ ১৮৮৬ সালে আরম্ভ হয়; ১৯১৭ সালে মোট ৬ লক্ষ ৮০ হাজার টন্ কয়লা উঠিয়াছিল। ৫ ফিটের স্তরে

হায়দ্রাবাদে সিঙ্গারণীর খনি।

বর্ত্তমানে কাজ হইতেছে। অনুমান প্রায় ৪ কোটি টন্ কয়লা সেখানে আছে।

অন্যান্য দেশে।

মধ্য-ভারতের মহানদীর ধারে ধারে কয়লার খনি আছে। রেবা রাজ্যের উমরিয়া-ক্ষেত্রে ছয় স্তর কয়লা আছে। এইখানে প্রায় ২½ কোটি টন্ কয়লা আছে বলিয়া বোধ হয়। উমরিয়ার ক্ষেত্রে ১৯১৭ সালে ১ লক্ষ ৯৮ হাজার টন্ কয়লা উঠিয়াছিল। গণ্ডোয়ানা পর্য্যার বাহিরে ব্রহ্মদেশ, আসাম, বেলুচিস্থান ও বিকানীরে কয়লার খনি আছে।

কয়লার খরচ।

ভারতবর্ষে কয়লার খনি দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। প্রথমতঃ জ্বালানি কাঠের অভাব ও সহরের সংখ্যা ও আয়তনবৃদ্ধি। হইতেছে। দ্বিতীয়তঃ রেলপথ ক্রমশঃই বাড়িয়া চলিয়াছে। তৃতীয়তঃ ভারতীয় শিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কারখানায় কয়লার খরচ বাড়িতেছে। ১৮৭৮-৮০ সালে গড়ে বাৎসরিক উৎপন্ন কয়লা ৯ লক্ষ টনের অধিক ছিল না; ১৯১৫ সালে কয়লা প্রায় উহার ১৭ গুণ অধিক। গত দশ বৎসরে এই বৃদ্ধি আরও বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। আমাদের দেশের যে কয়লা উৎপন্ন হইতেছে তাহা কিরূপভাবে খরচ হয় তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে।

রেলওয়ে	৫১ লক্ষ টন্	পাঁজা পোড়ানো	১২ লক্ষ টন্
পাটের কল	৮,৮৬ হাজার টন্	জাহাজের জন্য	৮ লক্ষ "
কাপড়ের কল	১১ লক্ষ টন্	খনির কাজ	১৭ লক্ষ "
লোহার ও পিতলের কারখানা	১৩ লক্ষ টন্	অন্যান্য শিল্প ও গৃহাদির রন্ধন কার্য্যে	৩৩ লক্ষ "

By-Products

কয়লা হইতে বহুপ্রকার উপসামগ্রী (By-products) পাওয়া যায়। আল্‌কাতরা, আমোনিয়া, বেঞ্জন প্রভৃতি বহুবিধ পদার্থ সাকৃচি, বরাকর, গিরিধি প্রভৃতি স্থানে

হইতেছে। পাশ্চাত্য দেশে, বিশেষভাবে জারমেনীতে উপ-সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া খনিওয়ালারা কোটি কোটি টাকা তুলিয়া থাকে।

বাংলাদেশের ১৯১৭ সালে ১৫৩টি যৌথ-কোম্পানী ছিল; এবং তাহাদের মূলধন ছিল ৬ কোটি ৭২ লক্ষ টাকা; ইহার বিশ বৎসর পূর্বে মূলধন ছিল ১ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা। সুতরাং এই কয় বৎসরে এই ব্যবসায় কি পরিমাণ বাড়িয়াছে তাহা দেখিয়া বিস্ময় লাগে। উপর্যুক্ত যৌথ-কারবার ব্যতীত ব্যক্তিগত সম্পত্তিও অনেক আছে। বর্ত্তমানে কয়লার ব্যবসায় সম্পূর্ণরূপে য়ুরোপীয় বণিকদের হাতে না হইলেও বড় বড় ভাল খনিগুলির মালিক তাঁহারাই। ভারতবাসীদের খনিগুলির অধিকাংশই ছোট ছোট পিট্ বা ঢালু খনি।

শ্রমজীবির সংখ্যা আয়, শ্রমশক্তি ও অল্প মৃত্যু।

১৯১৭ সালে বঙ্গবিহারের য়লার খনি সমূহে গড়ে প্রতিদিন ১ লক্ষ ৪৫ হাজার করিয়া মজুর খাটিত। গড়ে তাহাদের দৈনিক আয়।৴১০ আনা; মাথা পিছু প্রত্যেক কুলী বৎসরে ১৭০ টন্ কয়লা উঠায়। আমাদের দেশের কুলীরা বিলাতের শ্রমজীবিদের তুলনায় কম পরিশ্রম করিতে পারে। বিলাতের দুইজন কুলী সারাদিন যেকাজ করে আমাদের পাঁচ জনে তাহা অতি কষ্টে করে। কয়লার খনির কাজে মাঝে মাঝে আকস্মিক দুর্ঘটনা ঘটিয়া থাকে—কর্ত্তৃপক্ষের অমনোযোগই অধিকাংশ স্থলে ইহার জন্ম দায়ী। ১৯১৭ সালে সমগ্র ভারতে ১৭২টি এইরূপ আকস্মিক মৃত্যু ঘটিয়াছিল।

পেট্রোলিয়াম।

পেট্রোলিয়াম এক প্রকার তৈল; ইহার যথার্থ অর্থ পাথুরী-তৈল অর্থাৎ যে কোন প্রকারের তৈল মাটির মধ্য হইতে নির্গত হয় বা নিষ্কাশিত হয় তাহাকেই এই সাধারণ নামে অভিহিত করা হয়। পেট্রোলিয়াম

দেখিতে একটু হল্‌দে, কোনো কোনো শ্রেণীর তৈল কালো-বাদামী। ইহার উৎপত্তি কি তাহা অধিক বলা যায় না। তবে অনেকে অনুমান করেন যে অত্যধিক চাপে উদ্ভিজ্জ ও প্রাণীজ পদার্থ পাতালের স্তরে স্তরে তৈল হইয়া গিয়াছে। মাটির মধ্য হইতে যে অপরিষ্কার তৈল পাওয়া যায় তাহাকে চোলাই করিয়া নানা প্রকার রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারা শোধন ও মন্থন করিয়া বিবিধ সামগ্রী প্রস্তুত হয়। এই সকল পদার্থ নানা নামে নানা দেশে পরিচিত। আলো জ্বালিবার জন্য যে এক প্রকার লঘু তৈল ব্যবহৃত হয় আমরা তাহাকে কেরোসিন বলি। অপেক্ষাকৃত ভারি তৈল কলে তেল দিবার জন্য, ঠাণ্ডার দেশে গৃহাদি উত্তপ্ত করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। আমেরিকায় এই জাতীয় তৈলকে কেরোসিন বলে না, সেখানে বলে পারাফিন তৈল। পেট্রোলিয়ামের মধ্যে পারাফিন ও ন্যাপ্‌থা নামক সহজ-দাহ্য দুই প্রকার পদার্থ থাকে। বর্মার যে বাতিকে আমরা মোমবাতি বলি, বস্তুতঃ তাহার সহিত মৌমাছির মোমের সম্পর্ক নাই, সেগুলি পারাফিনের তৈয়ারী। আমেরিকান্ তৈলে পারাফিনের অংশ বেশী, রুশের তৈল নাপ্‌থার ভাগ বেশী। পেট্রোলিয়াম বিশুদ্ধ করিলে কেরোসিন হয়।

১৯১৩ সালে পৃথিবীতে ৫ কোটি ৩০ লক্ষ টন্ পেট্রোলিয়াম উৎপন্ন হয়; ইহার মূলধন ছিল ৭৫০ কোটি টাকা। পৃথিবীর মধ্যে আমেরিকার যুক্তরাজ্যে পেট্রোলিয়াম সর্বাপেক্ষা অধিক উৎপন্ন হয়।

ভারত সাম্রাজ্যে পেট্রোলিয়াম।

১৯১৭ সালে ভারতবর্ষে ২৮ কোটি ২৭ লক্ষ গ্যালন তৈল উঠিয়াছিল অর্থাৎ পৃথিবীর উৎপন্ন তৈলের শতকরা ২ ভাগেরও কম। নিজ ভারতবর্ষে পেট্রোলিয়াম খুব কমই পাওয়া যায়। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় ভারতের সীমানার বাহিরে হিমালয়ের দুই প্রান্তে পেট্রোলিয়ামের খনি আছে; পশ্চিমে পঞ্জাব, বেলুচিস্থান ও পারস্যে ও পূর্বে আসাম, ব্রহ্মদেশ ও সুমাত্রা

প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জে। ব্রহ্মদেশে তৈল মৃত্তিকার মধ্যে সঞ্চিত থাকিবার পক্ষে অনুকূল। এখানে দুই শত ফিটের মধ্যেই তৈল পাওয়া যায় ; উপরে কর্দমের স্তর থাকায় তৈল অপব্যয় হয় না। বেলুচিস্থানে মৃত্তিকা বালুময় বলিয়া সমস্ত তৈলই নষ্ট হইয়াছে। পঞ্জাবে রবালপিণ্ডি জিলায় ১ হইতে ২ হাজার গ্যালন কেরোসিন বৎসরে পাওয়া যায়। এই কারবার মেসার্স ষ্টীল ব্রাদার্স কর্তৃক চালিত হইতেছে। আসামের তৈল-ক্ষেত্রের কথা ১৮৬৫ সালে প্রকাশিত হয়, কিন্তু ১৮৯৯ সালের পূর্বে সেখান হইতে তৈল সংগ্রহের বিশেষ চেষ্টা হয় নাই। ঐ বৎসরে আসাম-অয়েল কোম্পানী গঠিত হয়। সেই বৎসরেই ৬ লক্ষ ২৩ হাজার গ্যালন তেল উঠে ; যুদ্ধারম্ভে ৪৭ লক্ষ ও ১৯১৭ সালে ৬০ লক্ষ গ্যালন্ উৎপন্ন হয়। ১৯১৬ সালে বর্মা-ওয়েল কোম্পানী চট্টগ্রামের নিকট বদরপুর নামক স্থানে একটি পেট্রোলিয়াম খনি আবিষ্কার করিয়াছেন। ১৯১৭ ডিগ্‌বি ও বদরপুর হইতে উত্তোলিত তৈলের পরিমাণ মোট ৯৩ লক্ষ গ্যালন হইয়াছিল।

আসাম ও চট্টগ্রামের পেট্রোলিয়াম খনি।

বর্মাতেই ভারত সাম্রাজ্যের পেট্রোলিয়ামের প্রধান কেন্দ্র। সেখানে ইনান্‌গিয়াং সর্বপেক্ষা পুরাতন ও বিখ্যাত খনি। বর্মনরা শতাধিক বৎসর এইখান হইতে তৈল সংগ্রহ করিতেছিল। বৃটীশ অধিকারের পূর্বে বৎসরে ২০ লক্ষ গ্যালনের অধিক তৈল এখান হইতে উৎপন্ন হইত না। ১৮৮৭ সাল হইতে বৈজ্ঞানিক উপায়ে মৃত্তিকা ভেদ করিয়া পেট্রোলিয়াম বাহির করা আরম্ভ হয়। ১৮৯১ সালে বর্মা-ওয়েল কোম্পানী গঠিত হয় এবং তাহারা এই ব্যবসায়ে কিরূপ ধনী হইয়াছে তাহা তাহাদের একটি ব্যয়ের উদাহরণ দিলেই চলিবে। প্রথম প্রথম খনি হইতে পেট্রোলিয়াম তুলিয়া জালা ভরিয়া কুলীর মাথায় বা গরুর গাড়ীতে করিয়া নদীর ধারে আনীত হইত। পরে বাঁশের নালাতে তৈল ঢালিয়া দেওয়া

হইত ও নদীতে দেশী নৌকার উপরে জালাতে ধরা হইত। কিছুদিন পরে আরও নূতন পন্থা উদ্ভাবিত হইল। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চ্যাপ্টা-তলা বজরাতে বড় বড় মাটির পাত্রে তৈল ধরার ব্যবস্থা হইল। পরে বড় বড় ইস্পাতের চৌবাচ্ছাশুদ্ধ ষ্টীমার গঠিত হইল। ১৯০৮ সালে বর্মা অয়েল কোম্পানী ১ কোটি ১২½ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া খনি হইতে রেঙ্গুনের নিকটস্থ কারখানা পর্য্যন্ত ২৭৫ মাইল দীর্ঘ দশ-ইঞ্চি-মোটা এক নল তৈয়ারী করিয়াছেন। রেঙ্গুনের তৈল সাফ্ করার জায়গায় এই নলে করিয়া প্রতিদিন ৫ লক্ষ ২০ হাজার গ্যালন তৈল আসে। বর্মা দেশের কেরোসিনের ব্যবসায় কি প্রকার উন্নতি লাভ করিয়াছে তাহা আমরা উপরের উদাহরণটি হইতেই বুঝিতে পারিলাম। ১৯০৫ সাল হইতে ১৯১৫ সাল পর্য্যন্ত ১৪ কোটি গ্যালন্ হইতে ২৯ কোটি গ্যালন কেরোসিন উৎপন্ন হয়; মূল্য ৮৮ লক্ষ টাকা হইতে ১ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা দাঁড়াইয়াছে। আরাকানের নিকটে কতকগুলি দ্বীপে কেরোসিন আছে বলিয়া বোধ হয়। আকাইবের সন্নিকটস্থ কয়েকটি দ্বীপেও কেরোসিন পাওয়া গিয়াছে।

ভারতবর্ষে কেরোসিনের ব্যবহার ক্রমেই বাড়িতেছে। এখন গ্রামে গ্রামে মাটির-তেল ও'কূপী'বা'লম্প' ডিজ্ ব্যবহৃত হইতেছে। বর্মা ব্যতীত কেবল ভারতবর্ষেই কেরোসিনের ব্যবহার ১৯০১ সালে ৭ কোটি ৩০ লক্ষ গ্যালন্ হইতে ১৯১১ সালে ১৬ কোটি ৮০ লক্ষ গ্যালন্ দাঁড়ায়। বর্মার কেরোসিন-কোম্পানীর শ্রীবৃদ্ধির সহিত বৈদেশিক তৈলের আমদানী হ্রাস পাইয়াছে। ১৯১৪ সালে আমদানী কেরোসিন প্রায় ৮ কোটি ৪০ লক্ষ গ্যালন হইয়াছিল; ১৯১৬ সালে যুদ্ধের জন্য উহা কমিয়া ৫ কোটি ৮০ লক্ষ গ্যালনে পরিণত হয়। কেরোসিনের দাম সেই সময়ে কি ভীষণ বাড়িয়াছিল তাহা আমাদের স্মরণে আছে।

আমাদের দেশে কেরোসিন আসিবার পূর্বে সর্বত্রই জ্বালানীর জন্য

নানাপ্রকার চর্বি ও উদ্ভিজ্জ তৈল প্রদীপে ব্যবহৃত হইত। এক্ষণে কেরোসিন সেই স্থান পূরণ করিতেছে। পেট্রোলিয়াম বর্ত্তমানে আমাদের জীবনের কত কোঠায় প্রবেশ করিয়াছে তাহা তলাইয়া দেখিলে বুঝিব যে আমরা এখন একেবারে পৃথিবীর সকল প্রকার ঘূর্ণীর মধ্যে গিয়া বসিয়াছি, ঘরের কোণ বা দেশের গণ্ডি অনেক কাল আমাদিগকে ছাড়িতে হইয়াছে।

পেট্রোলিয়ামের উপ-সামগ্রী (By-Products)

গ্যাসোলিন নামে এক প্রকার অত্যন্ত সহজ-দাহ্য পদার্থ পেট্রোলিয়ামের ভিতর হইতে পাওয়া যায়; ইহার আর এক নাম পেট্রোল। পেট্রোল গ্যাসে আজকাল যাবতীয় মোটর-গাড়ী, আকাশ-যান, এমন কি অনেক জাহাজ ও এঞ্জিন পর্য্যন্ত চলিতেছে। বেঞ্জিন নামে একপ্রকার পদার্থ ইহা হইতে পাওয়া যায়; রবার গাটাপার্চা করিবার সময়ে ইহার প্রয়োজন লাগে। ভ্যাসেলিন্ পেট্রোলিয়াম হইতেই পাওয়া যায়; ডাক্তারী চিকিৎসায়, কেশবিন্যাসে ইহার প্রয়োজন খুবই। এ ছাড়া একপ্রকার ধূমহীন বারুদ প্রস্তুত করিতেও ইহার প্রয়োজন হয়। হ্রীগোলিন নামে একপ্রকার তৈল এই পেট্রোলিয়াম হইতেই পাওয়া যায়। ইহা খুব সহজেই উপিয়া যায় ও কোনো স্থানকে অসাড় করিবার জন্য ইহা কাজে লাগে। নাপ্থা পেট্রোলিয়াম হইতে পাওয়া যায়। আমরা আলো জ্বালিবার জন্য কেরোসিন নামে যে একপ্রকার তরল পদার্থ ব্যবহার করি তাহা পেট্রোলিয়ামেরই রূপান্তর। রাস্তা তৈয়ারী করিতে পীচ নামে এক প্রকার সামগ্রী ব্যবহার করা হয়; ইহাও পেট্রোলিয়াম খনিরই জিনিষ। পারাফিন হইতে মোম বাতি প্রস্তুত হয়। দিয়াশলাইএর কাটিকে সহজদাহ্য করিবার জন্য ইহা পারাফিনে ডুবাইয়া রাখা হয়। নানা শিল্পের বিচিত্র ব্যবহারে পারাফিন লাগে। মৃত্তিকার এই ঐশ্বর্য্যর হইতে ভারতবাসীরা বঞ্চিত হয় নাই, কিন্তু বিদ্যার অভাবে বুদ্ধির

অভাবে, চেষ্টার অভাবে এই বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী সে হইতে পারে নাই। প্রায় দুইশত প্রকারের উপসামগ্রী প্রস্তুত হয়।

কয়লা ও পেট্রোলিয়াম ভিন্ন অঙ্গার জাতীয় আরও দুইটি পদার্থ ভারতে পাওয়া যায়। ব্রহ্মদেশে Amber অতি সামান্য পরিমাণে পাওয়া গেলেও তাহার দাম বেশ যথেষ্ট পাওয়া যায়। গ্রাফাইট ভারতের নানা স্থানে পাওয়া যায়। আমরা যাকে লেড্‌পেন্সিল বলি বস্তুতঃ তাহার সহিত শীশার সম্পর্ক বড়ই কম। পেন্সিল গ্রাফাইট হইতে হয়। দাক্ষিণাত্যে ত্রিবঙ্কুর রাজ্য ব্যতীত আর কোথায়ও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় কিনা সে বিষয়ে সবিশেষ অনুসন্ধান প্রয়োজন।

আম্বের ও গ্রাফাইট।

লৌহ।

ভারতবর্ষে বহু প্রকার ধাতু-চুর (ores) প্রস্তরের সহিত মিশ্রিত অবস্থায় পাওয়া যায়। অধিকাংশ স্থলেই এই সব ধাতু চুর হইতে ধাতু নিষ্কাশিত হয় না। ধাতু-চুর বিদেশে চালান হইয়া যায়। চালান হইয়া যাইবার প্রধান কারণ এদেশে ধাতু-রসায়ন সম্বন্ধে লোকের অজ্ঞতা খুব অধিক। খাদসমেত ধাতু চুর পাঠাইতে আমাদের অনেক জাহাজ ভাড়া পড়িয়া যায়; তা ছাড়া বিদেশে তদ্দেশীয় বাজার দরে জিনিষ বিক্রয় করিতে হয়। তাহা ব্যতীত কাঁচা মালের দর শিল্পকারদের মর্জ্জির উপর নির্ভর করে। আমাদের দেশের খনিজ-শিল্পের উন্নতির অন্তরায় রসায়ন বিদ্যার সহিত খনিজ বিজ্ঞানের যোগের অভাব। উপ-সামগ্রী প্রস্তুত প্রণালী (By-product) আমাদের দেশে নূতন। আমরা এক্ষণে ভারতের প্রধান প্রধান খনিজ-ধাতুগুলির বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইব।

ধাতুচুর ও বৈদেশিক শিল্প।

লৌহের ব্যবহার ভারতবর্ষে কতকাল হইতে চলিতেছে তাহার সঠিক ইতিহাস পণ্ডিতগণ দিতে অসমর্থ। প্রাচীনকালের লৌহ-সামগ্রী দেখিয়া মনে হয় এ শিল্প দেশময় এককালে বিস্তৃত ছিল। য়ুরোপীয় বাণিজ্যের প্রতিযোগীতায় দেশীয় অন্যান্য শিল্পের সহিত লৌহ-শিল্পও লোপ পাইল। কলের কাছে বাহুর কাজ টিকিল না। য়ুরোপীয় পদ্ধতি অনুসারে লৌহ প্রস্তুত কেবলমাত্র বঙ্গ-বিহারে হইতেছে। বরাকরের নিকট একটি বিলাতী কোম্পানী লৌহ নির্মাণের কারখানা স্থাপন করে। এইখানে কয়লা ও লৌহচুর প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়; ম্যাগনেটাইট ও হেমাটাইট নামে দুই শ্রেণীর পাথরে লৌহচুর প্রচুর পরিমাণে থাকে; এই পাথর মানভূম ও সিংহভূম জেলায় পাওয়া যায় বলিয়া বরাকর কোম্পানী এখন লৌহচুর সেইখান হইতে আমদানী করিতেছেন।

বরাকরের লৌহের কারখানা।

কয়লা যেমন খনি হইতে খুঁড়িয়াই সহজে ব্যবহার করা যায়, লৌহ ও অন্যান্য ধাতু সেরূপভাবে ব্যবহার করা যায় না। লৌহ পাথর ও মাটির সহিত সংমিশ্রিত অবস্থায় থাকে; আবার সকল স্থানের লৌহচুর এক প্রকারের নয়—কোথাও বা লৌহের সহিত অন্য এক প্রকারে ধাতু কখনো বা একাধিক জাতীয় ধাতু মিশ্রিত থাকে। এই লৌহচুর গলাইয়া ফেলিলে যে লৌহ পাওয়া যায় তাহাকে ঢালাই লোহা (Pig-iron) বলে; ইহা কখনো বিশুদ্ধ হয় না। ইহার মধ্যে অঙ্গার, গন্ধক ও ফসফরাস থাকিয়া যায়। এই সব সামগ্রী থাকিয়া যায় বলিয়া কোনো মজবুত কাজ এই শ্রেণীর লোহার দ্বারা হয় না। এইজন্য এই ঢালাই-লোহা হইতে অঙ্গারের ভাগটি যথাসাধ্য বাহির করিয়া ফেলা হয়। এই লোহাকে পুনরায় আগুনে গলিতে দিয়া নাড়িতে থাকিলে অঙ্গারভাগ উপিয়া যায়। তখন তাহাকে পিটাইয়া চাদর, বার করিয়া ফেলা সহজ। কিন্তু এত

ঢালাই ও পেটা লোহা।

করিয়াও ইহা সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ হয় না ; কিয়দ্ পরিমাণে খাদ্ বা ছাই ইহার ভিতর ভিতর থাকিয়া যায়। পেটা-লোহা ঢালাইএর চেয়ে অনেক অংশে মজবুত হয় বটে কিন্তু যথেষ্ট শক্ত হয় না। অস্ত্র-শস্ত্র, ছুরি-কাঁচি প্রভৃতি সামগ্রী নির্মাণের জন্য যে লোহার প্রয়োজন তাহা একই কালে কঠিন ও নমনীয় হওয়া চাই। এবং এই সকল কার্য্যের জন্য লোহাকে ইস্পাতে পরিণত করিতে হয়। সাধারণ ইস্পাত সম্পূর্ণরূপে খাদ হইতে মুক্ত নয় ও শতকরা '৩ হইতে ২ ভাগ পর্য্যন্ত অঙ্গার থাকিয়া যায়।

পাথুরে-কয়লা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইবার পূর্বে লোহের কারখানায় কাঠের আগুন ব্যবহৃত হইত। য়ুরোপে বিংশ শতাব্দীতেও রুশিয়া ও সুইডেনের লোহার কাজে কাঠ পোড়ানো হয়। অনেকে অনুমান করেন সেই জন্যই সুইডিশ লোহা এত শক্ত। পাথুরে কয়লার মধ্যে গন্ধক থাকায় লোহা খারাপ হয় ; সেইজন্য আজকাল লোহার কারখানায় পোড়া কয়লা ব্যবহৃত হয়। * আমেরিকার কোথাও কোথাও পেট্রোলিয়াম এবং ভূগর্ভস্থিত গ্যাসের সাহায্যে লোহা গলানো হয়। আমাদের দেশে পেট্রোলিয়াম সস্তা নয় ও গ্যাস পাওয়া যায় না। লৌহ-চূর গলাইবার জন্য কেবলমাত্র কয়লারই প্রয়োজন হয় না ; কিছু চুণ বা চূণে-পাথর আগুনের মধ্যে লৌহচূরের সহিত ফেলিয়া দিতে হয়। তবে লাল হেমটাইট্ নামে যে লৌহচূর পাওয়া যায় তাহার মধ্যে শতকরা ৫৫ হইতে ৭০ ভাগ পর্য্যন্ত খাঁটি লৌহ থাকায় চুণের প্রয়োজন হয় না।

আগুনের চুল্লীর মধ্যে পোড়াকয়লা ও লোহাচূর দিয়া হাওয়া দেওয়ার প্রয়োজন হয়। আমাদের বাড়ীর উনানেও হাওয়া না দিয়া তলা বন্ধ

---

* লোহার কোম্পানীরা কাচা কয়লা কিনিয়া তাহা পোড়াইয়া লয়। কাচা পাথুরে কয়লার ধোঁয়া চোলাই করিয়া আল্কাৎরা হয়। আজ কাল অনেকেই এই ধোঁয়ার সদ্ব্যবহার করিতেছে।

Hot-Blast Furnace

করিয়া দিলে আগুন নিবিয়া যায়। এক্ষণে এই সব চুল্লীতে হাওয়া প্রবেশ করাইবার পূর্বে ইহাকে গরম করিয়া দিতে পারিলে তাপ বৃদ্ধি পায়, লোহাও সহজে গলে। কোনো কোনো উৎকৃষ্ট চুল্লীতে হাওয়ার তাপ ৮০০ ডিগ্রি হইতে ১২০০ ডিগ্রি পর্যন্ত দেওয়া হয়। এই শ্রেণীর চুল্লীকে গরম-হাওয়ার চুল্লী বা Hot Blast Furnace বলে। পূর্বে যেখানে এক টন্ (২৭৷৷০ মণ) লোহা তৈয়ারী করিতে ছয় টন্ কয়লা লাগিত এই চুল্লীর সাহায্যে সেখানে মাত্র দুই টন্ লাগে। গরম-হাওয়ার চুল্লীর মধ্যে যে গ্যাস্ উৎপন্ন হয় তাহাও নষ্ট হয় না—অন্যান্য এঞ্জিন চালাইতে কাজে লাগে। বর্ত্তমানে ইলেক্ট্রিসিটি কোথাও কোথাও লোহা গলাইবার জন্য ব্যবহৃত হইতেছে।

বর্ত্তমানে বেসেমার-প্রণালী অনুসারে লৌহ পরিষ্কার করিবার প্রথা সর্বত্র প্রচলিত হইতেছে। হেন্‌রী বেসমার এই পদ্ধতি আবিষ্কার করেন বলিয়া তাঁহারাই নামানুসারে Bessemer Steel বলে, কিন্তু মিঃ মুসেট্ ইহার যথার্থ উন্নতি করেন।

Bessemer Steel

এই পদ্ধতি অনুসারে গলিত ঢালাই (Pig) লোহাকে একটি পাত্রে প্রথমে লইয়া যাওয়া হয়; এই পাত্রের গায়ে এক প্রকার বেলে পাথর গুঁড়ার প্রলেপ দেওয়া হয়। গরমে উহা পাত্রের গায়ে লাগিয়া যায়; ইহা সহজে ভাঙ্গে না বা নষ্ট হয় না। এই পাত্রের নীচে কতক ছিদ্র আছে, এবং তলদেশ দিয়া ঠাণ্ডা হাওয়া এমনি প্রচণ্ডবেগে পাত্রের মধ্যে প্রবেশ করিতে থাকে যে গলিত লোহা ছিদ্র দিয়া গলিয়া পড়িবার অবসর পায় না। এই বায়ু লৌহের মধ্যস্থিত অঙ্গার সম্পূর্ণরূপে দূর করিয়া দেয়। এতদূর হইলে পাত্রটিকে কাৎ করিয়া প্রয়োজন মত অঙ্গার মিশ্রিত করা হয়। কিন্তু এই শ্রেণীর ইস্পাত ক্ষণভঙ্গুর হয় বলিয়া মিঃ মুসেট্ ম্যাঙ্গানিস্ নামে ধাতু ইহার সহিত মিশ্রিত করিয়া এই ইস্পাতের উক্ত দোষ দূর করিয়া দেন

আর একটি প্রণালীকে বলে খোলা চুল্লী-প্রথা। বেসেমার প্রণালীর

সহিত ইহার মোটামুটি সবই মেলে ; কেবল বেসেমার প্রবর্ত্তিত বায়ু চালনার প্রথা সিমেন্সমার্টিন প্রথাতে নাই। ইহাতে খোলা উনানের চারিদিক হইতে বায়ু আসিয়া অঙ্গার দূর করিয়া দেয়।

নানাশ্রেণীর ইস্পাত

কিছুকাল হইতে নানাপ্রকার ধাতুর সহিত লৌহ মিশ্রিত করিয়া নূতন নূতন গুণ-সম্পন্ন ইস্পাত তৈয়ারী হইতেছে। নিকেল-ইস্পাতে প্রায় তিন ভাগ নিকেল থাকে। ইহা সাধারণ ইস্পাত হইতে অনেক শক্ত। ইস্পাতের সহিত ম্যাঙ্গানিস্ নামে এক প্রকার ধাতু শত করা ১২ হইতে ১৪ ভাগ মিশ্রিত করিলে ম্যাঙ্গানিস্ ইস্পাত হয়। এই ইস্পাত এমন কঠিন যে সাধারণ যন্ত্রে ইহাকে কাটা যায় না, সাধারণ অস্ত্র ইহাকে ভেদ করিতে পারে না। ক্রোম-ইস্পাতে ক্রোমিয়াম নামে এক প্রকার ধাতু শত করা দুই ভাগ মিশানো হয়। এই ইস্পাতও খুব শক্ত ; লৌহাদি ভেদ করিবার জন্য যে সব অস্ত্র হয়, এই ক্রোমিয়াম ইস্পাতেই তাহা গঠিত। আর এক প্রকার ইস্পাতকে টাঙ্গস্টেন্ ইস্পাত বলে। ৭৫০ ডিগ্রি তাপেও ইহা নরম হয় না ; সেই জন্য লেদ্ প্রভৃতির যন্ত্র যাহাতে অবিরত ঘর্ষণে তাপ সৃজিত হয়—সেগুলি টাঙ্গাস্টেন্ ইস্পাত দিয়া নির্মিত হয়।

ভারতবর্ষে বর্ত্তমানে এই সকল উপায়ে লৌহ প্রস্তুত করিবার চেষ্টা চলিতেছে বলিয়া আমরা একটু বিশদভাবে জিনিষগুলি বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি। তাতা কোম্পানীর লৌহ ও ইস্পাতের কারখানা এখন কেবল ভারতে নয়, ধীরে ধীরে পৃথিবীর মধ্যেও নাম করিতেছে। বোম্বাইএর পার্শী তাতা পরিবার বহু দিন হইতে বিখ্যাত। এই কোম্পানীর কাজ আরম্ভের পূর্বে তাঁহারা য়ুরোপ ও আমেরিকা হইতে বিশেষজ্ঞদের আনাইয়া ভারতবর্ষে লৌহ ও ইস্পাত কারখানা খুলিবার সকল প্রকার সুবিধা অসুবিধাগুলি তন্ন তন্ন করিয়া বিচার করিয়াছিলেন। প্রায় ৫½ লক্ষ টাকা তাঁহারা এই তথ্য অনুসন্ধানেই ব্যয় করিয়াছিলেন।

বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের উপর কালামাটি ষ্টেশন হইতে দুই মাইল দূরে সিংহভূম জেলায় সাকৃচি নামে একটি স্থান আছে বর্ত্তমানে এই স্থানটির নাম জাম্‌শেদজী তাতার নামানুসারে জাম্‌শেদপুর নাম ইয়াছে। সাকৃচির নিকটেই লৌহচুর পাওয়া যায় এবং কয়লার খনিও এখান হইতে অধিক দূরে নয়। এ ছাড়া তাতা কোম্পানী মৌরভঞ্জ রাজ্যে ও রাজপুর জেলায় দুইটি স্থানের লৌহচুরপূর্ণ পাহাড়ের পত্তনি লইয়াছেন। মৌরভঞ্জের পাহাড়ের নীচু থাক-গুলিতেই অনুমান ৭০ লক্ষ টন্ প্রস্তর আছে। রাসায়নিক পরীক্ষার দ্বারা জানা গিয়াছে এখানকার পাথরের মধ্যে শতকরা প্রায় ৬০ ভাগ লোহা আছে। প্রতি বৎসর দুই লক্ষ টন্ করিয়া পাথর কোম্পানী লইয়া থাকেন। প্রথম ত্রিশ বৎসর টন্ প্রতি দশ পয়সা করিয়া দিতে হইবে ও ত্রিশ বৎসর পরে পাঁচ আনা করিয়া টন্-করা খাজনা দিতে হইবে। সাকৃচি হইতে এই খনি ৪০ মাইল দূরে এবং লৌহচুরের দাম আনিবার খরচ সমস্ত বাবদ্ টন্ করা ২৷০ করিয়া পড়ে। লৌহচুর ব্যতীত আরও কত জিনিষের প্রয়োজন তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই সব জিনিষের যোগাড় করা সহজ ব্যাপার নহে। গাংপুর রাজ্যে পানপোখা নামে এক স্থান হইতে চুণ আসে। মৈশূরে ম্যাগনেসাইট পাথর পাওয়া যায়; উহা হইতে ম্যাঙ্গানিস নিষ্কাশিত করা হয়। নয়টি কয়লার খনি হইতে কয়লা সরবরাহ হয়; প্রতি মাসে ৫৫,০০০ টন্ কয়লা বর্ত্তমানে কাজে লাগে। লৌহ গলাইবার জন্য দুইটি ব্লাষ্ট চুল্লী আছে; ইহার প্রত্যেকটিতে প্রায় ৩৫০ টন্ লৌহ প্রতিদিন প্রস্তুত হয়। এই প্রকার আরও তিনটি নূতন চুল্লী নির্ম্মিত হইতেছে। এই সকল চুল্লীর জন্য যে পোড়া কয়লা লাগে তাহাও প্রস্তুত করিতে হয়। এই জন্য ১৮০টি কাম-রায় পাথুরে কয়লা পোড়ান হয়; প্রত্যেকটি কামরায় ৭½ টন্ করিয়া কয়লা ধরে। এই উনানগুলি রাতদিন বারমাস জ্বলিতেছে; ইহার

ধোঁয়া নষ্ট হয় না—আলকাৎরা প্রভৃতি উপসামগ্রী (By-product) তৈয়ারী হয়। কোক প্রস্তুত করিবার জন্য আরও ২০০টি ১৩টনী উনান তৈয়ারী হইতেছে। ইস্পাত তৈয়ারীর জন্য চারিটি ৫০ টনী ও দুইটি ৭৫ টনী খোলা চুল্লী আছে ও এই ছয়টি ছাড়া আরও একটি খোলাচুল্লী, দুইটি ২৫ টনী বেসেমার চুল্লী, তিনটি বৈদ্যুতিক চুল্লী, দুইটি ২০০ টনী আর একপ্রকার চুল্লী এবং ব্ল্যাষ্টচুল্লী হইতে গলিত লোহা আনিয়া রাখিবার জন্য ১৩০০ টনের উপযোগী করিয়া স্থান নির্মিত হইতেছে।

আজকাল প্রতিমাসে ১৭,০০০ টন্ ইস্পাত প্রস্তুত হইতেছে। রেল ও অন্যান্য লোহার জিনিষ প্রায় ১ লক্ষ ২০ হাজার টন্ প্রতি বৎসর হইতেছে। ভারত সরকার দশ বৎসর ধরিয়া প্রতিবৎসর ২৫,০০০ টন্ রেল লইতে প্রতিশ্রুত আছেন। বর্ত্তমানে সাকৃচিতে যেসকল নূতন উদ্যোগে ইহাঁরা হস্তক্ষেপ করিয়াছেন তাহাতে প্রায় ১২½ কোটী ব্যয় পড়িবে।

সাকৃচির জনসংখ্যা

কোম্পানীর খাস কাজে বর্ত্তমানে প্রায় ১৩,০০০ লোক নিযুক্ত; এ ছাড়াও এখানে এত প্রকারের কলকব্জা আছে ও নূতন হইতেছে যে সবগুলির নাম করাও অসম্ভব। কেবল লোহার কাজ ছাড়াও এখানে আরও ২০টি নূতন কারবার খুলিবার চেষ্টা চলিতেছে। এ সব ছাড়া কোম্পানীর ঠিকা কাজ করিবার জন্য কন্‌ট্রাকটারগণের অধীনে প্রায় ১৫ হাজার লোক খাটিতেছে। সাকৃ-চিতে এখন প্রায় ৫০ হাজার লোক বাস করিতেছে, কিন্তু জনসংখ্যা অচিরেই লক্ষাধিক হইবে। কোম্পানীর লোকেদের জন্য বাসগৃহ, চিকিৎসালয়, শিক্ষার সুব্যবস্থা আছে।

দেশীয় উপকরণ সংগ্রহের চেষ্টা

তাতাদের বিশেষ চেষ্টা যে যথাসাধ্য বিলাতী মাল বর্জ্জন করয়া দেশীয় উপকরণ দিয়া কাজ চালান। সেই জন্য ভারতের নানাস্থানে কোথায় কিরূপ জিনিষ পাওয়া যায় তাহা অনুসন্ধান করিবার জন্য বিশেষজ্ঞগণ নিযুক্ত

আছেন। চুল্লীর জন্য বিশেষ এক প্রকার ইটের প্রয়োজন; বিদেশ হইতে বৎসরে প্রায় ১৫ লক্ষ করিয়া এই ইট আমদানী করা হইত। তাঁহারা আশা করিতেছেন এই ইট এই দেশেই প্রস্তুত করা যাইবে। তাতা কোম্পানীর বড় বড় কর্ম্মচারী প্রায় সবই সাহেব; কিন্তু ক্রমেই দেশীয় লোকে তাহাদের কৃতিত্ব দেখাইয়া সম্মান পাইতেছে। কয়েকটি বাঙালী যুবক কতকগুলি বিভাগের ভার পাইয়াছেন। সম্প্রতি একটি টেক্‌নিক্যাল বিদ্যালয় এইখানে খোলা হইয়াছে। মনোনীত ছাত্রদের ৬০৲ টাকা করিয়া মাসহারা দেওয়া হইবে ও তিন বৎসর পরে তাহারা ২০০৲ টাকা মাহিনার কাজ পাইবে।

উৎপন্ন সামগ্রী

তাতার লৌহ ও ইস্পাত কোম্পানী ছাড়া বরাকরের লোহার কারখানা আছে। ১৯১৬ সালে তাতা কোম্পানী ১ লক্ষ ৫২ হাজার টন্ লোহা ও ৯৩ হাজার টন্ ইস্পাত প্রস্তুত করিয়াছিল। বরাকর কোম্পানী যথাক্রমে ৯২ হাজার ও ৩০ হাজার টন্ উৎপন্ন করিয়াছিল।

ম্যাঙ্গানিস

লৌহের সহিত ম্যাঙ্গানিসের সম্বন্ধ যে খুবই নিকট তাহা পূর্ব্বেই আভাস দিয়াছি। এক রুশিয়া ছাড়া পৃথিবীর আর কোথায়ও এই ধাতু প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় না। ম্যাঙ্গানিস মধ্য-প্রদেশ, মাদ্রাস, মধ্য-ভারত ও মৈশূরের নানা স্থানে পাওয়া যায়। এই ধাতু ব্যতীত ভাল ইস্পাত হয় না সে কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই জন্য ভারতবর্ষ হইতে প্রচুর পরিমাণে ম্যাঙ্গানিস চুর বিদেশে রপ্তানী হইয়া যাইতেছে। এ ছাড়া ইহা রাসায়নিক কারখানায় নানা কাজে লাগে। রঙ জ্বালাইয়া বা ফিকে করিবার জন্য যে ব্লীচিং পাউডারের অভাবে আমাদের দেশে ভাল কাগজ দুর্ম্মূল্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সেই ব্লীচিং সামগ্রী ম্যাঙ্গানিস হইতে করা যায়; কাঁচ, চীনামাটি রঙ করিতেও ইহার প্রয়োজন হয়। এই মূল্যবান্ খনিজ যে পরিমাণে চুর

সমেত বিদেশে রপ্তানী হইয়া যাইতেছে তাহাতে আশঙ্কা হয় যে ভারতের শিল্পের উন্নতির জন্য যখন এই খনিজের প্রয়োজন হইবে তখন উহা অর্দ্ধ-নিঃশেষিত হইয়া যাইবে। গাছ কাটিয়া পুনরায় বীজ পুঁতিলে ১০।২০ বৎসরে ফল পাইবার আশা করা যায়, শস্য পুঁতিয়া ভাল সার দিলে প্রতি বৎসর উন্নতি দেখা যায়; কিন্তু খনি হইতে ধাতু নিঃশেষিত হইলে তাহা পুনর্প্রাপ্তির আশা করা বাতুলতা। *

ক্রোমিয়াম

লৌহের সহিত ক্রোমিয়াম নামে এক প্রকার ধাতু মিশ্রিত করিলে খুব মজবুত ইস্পাত হয় তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই ক্রোমিয়ামও ভারতে পাওয়া যায়। মাদ্রাজের অন্তর্গত সালেমে, আন্দামান ও বেলুচিস্থানে এই ধাতু পাওয়া যায়। ছোট নাগপুরে সিংহভুম জেলায় ক্রোমিয়ামের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে; ১৯১৩ সাল হইতে এখানে উক্ত ধাতু উত্তোলন কার্য্য চলিতেছে। ঐ বৎসরে ৮৪৮ টন্ ক্রোমিয়াম ওঠে; কিন্তু ১৯১৭ সালে ৩,২৬৬ টন্ উঠিয়াছিল; ইহার মূল্য ৪৬ হাজার টাকা।

পূর্ব্বে আমরা টাঙ্গস্‌টন ইস্পাতের কথা উল্লেখ করিয়াছি। আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়াতেই টাঙ্গসেটনের প্রধান খনি। ভারতবর্ষকে প্রকৃতি এই মূল্যবান্ ধাতুসম্পদ হইতে বঞ্চিত করেন নাই। রাজপুতানা, নাগপুর

---

* ম্যাঙ্গানিস রপ্তানীর হিসাব :—

১৮৯৯...৮৭ হাজার টন্	১৯১০...৮০০ হাজার টন্
১৯০০...১২০ " "	১৯১১...৬৭০ " "
১৯০৫...২৪৭ " "	১৯১৬...৬৪৫ " "
১৯০৭...৯০২ " "	১৯১৭...৫৯০ " "
১৯০৯...৬৪২ " "	

টাঙ্গস্টন বা ওলফ্রাম

ও সিংহভূমে এই ধাতু পাওয়া যায়। এ ছাড়া বর্মা-দেশে ট্যাঙর নামক স্থানে প্রচুর পরিমাণে এই ধাতু পাওয়া যায়। টাঙ্গসটনের দাম খুব—এক টনের দাম তিন হাজার টাকা। গত যুদ্ধের পূর্ব্বে ভারতের উৎপন্ন-টাঙ্গস্টনের অর্দ্ধেকই রপ্তানী হইত। ১৯১৭ সালে ৪৫৪২ টন্ ধাতু উঠিয়াছিল; ইহার মূল্য ৬,২৩,০৭৪ পাউণ্ড বা ৯৩ লক্ষ টাকার উপর।

স্বর্ণ

দেশের প্রধান ঐশ্বর্য্য সোণারূপা ও মণি মাণিক্য। রৌপ্য ব্যতীত আর প্রায় সব প্রকারই ধাতু আমাদের দেশে পাওয়া যায়। আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, আলাস্কা প্রভৃতি স্থানের স্বর্ণখনি আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বে ভারতের সোণা জগতে বিখ্যাত ছিল; এবং সেই কারণেই এ দেশের সোণার খ্যাতি অসম্ভব রকম বাড়িয়া গিয়াছিল। সোণা দুই রকমের পাওয়া যায়; এক জলের সঙ্গে ধুইয়া বালির সঙ্গে মিসিয়া আসে, আর এক প্রকার পাথরের সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় পাওয়া যায়।

নদীজলে স্বর্ণচুর

জলে ধুইয়া যে পরিমাণ সোণা পাওয়া যায় তাহা নিতান্তই সামান্য। কাশ্মীরে লদক অঞ্চলে ১৯১০ সালে উৎপন্ন স্বর্ণের পরিমাণ ২৩৬ আউন্স হয়, ইহার পরে এখানকার উৎপন্ন স্বর্ণের কোনো পরিমাণ সরকারী বিভাগের গোচরীভূত হয় নাই। হিমালয়ের ভিতর হইতে স্বর্ণ প্রস্তরের পার্শ্ব দিয়া সিন্ধুনদ ধুইয়া আসিয়াছে, সেই জন্য সিন্ধুতে ও ইরাবতী ভিন্ন ইহার প্রায় অন্য সকল শাখানদীতেই সোণার চুর পাওয়া যায়। ১৯০৯ হইতে ১৯১৩ সাল পর্য্যন্ত ৫ বৎসর পঞ্জাব প্রদেশে নদীসৈকতে ৬৭৬ আউন্স স্বর্ণ পাওয়া যায়।

ছোটনাগপুর এবং মধ্য প্রদেশের পূর্ব্বদিকে অনেকগুলি স্থানে সোণা পাওয়া যায়; ইহার মধ্যে সিংহভূম জিলায় বৎসরে প্রায় ২½ হাজার আউন্স সোণা উৎপন্ন হয়। উত্তর আসামের ডিহং নদীর সোণা বহুকাল

হইতে প্রসিদ্ধ। শোনা যায় ইংরাজ-অধিকারের পূর্ব্বে আসামের স্বর্ণকারদের নিকট হইতে ২ লক্ষ টাকা খাজনা আদায় হইত। এই সোণা উত্তর ব্রহ্মপুত্রের উভয় পার্শ্বস্থ স্বর্ণ-প্রস্তর ভেদ করিয়া আসিতেছে। তিব্বতেও সোণার খনি আছে; সেখান হইতে স্বর্ণচূর আসে। ব্রহ্মদেশের ইরাবতী নদীতে বহুকাল হইতে সোণা পাওয়া যায়। অতি প্রাচীন কাল হইতে বর্মনরা নদীতে সোণা সংগ্রহ করিত। ইহাদের সোণা-সংগ্রহের উপায় বড় অদ্ভুত ছিল; জলের মধ্যে চামড়া খোঁটা দিয়া টানিয়া পাতা থাকে; লোমের দিকটা উপরে থাকে বলিয়া স্বর্ণচূর তাহাতে লাগিয়া যায়। পরে ইহা উঠাইয়া রোদ্রে শুকাইয়া ঝাড়িলেই সোণার গুঁড়া পড়িয়া যায়।

স্রোতে ছাড়া খনিতে প্রচুর পরিমাণে সোণা দাক্ষিণাত্যে পাওয়া যায়।

সোণার খনি

প্রাচীনকালে ধারবার ও নিজামের হাদ্রাবাদ প্রদেশে সোণার খনি ছিল; সে সকলের চিহ্ন এখনো বিদ্যমান। ধারবারের কেনো একটি খনিতে প্রায় ৫০০ ফিট নীচেও কাজ হইত। ছোটনাগপুরের নানা জায়গায় পাথর গুঁড়া করিবার হামানদিস্তা ও জাঁতা দেখিতে পাওয়া যায়। দাক্ষিণাত্যের সব চেয়ে বড় খনি, মৈশূরের কোলার খনি। সমগ্র ভারতের উৎপন্ন সুবর্ণের শতকরা ৯৪ ভাগই এই কোলার খনি হইতে উত্তোলিত হইয়া থাকে। কোলোর খনি মৈশূরের রাজধানী বাঙ্গালা হইতে ৬০ মাইল দূরে অবস্থিত। এখানকার যন্ত্রপাতি বাষ্পের দ্বারা ও কাবেরী জলপ্রপাত-উৎপন্ন বৈদ্যুতের সাহায্যে চলে। কয়লা বঙ্গদেশ ও অষ্ট্রেলিয়া হইতে আমদানী হয়।

কোলার স্বর্ণখনি

কোলার স্বর্ণখনিগুলি সম্পূর্ণরূপে বৃটীশ মূলধনে চলিতেছে। সর্ব্বপ্রথম ১৮৮০ সালে ব্যবসায়ীদের দৃষ্টি এখানকার সোণার প্রতি পড়ে, ১৮৮০ হইতে ১৯০৩ পর্য্যন্ত অংশীদারগণ প্রায় ৮২ লক্ষ ৫০ হাজার পাউণ্ড মুনফা পাইয়াছিলেন। কোলারের খনি

গুলিতে বর্ত্তমানের উপযোগী বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম সবই আছে। ১৯১৭ সালে কোলার সোণার খনিগুলিতে ৫,৩৬,৫৫৯ পাউণ্ড সোণা উৎপন্ন হয়।

কোলারের স্বর্ণখনির পরই হায়দ্রাবাদের হুট্টির খনি বিখ্যাত। ১৯০৩ সালে সেখানে কাজ আরম্ভ হয়। ১৯১৭ সালে ওখানে ১৩,৪৬৬ আউন্স সোনা উঠে। এ ছাড়া বোম্বাইএর ধারবার জেলায় ও মাদ্রাসের অনন্ত-পুর জেলায় সোণার খনিতে কাজ হয়। ১৯১২ সালে ধারবারে কাজ বন্ধ হইয়া যায়। বর্মাতেও সোণা পাওয়া যায়। পঞ্জাব ও যুক্ত-প্রদেশে কিছু কিছু সোণা আছে এবং কাজও চলে। ১৯১৬ সালে সমগ্র ভারতে ৫,৭৪,২৯৩ আউন্স স্বর্ণ উৎপন্ন হয়; কিন্তু মৈশূরে সোণা কমিতেছে বলিয়া ১৯১৭ সমগ্র ভারতে ৫,৩৬, ১১৮ আউন্স হইয়াছিল। ইহার মূল্য ৩০ লক্ষ টাকার উপর।

টীন

টীন বলিলেই আমাদের মনে হয় কেরোসিনের টীন বা টীনের মগ বা বাক্স জাতীয় কোনো সামগ্রী। কিন্তু খনি হইতে আমরা যে জিনিষটা পাই সেটা মোটেই এরূপ নয়। টীনচুর পাথরের সঙ্গে ও পলিমাটিতে পাওয়া যায়। টীনচুর হইতে টীন নামে এক প্রকার ধাতু পাওয়া যায়। সেই ধাতু লোহার চাদরের উপর মাখাইলে ইহাতে মরিচা ধরিতে পারে না। আমরা যাহাকে টীন বলি তাহা যথার্থরূপে লোহার পাতলা চাদর। খনিজ টীন পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে বেশী পাওয়া যায় মালয় উপদ্বীপে। ইহার পরেই ওলন্দাজ দ্বীপ-পুঞ্জে প্রচুর টীন উৎপন্ন হয়; সেখানকার টীন সবই প্রায় হল্যাণ্ডে যায় ও সেখান হইতে ইংল্যাণ্ডে চালান হয়। তথায় বহুপ্রকারের জিনিষ তৈয়ারী হইয়া পুনরায় পূর্ব্বদেশে ফিরিয়া আসে। ভারতের এত কাছে প্রচুর টীন, অথচ ভারতে সে শিল্প জাগ্রত হয় নাই। ভারত সাম্রাজ্যের অন্তর্গত বর্ম্মা প্রদেশেও টীন পাওয়া যায়; তবে প্রচুর পরিমাণে নয়।

১৯১৭ সালে সেখানকার টীন ধাতু ও চুরের মূল্য ৯৪॥০ হাজার পাউণ্ড হইয়াছিল। ইহার সমস্তই বিদেশে চালান হইয়া যায়। ভারতবর্ষের মধ্যে হাজারীবাগ জিলার অন্তর্গত পালগঞ্জ জমিদারীতে নাকি টীন পাওয়া যায়। তবে সেখানে তেমন করিয়া অনুসন্ধান হয় নাই।

আমাদের দেশে তাম্র পবিত্র ধাতু বলিয়া পরিগণিত হয়। প্রাচীন কালের পূজার ও গৃহস্থালীয় বাসনপত্র অধিকাংশ স্থলে তামার হইত।

তাম্র।

তামা দক্ষিণ-ভারত, রাজপুতানা ও হিমালয়ের পাদমূলে কুলু, ঘরবাল, নেপাল, সিকিম এবং ভুটানে পাওয়া যায়। এই সকল স্থানের তামার মূর্ত্তিসমূহ বিখ্যাত। এই সব জিনিষ এখানে নির্ম্মিত হইত এবং তামাও দেশে পাওয়া যাইত। ছোটনাগপুরের কয়েকটি স্থানে তামার কাজ ছোট আকারে বরাবরই চলিয়া আসিতেছে। কয়েক বৎসর হইল Cape Copper Company নামে একটি য়ুরোপীয় কোম্পানী মাটীগড়া নামক স্থানে (B. N. Ry গালুড়ি ষ্টেশনের নিকটে) বিপুল উদ্যমে তাম্র নিষ্কাষণ কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়াছেন। তাঁহারা আধুনিক এবং বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি সাহায্যে অতি অল্পকালের মধ্যেই এই কার্য্যে বেশ সুফল লাভ করিয়াছেন। ১৯১৭

সিংহভূমে।
তাম্রখনি।

সালে এই কোম্পানী ২০,১০৮ টন তাম্রচুর উত্তোলন করিয়াছিল; ইহার মূল্য প্রায় ৪ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা। সিংহভূম জেলায় ৭৭ মাইল একটা জায়গায় তামার চিহ্ন আছে। রাজদোহ নামে একটি স্থানে প্রায় আড়াই ফিট্ গভীর পর্য্যন্ত তাম্রচুর আছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে গিরিধি হইতে বার মাইল দূরে বারগণ্ডা নামক একটি স্থানে তিনশ' ফিট্ মাটির নীচে প্রায় চৌদ্দ ফিট্ গভীর এক তাম্রচুরের স্তর আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ইহার কাজ গিরিধিতে কিছু কাল মাত্র চলিয়াছিল। বর্ত্তমানে গিরিধির যে অংশে এই কারখানার কাজ হইত তাহাকেই বারগণ্ডা বলে।

আজকাল তামা বিদেশ হইতেই বেশীর ভাগ আমদানী হয়। বিদেশ হইতে আমদানী ধাতুর শতকরা ২০ ভাগ তামা। পৃথিবীর মধ্যে মার্কিন রাজ্যই তামাতে শ্রেষ্ঠ। ইহার পরেই স্পেন, পর্টুগাল, জাপান, চিলি, জারমেনী, অষ্ট্রেলিয়া। ইংলণ্ডে তামা কমিয়া গিয়াছে। তামার পয়সা তামার বাসন ছাড়া তামা দিয়া বৈদ্যুতের তার প্রস্তুত হয়। পিতলের সহিত মিশাইয়া ভরণ করিবার জন্য তামার প্রয়োজন হয়। ব্রোঞ্জের মধ্যেও প্রচুর পরিমাণে তামা থাকে। বর্ত্তমানে ভারতে তামার যে প্রকার খরচ, বাহির হইতে এই ধাতু আমদানী না করিলে উপায় নাই।

তামার ব্যবহার।

সীসা ও রূপা প্রায় একই জায়গায় পাওয়া যায়। সীসা পাথরকে 'গ্যালেনা' বলে; ইহার মধ্যে সীসা ও গন্ধক প্রধানতঃ থাকে; রূপা ইহার ভিতর হইতে বাহির করা হয়। ভারতের ভূতত্ত্বে যাহাকে পুরাণ-পাথর বলে তাহার মধ্যে ও অন্যান্য প্রাচীন স্তরে 'গ্যালেনা' পাওয়া যায়। সেই জন্য দেশে এক সময়ে রৌপ্য পাওয়া যাইত। দেশীয় কারিগরগণ ইহারই ভিতর হইতে সীসা ও রূপা নিষ্কাষণ করিত।

সীসা ও রূপা।

বর্মার উত্তর পূর্বে শানরাজ্যে সীসা রূপা ও দস্তা পরস্পরের সহিত মিশ্রিত অবস্থায় পাওয়া যায়। এখানে এককালে চীনাদের প্রকাণ্ড কারবার ছিল। ইংরাজ বণিকেরা তাহাদের পরিত্যক্ত খাদ হইতেও অনেকখানি ধাতু বাহির করিয়া লইতেছে। ভারতের উৎপন্ন সমস্ত সীসাই ব্রহ্মদেশের শান্‌রাজ্যে পাওয়া যায়। ১৯১৬ সালে ১৪ হাজার টন ও ১৯১৭ সালে ৭১ হাজার টন গ্যালেনা উঠিয়াছিল। ১৯১৭ সালে যত ধাতুচুর উঠিয়াছিল তাহার অধিকাংশই বিদেশে রপ্তানী হইয়া হইয়া যায়, সামান্যই এদেশে ধাতু আকারে পরিণত করা হয়। ১৯১৭ সালে এদেশে প্রায় ১৭ হাজার টন সীসা প্রস্তুত হইয়াছিল। ১৯১৬

সালে সীসাচুর হইতে ৭,৫৯,০১২ আউন্স রৌপ্য ও ১৯১৭ সালে ১৫,৮০,-৫৫৭ আউন্স রৌপ্য নিষ্কাষিত হইয়াছে। সীসার ন্যায় ভারতের উৎপন্ন সমস্ত রৌপ্যই শান্ ষ্টেটের বৌদউইন (Bawdwin) খনিতে প্রস্তুত হয়। ভারতে মুদ্রা ও অলঙ্কারাদির জন্য যেরূপ রৌপ্যের প্রয়োজন তাহা বিদেশ হইতে আমদানী না করিলে চলিতে পারে না। রৌপ্য আমেরিকায় প্রচুর পরিমাণে হয়। সেইখান হইতে রৌপ্য কিনিয়া আমাদের সরকার বাহাদুরকে আনিতে হয়। সেখানকার বাজার-দর কমাবাড়ার সঙ্গে আমাদের বাজার-দরের খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে।

আলুমিনিয়াম।

আজকাল আলুমিনিয়ামের বাসনপত্রের খুব প্রচলন হইতেছে। ইহার চাদর বিদেশ হইতে আসে ও এখানকার কারখানায় নানাপ্রকার সামগ্রী প্রস্তুত হয়। ছোটনাগপুর অঞ্চলে ও বীরভুম প্রভৃতি জেলায় মাটির মধ্যে আলুমিনিয়াম আছে বলিয়া আমার মনে হয়। আলুমিনিয়াম সস্তা ও মজবুত বলিয়া দিন দিন ইহার প্রসার হইতেছে। দেশীয় রাসায়নিকগণ এদিকে দৃষ্টি দিলে অভাবনীয় ঘটনাও ঘটিতে পারে।

পাথর ও মার্বেল।

মাটির নীচে হইতে যে সকল মহা মূল্যবান্ পদার্থ পাই তাহাই যে কেবল খনিজ পদার্থ এমন নহে। পাথর, শ্লেট, কাঁকর, চুণ সমস্তই খনিজ সামগ্রী হইলেও সেগুলি ধাতু নহে। পাথর হইতে শীল, নোড়া, জাঁতা, চাকি, বাটি, খোরা, গেলাস, ঘটি প্রস্তুত হয়। এ ছাড়া বাড়ী তৈয়ারীর বেলে ও লাল পাথর, মূর্ত্তি প্রভৃতি খোদাই করিবার জন্য কালো পাথর, মূল্যবান্ কার্য্য করিবার জন্য মার্বেল পাথর ব্যবহৃত হয়। এই সবই খনিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন ভারতবর্ষের স্থাপত্যের কীর্ত্তিচিহ্ন যে রহিয়াছে তাহার কারণ সেগুলি পাথরের তৈয়ারী। কিন্তু আজকাল বিদেশ হইতে মার্বেল পাথর প্রচুর পরিমাণে আমদানী হইতেছে। ইতালী, স্কট্ল্যাণ্ডে শ্বেতপাথর

পাওয়া যায়; কিন্তু ভারতের মার্বেল অপেক্ষা যে সেগুলি ভাল তাহা প্রমাণিত হয় নাই। বিদেশ হইতে প্রতি বৎসর এক মার্বেল পাথরই দুই লক্ষ টাকার উপর আমদানী হয়; অন্যান্য শ্রেণীর পাথর ও প্রায় দুই লক্ষ টাকার আসে। আমাদের দেশে রাজপুতনার মাকারাণার মার্বেল বিখ্যাত; তাজমহল প্রভৃতি মোগলদের অতুল কীর্ত্তিগুলি সমস্তই এইখানকার মার্বেলই নির্ম্মিত। বর্ত্তমানে দিল্লীতে বড়লাট বাহাদুরের প্রাসাদের মার্বেল মাকারাণা হইতে সংগৃহীত হইতেছে।

পাথুরে চুণ ও ঘুটিং।

কেবলমাত্র প্রস্তরই গৃহাদি নির্ম্মাণের উপকরণ নয়। চুণ ও একটি প্রধান উপাদান। চুণ জিনিষটা প্রাণীজ হইলেও আমরা তাহাকে প্রস্তররূপেই পাই। চুণের খনি পাহাড়েই পাওয়া যায়। এক প্রকার পাথর গুড়াইয়া চুণ হয়। বাংলাদেশের পূর্ব্বদিকে খাশিয়া পাহাড় এই চুণেপাথর আছে। ছাতক এই চুণের ব্যবসায়ের কেন্দ্র বলিয়া ইংরাজ বণিকগণ ১৮শ শতাব্দীর শেষভাগে সেখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ছাতক সিলেট জেলায় বলিয়া উহা 'সিলেটী' চুণ বলিয়া বিখ্যাত। জব্বলপুরের নিকট কাটনীতেও আর একটী চুণের পাহাড় আছে। এ ছাড়া ছোটনাগপুরে ও বীরভূম জেলায় 'ঘুটিং' বলিয়া একপ্রকার কাঁকুরে পাথর পাওয়া যায়। সেইগুলি পুড়াইয়া চুণ পাওয়া যায়।

শ্লেটপাথরের প্রচলন ক্রমেই বাড়িতেছে। কাঙ্গারা জেলায়, দিল্লীর দক্ষিণে রেবারীতে শ্লেটের ব্যবসায় বড় করিয়া ফাঁদা হইয়াছে। দাক্ষিণাত্যের বহুস্থানে শ্লেট পাওয়া যায়; কিন্তু কোথায়ও ইহার হিসাব রাখা হয় না বলিয়া কি পরিমাণের ও কত মূল্যের সামগ্রী বিক্রয় হয় তাহা বলা যায় না।

খনিজ রঙ ভারতে যে পরিমাণে পাওয়া যাইতে পারে তাহার চেষ্টা সেরূপ হয় নাই। জব্বলপুর জেলায় খনিজ রঙের এক কারখানায় গিরি-

খনিজ রঙ

মাটি কাজে লাগানো হইতেছে এবং পান্না রাজ্যে হরিদ্রা রঙ প্রস্তুত হইতেছে; কিন্তু কলিকাতায় এই সব রঙ বিদেশ হইতে আমদানী হয়। এ দেশের লোকে বহুকাল হইতে লাল, হরিদ্রা প্রভৃতি বিবিধ রঙ মৃত্তিকা হইতে বাহির করিয়া ব্যবহার করিত তাহার চিহ্ন অজন্তা, বাগ্, রামগড় প্রভৃতি স্থানের প্রাচীন চিত্রে এখনো দেখা যায়। অজন্তা ও বাগের গুহার চিত্রগুলি খুব কম করিয়া বার শত বৎসরের পুরাতন, অথচ সকল প্রকার প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার মধ্যে তাহাদের রঙ ঠিক রহিয়াছে, ইহা কম কৃতিত্বের কথা নয়। এসব রঙ এককালে দেশেই পাওয়া যাইত। মধ্যযুগের রাজপুত, মোগল চিত্রের রঙও ভারতে প্রস্তুত হইত; দাক্ষিণাত্যে ও বর্মাতে একপ্রকার পাথরকে 'মাকড়া' পাথর বলে; ইহা হইতে রঙ পাওয়া যায়। মাদ্রাসের ত্রিচিনপল্লী জেলায়, বর্মার বহুস্থানে গিরিমাটি রঙ পাওয়া যায়। বৃন্দাবনে মথুরায়, জয়পুর, প্রভৃতি স্থানে প্রস্তর মূর্ত্তি সমূহের উপর এক প্রকার কাল রঙ দিয়া চক্‌চকে করে। মথুরাতে লেখক সেই প্রকার রঙ দিতে স্বয়ং দেখিয়াছেন। এই বিদ্যা ক্রমে লুপ্ত হইয়া আসিতেছে এবং পাথরের উপর কি করিয়া এনামেল করিতে হয় তাহা দেশের লোক ভুলিয়া যাইতেছে।

অভ্র

অভ্র ভারতবর্ষে যে পরিমাণে উৎপন্ন হয়, পৃথিবীর আর কোথাও তদ্রূপ দেখা যায় না। ভারতবর্ষ, কাণাডা ও মার্কিন দেশ এই তিনটি স্থানই পৃথিবীর অভ্র সরবরাহ করিয়া থাকে। ইহার মধ্যে ভারতবর্ষেই প্রায় শতকরা ৭০ ভাগ উৎপন্ন হয়। ভারতের অভ্রের ব্যবসায় ক্রমেই উন্নতি লাভ করিতেছে; বর্ত্তমানে এই কার্য্যে প্রায় ১৬,০০০ লোক নিযুক্ত রহিয়াছে। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র অভ্র পাওয়া যায় না। হাজারীবাগ ও গয়া জেলার মধ্যে ৬০ মাইল দীর্ঘ ও ১২ মাইল প্রস্থ একটি স্থানে এবং দাক্ষিণাত্যে নেলোর জিলায়

অভ্র পাওয়া যায়। ভারতে উৎপন্ন অভ্রের প্রায় শতকরা ৮০ ভাগই বিহারে খনিত হয়; প্রায় ১৫ ভাগ মান্দ্রাজে ও অবশিষ্ট ৫ ভাগ রাজপুতনায় পাওয়া যায়।

অভ্রের খনিগুলিতে অত্যন্ত সে-কেলে ধরণে কাজ হয়। যেখানে অভ্র পাওয়া যায় সেই স্থানটি পুকুরের মত করিয়া খুঁড়িয়া ফেলা হয়; কুলিরা দল বাঁধিয়া সারি দিয়া উপর হইতে নীচ পর্য্যন্ত দাঁড়ায় এবং পুষ্করিণী বা খাদ হইতে মাটি, জল ও অভ্রের চাপড়া তুলিতে থাকে। বর্ষাকালে জলের জন্য কাজ বন্ধ থাকে। কিন্তু এই সকল অসুবিধা দূর করিবার জন্য ব্যবসায়ীরা চেষ্টা করিতেছে। অভ্র চিরাই করিয়া বিদেশে রপ্তানী হয়। যুদ্ধের পূর্ব্বে জারমেনী ছিল অভ্রের প্রধান খরিদ্দার। ১৯১৬ সালে ৪৪,১০০ হন্দর অভ্র রপ্তানী হইয়াছিল; ইহার মূল্য ১৬ লক্ষ টাকা। ১৯১৭ সালে অভ্রের রপ্তানী আরও বৃদ্ধি পায়; ঐ সালে ৬২,৪০৪ হন্দর রপ্তানী হয়। গিরিধি 'ফাকৃনিফাড়া' ও অভ্র-চালানের খুব বড় একটি কেন্দ্র।

আস্‌বেস্‌টস নামক আর এক প্রকার খনিজ অভ্রের ন্যায় তাপ নিবারক। ইঞ্জিন প্রভৃতিতে ইহার চাদর তাপ নিবারণের জন্য প্রয়োজনে লাগে। করোগেট টীনের পরিবর্ত্তে কোথায় কোথায় ইহার চাদর ছাদে ব্যবহৃত হয়। বিহারের সিংহভূমে সেরাইকেলা রাজ্যে, রাজপুতনার মেবারে, যুক্ত-প্রদেশস্থ গড়বালে, মৈশূরের হস্‌সন জেলায়, মধ্যপ্রদেশের ভাণ্ডার জিলায়, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির ইদর রাজ্যে আস্‌বেসটস্ পাওয়া যায়। আজ পর্য্যন্ত ভারতে যত আস্‌বেস্‌টস পাওয়া গিয়াছে তাহার কোনোটিই উচ্চশ্রেণীর বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। ইহাদের আঁশ সমূহ প্রায়ই অতিশয় ভঙ্গুর বলিয়া বিদেশে রপ্তানীর পক্ষে অনুপযোগী। অবশ্য আমাদের দেশে আস্‌বেসটসের ব্যবহারোপযোগীর দ্রব্যাদির কারখানা খুলিলে এই আস্‌বেসটসই

আসবেসটস

অনেক কাজে আসিতে পারে। আমরা কেবল নামমাত্র দামে উৎকৃষ্ট খনিজ সমুহ বিদেশে চালান দিয়া থাকি। অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট শ্রেণীর খনিজ বিদেশে চালান করিলে জাহাজ ভাড়া দিয়া লাভের অংশে কিছুই থাকে না; এই কারণে আমাদের দেশের অপেক্ষাকৃত একটু খারাপ শ্রেণীর ধাতুচুর বা মৃৎপ্রস্তরাদি ভূগর্ভে পড়িয়া থাকে অথবা নিতান্ত মাটির দরে চালান করিয়া দিই; কেননা তাহার সদ্ব্যবহার করিতে আমরা জানিনা। আস্‌বেস্‌টসের অনেক গুণ; ইহা আগুন-সহা, ইহার দ্বারা রঙ, কাগজ, পটি, দস্তানা চাদর প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। বৈজ্ঞানিকগণ ইহা হইতে আরও কত জিনিষ বাহির করিতে পারেন তাহা বলা কঠিন।

মগ্নক বা ম্যাগনেসাইট নামে এক প্রকার ধাতু অন্যান্য খনিজ ধাতুর সহিত দক্ষিণ ভারতে পাওয়া যায়। সালেম জেলা ইহার প্রধান কেন্দ্র।

ম্যাগনেসাইট

কয়েক বৎসর হইতে ইহার খনন কার্য্য চলিতেছে; নানা প্রকার রাসায়নিক সামগ্রীতে ইহার প্রয়োজন হয়, বিশেষ ভাবে ইস্পাত প্রস্তুতের চুল্লীর জন্য যে ইট লাগে সেই ইট নির্মানের প্রধান উপাদান এই ম্যাগনেসাইট। সাকচির লোহার কারখানায় প্রচুর পরিমাণে এই ইট লাগে; এই তাপসহা ইটের প্রতিখণ্ডের দাম এক টাকারও উপর পড়ে। আর সর্ব্বোৎকৃষ্ট ম্যাগনেসাইট যাহা চালান হইয়া যায় তাহার দাম মণকরা ৪।৫৲ টাকার বেশী হয় না। এইরূপে দেশের মূল্যবান্ খনিজসমুহ মাটির দরে বিক্রয় হইয়া যাইতেছে। তাতা কোম্পানী বিদেশ হইতে এই ইট আমদানী না করিয়া এদেশেই প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ১৯১৬ সালে ২ লক্ষ ১০ হাজার টাকার ম্যাগনেসাইট উৎপন্ন হয়।

ভারতবর্ষের মধ্যে প্রধানতঃ বিহারেই সোরা পাওয়া যায়। এককালে সোরা বারুদ তৈয়ারীর একমাত্র উপাদান ছিল। কিন্তু দক্ষিণ আমেরি-

সোরা

কার অন্তর্গত চিলি দেশে সোডিয়াম্ নাইট্রেট নামে নামে এক প্রকার তলানি জমাট (Deposit) আবিষ্কৃত হওয়ায় ভারতবর্ষের এই ব্যবসায় মন্দা পড়িয়া আসিয়াছে। এক-কালে য়ুরোপের গোলাবারুদের এই শ্রেষ্ঠ উপাদান বিহার হইতেই রপ্তানী হইত। যুদ্ধের পূর্ব্বে ৪০।৪৫ লক্ষ টাকার মূল্যের অধিক সোরা উৎপন্ন হইত না। যুদ্ধের সময়ে ১৯১৬ সালে ৬৪ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকার মূল্যের সোরা উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯০১ সালের আদমসুমারীতে প্রকাশ যে বিহারের নুনিয়া (যাহারা সোরা তোলে) জাতি ক্রমেই লুপ্ত হইয়া আসিতেছিল। ১৯১১ সালেও তাহাদের অবস্থা তদ্রূপই ছিল। এই জাতের অবনতির কারণ সরকারের তরফ হইতে এই ব্যবসারের প্রতি যথেষ্ট মনোযোগের অভাব। নুনিয়ারা জাতব্যবসায় ছাড়িয়া জমির শরণাপন্ন হইতেছে। ভারতে যে পরিমাণ সোরা হইত তাহার শতকরা ৮০ ভাগই বিদেশে রপ্তানী হইত। অন্য দেশে তাহাদের যে প্রকার সদ্‌গতি হয় এ দেশেও কেন তদ্রূপ হইতে পারে না তাহাই ভাবিবার প্রয়োজন।

চীনামাটি

জিপসাম্ নামে এক প্রকার খনিজ মৃত্তিকা ভারতের নানা স্থানে পাওয়া যায়। এই জিপসাম্ হইতে প্লাষ্টার অব প্যারীস (Plaster of Paris) তৈয়ারী হয়। এই পদার্থে নানা প্রকার খেলনা, মূর্ত্তি, বাটি, পেয়ালা প্রভৃতি সামগ্রী নির্ম্মিত হয়। কলিকাতার পটারী ওয়ার্কসে ইহার খুব ব্যবহার হইতেছে। ছোট নাগপুরে, সিন্ধুপ্রদেশে, কচ্ছউপদ্বীপে, পঞ্জাবের লবণ-পাহাড়ে এই মৃত্তিকা পাওয়া যায়। যোধপুরে এক জায়গায় প্রায় হাত দুই গভীর স্থানে এই মৃত্তিকা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গিয়াছে। কেহ কেহ অনুমান করেন সেখানে পূর্ব্বে একটা লবণ সমুদ্র বা হ্রদ ছিল।

ফিট্‌কারী এক সময়ে আমাদের দেশে প্রচুর পরিমাণে তৈয়ারী হইত;

ফিটকারী।

কচ্ছ রাজপুতানা ও পঞ্জাবের নানা স্থানে ইহার বড় বড় কারবার ছিল। কিন্তু বিদেশ হইতে ইহার আমদানী সুরু হইলে এই ব্যবসায় লোপ পাইল। বর্ত্তমানে কচ্ছতে কিছু কিছু তৈয়ারী হয়। রঙ ও চামড়ার কাজে ফিটকারীর প্রধান ব্যবহার।

আমাদের দেশে লবণ সমুদ্র, হ্রদ ও পাহাড় হইতে পাওয়া যায়।

লবণ।

সাধারণতঃ লোকে যে লবণ খায় তাহা লিভারপুল বা এডেন হইতে আসে। সৈন্ধব-লবণ পঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত-প্রদেশে পাওয়া যায়; এই খনিতে বহু শতাব্দী ধরিয়া কাজ চলিতেছে এবং এখনো বহুকাল ধরিয়া চলিলেও নিঃশেষিত হইবে না। ১৮৪৯ সালে পঞ্জাব অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে এখানকার লবণের খনি বৃটীশ তত্ত্বাবধানে আসে এবং ১৮৭২ সাল হইতে বরাবর নিয়মিত কাজ

সৈন্ধব লবণ।

চলিতেছে। এখানে প্রায় ৫০০ ফিট্ গভীর লবণ-স্তর আছে; কিন্তু শেষ ২৭৫ ফিট্ লবণের সহিত এত মাটি মিশ্রিত যে তাহা কোনো কাজে লাগিবে না। কোহাটের সৈন্ধব-ক্ষেত্র আট মাইল স্থান জুড়িয়া আছে। ইহার গভীরতা হাজার ফিটের উপর। এই দুইটি স্থান ছাড়াও সৈন্ধব লবণ পাওয়া যায়। সৈন্ধব-লবণ বৎসরে ১ লক্ষ ৮০ হাজার টন্ অর্থাৎ সমগ্র লবণের দশমাংশ উত্তোলিত হয়।

সৈন্ধব-লবণ ব্যতীত রাজপুতানার মধ্যস্থিত সম্বর হ্রদের লবণ উত্তর পশ্চিম ভারতে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই হ্রদের পরিধি বর্ষাকালে ৬০।৭০ বর্গ মাইল পর্য্যন্ত হয়। কিন্তু গভীরতা কোথায় দুই হাতের বেশী নয়। চারিদিকের লবণাক্ত মাটি ধুইয়া হ্রদে জল জমিতে

সম্বর হ্রদের লবণ।

থাকে এবং বৃষ্টির দুই তিন মাসের মধ্যে সমস্ত হ্রদের জল লবণাক্ত হইয়া যায়। এই হ্রদ বৃটিশ-সরকার যোধপুর ও জয়পুরের নিকট হইতে বার্ষিক এক লক্ষ টাকা দিয়া ইজারা

লইয়াছেন। ইহা হইতে সরকারের বার্ষিক লাভ হয় প্রায় ৮০ লক্ষ টাকা। এই হ্রদ হইতে প্রায় ১ লক্ষ ৩৫ হাজার টন্ লবণ উৎপন্ন হয়। সমস্ত হ্রদই কতকগুলি বাঁধ বাঁধিয়া ছোট ছোট চৌবাচ্ছার মতো করা আছে। সেই ঘেরাজলের উপর সর জমিতে থাকে; তাহাই তুলিয়া শুকাইতে দিলেই লবণ হয়।

সৈন্ধব ও সম্বর হ্রদ ব্যতীত সমুদ্রের জল হইতে লবণ করা হয়। সমগ্র ভারতে প্রায় ১৫ লক্ষ টন্ লবণ ব্যবহৃত হয়; ইহার মধ্যে সমুদ্রের জল রৌদ্রে শুকাইয়া যে লবণ তৈয়ারী হয় উহা প্রায় অর্দ্ধেক। লবণ সরকারী সম্পত্তি বলিয়া সমুদ্রের ধারেও সরকারী লোক ছাড়া কেহই লবণ তৈয়ারী করিতে পারে না।

সামুদ্র লবণ।

মণিমাণিক্যের জন্ত ভারতবর্ষের নাম এককালে পৃথিবীতে সুপরিচিত ছিল; কিন্তু বর্ত্তমানে তাহার সে স্থান আর নাই। প্রাচীন হিন্দুগ্রন্থের ভারতের ঐশ্বর্য্যের কথা, পর্য্যটক-দের বিবরণে ভারতের গৌরবের কথা, এখন স্বপ্নের ন্যায় মিথ্যা বলিয়া মনে হয়। হীরক দক্ষিণ-ভারতে তিন স্থানে পাওয়া যায়, ১ম মাদ্রাসের কুড্ডাপা, অনন্তপুর, কুরনুল, গণ্টুর, কৃষ্ণ ও গোদাবরী জেলা, ২য়—মহানদীর অপ্-বাহিকা প্রদেশ সম্বলপুর ও চান্দ জিলা; ৩য়—মধ্য-ভারতের পান্না রাজ্য।

মণি-মাণিক্য।

ভারতে যে সব বিখ্যাত হীরক পাওয়া গিয়াছে তাহাদের কয়েকটির নাম ও ওজন প্রদত্ত হইল। কোহিনূর ১৮৬ কারেট, গ্রেট্ মোগল—২৮০ কারেট্, অরলফ্—১৯৩ কারেট্, পিট্ ৪১০ কারেট, (১ কারেট=৩½ গ্রেণ; ১ গ্রেণ প্রায় ৪ মাষা) পিট্ হীরকের দাম অনুমান ৫ কোটি টাকা।

প্রসিদ্ধ হীরক।

পদ্মরাগ মণি, নীলকান্ত, গোমেদ মণি ও অন্যান্য শ্রেণীর মণি ব্রহ্মদেশ, কাশ্মীর, ছোটনাগপুর, রাজপুতানা প্রভৃতি নানা স্থানে পাওয়া যায়।

৭। বাণিজ্য।

অতি প্রাচীনকালে ভারতবর্ষ বাণিজ্যে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছিল। প্রত্যেক গ্রামেই দুই একজন ব্যবসায়ী থাকিত; তাহারা একধারে মহাজনের তেজারতী কাজ ও ব্যবসায়ীর কেনাবেচা করিত। কয়েক খানি গ্রামের মাঝে একটি হাট থাকিত; সেই হাটে হাটবারে বেচা কেনা চলিত—অধিকাংশ কারবার বিনিময়ে চলিত। উদ্বৃত্ত মাল বাহিরের ব্যবসায়ী ও ফিরিওয়ালারা সংগ্রহ করিয়া লইয়া যাইত। কিন্তু পথ ঘাট ভাল ছিল না বলিয়া এক গ্রামের জিনিষ সহজে অন্য গ্রামে বা সহরে লওয়া সুকঠিন ছিল। য়ুরোপে অষ্টাদশ শতাব্দীতে অনেক দেশে নৌতার্য্য খাল খনন করা হয়—সেইজন্য আভ্যন্তর-বাণিজ্য যথেষ্ট উন্নতি লাভ করে। আমাদের দেশের প্রধান পথ নদী; নদীর ধারে 'গঞ্জে' জিনিষ পত্র গো-শকটে আসিত।

প্রাচীনকালের বাণিজ্য।

প্রাচীনকালের দ্রব্য বিনিময়ের আর একটি স্থান ছিল তীর্থস্থানের কেন্দ্রগুলি। ভারতবর্ষে অসংখ্য তীর্থস্থান আছে—ইহার কতকগুলি খুবই নগণ্য ও গ্রাম্য – তথাচ সর্বত্রই বছরে একবার করিয়া মেলা হয়। এ ছাড়া হরিহরছত্রের মেলা বহুকাল হইতে দ্রব্য কেনাবেচার জন্য বিখ্যাত। বড় বড় সহর ও রাজধানীগুলি বাণিজ্যের ও শিল্পের কেন্দ্র ছিল।

বাণিজ্যের কেন্দ্র।

এই সকল ব্যবসায় বাণিজ্য কতকগুলি বিশেষ জাতের লোকের হাতে গিয়া পড়িয়াছে। রাজপুতনার মাড়োবারীরা ভারতের সর্বত্র ছাইয়া ফেলিয়াছে, মাদ্রাজের চেটিয়া, বম্বের পার্সী ও ভাটিরায় উক্ত প্রদেশগুলির একচেটিয়া ব্যবসায়ী। মুসলমানদের মধ্যেও ক্রমে এক এক

স্থানের লোকেরা বাণিজ্য বুদ্ধিতে খ্যাতি লাভ করিয়াছে; ইহাদের মধ্যে বম্বের ও গুজরাটের বেড়া ও খোজারা নামজাদা ব্যবসায়ী, দিল্লীর মুসলমানেরাও উত্তর ভারতে বিখ্যাত।

প্রায় তিন হাজার বৎসর ভারতবর্ষীয় হিন্দু বণিকেরা পূর্বগোলার্দ্ধে ব্যবসায় বাণিজ্য চালাইয়াছিল। পেগু, কাম্বোড়িয়া, যবদ্বীপ, বালি, লম্বক, সুমাত্রা, বোর্ণিও, জাপান, সিংহলে ভারতীয় উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল। দক্ষিণ চীন, মলয়, আরব, পারস্য, আফ্রিকার পূর্ব উপকূলে ও প্রাচীন জগতের বাণিজ্যের মহাকেন্দ্র আলেকজেণ্ড্রিয়াতে হিন্দুদের যাতায়াত ছিল।

প্রাচীনকালে হিন্দুদের উপনিবেশ।

মধ্যযুগের ভারতীয় মুসলমানগণ বহির্বাণিজ্য বিমুখ ছিলেন; সুতরাং আরবী মুসলমানগণ য়ুরোপ ও এশিয়ার মধ্যস্থলে থাকিয়া বাণিজ্যের মধ্যবর্ত্তীত্ব করিয়া বিপুল অর্থ লাভ করিত। পূর্ব দ্বীপপুঞ্জ ও ভারত হইতে সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া তাহারা মিশরের মধ্য দিয়া বা মেসোপটেমিয়া ও তুর্কীর ভিতর দিয়া ভূমধ্যসাগরের কূলে গিয়া উপস্থিত হইত; সেখানকার বন্দরসমূহ হইতে ভেনিসের বণিকেরা পূর্বদেশের জিনিষপত্র ক্রয় করিয়া য়ুরোপময় প্রেরণ করিত। পঞ্চদশ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগ পর্য্যন্ত ভারতের বাণিজ্য ইতিহাস এইরূপই চলিয়াছিল।

মধ্যযুগের বাণিজ্য।

ইতিমধ্যে আফ্রিকা বেষ্টন করিয়া পর্টুগীজেরা সমুদ্রপথে ভারতে প্রবেশ করিয়া আরবদের হাত হইতে বহির্বাণিজ্য কাড়িয়া লইল।

হিন্দু ও মুসলমান রাজগণ ভারতের বহির্বাণিজ্যের প্রতি তেমন মনোযোগ কখনো দেন নাই। হিন্দুরাজগণ মন্দিরনির্মাণে, বৌদ্ধ নৃপতিগণ স্তূপগঠনে, মহারাষ্ট্রগণ দুর্গনির্মাণে, মুসলমান বাদসাহগণ প্রাসাদ ও কবরগঠনে তাঁহাদের অর্থ সামর্থ প্রয়োগ করিয়াছিলেন।

বর্ত্তমানের বাণিজ্য।

য়ুরোপীয় বণিকগণই প্রথম বাণিজ্য-নগরী বা ফ্যাক্টরী স্থাপন করেন। বর্ত্তমান সভ্যতার কেন্দ্র এই বাণিজ্য-নগরী। গত চারিশত বৎসর ভারতের শিল্প ও বাণিজ্যকে গ্রাম হইতে সহরে বা কুটীর হইতে ফাক্টরীতে বা বহুজনের হাত হইতে কয়েক জনের মুষ্টির মধ্যে আনিবার চেষ্টা চলিতেছে। বর্ত্তমান সভ্যতার গতি সেইদিকে।

পর্টুগীজ বণিকেরা অমানুষিক অত্যাচার করিয়া ভারতের বাণিজ্য হস্তগত করে। আফ্রিকার দক্ষিণতম অন্তরীপ হইতে চীনের পূর্ব সীমান্ত পর্য্যন্ত সমগ্র উপকূলে তাহাদের ফাক্টরী স্থাপিত হইয়াছিল।

প্রাকৃতিক কারণের জন্য মধ্যযুগে ভারতবর্ষের মধ্যে বাংলাদেশই বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র ছিল; ইহার অসংখ্য নদনদী বাহিয়া উত্তর ভারতের বাণিজ্য চলিত। চাটিগাঁ, সাতগাঁ মুসলমান যুগের প্রধান বন্দর ছিল। ক্রমে নদীর জল শুকাইতে আরম্ভ করিলে সাতগাঁ বন্দরে বড় জাহাজ চলা অসম্ভব হইয়া উঠে ও গঙ্গার জলরাশি বর্ত্তমান ভাগীরথী দিয়া প্রবাহিত হইতে থাকিলে পর্টুগীজরা হুগলীতে তাহাদের বাণিজ্যের কেন্দ্র স্থাপন করে। তাহাদের বন্দর সমূহকে বাণ্ডেল বলিত।

পর্টুগীজদের দেখাদেখি ওলন্দাজ, দিনেমার, ফরাসী, ইংরাজ সকলেই বাণিজ্য বিস্তারের আশায় এ দেশে আসিতে লাগিল। এই বাণিজ্যজয় লইয়া বিবাদ ক্রমে দেশজয়ে পরিণত হইল; সেসব যুদ্ধ ও রক্তপাত ইতিহাসের অন্তর্গত, সুতরাং এখানে অপ্রাসঙ্গিক।

১৬০০ সালে ইংরাজদের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী গঠিত হয়। তখন এই কোম্পানীর মূলধন ছিল মাত্র সাতলক্ষ টাকা ও অংশীদার ছিল ১২৫ জন। বৎসরে পাঁচ ছয় খানি জাহাজ (ইহার মধ্যে ছয়শ টনী জাহাজ দুই একখানি মাত্র থাকিত) তিন মাস সমুদ্র ঘুরিয়া ভারতে আসিত। তখনকার বাণিজ্যের অসংখ্য বাধা-ছিল; পথঘাট সম্পূর্ণ অপরিচিত,—য়ুরোপের দেশে দেশে লড়াই

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী

—সমুদ্রে বোম্বেটের উৎপাত; তা ছাড়া ঝড়ের ভয়, ব্যাধির আক্রমণ। এত বাধাবিপত্তি সত্বেও ৭৫ বৎসর পরে এই কোম্পানীর বাণিজ্য প্রায় ১৩ লক্ষ পাউণ্ডে দাঁড়ায়। সপ্তদশ শতাব্দী শেষ হইবার পূর্ব্বে কোম্পানীর অংশীদারগণ শতকরা প্রায় ১৫০ হারে লাভ পাইয়াছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগ হইতে কোম্পানীর আয়তন বাড়িতে লাগিল। এই শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় হইতে কোম্পানী ভারতের রাজনৈতিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে সুরু করেন এবং ১৮১৩ সাল পর্য্যন্ত শাসন ও বাণিজ্য একাধারে চালাইলেন। এই বৎসরে কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্য উঠাইয়া দেওয়া হয়—তখন নিজ কোম্পানীর মূল ধন হইয়াছিল ২৫ লক্ষ পাউণ্ড। এ ছাড়া বেসরকারী ইংরাজ বণিকদের মূলধন নিতান্ত অল্প খাটিত না।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে কোম্পানীর বাণিজ্য বিংশশতাব্দীর প্রথমভাগের তুলনায় নিতান্ত সামান্য ছিল। য়ুরোপীয় বণিকেরা তখনো তেমন করিয়া ভারতের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে নাই; উপকূল হইতে অধিক দূর পর্য্যন্ত যাওয়া সে যুগে দুঃসাধ্য ছিল; পথঘাট সাধারণতঃ দুর্গম ছিল এবং এমন কি সুগম হইলেও সেখান হইতে অধিক পরিমাণে দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া আনা এবং বিলাতে চালান দিয়া দাম পোষানো কঠিন ছিল।

কোম্পানীর রাজত্বের প্রথম ভাগে ভারতবর্ষ হইতে শিল্পজাত সামগ্রী বিলাতে চালান যাইত। ইহাতে এ দেশীয় কারিগরগণ লাভবান হইত।

ভারতীয় ও বিলাতী বাণিজ্যের প্রতিযোগীতা

কিন্তু ইংলণ্ডের মধ্যে শিল্পোন্নতি আরম্ভ হইলে এ দেশের স্বার্থের সহিত সেদেশের স্বার্থের বিরোধ বাঁধিল। এখানকার শিল্পজাত সামগ্রী—যেমন রেশমের ও সুতার কাপড় চোপড় ও চিনি—ইংলণ্ডে রপ্তানী হইত। কিন্তু ইতিমধ্যে ইংলণ্ডে নূতন নূতন কল ও ষ্টীমশক্তি আবিস্কৃত হওয়ায় প্রচুর পরিমাণে জিনিষ উৎপন্ন হইতে থাকিল। সেই সব জিনিষ ভারতে ও

অন্যান্য দেশে চালান না দিলে লাভ করা অসম্ভব। সেইজন্য বহু আইন পাশ করিয়া ভারতের শিল্পজাত সামগ্রী য়ুরোপের বাজার হইতে ধীরে ধীরে অপসৃত করা হয়। ইংলণ্ডের সহিত ভারতের বস্ত্র ব্যবসায় লইয়া যে প্রতিদ্বন্দীতা চলিয়ছিল তাহার ইতিহাস যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইয়াছে। (শিল্প দেখ 'তুলা') সেই দ্বন্দের সময়ে বিলাতের কলওয়ালাদের রক্ষা করিবার জন্য যেসকল আইন পাশ করা হইয়াছিল, তাহার জন্য সে যুগের ও পরবর্ত্তীযুগের অনেক ভদ্র ইংরাজ লজ্জিত ও অনেকে ক্ষুব্ধ হইয়া তাঁহাদের মতামত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। এমন কি কোম্পানীর জনৈক পরিচালক এসব ব্যাপারে তাঁহার তীব্র মত লিখিয়া গিয়াছেন। *

১৮৪৬ সালে ভারতে অবাধ বাণিজ্যনীতি প্রবর্ত্তিত হয় এবং ইহারই বৎসর দশ পরে কোম্পানীর হাত হইতে ভারতের শাসনভার পার্লামেণ্টের উপর পড়ে। এতদিন এক দল বণিক রাজার নামে ভারত শাসন করিত এখন স্বয়ং রাজা সে ভার লইলেন।

ভারতের বাণিজ্য বিস্তার আরম্ভ হয় রেলপথ নির্ম্মাণের সঙ্গে। ১৮৪৬ সালে রেলপথ আরম্ভ হয়। সিপাহী-বিদ্রোহের পূর্ব্বে আট বৎসরের মধ্যে ২৭০ মাইল রেল নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই সামান্য রেলপথের সাহায্যেই বাণিজ্য খুব বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তুলার রপ্তানী তিন গুণের বেশী হইয়াছিল। আমদানী সামগ্রীর মূল্য আট বৎসরেই প্রায় ১½ কোটি পাউণ্ড হইতে ২½ কোটী পাউণ্ড দাঁড়ায়। এই কয় বৎসরেই রেলপথ যুগান্তর আনিয়াছিল। যতই রেলপথ বাড়িতে লাগিল ততই দেশের কাঁচামাল সহজে ও সুলভে বন্দরে আনীত হইতে লাগিল ও বিদেশের সস্তামাল দেশময় সহজে বিস্তৃত হইতে লাগিল।

রেলপথ ও বাণিজ্য-বিস্তার

* Henry St. George Tucker—Memorials of Indian Government.

সিপাহী-বিদ্রোহের পর ইংরাজ সরকার বুঝিলেন. কেবলমাত্র রণনীতি ও রাজ্যরক্ষার দিক হইতেই রেলপথ নির্ম্মাণ আশু প্রয়োজন। সেই জন্য ভারত-সাম্রাজ্য পুনরায় সুস্থির হইলে রেলপথ দ্রুত নির্ম্মিত হইতে লাগিল কিন্তু এই দ্রুত রেলপথ বিস্তারের আর্থিক ফল ভাল হইল না। প্রথমতঃ ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত দেশীয় শিল্পী ও কারিকরগণ আমদানী বিদেশীমালের সহিত বাজারে প্রতিযোগীতায় পারিয়া উঠিল না। অকস্মাৎ বাজার বিলাতীমালে বোঝাই হইয়া গেল। একজন সাহেব লেখক লিখিয়াছিলেন যদি এই রেলপথ বিস্তার ধীরে ধীরে হইত —তবে হয় ত দেশীয় শিল্পীকারিকরগণ বিদেশী বণিকদের এই সহসা আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিত এবং য়ুরোপে যেমন ধীরে ধীরে লোকে নানা কাজের মধ্যে প্রবেশ করিয়া জীবনযাত্রার সঙ্কট হইতে উদ্ধার পাইয়াছিল এখানেও তাহা সম্ভব হইত। এতদিন ভারতে কৃষি ও শিল্পের মধ্যে যে সামঞ্জস্য ছিল তাহা ধ্বংস হইল। শিল্পীর শিল্প ধ্বংস হওয়াতে তাহার একমাত্র গতি থাকিল কৃষি অবলম্বন; যাহারা জমি পাইল না তাহারা শ্রমজীবি হইল।

বাণিজ্য-বিস্তারের দ্বিতীয় উপায় হইতেছে জলপথ। ভারতবর্ষের জাহাজ এককালে সমুদ্রপথে যাওয়াআসা করিত—যখন তাহার নিজের বাণিজ্য নিজের হাতে ছিল। ভারতবর্ষের জাহাজ ও এখানকার লস্করদের অধঃপতনের ইতিহাস বড়ই শোকাবহ। সংক্ষেপে ভারতীয় সমুদ্র পথের ইতিহাস এখানে বিবৃত করিলে অবান্তর হইবে না। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আসিবার পূর্ব্বে ভারতের বাণিজ্য দেশীয়দের হাতে ছিল এবং সমুদ্রগামী জাহাজ সমূহ এদেশেই প্রস্তুত হইত। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রথমে সুরাটে ও পরে বম্বেতে ডক্ খোলেন। এই ডকের কর্ত্তা ছিল পার্সীরা। একশত বৎসর ধরিয়া তাহারা এমন সুচারুরূপে কাজ চালাইয়াছিল যে

জলপথ ও বাণিজ্য বিস্তার।

ইংলণ্ডেও সকলে তাহাদের প্রশংসা করিতেন। এই সব দেশী জাহাজের গঠনপ্রণালী ও বিশেষত্বসমূহ ইংরাজ জাহাজনির্মাতারা পরে গ্রহণ করেন। তখনকার ভারতীয় নৌবাহিনী বম্বেতে থাকিত। এই সব জাহাজ দেশেই প্রস্তুত হইত। দেশী জাহাজের উপাদান ছিল, সেগুণ শাল ও শিশু কাঠ। এই সব কাঠ বিলাতের ওকের চেয়ে ভাল বলিয়া সকলে বলিতেন। বিলাতী জাহাজ বার বছর অন্তর বদলাইতে হইত, ভারতীয় জাহাজ পঞ্চাশ বছরেও কিছু হইত না। অনেক সময়ে ৭।৮ বার এদেশ হইতে বিলাত যাওয়াআসার পরেও কোম্পানী রণবিভাগের জন্য দেশীজাহাজ ক্রয় করিতেন। বম্বের জাহাজ তৈয়ারী করিতে প্রায় সিকি খরচ কম পড়িত, আর বিলাতী জাহাজ বার বছর অন্তর বদলাইতে হইত বলিয়া খরচ হিসাব মত চতুর্গুণ পড়িত। বাংলাদেশে ঢাকা, সিলেট ও কলিকাতা জাহাজ নির্মাণের কেন্দ্র ছিল। কলিকাতার বন্দরে ১৭৮১ হইতে ১৮০০ সাল পর্য্যন্ত ৩৫ খানি জাহাজ নির্মিত হইয়াছিল। ১৮০১ সালে ১৯ খানি, ১৮১৩ সালে ২১ খানি জাহাজ তৈয়ারী হয়। ১৮০১ হইতে ১৮২১ সাল পর্য্যন্ত হুগলী নদীতে ২৩৭ খানি জাহাজ নির্মিত হয়; ইহার ব্যয় প্রায় দুই কোটি টাকা পড়ে এবং ইহার অধিকাংশই দেশী লোকের হাতে নানা উপায়ে আসিয়া পড়িয়াছিল। এ ছাড়া উপকূলে বাণিজ্য নিতান্ত অল্প ছিল না; সেসব দেশী নৌকা বা জাহাজে চলিত। বাংলাদেশের 'দোনী' নৌকা সমুদ্রে চলাফেরা করিত—মাদ্রাস হইতে লবণ আনা ছিল ইহার প্রধান কাজ; প্রতিমণ লবণে তাহারা ৫৫৲ টাকা করিয়া পাইত।

দেশীয় জাহাজের ইতিহাস।

উনবিংশ শতাব্দীর গোড়া হইতে বিলাতে ভারতীয় জাহাজে, ভারতীয় সামগ্রী, ভারতীয় লস্করদের দ্বারা চালিত হইয়া যাইত বলিয়া কথা উঠিল। ভারতীয় লস্করদের বিলাতে যাওয়া বন্ধ করিবার জন্য বিধিমত চেষ্টা সুরু হইল। এদিকে ১৮৪০ সাল হইতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এদেশে

জাহাজ নির্ম্মাণ করা একপ্রকার কমাইয়া ছিল। ভারত-সাম্রাজ্য পার্লামেন্টের হাতে যাইবার ৫ বৎসর পরেই ১৮৬৩ সালে ভারতের বন্দরে জাহাজ তৈয়ারী একেবারে বন্ধ হইয়া গেল।

এই শিল্প উঠিয়া যাওয়াতে ভারতের যে কি ক্ষতি হইয়াছে তাহা সহজে বুঝা যায় না। ১৮৭০ সালে সুয়েজ খাল কাটা হইলে য়ুরোপ হইতে ভারতে আসিবার পথ, সময় ও ব্যয় সবই কমিয়া যায়। এই সময় হইতে ভারতের বহির্বাণিজ্য আরও বাড়িতে লাগিল। ১৮৭১ সালে সর্বপ্রথম এদেশ হইতে খাদ্যশস্য রপ্তানী হয়। প্রতি বৎসরই আমাদের আমদানী রপ্তানীর পরিমাণ ও মূল্য বাড়িয়া চলিয়াছে। ইহার জন্য বিদেশী জাহাজ কোম্পানীদের হাতে বছরে প্রায় ত্রিশ কোটি টাকা আমরা দিয়া থাকি। ইংরাজ, ফরাশী, জার্ম্মান, ওলন্দাজ, ইতালীয়, মার্কিন, জাপানী প্রভৃতি পৃথিবীর সকল দেশের জাহাজ ভারতের বন্দর হইতে যায়—কেবল যায় না ভারতের জাহাজ ভারতের বন্দর হইতে। পৃথিবীর সমস্ত জাতির সহিত আমাদের বাণিজ্য সম্বন্ধ একদিকে য়ুরোপ, আফ্রিকা, অপরদিকে আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া। ভৌগলিক দিক হইতে ভারত এমন সুন্দর স্থানে অবস্থিত যে এখান হইতে পূর্ব পশ্চিমের বাণিজ্য সহজে নিয়ন্ত্রিত করা যায়।

জাহাজের অভাবে ভারতের লোকসান।

এদেশের বহির্বাণিজ্যই যে কেবল বিদেশী জাহাজে চলিতেছে তাহা নহে। অন্যান্য সব দেশেই উপকূলের বাণিজ্যে যাহাতে বাহিরের প্রতিযোগীতা না থাকে সে বিষয়ে সরকার প্রায় দৃষ্টি দিয়া থাকেন। আমাদের দেশে অবাধ-বাণিজ্য নীতি অনুসরণের ফলে এখানে শতকরা ৮৫% ভাগ বাণিজ্য বিদেশী জাহাজে চলে। এমনকি ভারতের নদী পথে যেসব ষ্টীমার কোম্পানী আছে তাহাও বিদেশী মূলধনে চলিতেছে। তাহাদের আয় প্রায় ২০ লক্ষ টাকা। ভারত হইতে প্রতি বৎসর ২০।২৫ হাজার

মুসলমান মক্কাতে হজ্‌ করিতে যায়—ইহাদের জাহাজ ভাড়া বিদেশেই যায়। আমাদের দেশে যেসব ইংরাজ সৈন্য থাকে, তাহাদের প্রায় ২৫ হাজার গড়ে ভারত হইতে প্রতি বৎসর আসে যায়—ইহাদের ভাড়া ৫৫ লক্ষ টাকা ভারতবাসীরা পায় না। ভারতের ডাক বিদেশী জাহাজ-কোম্পানী বহন করিয়া বছরে ৮।১০ লাখ টাকা পায়। ভারতের সমুদ্র-পথে যে বাণিজ্য চলে তাহার শতকরা একভাগও দেশী জাহাজের ভাগে পড়ে না। আজকাল আমাদের জাহাজ বলিতে খানকয়েক নৌকা বুঝায়। ৮০ টনের কম ১৩০ খানি ও ২০ টনের ৭২৮০ জাহাজ যুদ্ধের পূর্বে আমাদের সম্বল ছিল। ভারতবর্ষ একটা মহাদেশ ; ইহার সমুদ্র উপকূল ৪,০০০ মাইলের উপর ; অথচ জাহাজ নামের উপযুক্ত জাহাজ এক-খানিও এদেশে হয় না বা এদেশের লোকের নাই। আমাদের যে কেবল অর্থের ক্ষতি হইতেছে তাহা নহে ; এই নৌবাহিনী গঠনের শিল্প দেশের লোক ভুলিয়াছে এবং করিবার পারিশ্রমিক হইতে বঞ্চিত হইতেছে।

যুদ্ধের পূর্বে বাণিজ্যের জাহাজ

ভারতবর্ষের বন্দরে যুদ্ধের পূর্বে প্রতি বৎসর ৮।১০ হাজার জাহাজ আসিত ; ইহার মধ্যে শতকরা ৭৫ খানি ছিল ইংরাজদের। পূর্ব্বদিকে জার্ম্মাণী ক্রমেই বাণিজ্য বিস্তারলাভ করিতেছিল ; সুয়েজ খাল দিয়া ইংরাজদের পরেই জার্ম্মাণ জাহাজ সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে যাতায়াত করিত। ১৯১৩-১৪ সালে ৫৫৯ খানি জার্ম্মাণ জাহাজ সুয়েজ দিয়া গিয়াছিল।

যুদ্ধের সময়ে দেখা গেল ভারতবর্ষ কি দরিদ্র ! যুদ্ধের জন্য ভারত-সাগর হইতে বড় বড় জাহাজগুলি য়ুরোপে লইয়া যাওয়া হয়—এমন কি মেসোপটেমিয়ার জন্য নদীর ষ্টীমারও প্রেরিত হয়। ফলে জাহাজের অভাবে মাল বন্দরে নষ্ট হইতে লাগিল ; এক বৎসর পাটের দর কমিয়া কৃষকদের সর্বনাশ করিল, বিলাত হইতেও অনেক সামগ্রীই জাহাজের অভাবে এখানে

আসিতে পারিতেছিল না। ইতিমধ্যে জাপান আসিয়া এই বহনের কার্য্য গ্রহণ করিল। যুদ্ধের পূর্বে ভারতে ১৩০ খানি জাপানী জাহাজ আসিয়াছিল; ১৯১৭ সালে সেই স্থানে ৪৭৭ খানি আসিল। এই উন্নতির কারণ জাপানী গভর্ণমেণ্ট কয়েক বৎসর পূর্বে জাহাজ কোম্পানী গুলিকে ২ কোটি টাকার উপর দানসাহায্য করিয়া তাহাদিগকে উৎসাহিত করেন।

আমাদের জাহাজ না থাকিবার আর একটি অসুবিধা হইতেছে যে বিদেশী কোম্পানীরা যে যেমন ভাড়া বলে তাহাই আমাদের মানিয়া লইতে হয়। ভারত হইতে যে সব কাঁচা মাল যায় তাহার ভাড়া এক প্রকার; তৈয়ারী সামগ্রী যেমন তেল প্রভৃতির ভাড়া আবার এমন বেশী যে এদেশ হইতে সেসব সামগ্রী বিদেশ চালান করিয়া লাভ করা দুঃসাধ্য। এইসব কারণে ভারতের নিজস্ব জাহাজ থাকার নিতান্ত প্রয়োজন। ভারত সরকার এখন বুঝিয়াছেন যে ভারতের শিল্প ও বাণিজ্য উন্নতি করিয়া ভারতকে কেবলমাত্র পৃথিবীর বাণিজ্য-সভার জলবাহক ও কাষ্ঠচ্ছেদকের কার্য্যে লিপ্ত রাখিলে তাঁহাদেরই লোকসান; ভারতের শিল্পোন্নতিতে তাঁহাদের উন্নতি একথা এই নিদারুণ যুদ্ধের শিক্ষা।

ভারতের বাণিজ্য প্রতি বৎসরই বাড়িয়া চলিয়াছে। যুদ্ধের পূর্বে এই বাণিজ্যের মূল্য ছিল ৩৭৫ কোটি; যুদ্ধান্তে ১৯১৭-১৮ সালে ৪১১ কোটি হইয়াছিল। সোণারূপার আমদানী ৩৯ কোটি স্থানে ৪৭ কোটী টাকা হইয়াছে। কিন্তু এই বাণিজ্যের মূল্য অন্যান্য দেশের তুলনায় নিতান্ত সামান্য। এক চীন ছাড়া পৃথিবীর এমন কোনো সুসভ্য জাতি নাই যাহার অধিবাসীর জনপ্রতি ভাগে এত অল্প টাকা পড়ে। নিম্নে কয়েকটি দেশের অধিবাসীদের মাথাপিছু বাণিজ্যের অংশ প্রদত্ত হইল।

মাথাপিছু বাণিজ্যের ভাগ

ইংল্যাণ্ড—৩৮৬৲, ফ্রান্স—২৩২৲, জারমেনী—২৩০৲,
মার্কিণ—১৩৬৲, ইতালী—১০৬৲, জাপান—৩৯৲
রুশিয়া—২৫৲ ভারতবর্ষ—১৩৵০, চীন—৫৷৹ টাকা।

যুদ্ধের পূর্বে ১৯১৩-১৪ সালে ১৮৩ কোটি টাকার সামগ্রী ও মুদ্রা আমদানী হইয়াছিল—দশ বৎসরে প্রায় ৪০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পায়। যুদ্ধের সময়ে সব বাণিজ্যই হ্রাস পায়—১৯১৫ সালে ১৩১ কোটিতে পরিণত হয়। আবার যুদ্ধের পর এই মূল্য বাড়িতে আরম্ভ করিয়াছে।

আমদানী সামগ্রী

বিদেশ হইতে আমদানী সামগ্রীর দীর্ঘ ও বিচিত্র তালিকা দেখিলে বেশ বোঝা যায় আমাদের দেশে এমন সব জিনিষ আসে, যাহা অনায়াসে এখানে তৈয়ারী করা যায়। কিন্তু নানা কারণে এত দিন এসব জিনিষ হইতে শিল্পদ্রব্য এখানে তৈয়ারী করা শিল্পীদের পোষাইত না। আমদানী সামগ্রীর মধ্যে কাপড়চোপড় সব চেয়ে বেশী; সুতা ও কাপড় ৬০ কোটি টাকার আমদানী হয়। এ ছাড়া লোহা, ইস্পাত, কলকজা, লবণ, মন্ড, চিনি, ঔষধাধি প্রভৃতি অনেক জিনিষ আসে।

রপ্তানীর সামগ্রী

যুদ্ধের পূর্বে রপ্তানীর মূল্য ছিল ২৪৪ কোটি টাকা। কাঁচা মালই ভারতের প্রধান রপ্তানীর বিষয়। ইহার মধ্যে খাদ্যশস্য সব চেয়ে বেশী পরিমাণে রপ্তানী হইত। তা ছাড়া য়ুরোপের শিল্পের জন্য এখান হইতে তুলা, পাট, নানা প্রকার তৈল-বীজ, চামড়া প্রায় অধিকাংশই প্রেরিত হইত। এই সব জিনিষের খুব বড় খরিদ্দার ছিল জারমেনী। ভারতের কাঁচামাল হইতে বহুবিধ সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া সেখানকার বণিকগণ খুব লাভবান হইয়াছিল। ভারতবর্ষের উৎপন্ন সামগ্রীর কত অংশ বিদেশে রপ্তানী হইত তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

চাউল—৯% গম—১৫% তুলা—৫৫% সরিষা—২৩% মসিনা—৭৭%

তিল—২৫% চিনি—৫% নীল—৩৯% চীনা বাদাম—৩৮% পাট—৫০%
যুদ্ধের প্রথম কয়দিন জাহাজের অভাবে খাদ্যশস্য বিদেশে রপ্তানী কমিয়া গিয়াছিল। কিন্তু মেসোপটেমিয়াতে যুদ্ধাভিযান আরম্ভ হওয়াতে সেখানে প্রচুর খাদ্যশস্য কয়েক বৎসর ধরিয়া চালান হইয়াছে।

১৯১৬-১৭ সালে যাবতীয় রপ্তানী আমদানীর ওজন অনুমান ৬ কোটি ৮০ লক্ষ টন ছিল। ইহার মূল্য ছিল ১,০১৪ কোটি টাকা। যুদ্ধের পূর্বে গড়ে ৬ কোটি টন্ মালের কারবার হইত ও ইহার মূল্য ৮১৯ কোটী টাকা ধরা হয়।

ভারতের আন্তর-বাণিজ্যও যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছে। কিন্তু সঠিক হিসাব পাওয়া যায় না; কারণ দেশের মধ্যে অনেক জিনিষ উৎপন্ন হয় যাহা নৌকা ও গোশকটে করিয়া স্থানান্তরিত করা হয়। রেলের আয় দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে; আরোহীর সংখ্যা ও মালের ওজন সবই বাড়িয়া চলিতেছে। প্রতি বৎসর অনুমান ১০০০ কোটি টাকার কারবার দেশের মধ্যে চলিতেছে। যুদ্ধের পূর্ব হইতে প্রায় ১০০ কোটি টাকা বাড়িয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

আন্তর-বাণিজ্য

বহির্বাণিজ্য ও আন্তর-বাণিজ্য ব্যতীত সীমান্তস্থিত দেশগুলির সহিত ভারতের বাণিজ্য চলে। এই সীমান্ত প্রদেশ প্রায় ৬,৮০০ মাইল বিস্তৃত। তিব্বত, ভুটান, নেপাল,আফগানিস্থান প্রভৃতি দেশের সহিত এই কারবার চলে। যুদ্ধের পূর্বে প্রায় ২২ কোটি টাকার কারবার ছিল—যুদ্ধান্তে আর ৬ কোটি টাকা বাড়িয়াছে। ইতিপূর্বে এত টাকার বাণিজ্য সীমান্ত-প্রদেশের সহিত কখনো হয় নাই।

সীমান্ত-বাণিজ্য

উপকূলে বাণিজ্যের মধ্যে ভারত হইতে বর্ম্মার বাণিজ্যই প্রধান। বর্ম্মা হইতে কেরোসিন তেল, চাল, ও সেগুন কাঠ প্রধানতঃ আমদানী হয়। এছাড়া বন্দর হইতে বন্দরে মাল চালাচালি চলে। এই বাণিজ্য যুদ্ধের পূর্বে প্রায় ৬৫ কোটি টাকার ছিল।

উপকূল-বাণিজ্য

যুদ্ধের পূর্বে ১৯১৩-১৪ সাল পর্য্যন্ত দশ বৎসরে ভারতে ২১৯ কোটি টাকার সোণা আমদানী হইয়াছিল। এই সংখ্যাটি দেখিলে হঠাৎ অনেক মনে হইতে পারে। কিন্তু ৩১ কোটি লোকের পক্ষে দশ বৎসরে ২১৯ কোটি টাকা পাওয়া খুব বেশী নয়। যুদ্ধের পূর্বে পঞ্চাশ বৎসরে ভারতের সমগ্র বাণিজ্য ১২৭ কোটি টাকার স্থানে ৪৪০ কোটির কিছু অধিক হইয়াছিল। আমদানী ৪৪ কোটি স্থানে ১৯০ কোটি ও রপ্তানী ৮১ কোটি ২৫০ কোটি দাঁড়াইয়াছে।

ভারতবর্ষ এখন আপনার মধ্যে আপনি আবদ্ধ নহে। ইংরাজদের আগমনের ফলে ভারতবর্ষ সমগ্র পৃথিবীর সহিত যোগযুক্ত হইয়াছে। য়ুরোপ, এশিয়া, আমেরিকা, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়ার সঙ্গে আমাদের লেনাদেনা চলিতেছে—যদিও প্রধান কারবার বিলাতের সঙ্গেই। যুদ্ধের পূর্বে ভারতের সমগ্র আমদানী রপ্তানীর শতকরা অর্দ্ধেকের উপর গ্রেট বিটেন (৪১%) ও তাহার উপনিবেশাদির (১১%) সহিত চলিত। অবশিষ্টাংশ (৪৮%) পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সহিত ছিল।

দেশহিসাবে বাণিজ্য

মহাদেশ হিসাবে য়ুরোপ আমাদের সব চেয়ে বড় খরিদ্দার ও দোকানদার; যুদ্ধের পূর্বে আমদানী সামগ্রীর প্রায় ৮০ ভাগ য়ুরোপ হইতে আসিত। অবশিষ্ট ২০ভাগ অন্যান্য মহাদেশ প্রেরণ করিত। কিন্তু রপ্তানীর দিক দিয়া দেখিলে দেখা যায় য়ুরোপ ব্যতীত অন্যান্য মহাদেশের সহিত ভারতের যোগ যথেষ্ট। য়ুরোপ এখান হইতে রপ্তানীসামগ্রীর ৫৭ ভাগ, এশিয়া ২৬, আমেরিকা ১২, আফ্রিকা ৩, ও অষ্ট্রেলিয়া ২ ভাগ গ্রহণ করিত। যুদ্ধের পূর্ব্বে জার্ম্মানীর সহিত ভারতের বাণিজ্য ক্রমেই ঘনিষ্ঠতর হইয়া উঠিতেছিল। যুদ্ধারম্ভে জার্ম্মানী ও তাহার মিত্রদের সহিত কারবার বন্ধ হইয়া যায়। জার্ম্মানীর বন্ধুদের মধ্যে অষ্ট্রীয়া-হাঙ্গেরী কাঁচামালের খুব বড় খরিদ্দার ও চিনি প্রভৃতির বড় রকমের আড়তদার

ছিল। তাহাদের সহিত বাণিজ্য বন্ধ হওয়াতে ইংলণ্ড ফ্রান্স ইতালী মার্কিণ প্রভৃতি দেশের খুব সুবিধা হইয়াছিল। শত্রুদের হাতে সমগ্র বাণিজ্যের নয়ভাগের একভাগ ছিল ; এই বাণিজ্য ইহারা ভাগ করিয়া লইল।

যুদ্ধের পর দেখা যাইতেছে ভারতের বৃটীশ-আমদানী কমিয়াছে। যুদ্ধের সময়ে মাঝে মাঝে জাহাজের অভাবে বিলাত হইতে মাল আসা বন্ধ হইয়া যাইত। বৃটীশ-আমদানী কমিয়াছে বলিয়া আমাদের শিল্পের বা বাণিজ্যের তেমন কিছু লাভ হয় নাই। অবশ্য যুদ্ধের সময়ে অনেক লোক ছোট খাটো কন্‌ট্রাক্‌টারী করিয়া, কাপড়ের ব্যবসা করিয়া খুব লাভবান হইয়াছে ; কিন্তু আসলে লাভবান্ হইয়াছে জাপান। সে এখানকার কাঁচামাল সস্তায় ক্রয় করিয়া শত প্রকারের মনোহারী সামগ্রী বানাইয়া এ দেশে চালান দিতেছে। জাপান হইতে এখন সকল প্রকার শিল্পজাত সামগ্রী আমদানী হইতেছে—বাজার জাপানী সামগ্রীতে বোঝাই হইয়া গিয়াছে। কাপড়চোপড়, সুতা, রেশমের সামগ্রী, রুমাল, গেঞ্জি, মোজা, তোয়ালে, বোতাম, চীনের বাসন, ছাতা, খেলনা, ঘড়ি, কলকব্জা, কাঁচের জিনিষ, দিয়শালাই, ঔষধ পত্র প্রভৃতি শত প্রকারের জিনিষ এখন জাপান পাঠাইতেছে। ঔষধপত্র জাপান হইতে শতকরা ৮১% ভাগ আসিয়াছিল। জাপানী সামগ্রী এ দেশে ১৯১৫ সালে ৪ কোটি ২২ লক্ষ য়েন (yen-১৷৷০ টাকা) স্থলে ১৯১৬ সালে ৭ কোটি ১৬ লক্ষ য়েন হয়। এদেশ হইতে রপ্তানীর মূল্য এক বৎসরে ১৪ কোটি ৭৫ লক্ষ হইতে ১৭ কোটি ৯৪ লক্ষ দাঁড়ায়। যুদ্ধারম্ভের পাঁচ বৎসরের মধ্যে জাপানী মালের আমদানী প্রায় চতুর্গুণ হইয়াছে (শতকরা ৫০০%) এবং এখানকার রপ্তানী দ্বিগুণের অধিক দাঁড়াইয়াছে (১০০%)। যুদ্ধের ৫ বৎসরে জাপান ভারতের সহিত বাণিজ্য করিয়া ১৭ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা লাভ করিয়াছে। মার্কিনের সহিত ভারতের বাণিজ্য যুদ্ধের সময়ে প্রায় দ্বিগুণ হইয়াছে।

জাপানের উন্নতি

ইংলণ্ড এক মাত্র অবাধ বাণিজ্য-নীতির পক্ষপাতী, তাছাড়া য়ুরোপীয় আর সকল দেশ, আমেরিকার যুক্তরাজ্য ও এমনকি বৃটিশ উপনিবেশ গুলিও অবাধনীতির বিরোধী। ইংলণ্ডে বিদেশীয় শিল্পজাত সামগ্রী বিনা শুল্কে বিক্রয় হয়। কিন্তু তা' বলিয়া বৃটিশসামগ্রী কেহ নিজদেশে অবাধে প্রচলিত হইতে দেয় না। এক দল লোক বলেন ইংলণ্ডেও সংরক্ষণ-নীতি অবলম্বন করা হউক; কারণ ইংরাজবণিক যখন নিজ টাকা হইতে বিদেশী গভর্ণমেণ্টকে শুল্করূপে রাজস্ব দিতেছে, তখন যাহারা বিলাতে ব্যবসা করিতে আসিবে তাহারা শুল্করূপে কেন সেখানকার রাজকোষে টাকা দিবে না? কিন্তু কেবল ত জার্ম্মানী, আমেরিকাই বিদেশী জিনিষের উপর শুল্ক বসাইয়াছে, তা নয়— ইংরাজের কলোনী বা উপনিবেশগুলিও সংরক্ষণ-নীতি অবলম্বন করিয়াছে, সুতরাং বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে কতকগুলি বিশেষ সুবিধার ব্যবস্থা করিবার প্রস্তাব চলিতেছে। সমগ্র সাম্রাজ্য একটি ঐক্য অনুভব করিয়া পরস্পরের ক্ষতিবৃদ্ধির প্রতি দৃষ্টি দিবে একের অভাব অন্যে পুরন করিবে। ভারতবর্ষকে এই প্রস্তাবের মধ্যে টানিবার চেষ্টা হইতেছে। বাণিজ্য বিষয়ে এই প্রথা প্রচলিত হইলে ভারতের চা, কফি, চিনি, গম এবং সকল প্রকার কাঁচামাল বিনা শুল্কে ইংলণ্ডে ও বৃটিশ কলোনীসমূহে রপ্তানী হইতে পারিবে; এবং ভারতবর্ষে বিনা শুল্কে বৃটীশ শিল্পজাত সামগ্রী আমদানী হইবে।

বৃটীশ বাণিজ্যনীতি

ভারতীয় গভর্ণমেণ্ট ১৯০৩ সালে এই প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন যে (১) ইংলণ্ড কোনো কালে ভারতের শিল্পরক্ষা করিবার জন্য তাহার সংরক্ষণশীল শুল্ক বসাইতে দিবেন না। (২) বৃটিশ শিল্পজাত সামগ্রীর উপর হইতে শুল্ক উঠাইয়া দিলে রাজস্বের ভীষণ ক্ষতি হইবে। অন্যান্য বিদেশীদের উপর শুল্ক বসিলেও ভারতবর্ষের বিশেষ লাভ

ভারত-সরকারের আপত্তি

হইবার সম্ভাবনা কম; কারণ বৃটীশ-বাণিজ্য সমগ্র বাণিজ্যের শতকরা ৬০ ভাগ—আমদানীর প্রায় ৭০ ভাগ বৃটীশ ও বৃটীশ সাম্রাজ্য হইতে আসে। বিলাতী শিল্পজাত দ্রব্য বিনাশুল্কে আসিতে আরম্ভ করিলে অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে জাপান বা আমেরিকা প্রভৃতি প্রতিযোগী জাতির আমদানীবাণিজ্যের পালা শেষ হইবে। তাহারা শুল্ক দিয়া বাণিজ্য চালাইবে ও ইংরাজ, কানাডাবাসী, অষ্ট্রেলিয়াবাসী ও দক্ষিণআফ্রিকা-বাসী ইংরাজেরা বিনা শুল্কে বাণিজ্য করিবে, এমন অসুবিধাকর অবস্থায় পড়িয়া তাহারা কয়দিন টিকিবে? সুতরাং ব্যবসায় সম্পূর্ণরূপে বৃটীশ সাম্রাজ্যের লোকদের হাতে গিয়া পড়িবে। নূতন প্রস্তাব অনুসারে তাহা-দিগকে শুল্ক দিতে হইবে না বা নামমাত্র শুল্ক দিয়া অবাধবাণিজ্য চালা-ইতে পারিবে; ফলে অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে বাণিজ্য সম্পূর্ণরূপে ইহা-দের হস্তগত হইবে ও ভারতের রাজস্ব ১২।১৩ কোটি টাকা করিয়া কমিবে।

(৩) ভারতবর্ষ ঋণ-গ্রস্থ দেশ। ইংলণ্ডের নিকট তাহার কোটি কোটি টাকা ঋণ। সেই ধারের সুদ আমাদিগকে নিয়মিত ভাবে প্রতিবৎসর সোণায় গুণিয়া দিতে হয়। আমাদের উদ্বৃত্ত কাঁচামাল বিদেশে রপ্তানী করিয়া আমরা যে টাকা পাই তাহাই দিয়া দেনা ও সুদ দিয়া থাকি। বৃটিশ সাম্রাজ্যের সহিত যদি আমরা বিশেষ কোনো সুবিধাসর্ত্তে আবদ্ধ হই, তাহা হইলে বিদেশী বণিকেরা ভারতের রপ্তানীমাল না লইতে পারে, ফলে ভারতের রপ্তানীর উদ্বৃত্ত টাকা ঘরে আসিবে না এবং ঋণ শোধ করিতে না পারিয়া ভারতবর্ষ দেউলা হইবে।

যুদ্ধের পর বাণিজ্য-নীতির যথেষ্ট পরিবর্ত্তন হইবে; ভারতের ভাগ্যে কি পড়িবে তাহা বলা যায় না।

উপরের মীমাংসা হইতেছে বাহির হইতে বিদেশীর মীমাংসা; দেশের এক দল লোক ভারতের বাণিজ্য-উন্নতির জন্য যেপথ নির্দ্দেশ করেন তাহা

সংরক্ষণ-নীতি

রাজপুরুষ বা পার্লামেণ্ট বা ইংরাজ বণিকদের মনো-পুত নহে। সেই পথ হইতেছে সংরক্ষণ-নীতি। তাঁহারা বলেন প্রত্যেক দেশের বাণিজ্যের তিনটি অবস্থা আছে।

(১) দেশের কৃষিযুগে অবাধ বাণিজ্যনীতি প্রচলিত থাকা ভাল। সভ্য শিল্পীদের সংস্পর্শে আসিয়া তাহার চক্ষু খুলিয়া যায়। (২) দ্বিতীয় অবস্থায় প্রত্যেক জাতি নিজ নিজ শিশু বাণিজ্য বাহিরের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবে। ছোট চারাগাছের চারিদিকে যেমন বেড়া দিতে হয়, পাছে তার চারি পাশের বড় গাছ আওতা করিয়া তার প্রাণ শুকাইয়া মারে, তেমনি দেশের বাণিজ্যও প্রথম অবস্থায় বিদেশীর প্রতিযোগিতা হইতে রক্ষা করিতে হইবে; এ ক্ষেত্রেও সংরক্ষণনীতি অবলম্বন করিয়া শিল্পজাত সামগ্রীর উপর আমদানী-শুল্ক বসাইয়া বাহিরের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে হইবে। (৩) তৃতীয় অবস্থায় দেশ ধন ও বাণিজ্যের উচ্চ শিখরে উঠিলে পুনরায় অবাধ বাণিজ্যনীতি অবলম্বন করিবে। এই অবস্থায় গৃহে বদ্ধ হইয়া থাকিলে জাতীয় জীবনে শৈথিল্য ও আলস্য প্রবেশ করিবে, সুতরাং পৃথিবীর সহিত পুনরায় যোগযুক্ত হওয়া তাহার নিতান্ত প্রয়োজন।

ভারতের পক্ষে কি প্রয়োজন তাহা লইয়া এখনো বিবাদ চলিতেছে। এক দল বলেন অবাধ বাণিজ্যনীতিই চলুক,—তাহাতে লোকে সস্তায় জিনিষ পাইবে। দেশের মধ্যে বাণিজ্য-উন্নতির যথার্থ চেষ্টা চলুক, কিন্তু স্বদেশীর নাম দিয়া জঘন্য জিনিষ চালাইয়া দেশকে বঞ্চিত করিলে চলিবে না। আর একদল বলেন দেশের বাণিজ্য রক্ষা করিতে হইলে বাহিরের শিল্পজাত সামগ্রী, যাহা দেশীয় শিল্পের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া উহাকে ধ্বংস করিতেছে, তাহার উপর শুল্ক বসানো হইক। কাপড়ের কলের ইতিহাস হইতে দেখাইয়াছি যে ভারতের পক্ষে এই সংরক্ষণ নীতির কত প্রয়োজন; এবং সেইটি না থাকাতে দেশীয় বস্ত্রশিল্পের কিরূপ সর্ব্বনাশ হইয়াছে। একজন ইংরাজ (Sir

সংরক্ষণ নীতি ও অবাধ বাণিজ্য-নীতি

Edward Law) বলিয়াছিলেন যে 'ভারতের অধিবাসীদিগকে কাঠ কাটিবার ও জল টানিবার জন্য রাখাই হইতেছে পৃথিবীর বাণিজ্য সংরক্ষণশীল জাতির স্বার্থ ও অভিপ্রায়।'

৮। রেলপথ

ইংলণ্ড রেলপথের আবিষ্কর্ত্তা। সেখানে প্রথম গাড়ী চলিবার দশ বৎসরের মধ্যেই (১৮৪৫ সালে) ইংলণ্ডের তৎকালীন বিখ্যাত ইঞ্জিনীয়ার মিঃ আর, এম, ষ্টীফেন্‌স্ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ত্তাদের কাছে ভারতে রেলপথ প্রস্তুত করিবার প্রস্তাব করেন। কোম্পানীর কর্ত্তারা ভয়ে ভয়ে ভারতের কয়েকটি বড় বড় জায়গা হইতে রেলপথ নির্ম্মাণের অনুমতি দিলেন। সেই সময়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানী হাওড়া হইতে রাণীগঞ্জ ১২০ মাইল রেলপথ প্রথম খুলিবার অনুমতি পান। এ ছাড়া বোম্বাই হইতে কল্যাণ ৩৩ মাইল, মাদ্রাস হইতে আরকোনাম্ ৩৯ মাইল রেলপথ নির্ম্মাণ সুরু হয়। কিন্তু লর্ড ডালহৌসীর সময়ে যথার্থভাবে রেলপথ বিস্তার আরম্ভ হয়। বেসরকারী কোম্পানীর হাতে রেলপথ নির্ম্মাণের ভার সমর্পণ করিবার জন্য তিনি বিলাতের বোর্ডের নিকট লিখিয়া পাঠাইলেন। লর্ড ডালহৌসী তাঁহার পত্রে বেসরকারী মূলধন উঠাইবার সপক্ষে যে যুক্তিগুলি দিয়াছিলেন তাহা আমাদের জানা দরকার। তিনি বলেন সরকারী অথবা বেসরকারী ইঞ্জিনীয়ারগণ উভয়েই যথাসাধ্য স্বল্প ব্যয়ে ও অল্প সময়ের মধ্যে এই কার্য্য সুসম্পন্ন করিবেন, অথচ একদল সুদক্ষ কর্ম্মচারীকে সাম্রাজ্যের অন্যান্য গুরুতর কার্য্য হইতে স্থানান্তরিত করিয়া রাখিলে দেশের কল্যাণ হইবে না; বাণিজ্য বিস্তারের সহায়তা করা কোনো গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না; বিশেষতঃ ভারতবর্ষের

প্রথম রেলওয়ে স্থাপনের চেষ্টা।

লর্ড ডালহৌসীর প্রতিবেদন। (Report)

লোক স্বভাবতই সরকারী সাহায্য মুখাপেক্ষী। এই সব মুখাপেক্ষী দেশের উন্নতি ও অগ্রসরের বিষম অন্তরায়। এইজন্যই ভারতের পক্ষে ইংরাজের অর্থ ও সামর্থ্য উভয়ই নিয়োজিত হইবার প্রয়োজন আছে; ইংলণ্ডের মূলধনে রেলওয়ে নির্মিত হইলে ভারতবর্ষ উপকৃত হইবে এবং নানা ব্যবসায় বাণিজ্য, শিল্পকর্মে ইংরাজের শক্তি ও অর্থ নিয়োজিত হইবে। লর্ড ডালহৌসীর এই যুক্তি ইংলণ্ডের মূলধনওয়ালাদের মনোমত হইবার আরও কারণ ছিল। যেসব কোম্পানী বিলাতে টাকা তুলিতে চেষ্টা করেন তাহারা বলিল যে ভারত-সরকার যদি তাহাদের মূলধন লোকসান হইবে না এইরূপ কোনো ব্যবস্থা করেন তবেই তাহারা টাকা ব্যয় করিবে। ভারত গভর্ণমেণ্ট বলিলেন যে তাহারা টাকা তুলিলে সরকার বাহাদুর তাহাদিগকে নিষ্কর জমি দিবেন ও মূলধনের উপর শতকরা ৫ টাকা হারে সুদ গারান্টি দিবেন। কোম্পানীর তহবিলে খরচপত্র বাদে যাহা থাকিবে তাহার অর্দ্ধাংশ গভর্ণমেণ্ট পাইবেন, অপরার্দ্ধ কোম্পানীর অংশীদারগণের হস্তগত হইবে—ইহাই ছিল যুক্তিপত্রের সর্ত্ত। এই সকল সর্ত্তানুসারে কোম্পানী নিজ নিজ কর্মচারী নিয়োগ ও বরখাস্ত ব্যতীত প্রায় সকল বিষয়েই সরকারী রেলওয়ে-বোর্ডের অধীন। কোম্পানী ইচ্ছামত খরচপত্র বাড়াইতে পারেন না; সামান্য ব্যয়বৃদ্ধির জন্য তাঁহাদিগকে বোর্ডের অনুমতি লইতে হয়। কোম্পানীর রেলপথ, ব্রিজ্, গাড়ী, ইঞ্জিন, কারখানা, ভাড়া, সময়সূচী প্রভৃতি বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার সরকারের আছে। এই সকল রেলওয়ে কোম্পানী ৯৯ বৎসরের জন্য ইজারা পাইয়াছে; তাহার পর কোম্পানীর জিনিষপত্রের ন্যায্য মূল্য দান করিলে এই সকল রেলপথ একেবারে খাস সরকারী সম্পত্তি হইয়া যাইবে। ইহা ছাড়া ২৫ বা ৫০ বৎসরের শেষে সরকার বাহাদুরের ইচ্ছা হইলে রেল-কোম্পানীকে জিনিষের দাম ছাড়া এই কয় বৎসরের মূলধনের সুদ দিয়া রেল সম্পত্তি

কোম্পানীর গারাণ্টী।

খাস করিয়া লইতে পারেন। ১৮৫৯ সালের মধ্যে ভারতে ৫০০০ মাইল রেলপথ বিস্তারের জন্য বিলাতে ৫২ কোটি টাকা মূলধন উঠিল।

১৮৬২ সালে মাঝে একবার ভারত সরকারের মত বদলাইল; সিপাহী বিদ্রোহের পর তাঁহারা রেলপথ নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা খুব ভাল করিয়া বুঝিলেও 'গারাণ্টী' দিয়া সুদ গণিয়া দিতে অস্বীকৃত হইলেন। গভর্ণমেণ্ট বলিলেন এবার হইতে যাহা প্রয়োজন একেবারে দিয়া দিব বছর বছর 'গারাণ্টীর' টাকা দিতে পারিব না। সরকার বিনা খাজনায় জমি দিলেন, ও মাইল পিছু ১৫০০টাকা ব্যবস্থা করিলেন। এছাড়া যে সেতু নির্মাণের জন্ত ১৫ লক্ষ টাকার উপর খরচ পড়িবে তাহার ব্যয়ভার গ্রহণ করিলেন। ১৮৬৪ সালে মাত্র দুইটি কোম্পানী রেলপথ খুলিল। প্রতিবৎসর বিনা আয়াসে শতকরা ৪।৫ টাকা হারে সুদের গারাণ্টী পাইয়া ও যদৃচ্ছা ব্যয় করিয়া কোম্পানীরা এতই অতিলোভী হইয়া উঠিয়াছিল যে তাহারা ভারত সরকারের ন্যায্য প্রস্তাবে সম্মত হইল না। ১৮৬৯ সালে স্যর জন্ লরেন্স তৎকালীন রেলওয়ের অবস্থা লিখিয়া গভর্ণমেণ্টের নিকট পেশ করেন। তিনি লিখিয়াছিলেন, 'গভর্ণমেণ্ট কয়েক বৎসর ধরিয়া মূলধন-দাতাগণকে নিজেদের দায়ীত্বে ভারতে রেলপথ নির্মাণের জন্ত আহ্বান করিতেছেন। কিন্তু এই প্রয়াস সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইয়াছে; এবং সরকার বাহাদুর যদি মূলধন দাতাগণকে 'গারাণ্টী' না দেন ত' কেহ তাহাদের অর্থ ভারতবর্ষে ব্যয় করিতে আসিবে না।"

গারাণ্টী দিতে সরকারের অনিচ্ছা।

ভারত-সরকার শক্ত হইয়া থাকিলেন; তাঁহারা কিছুতেই 'গারাণ্টী' দিবেন না। ১৮৬৯ সালে তৎকালীন বড়লাট লর্ড লরেন্স লিখিলেন, "বর্ত্তমান রেলপথগুলি তৈয়ারী করিবার সময়ে ব্যয় সম্বন্ধে যদি কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি থাকিত তবে তাহারা কোন্‌কালে গারাণ্টী হইতে মুক্তিলাভ

১৮৬৯-১৮৮০ সরকারী চেষ্টায় রেলপথ।

করিতেন এবং উপরন্তু কোম্পানীরাই ভারত-সরকারকে শতকরা ৫ টাকা হারে মুনফা দিত।” লর্ড লরেন্স কোম্পানীদের যদৃচ্ছাব্যয়বাহুল্য দেখিয়া খুবই বিরক্ত হইয়াছিলেন। প্রত্যেক মাইল রেলপথ নির্মাণে ১ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা করিয়া ব্যয় পড়িয়াছিল। ১৮৬৯ সালে দেখা গেল যে ষোল বৎসরের মধ্যে রেল-নির্মাণ খাতে ভারত সরকারের ১ কোটি ৬৬½ লক্ষ টাকা লোকসান হইয়াছিল। ১৯০০ সাল পর্য্যন্ত ইংলণ্ডে কোম্পানীগুলিকে ৬০ কোটি টাকা সুদ বাবদই প্রেরণ করা হইয়াছিল।

১৮৬৯ সাল হইতে সরকার বাহাদুর স্বয়ং রেলপথ খুলিতে সুরু করিলেন। ভারতীয় কোষাগার হইতে প্রতি বৎসর রেলপথ নির্মাণের জন্য টাকার ব্যবস্থা হইতে থাকিল। প্রশস্ত রেলপথ নির্মাণের খরচ বেশী হয় বলিয়া সরকার মিটার মাপের (৩ ফিট্ ৩ ইঞ্চি) পথ তৈয়ারী করিতে আরম্ভ করিলেন। এই পর্বটিতে ভারতের আর্থিক অবস্থা মোটেই ভাল ছিল না। অনেকগুলি বড় বড় দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল; এ ছাড়া সামরিক কারণের জন্য সিন্ধু ও পঞ্জাবের রেলপথগুলিকে মিটার মাপ হইতে প্রশস্ত পথে পরিণত করিতে হইল। ইহাতে ব্যয় বৃদ্ধি হইল এবং অন্যদিকে নূতন পথ নির্মিত হইতে পারিল না। ১৮৬৯ হইতে ১৮৮০ সাল পর্য্যন্ত সরকার নিজ ব্যয়ে সিন্ধু, পঞ্জাব, রাজপুতানা, উত্তর বঙ্গ ও বর্মাতে প্রায় ২১৭৫ মাইল রেলপথ নির্মাণ করিয়াছিলেন। ১৮৬৯ সালে মোট ৬১২৮ মাইল রেলপথ ছিল।

পূর্বেই বলিয়াছি লর্ড লরেন্সের শাসনকালের পর হইতে কয়েক বৎসর ভারত রাজকোষের অবস্থা খুবই শোচনীয় হইয়া উঠে। ১৮৬৯ সালে সরকারের মত বদলাইতে সুরু হইল এবং তাঁহারা পুনরায় বিলাতী কোম্পানীদের আহ্বান করিলেন। প্রথমতঃ সরকার বাহাদুর বলিলেন যে তাঁহারা কোনো সর্ত্তে বাঁধা পড়িবেন না—কোম্পানীদের নিজের দায়ীত্বে কাজ করিতে হইবে। চারিটি মাত্র কোম্পানী গঠিত হইল; কিন্তু কেহই টিকিল

পুনরায় গারান্টী প্রদান।

না ; কেহ দেউলা হইল, কাহারও অবস্থা শোচনীয় দেখিয়া সরকার বাহাদুর তাড়াতাড়ি 'গারাণ্টী' দিলেন। ১৮৭৮ সালের ভীষণ দুর্ভিক্ষের পর, ইহার কারণ ও নিরাকরণের উপায় নির্দ্দেশ করিবার জন্য যে কমিশন বসিয়াছিল তাহার সদস্যগণ প্রতিকারের অন্যান্য উপায়ের মধ্যে রেলপথ প্রসারের জন্য অনুরোধ করেন। সুতরাং সরকার বাহাদুর পুনরায় গারাণ্টী দিয়া কোম্পানীদের ডাকিতে লাগিলেন। দেশীয় রাজগণের মধ্যে হায়দ্রাবাদ রেলপথ খুলিবার জন্য গারাণ্টী দিয়া কোম্পানীর কাজ আরম্ভ করিলেন। ইতিমধ্যে রুশের সঙ্গে ইংরাজ সরকারের যুদ্ধ বাধিবার উপক্রম হইল।

রাজনৈতিক কারণ ও দুর্ভিক্ষ দমন।

১৮৮০ সালের পর হইতে এই দুই জাতির মধ্যে মনান্তর চলিতেছিল ; সেই মনান্তর যতই পাকা হইতে লাগিল ভারত-সরকার উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে পথ ঘাট ততই দৃঢ় করিবার দিকে মন দিতে লাগিলেন। সমরকুশল মন্ত্রীগণ বলিলেন যে ভারতবর্ষের রেলপথের সহিত বেলুচিস্থানের রাজধানী কোয়েটা ও সীমান্ত-নগর চমনের সহিত যোগ স্থাপন না করিলে বিপদ আসন্ন, এই রেলপথ নির্ম্মাণে অসংখ্য টাকা ব্যয়িত হইয়াছিল। বোলন হরনাই প্রভৃতি গিরিসঙ্কটের মধ্য দিয়া রেলনির্ম্মাণে যে পরিমাণ টাকা লাগিয়াছিল তাহা দিয়া পাহাড় উড়ানো যাইত।

লর্ড রীপনের সময় হইতে পুনরায় কোম্পানীদের গারাণ্টী দিয়া কাজ করানো সুরু হয়। তবে পূর্ব্বের গারাণ্টী প্রথা হইতে এবারকার সর্ত্তগুলি অন্য ধরনের হইল। যাহাই হোক এই নূতন গারাণ্টী অনুসারে গ্রেট্ পেনিন্-সুলার রেলওয়ের অনেকখানি পথ (১৮৮২-৮৫), বেঙ্গল-নাগপুর (১৮৮৩-৮৭) দক্ষিণ-মহরাট্টা (১৮৮২) ও আসাম-বেঙ্গল (১৮৯১) নির্ম্মিত হইল।

১৮৯৩ সালে সরকার পুরাপুরি গারাণ্টী-প্রথা না রাখিয়া রিবেট-প্রথা করেন। সোণা রূপার বাজারে খুব গণ্ডগোল হওয়ায় ভারত-সরকারের

টাকা লোকসানের পালা সুরু হয়। তখন তাঁহারা আর পূর্ব্বের গারাণ্টী না দিয়া রেল-কোম্পানীদের মোট খরচের শতকরা ১০ ভাগ টাকা দেওয়া স্থির করিলেন। গভর্ণমেণ্ট জমি বিনা খাজনায় পূর্ব্বের ন্যায় দিতে থাকিলেন। ছোট খাট তিনটা কোম্পানী কাজ সুরু করিল বটে, কিন্তু এসর্ত্তে বড় বেশী কেহ রাজি হইল না। ১৮৯৬ সালে রেল আরও লোভনীয় করিবার জন্য সরকার বলিলেন তাঁহারা শতকরা তিন টাকা হারে গারাণ্টী দিতে রাজি আছেন এ ছাড়া লাভের ভাগ দিতেও রাজি অথবা রিবেট ভাল সর্ত্তে দিতে তাঁহারা প্রস্তুত। কিন্তু তাহাতে বিশেষ সুবিধা হইল না।

রিবেট প্রথার চেষ্টা

সরকার এযাবৎ বরাবর রেলওয়ে নির্ম্মাণের জন্য ব্যয় করিয়াছেন; কোম্পানীরা বিলাতে কিছু টাকা তুলিতেন এবং ভারত সরকার তাহাদের হাতে অবশিষ্ট টাকা দিতেন; ইহারা মধ্যবর্ত্তিত্ব করিয়া রেলপথ চালাইত। সরকার অধিকাংশ ক্ষেত্রে সামরিক দিক হইতে যেসব স্থানে রেলপথ খোলা প্রয়োজন সেই দিকেই দৃষ্টি দিতেন; দেশের মধ্যে যেসব পথে ভবিষ্যতে বাণিজ্য বাড়িতে পারে ও আয় হইতে পারে সরকার সেগুলি কোম্পানীদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। আমরা পূর্বেই দুর্ভিক্ষ কমিশনের রেল সম্বন্ধে তাগিদের কথা ও রুশের সহিত বিবাদের বিষয় বলিয়াছি। সরকার প্রতিবৎসর রাজস্ব হইতে ৩৩½ কোটি টাকা রেলপথ নির্ম্মাণের জন্য ব্যবস্থা করিতেন। এই ব্যয় উত্তরোত্তর বাড়িয়া আসিতেছে এবং ১৯১৯ সালে ২৬ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা রেল-বিভাগের জন্য ধার্য্য হইয়াছিল। এক বৎসরে এত ব্যয় ইতঃপূর্বে আর কখনো হয় নাই।

সরকারের ব্যয়

ইতিমধ্যে দেশের আভ্যন্তরীন বাণিজ্য, আমদানী, রপ্তানী বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এতদিন বৈদেশিক বাণিজ্য তেমনভাবে বাড়ে নাই বলিয়া মোটের উপর রেলকোম্পানীদের লাভ কম হইতেছিল।

সরকারের লাভ লোকসান

লাভ হইতেই সরকারের ভাগ পাইবার কথা; কিন্তু সরকার সেই টাকা নগদ না লইয়া কোম্পানীর প্রাপ্য গারান্টীর সুদ ও মূলধন শোধ বাবদ দিতেন। এই টাকা বরাবর দেওয়া হইতেছে বলিয়া সরকারের লাভ বহুকাল হয় নাই; কিন্তু এইভাবে ভারতবর্ষের প্রায় সমুদয় রেলপথই এখন খাস সরকারী সম্পত্তি; তবে সরকার বাহাদুর কোম্পানীদের হাত হইতে রেল চালাইবার ভার তুলিয়া না লইয়া তাহাদের হাতেই বাহাল রাখিয়াছেন। ১৯০০ সালে অর্থাৎ রেলপথ নির্ম্মাণ সুরু হওয়ার ৪৭ বৎসর পরে সরকার রেল হইতে প্রথম লাভ করেন। ১৯০৭ সালে দেখা যায় যে পূর্ব্বের চারি বৎসরে গড়ে প্রায় দুই মিলিয়ন পাউণ্ড (তিন কোটি টাকা) করিয়া সরকারের লাভ হয়। পর বৎসর ভারতের দুর্ব্বৎসর ছিল; সরকারের ১ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকা লোকসান হইল। কিন্তু তারপর হইতে সরকারের আর লোকসান হয় নাই। ১৯১৯ সালে লাভ হয় ১৯ কোটি ৬৮ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা।

সরকার বাহাদুরই সমস্ত রেলপথের মালিক। সমস্ত রেল এক দিন সম্পূর্ণরূপে সরকারী হইয়া যাইবে। ১৯০৫ সালে সরকারী রেলওয়ে-বোর্ড স্থাপিত হয়। কয়েক বৎসর রেলওয়ে-বোর্ড ব্যবসায় ও বাণিজ্য

রেলওয়ে-বোর্ড

বিষয়ক সরকারী-সচিবের তত্ত্বাবধানে থাকে; কিন্তু তাঁহাদের অতিরিক্ত বাঁধাবাধির জন্য কাজের ক্ষতি হইতে লাগিল; তখন ১৯০৮ সালে রেলওয়ে বোর্ডের সভাপতির মন্ত্রীসভায় বিশেষ স্থান পাইবার অধিকার পাইলেন।

বে-সরকারী রেল-কোম্পানীদের পরিচালক-বোর্ড লণ্ডনে; ভারতবর্ষে

রেলওয়ে পরিচালন

তাঁহাদের এজেণ্ট আছেন। কোম্পানীর সকল চাকর এজেণ্টের অধীনে। ইঁহারই অধীন ট্রাফিক ম্যানেজার, ইঞ্জিনীয়ার, ইঞ্জিন বা লোকো-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, ষ্টোর বা ভাণ্ডার

রক্ষক, রেল-পুলিশ অধ্যক্ষ (ইনি সরকার হইতে নিযুক্ত) এবং একজন হিসাব-পরীক্ষক। সরকারী রেলওয়েরও ব্যবস্থা এইরূপ।

কিছুকাল হইতে আমাদের দেশে সরকারী ও কোম্পানী পরিচালিত রেল-পথের মধ্যে কোনটি ভাল ও কোনটি আমাদের দেশের উপযোগী তাহা লইয়া ঘোর তর্ক চলিতেছে। সুসভ্য জাতিদের মধ্যে দেখা যাইতেছে যে রেলপথ জাতীয় ঐশ্বর্য্যের অন্তর্গত করাই অনেকের অভিপ্রায়। কয়েকজন ব্যক্তি বিশেষকে লাভের অংশী না করিয়া গবর্ণমেণ্ট সেই লাভটা পাইলে বেশী ভাল হয়। পোষ্টাফিস, টেলিগ্রাফ প্রভৃতি লোকহিতকর সামগ্রীগুলি যেমন ব্যক্তিগত লাভের সম্পত্তি করিয়া রাখা হয় নাই, রেলপথকেও তেমনি ব্যক্তিগত বা কোম্পানীগত সম্পত্তি করিতে দেওয়া উচিত নয়। সরকার রেলের মালিক হইবেন ও সরকারই রেলের পরিচালক হইবেন। সরকার বাহাদুর স্বয়ং ভারতীয় রেলপথের ভার লন ইহাই অধিকাংশের ইচ্ছা। যে যে কারণে রেলপথ সরকার পরিচালিত হওয়া উচিত তাহা এই।

সরকারী ও বেসরকারী রেল

(১) তৃতীয় শ্রেণী যাত্রীদের উপর সদ্ব্যবহার। ৩য় ও মধ্যম শ্রেণীর আরোহীদের পয়সায় রেলের লাভ; তাহা-রাই বৎসরে ১৯ কোটি টাকা দেয়; আর ১ম ও ২য় শ্রেণীর আরোহীদের নিকট হইতে আয় ৪ কোটি টাকা পুরা নয়। যে পরিমাণ গাড়ী আছে ও যে সংখ্যক আরোহী প্রতি বৎসর রেলে চড়ে তাহাদের সংখ্যার অনুপাত বিসদৃশ; ১ম ও ২য় শ্রেণীর গাড়ীপ্রতি ১,৪৩০ জন ও তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ী-প্রতি ১৮,০০০ লোক। য়ুরোপে, আমেরিকায় বা কোনো সভ্য দেশে গাড়ী ভাড়া দিয়া লোকে মালগাড়ীতে করিয়া যায় না।

তৃতীয় শ্রেণী হইতে আয়

(২) ভারতীয় বাণি-জ্যের ও শিল্পের ক্ষতি। প্রথমতঃ ভারতের কাঁচামাল সহজে দেশ হইতে বাহির করিয়া লইবার প্রধান সহায় রেল; আবার বিদেশী আমদানী মাল বাজারে

শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি ও অবনতি

বাজারে সস্তায় চালান করিবার উপায় এই রেলপথ। ভারতীয় শিল্পের অবনতির কারণ বিলাতী সামগ্রীর আকস্মিক আক্রমণ। ইংলণ্ডে যেমন লোকে কলের সঙ্গে হাতের প্রতিযোগীতা হওয়া সত্তেও ধীরে ধীরে মানাইয়া লইতে পারিয়াছিল ভারতকে সে অবসর দেওয়া হয় নাই। ইহার জন্য দ্রুত রেলপথ নির্ম্মাণই দায়ী। পুরাণো কুটীর-শিল্প নষ্ট হইয়াছে বটে, তাহার স্থানে ভারতের অন্যান্য শিল্পের উন্নতিও হইয়াছে; ইহার সহায় রেলপথ। সরকারের কর্ত্তব্য হইবে ভারতবাসীর স্বার্থ, তাহাদের বাণিজ্য কিরূপে রক্ষিত হইতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয় ভারতের রেল-পথের ভাড়া অত্যন্ত বেশী, কাঁচামাল একস্থান হইতে অন্যস্থানে আনিয়া প্রস্তত করিতে গেলে যে খরচ হয় তাহাতে ব্যবসায় মোটেই পোষায় না। ইহার চেয়ে বিদেশীমাল আমদানী করা সহজ। উদাহরণ স্বরূপ বলিতে পারি কাগজের জন্য যে ঘাস লাগে তাহা হিমালয় হইতে আনিতে যে ব্যয় পড়ে তাহার চেয়ে অনেক সস্তায় হামবুর্গ (জারমেনী) হইতে কাগজ আনা যায়। (৩) ভারতবাসীরা রেল-কোম্পানীতে বড় বড় চাকুরী খুব কমই পাইয়া থাকে। তা ছাড়া বড় বড় কর্ম্মচারীদের বেতন নিম্নস্তরের কর্ম্মচারীদের তুলনায় অনেক বেশী। শ্রীযুক্ত চন্দ্রিকা প্রসাদ প্রায় ৪৪ বৎসর রেলওয়েতে বড় কাজ করিয়াছেন; তিনি পৃথিবীর সমস্ত রেলের অবস্থা খুব ভাল করিয়া অধ্যয়ন করিয়া এক প্রকাণ্ড পুস্তক লিখিতেছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে ভারতের সর্ব্বনিম্ন কর্ম্মচারী বা কুলি মাসিক ৭৲ টাকা বেতন ও সর্ব্বোচ্চ কর্ম্মচারী বা এজেণ্ট ৩,৫০০৲ টাকা বেতন পাইয়া থাকেন—অর্থাৎ ৫০০ গুণ অধিক। ফরাসী-দেশে ২১, বেলজিয়ামে ৮, সুইট্জারলাণ্ডে ১১, জার্ম্মেনীতে ১১, নরওয়েতে ৮, সুইডেনে ২২ ও ডেনমার্কে ১২ গুণ তফাৎ। সর্ব্বোচ্চ কর্ম্মচারীর বেতন ৪৫০৲ হইতে ১৩৮৭৲ টাকা। রেলের দুইধারে ভদ্রলোক কর্ম্মচারীদের

রেলের বড় বড় চাকরী ও অন্যান্য দেশ

জন্য সরকারী বাড়ীর নমুনা দেখিয়া মনে হয় যে দেশীয়দের সুখের প্রতি যথেষ্ট দৃষ্টি এখনো পড়ে নাই।

(৪) প্রায় ৬৩ বৎসর (১৮৫৩) হইল ভারতে রেলওয়ে সুরু হইয়াছে ; কিন্তু এত বৎসরের মধ্যেও ভারতবর্ষে লোহার কারখানার উন্নতির দিকে বা রেলের বড় বড় কলকব্জাগুলি এখানে প্রস্তুত করিবার চেষ্টা হয় নাই।

লৌহ শিল্প ও কলকব্জা তৈয়ারী চেষ্টার অভাব

ইহাতে কত কোটি টাকা লোকসান হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। ১৯১৮-১৯ সালে সরকারী ও বে-সরকারী রেলওয়ের জন্য ১কোটি ৬৮লক্ষ টাকার জিনিষ বিলাত হইতে রপ্তানী করা হইয়াছিল। ১৯০৫ সালে ১ কোটি ৪০ লক্ষ টাকার জিনিষ আসে। এই অনুপাতে আজ ৬৩ বৎসর ধরিয়া লোহা-লক্কড় আসিতেছে ; পূর্বে রেলপথ কম ছিল জিনিষপত্র সেই অনুপাতে কম আসিত। খুব কম করিয়া ৬০ কোটি টাকার রেলওয়ে-সামগ্রী পর্য্যন্ত বিদেশ হইতে আসিয়াছে। সরকার বাহাদুরের উচিত এবং আমা-দেরও চেষ্টা করা উচিত যাহাতে এই সব সামগ্রী এদেশেই তৈয়ারী করা যায়। তাতা কোম্পানী রেল লাইন তৈয়ারী করিতেছে।

(৫) রেলপথ বিস্তারের সহিত দেশে ম্যালেরিয়া বাড়িতেছে লোকের এ বিশ্বাস একেবারে ভিত্তিহীন নহে। দেশের স্বাভাবিক জলপথ মাটি

স্বাভাবিক জলপথ রোধ

উঁচু করিয়া প্রায়ই বদ্ধ দেখা যায়। সেতু কম। তা ছাড়া রেলপথের পাশে যে মাটি তোলা হয় তাহা একটু যত্ন করিলে সুন্দর জলপথে বা জলসেচনের খালে পরিণত করা যায়। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশেও রেল লাইনের এই দুর্দ্দশা।

(৬) রেল গাড়ীতে সাহেব ও দেশীয়দের মধ্যে অত্যন্ত পার্থক্য করা হয়। রেল-কোম্পানীরা দেশীয় আরোহীদের ও যাত্রীদের সুবিধার দিকে তত

সাহেব ও দেশীয়দের মধ্যে পার্থক্য

দৃষ্টি দেন না যতদৃষ্টি তাঁহারা য়ুরোপীয় ও ইঙ্গ-ভারতীয় যাত্রীদের প্রতি দেন। এই কারণে দেশীয় লোকেরা রেলওয়ের সংস্কারের জন্য বহুকাল হইতে চেষ্টা

করিতেছে। (৭) রেলওয়ের জন্য সরকার যাহা ব্যয় করেন তাহাতে করিয়া দেশের দুটি কার্য্য সিদ্ধ হয় ; প্রথম আমদানী রপ্তানীর সুবিধা ; দ্বিতীয় ভারতবর্ষকে আভ্যন্তরীন বিপ্লব বা বৈদেশিক আক্রমণ হইতে রক্ষা। কিন্তু

জলসেচনের ব্যয় কম

যেখানে দেশের শত করা ৭২ জন লোক কেবল চাষের উপর নির্ভর করিয়া দিনাতিপাত করে তাহাদের ক্ষেতে জল সেচনের ব্যবস্থাটা করা বেশী দরকার। তা ছাড়া জলসেচন হইতে সরকারের লাভ রেলের তুলনায় অনেক বেশী।

(৮) বে-সরকারী কোম্পানীদের আয়ব্যয়, রেল, ব্রিজ দেখিবার জন্য

বহুপ্রস্থ কর্ম্মচারী

এক প্রস্থ বিশেষজ্ঞ আছেন, আবার সরকারী পক্ষ হইতে তদারক করিবার জন্যও লোক আছেন। সরকার বাহাদুর যদি সমস্তটাই নিজে করেন তবে আর বহু তদারকের ব্যয়টা হয় না।

রেলওয়ে সমূহ সরকার বাহাদুরের খাস তত্ত্বাবধানে চলিবে, না কোম্পানীর দ্বারা পরিচালিত হইবে এই লইয়া আজ প্রায় দশ বৎসর ধরিয়া কাগজে বাদানুবাদ চলিতেছে। দেশের নেতারা চান সরকার বাহাদুর নিজে

রেলওয়ে কমিশন

সমস্তের ভার লন। এই বিষয়ের তদারক করিবার জন্য সরকার বাহাদুর এক কমিশন বসাইয়াছেন। ইহার মধ্যে ছয় জন ইংরাজ ও তিনজন মাত্র দেশীয় লোক। ভারতবর্ষের স্বার্থ যেখানে জড়িত সেখানে ভারতবাসীর সংখ্যা অধিক থাকা উচিত ছিল। সাহেব বণিকেরা কোম্পানী-পরিচালিত রেলপথের পক্ষপাতী ; দেশীয় লোকেরা চান সরকার বাহাদুর স্বয়ং ভারগ্রহণ করিয়া সকলের প্রতি সমান ব্যবহার ও সদ্বিবেচনা প্রকাশ করেন।

১৯১৮-১৯ সাল পর্য্যন্ত ভারতে ৩৬,৬১৬ মাইল রেলপথ নির্ম্মিত হইয়াছে—গত দশ বৎসরেই ৫ হাজার মাইলের উপর পথ তৈয়ারী হইয়াছে।

রেলপথ

ঐ বৎসরে কিন্তু ৩৩৫ মাইল মাত্র খোলা হইয়াছিল ; এ ছাড়া আরও ১,৮০৩ মাইল পথ তৈয়ারী হইতেছে বা করিবার জন্য টাকা সাব্যস্ত হইয়াছে।

এ পর্য্যন্ত রেল বাবদ সরকার বাহাদুর রেল কোম্পানীদের সম্পত্তি ক্রয় করিতে, নূতন রেলপথ নির্ম্মাণে ও সকল প্রকার ধার শোধের জন্য ৩৭০,১৮০,৫৬০ পাউণ্ড বা ৫৫৫,৩৭,০৮,৪০০ টাকা ব্যয় করিয়াছেন। ১৯১৮-১৯ সালে সর্বসমেত খরচ হইয়াছিল ৬,২৩,৯৪,০৪৬ টাকা। ১৯১৯-২০ সালের জন্য ২৬ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা রেলওয়ের জন্য ধার্য্য হইয়াছিল ; এ পর্য্যন্ত কোনো বৎসরে এত টাকা রেলের জন্য ব্যয়িত হয় নাই।

মূলধন ও রেলের জন্য ব্যয়

রেলওয়ে হইতে আদায় ১৯১৩-১৪ সালে অর্থাৎ যুদ্ধের পূর্বে ছিল ৫৬ কোটি ৩১ লক্ষ ৯২ হাজার টাকা ; কিন্তু যুদ্ধের সময়ে ভাড়া ও মাশুল বাড়াইয়া রাজস্ব বৃদ্ধির চেষ্টা সফল হইয়াছে। ১৯১৮-১৯ সালে রেলের মোট আদায় হয় ৭৬,২৫,৭০,০০০ টাকা। ঐ বৎসরে ব্যয় হয় ৩৭,০৭,৬৭,০০০ টাকা অর্থাৎ রেল কোম্পানীদের মোট লাভ হয় ৩৯,১৮,০৩,০০০ টাকা। সকল প্রকার সুদ, বন্দবস্তী টাকা, ঋণশোধ, কিস্তিবন্দী টাকা দিয়াও সরকারের লাভ হয় ১০,৮৫৮,৩৭৯ পাউণ্ড বা ১৯,৮৩,৭৫,৬০০ টাকা।

রেলের আয় ব্যয়

যাত্রীর সংখ্যা প্রতিবৎসরই বাড়িয়া চলিতেছে। এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে অন্যদেশের তুলনায় আমাদের রেলওয়ের অনেক দোষ ত্রুটি অসুবিধা থাকা সত্বেও লোকে তীর্থযাত্রা, দেশভ্রমণ, ব্যবসায় বাণিজ্যের জন্য অনেক বেশী চলা ফেরা করে। ১৯১৮-১৯ সালে প্রায় ৪২ কোটি রেলটিকিট বিক্রয় হয় ; ইহা হইতে আয় হয় প্রায় ৩০ কোটি টাকা। গড়ে প্রতি যাত্রী ৩৯.২ মাইল চলিয়াছে। মাইলপ্রতি ১৯০৩ সালে ২.৪৪ পাই ভাড়া ছিল, এখন সেই ভাড়া ৩.৮ পাই করিয়া হইয়াছে। এই আয়ের অধিকাংশ তৃতীয় ও মধ্যম শ্রেণী হইতে হইয়াছে, কেননা ১ম ও ২য় শ্রেণীর ভাড়া পূর্ব হইতে বৃদ্ধি পায় নাই—ভাড়া বাড়িয়াছে নিম্ন দুই শ্রেণীর।

যাত্রীর সংখ্যা

১৯১৮-১৯ সালে মালপত্র প্রায় ৯০ মিলিয়ন টন চলাফেরা করে—১৯০৮ সালে ৬২ মিলিয়ন টন্ ছিল। যুদ্ধের সময়ে ও পরে কয়লা, রসদপত্র, খাদ্যসামগ্রী প্রচুর পরিমাণে আনাগোনা করে। মাশুল প্রতিমাইলে টনকরা ১৯০৮ সালে ৫০০৯ পাই এর জায়গায় কমিয়া ৪০২৬ পাই হইয়াছিল; ১৯১৬-১৭ সালে ৪ পাই হয়। বর্ত্তমানে তাহার চেয়ে কিছু বাড়িয়াছে।

মালপত্র

সরকারী রেল ছাড়া জেলাবোর্ডের পরিচালনাধীন রেল লাইন আছে; ১৯১৮-১৯ সালে ইহার আয় হইয়াছিল ৯ কোটি ৯৩ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকা পূর্ব্বের বৎসর হইতে ১,৫৮,১৩,০০০ টাকা অধিক। জেলা-বোর্ডের রেলের মূলধন ৬৭ কোটি, ৩১ লক্ষ, ৭৬ হাজার; শতকরা ৭০৩৬ টাকা লাভ হইয়াছে।

জেলাবোর্ডের রেলপথ

ভারতবর্ষের মধ্যে এখন আর এমন একটি জেলা নাই যেখানে রেলে করিয়া না যাওয়া যায়। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া আসামের পূর্ব্বদিকে প্রায় চীনের সীমান্ত পর্য্যন্ত, আবার কাশ্মীরের দক্ষিণ হইতে ভারতের সর্বদক্ষিণ স্থান ধনুস্কোটি পর্য্যন্ত রেলপথ নির্মিত হইয়াছে। দেশের মধ্যে বিপ্লব, বিদ্রোহ হইলে তাহা তদ্দণ্ডেই সরকার দমন করিতে পারেন, আবার দেশের বাহির হইতে শত্রু আসিলে সমগ্র বৃটীশশক্তি সেখানে লইতে পারেন। তা ছাড়া ডাক বিভাগ সম্পূর্ণরূপে রেলের অধীন। পোষ্টাপিসের অর্দ্ধেক কাজ রেলের ডাকগাড়ীতে হয়।

রেলের উপকারিতা

ভারতবর্ষের রেলপথ ভারতের মধ্যেই আবদ্ধ। এশিয়ার অন্যান্য অংশের সহিত রেলপথে আনাগোনার বাধা অনেক; তার মধ্যে প্রধান বাধা প্রাকৃতিক। ভারতবর্ষ হইতে সিংহলে যাইতে এখন সমুদ্র ষ্টীমারে করিয়া পার হইতে হয়। ভারতের দক্ষিণতম ষ্টেশন ধনুস্কোটি; সেখান হইতে সিংহলের

সিংহলের সহিত রেলপথ যোগের চেষ্টা

নিকটতম রেলষ্টেশন ২১ মাইল দূরে। এইখান দিয়া রেল লইতে গেলে মাঝে মাঝে কতকগুলি দ্বীপ পড়ে; ১৯১৩ সালে এখানকার মাপজোখ হয়। প্রায় আট মাইল পথ স্থল দিয়া লওয়া যাইবে, অবশিষ্ট ১৩ মাইল সমুদ্রের উপর দিয়া লইতে হইবে। এই সব করিতে ব্যয় আনুমাণিক ১ কোটি ১১ লক্ষ টাকা পড়িবে। ইহা কবে আরম্ভ হইবে তাহা ঠিক হয় নাই।

বর্মার সহিত রেলপথ যোগ

ভারতবর্ষের সহিত ব্রহ্মদেশের রেলপথে যোগ নাই। এই রেলপথ নির্মাণের কথা ঠিক ঠাক হইয়াছে। চট্টগ্রাম হইতে আরাকানের ভিতর দিয়া এই পথ চলিবে। পথের মাপ হইয়া গিয়াছে। ব্যয় অনুমানিক ১০½ কোটি টাকা পড়িবে।

ভারতের কাছাকাছি দেশের সঙ্গে যেমন রেলপথে যোগস্থাপনের চেষ্টা চলিতেছে; য়ুরোপের সহিত স্থলপথে যোগস্থাপনের ইচ্ছা ইংরাজ সরকারের অনেক দিন হইতেই প্রবল। রুশেরা এশিয়াতে রাজ্যবিস্তার করিতে করিতে রেলপথ বিস্তার করিয়াছে; তাহাদের রেল পেটরোগ্রাড হইতে প্রশান্ত মহাসাগরের উপকুলস্থিত ভ্লাডিভোষ্টক পর্য্যন্ত। আর

য়ুরোপের সহিত রেলে যোগ

একটি পথ দক্ষিণরুশ দিয়া কাশ্যপ হ্রদের তীর পর্য্যন্ত আসিয়াছে; হ্রদের এপার হইতে পুনরায় আর একটি রেল মধ্যএশিয়ার ভিতর দিয়া আসিয়া আফগানিস্থানের উত্তর পর্য্যন্ত আসিয়া থামিয়াছে। রুশ হইতে বাহির হইয়া স্থল পথে প্রায় ভারতের কাছে আসা যায়। অপরদিকে এশিয়া মাইনরে জার্ম্মানরা তুর্কীসরকারের নিকট হইতে জমি লইয়া বহুশত মাইল রেলপথ নির্ম্মাণ করিয়া মেসোপটেমিয়ার দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিল। ইংরাজ সরকার প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে খুব উৎসাহের সহিত মাপজোখ করাইয়া, কমিশন বসাইয়া রেলনির্ম্মাণ করিবেন ঠিক করিয়াছিলেন; কিন্তু নানা রাজনৈতিক ও আর্থিক কারণে তাহা সম্ভব হয় নাই। বর্ত্তমানে অনেকগুলি পথ মাপা আছে; একটি মধ্যএশিয়া হইতে পারস্য ভেদ

করিয়া বেলুচিস্থান দিয়া ; আর একটি কনষ্টাণ্টিনোপল হইতে এশিয়ামাইনর দিয়া দক্ষিণ পারস্য দিয়া। এই রেল করাচীর সহিত মিলিত হইবে। মধ্যয়ুরোপের মধ্য দিয়া আসিলে কনষ্টাণ্টিনোপলের সম্মুখের প্রণালী পার হইতে হইবে না। আবার ইঞ্জিনীয়ারদের কল্পনা এখানে ক্ষান্ত হয় নাই। তাঁহারা ইংলণ্ড হইতে ফ্রান্স পর্য্যন্ত সুড়ঙ্গ করিয়া এক রেলপথ নির্ম্মাণের কথা ভাবিতেছেন। এই পথ সমুদ্রতল হইতে তিন শ' ফিট নীচে দিয়া যাইবে ও দৈর্ঘে ৩২ মাইল হইবে। সুতরাং লণ্ডন হইতে বাহির হইয়া সমস্ত য়ুরোপ ও এশিয়া পার হইয়া আট দিনের মধ্যে ভারতের রাজধানী দিল্লীতে আশা যাইবে। কবে এ পথ নিৰ্ম্মিত হইবে তাহা কেহ বলিতে পারে না। কারণ ইহার মধ্যে অনেক বাধা বিপত্তি আছে।

রেলওয়ের হিসাব নিকাশ।

	১৮৬১	১৮৭১	১৮৮১	১৮৯১	১৯০১	১৯১১	১৯১৮ ১৯
মোট রেলপথ (মাইল)	১,৫৮৭	৫,০৭৪	৯,৮৯০	১৭,৩০৮	২৫,৩৬৩	৩২,৮৩৯	৩৬,৬১৬
মোট মূলধন (কোটি টাকা)	৩৪	৯০	১৪১	২২১	৩৩৯	৪৫০	৫৪৯,(কোটি)
মোট আদায় (লক্ষ)	৯৯লক্ষ	৬,৫৯	১৪,৩২,	২৪,০৪,	৩৩,৬০,	৫৫,২৭,	৮৬,২৮, লক্ষ
মোট ব্যয় (লক্ষ)	৫৮	৩,৬৮,	৭,০৭,	১১,৩০,	১৫,৭২,	২৮,৩৩,	৪১,৮০ লক্ষ
আয়ের শতকরা ব্যয়	৫৯	৫৬	৪৯	৪৭	৪৭	৫২	৪৮%
মোট আয় (লক্ষ)	৪১	২,৯১,	৭,২৫,	১২,৭৪,	১৭,৮৮	২৬,৪৪,	৪৪,৪৮ লক্ষ
মূলধনের উপর আয়ের হার						৫·৪%	৮%
সরকারের লাভ ও ক্ষতি	(পাওয়া যায় না)		—৩৯লক্ষ	—২লক্ষ	১,১৫লক্ষ		১৫,৮৩ লক্ষ (১৯১৭-১৮)

আরোহী ও মালপত্রের মাইলপ্রতি গড় ভাড়া।

	১৮৬১	১৮৭১	১৮৮১	১৮৯১	১৯০১	১৯১১	১৯১৮ ১৯
১ম শ্রেণী আরোহী		(পাই)	১৩·০১	১২·৩২	১২·৭৫	১৪·২৯	১৫·২৮
২য় শ্রেণী আরোহী		„	৪·৭৫	৪·৯২	৫·৪৯	৬·৭৩	৭·১৫
মধ্য শ্রেণী আরোহী		„	৪·০৪	৩·১১	৩·০৯	৩·১০	৪·১৭
৩য় শ্রেণী আরোহী		„	২·৫৫	২·৩৩	২·৩১	২·৩০	২·৮৬
মান্থলি ও অন্যান্য						১·৩৩	১·৪৯
মালপত্র		„	৭·৯৫	৬·৭৫	৫·৭৭	৪·৭৩	৪·০৭ (১৯১৭-১৮)
১ম শ্রেণীর আরোহী (হাজার)		১,৪৪,	২,৬৯,	৪,৭৮,	৫,৭২,	প্রায় ৪০ কোটি টিকিট	প্রায় ৫২ কোটি টিকিট (১৯১৯-২০)
২য় শ্রেণীর আরোহী (হাজার)		৬,৪৩,	১১,৭৭,	২৭,৬৮,	২৪,০৫,		
মধ্য শ্রেণীর আরোহী(হাজার)		৫,২৪	২৮,৬১,	৪৬,৯৬,	৬৬,৭০,		
৩য় শ্রেণীর আরোহী(হাজার)		১,৭৬,৩০	৫,০৪,৫৬	১১,৪৯,০৫	১৭,০৪,১৬		
মান্থলি ও ভেণ্ডের টিকিট		১,৮৪,৭৯	৫,৪৭,৬৪	১২,২৮,৫৫	১৯,৪৭,৪৯		
১মশ্রেণী হইতে আয়(হাজার)		১,০০,	১,৭০,	২,৫০,	৩,৩০,	প্রায় ২৫ কোটি টাকা	প্রায় ৩৩ কোটি টাকা (১৯১৯-২০)
২য় শ্রেণী „ „		১,১০,	২,৬০,	৩,৫০,	৫,২০,		
মধ্য শ্রেণী „ „		৩০,	৩০,	৫০,	৬০,		
৩য় শ্রেণী „ „		১,৪১ ০০	৩,০৯,০০	৫,৮০,০০	৮,৪৮,০০		
মান্থলি, ভেণ্ডরের টিকিট		১,৬৫,০০	৩,৭৯,০০	৬,৮৬,০০	১০,০৭,০০		
মালপত্র (হাজার টন)			১,৩২,১৪,	২,৬১,৫৯	৪,৩৩,৯২	৭,১০,০০	৮,৩০,০০ (১৯১৫)
মালপত্র হইতে আয় (লক্ষ টাকা)			৯,১৬,	১৫,৬১,	২১,২৪,	৩২,০০,	৩৮,০০, „

৮। দুর্ভিক্ষ ও তাহার প্রতিকার

ভিক্ষা যখন দুর্লভ হয় তখনই লোকে বলে দুর্ভিক্ষ হইয়াছে। আমাদের দেশে ভিক্ষা দেওয়াটা লোকধর্মের অন্তর্গত অনুষ্ঠান ছিল সুতরাং সেই ধর্ম লোকে করিতে অক্ষম হইলে দেশে অকাল হইত। এই অকাল বা দুর্ভিক্ষ নানা কারণে হয়; যুদ্ধের জন্য শস্য ক্ষেত্র নষ্ট হয়, বন্যায় দেশ ডুবিয়া যায়, জলাভাবে শস্য পুড়িয়া যায়, পঙ্গপালে শস্য খাইয়া নিঃশেষ করিয়া ফেলে। মোটের উপর খাদ্যশস্যের অভাব হইলে দুর্ভিক্ষ হয় বা অকাল দেখা দেয়। তবে আমাদের দেশে সাধারণতঃ বৃষ্টির অভাবেই শস্য নষ্ট হয়। আমাদের দেশে শতকরা ৭২ জন লোক কৃষির মুখাপেক্ষী; সুতরাং এ চাষ নষ্ট হইলে লোকের কি অবস্থা হয় তাহা কল্পনা করা যায়; তবে সৌভাগ্যের বিষয় ভারতবর্ষ এত বড় দেশ এবং এখানকার জলবায়ু, কৃষি পদ্ধতি এত বিচিত্র রকমের যে সমগ্র দেশে একসঙ্গে দুর্ভিক্ষ খুব কমই হয়। এক প্রদেশে অন্নাভাব হইলেও অন্য প্রদেশে শস্য সস্তায় পাওয়া যাইতে পারে এবং বর্তমানে রেলপথের সুবিধা হওয়ায় শস্য সহজে স্থানান্তরিত করা কঠিন হয় না। কিন্তু সমস্যা শস্য সরবরাহ নহে—সমস্যা হইতেছে লোকের অর্থাভাব। সারা বছর যাহারা ক্ষেতে খামারে কাজ পায় সেই ভূমিহীন শ্রমজীবিদেরই সর্বপ্রথমে কাজ বন্ধ হয়। সেই লোকদের কাজ দেওয়াই সমস্যা; বর্তমানের দুর্ভিক্ষ অন্নের অভাব নয়, অর্থ ও কর্মের অভাবে লোকে অন্ন কিনিবার অক্ষমতা।

অনেকের ধারণা যে ইংরাজ আগমনের পূর্বে আমাদের দেশে দুর্ভিক্ষ ছিল না; এই ধারণা সম্পূর্ণ মিথ্যা। সত্যযুগে সত্য সত্যই শোক দুঃখ ছিল না, ইহা ঐতিহাসিক সত্য নহে। তবে প্রাচীন গ্রন্থাদিতে ও পরিব্রাজকগণের বর্ণনাতে দুর্ভিক্ষের উল্লেখ খুবই কম পাওয়া যায়। গ্রীক

পরিব্রাজক ও দূত মেগাস্থেনীস লিখিয়া গিয়াছেন যে 'ভা:
দুর্ভিক্ষ হয় নাই এবং পুষ্টিকর খাদ্যের সরবরাহ কখনো সা
অনটন্ হয় নাই।' গ্রীক্ দূতের কথা অতিরঞ্জন হইতে পারে।
তাঁহার অর্থ-শাস্ত্রে দেশে অকাল বা দুর্ভিক্ষ হইলে কি ব্যবস্থা
হইবে সে সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন।৷ তাহা এই :—(১) র
মাপ (২) দেশান্তর গমন (৩) রাজকোষ হইতে অর্থ ও শস্য দান (
জলাশয়, কূপ প্রভৃতি খনন (৫) অন্য স্থান হইতে শস্য আনয়ন।

মুসলমান ঐতিহাসিকগণ মুসলমান শাসনকালের অনেকগুলি দুর্ভিক্ষের বর্ণনা দিয়াছেন; প্রথম দুর্ভিক্ষ হয় ১৩৪৩ সালে মহম্মদ টোগলকের রাজত্বকালে। মহম্মদ অর্দ্ধউন্মাদ ছিলেন, তথাচ দিল্লীর অধিবাসীরা যাহাতে ছয় মাসের খাদ্য পায় তাহার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। আকবরের সময়ে সমগ্র হিন্দুস্থানে বৃষ্টির অভাবে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। বাদসাহ বড় বড় সহরে খাদ্যবিতরণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সাহজাহানের রাজত্বের প্রথম ভাগে যে প্রকার দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল তাহার তুলনা পূর্বে পাওয়া যায় না। সম্রাটের বিশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও বহু লক্ষ লোক মরিয়াছিল। আরঙজেবের সময়েও পুনরায় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। সেই দেশব্যাপী অভাবের দিনে তিনি রাজোচিত মহানুভবতা প্রকাশ করিয়াছিলেন; কৃষকদের খাজনা ও অন্যান্য কর মাপ করিয়া দিয়াছিলেন, রাজকোষ হইতে প্রজারা প্রচুর দান সাহায্য পাইয়াছিল; সস্তায় শস্য কিনিয়া আনিয়া সরকার বাহাদুর স্বল্পমূলে তাহা বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনকালে ভারতবর্ষের কোনো না কোনো অংশে সর্ব্বশুদ্ধ দুর্ভিক্ষ ১২ বার ও ৪বার অকাল হয়। আমরা নিম্নে সেই সব দুর্ভিক্ষের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিতেছি।

১৭৬৯-৭০ সালে বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষ হয়; এই দুর্ভিক্ষ ছেয়াত্তরে মন্বন্তর নামে প্রচলিত। শোনা যায় এই মন্বন্তরে বাংলা

দেশের একতৃতীয়াংশ লোক লোপ পাইয়াছিল। লর্ড কর্ণওয়ালিস আসিয়া বাংলা দেশের যে বর্ণনা দেন তাহা অতি ভীষণ। এই সময়ে ওয়ারেন হেষ্টিংস বাংলাদেশের শাসনকর্ত্তা হইলেও তখনকার শাসন-ভার মুসলমান-ইংরাজ উভয়ের উপর ন্যস্ত ছিল। ১৭৬৯ সালেই চারিদিকে দুর্ভিক্ষের চিহ্ন দেখা দেয়, কিন্তু কেহই কোনো প্রতিকারের চেষ্টা করেন নাই।

১৭৮১-৮২। মান্দ্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশে ভীষণ অকাল দেখা দেয়। মৈশূরের যুদ্ধের পর এই দাক্ষিণাত্যে দুর্ভিক্ষ হয়।

১৭৮৪। সমগ্র উত্তরভারতে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল। অযোধ্যা প্রভৃতি দেশ ১১।১২ বৎসর পূর্বে যেরূপ সমৃদ্ধ ছিল, এই সময়ে তাহার চিহ্ন মাত্র পাওয়া যায় না। দুর্ভিক্ষে মৃত্যুসংখ্যা জানা যায় না।

১৭৯২। ১৭৯১ সালে অতিবৃষ্টির জন্য বোম্বাই, মাদ্রাস ও হায়দ্রাবাদে দুর্ভিক্ষ মারাত্মকরূপে দেখা দেয়। মাদ্রাসে রিলিফ বা সেবাকার্য্য এই বৎসর খোলা হয়। ১৭৯৩ সালে বাংলাদেশে চিরস্থায়ী বন্দবস্ত হয় তারপর হইতে বাংলাদেশে মারাত্মক রকমের দুর্ভিক্ষ খুব কম হইয়াছে।

১৮০২-৩। বৃষ্টির অভাবে এই সময়ে বোম্বাই প্রদেশে দুর্ভিক্ষ ও মাদ্রাসে অকাল দেখা দিল। লর্ড ওয়েলেসলীর সহিত মহরাট্টাদের যুদ্ধের অনতিকালপরেই এই দুর্ভিক্ষ হয়। হোলকার ও তাঁহার পিণ্ডারীর দস্যুদের উৎপাত ও ধ্বংসকার্য্য এই দুর্ভিক্ষের অন্যতম কারণ।

১৮০৩-৪। সমগ্র উত্তরপশ্চিম প্রদেশ ও অযোধ্যাতে দুর্ভিক্ষের পরেই উপর্য্যুক্ত অন্নকষ্ট দেখা দেয়। অযোধ্যা-নবাবের রাজ্যের কিয়দংশ বৃটীশ শাসনাধীনে আসিলে জমি জমার বিলি নূতন করিয়া হয়। খাজনা আদায় সম্বন্ধে ইংরাজ কর্মচারীরা যেরূপ নিষ্ঠা দেখাইতেন মুসলমান আমলের ঢিলাঢাল ব্যবস্থাকালে তাহা সম্ভব হইত না। সরকার বাহাদুর

প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা মাপ করিয়াছিলেন; তা ছাড়া টাকা ধার দিয়া, বাহির হইতে শস্য আমদানী করিয়া প্রজার সুবিধা করিয়াছিলেন।

১৮০৫-৭। মান্দ্রাজের কয়েকটি জেলাতে অন্নাভাব দেখা দেয়। স্যর টমাস্ মন্‌রো এখানকার নূতন জমি বিলিব্যবস্থা করেন। অন্নাভাবের সময়ে সরকার হইতে কোনো সাহায্যের প্রয়োজন হয় নাই। দেশীয় লোকের বদান্যতার উপর গভর্ণর বাহাদুর দুস্থ লোকের সেবার ব্যবস্থা ছাড়িয়া দেন।

১৮১১-১৪। এই কয় বৎসর মাদ্রাস, বোম্বাই ও রাজপুতনায় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়—কোথায়ও বা ভীষণভাবে কোথায়ও বা সামান্য ভাবের আকারে। রাজপুতানার দশাই সবচেয়ে শোচনীয় হইয়াছিল; অনুমান ১৫ হইতে ২০ লক্ষ লোক অনাহারে মারা পড়িয়াছিল। দেশীয় রাজারা ইহার জন্য দায়ী—বৃটীশ সরকার নয়।

১৮৩০। বহু সুবৎসরের পর এই বার উত্তরমাদ্রাসে, দক্ষিণ মহরাঠাদেশে, মৈশূর ও হায়দ্রাবাদে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। গণ্টুর জেলার ৫ লক্ষ লোকের মধ্যে ২ লক্ষ লোক নিঃশেষিত হইবার পর মাদ্রাস গভর্ণমেণ্টের চেতনা হয়; কারণ সরকার বাহাদুর এই আকস্মিক ব্যাপারের জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। এই দুর্ভিক্ষে উক্ত প্রদেশগুলির অনেক জেলার শতকরা অর্দ্ধেক লোক অনাহারে বা অনাহারজনিত পীড়ায় প্রাণত্যাগ করে।

১৮৩৭। এই বৎসরে উত্তর ভারতে দুর্ভিক্ষ হয়। সরকার হইতে এই বার সর্ব্ব-প্রথম 'রিলিফ' কাজ খোলা হইয়াছিল; কিন্তু পীড়িত ও অকর্মণ্যদের সেবার ভার সরকার বে-সরকারী দান সাহায্যের উপর ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। কানপুর অঞ্চলে সরকার হইতে শব ফেলিবার ব্যবস্থা হয়, অনুমান ৮ লক্ষ লোক এই দুর্ভিক্ষে মারা পড়িয়াছিল; ১৮৮০ সালের দুর্ভিক্ষ-কমিশন বলেন যে উক্ত অনুমান কম হইয়াছিল। ১৮৩৮ ও

৩৯ সালে গুজরাট, কচ্ছ ও কাথিবাড়ে অকাল ও ১৮৪৪ সালে দাক্ষিণাত্যে অন্নাভাব হইয়াছিল।

১৮৫৪। মাদ্রাস ও হায়দ্রাবাদের কিয়দংশে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। সরকার এবার 'রিলিফ' কার্য্য খুলিয়া বহু অনাথের প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। নয় মাস ধরিয়া ৫০ হাজার লোক কাজ করিয়াছিল।

১৮৫৭ সালের পর ভারতবর্ষ শাসনের ভার কোম্পানীর হাত হইতে বৃটীশ পার্লামেণ্টের হাতে গেল। সিপাহী বিদ্রোহের পর গোল মিটাইয়া বসিতে বসিতে ভীষণ এক দুর্ভিক্ষ দেশকে আক্রমণ করিল।

১৮৬০-৬১। এই দুর্ভিক্ষ দিল্লী ও আগ্রা অঞ্চলেই ভীষণাকারে দেখা দেয়। সিপাহী বিদ্রোহের পর দেশের রাজনীতি, শাসন-পদ্ধতি ও অর্থনীতি সমস্তের মধ্যেই একটা নাড়া পড়িয়া যায়। উত্তরপশ্চিম প্রদেশের অর্দ্ধেকের উপর রাজস্ব মাপ করিতে সরকার বাধ্য হন। এই দুর্ভিক্ষে আনুমানিক ৫ লক্ষ লোক প্রাণত্যাগ করে। সরকার বাহাদুর দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য যথেষ্ট করিয়াছিলেন। ইহাতে প্রায় ২৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়—ইহার মধ্যে সাধারণে প্রায় ৯ লক্ষ টাকা দেয়। দুর্ভিক্ষান্তে দুর্ভিক্ষের কারণ, কতখানি স্থানে অভাব হইয়াছিল, কত লোক অনাহারে মরিয়া ছিল ইত্যাদি তথ্য সংগ্রহের জন্য সরকার কর্ণেল বেয়ার্ড স্মিথ্ নামে জনৈক বিচক্ষণ কর্মচারীকে নিযুক্ত করেন।

১৮৬৫-৭। উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষ নামে বিখ্যাত; তবে মাদ্রাস বোম্বাই প্রভৃতি প্রদেশেও হইয়াছিল। সর্বসমেত ৪ কোটি ৭৫ লক্ষ লোকের মধ্যে অন্নাভাব দেখা দেয়। উড়িষ্যার কষ্টের তুলনা হয় না। সরকার বাহাদুর দেশের অবস্থা সম্বন্ধে কর্মচারীদের নিকট হইতে ভুল সংবাদ পাইয়াছিলেন। সত্য খবর পাইবার পর উড়িষ্যাতে শস্য পাঠাইবার সময় চলিয়া গিয়াছিল; তখন উড়িষ্যায় রেল হয় নাই। সমুদ্রপথে জ্যৈষ্ঠ মাসে ধান পাঠাইলে উড়িষ্যায় পৌছিল আশ্বিন মাসে। বন্দর হইতে শস্য

দেশের মধ্যে লইয়া যাইবার উপায় ছিল না। ফলে উড়িষ্যার ১০ লক্ষ বা এক-তৃতীয়াংশ অধিবাসী সরকারী রিপোর্ট অনুসারে অনাহারে প্রাণত্যাগ করে। শোনা যায় মাদ্রাসে প্রায় সাড়ে চারি লক্ষ ও অন্যান্য স্থানে প্রায় ১ লক্ষ ৩৫ হাজার লোক মরিয়াছিল। উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষে সরকারের প্রায় ১½ কোটি টাকা নানাভাবে লোকসান হয়। উড়িষ্যায় সরকারী রিলিফে প্রায় ৯৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল এবং দুই বৎসরে প্রায় সাড়ে তিন কোটি পাত ভাত দেওয়া হইয়াছিল, মাদ্রাসে প্রায় ২ কোটি ১০ লক্ষ পাত ভাত বিলি করা হয়।

১৮৬৮—৭০। পূর্ব ও দক্ষিণ অঞ্চলের অভাবের ক্রন্দন থামিতে না থামিতে পশ্চিমে ও উত্তরভারতবর্ষে অনাহারের বিকট রূপ দেখা দিল। রাজপুতানায় ইহা বড়ই তীব্রভাবে হয়। এইখানেই প্রায় ১২ লক্ষ লোক মরিয়াছিল। অন্যান্য প্রদেশেও কেহ কেহ বলেন প্রায় ১২ লক্ষ লোক অনাহারে বা অনাহারজনিত পীড়ায় মারা পড়ে। এবারের দুর্ভিক্ষে কেবল যে মানুষের খাদ্যশস্যের অভাব হইয়াছিল তাহা নহে, গো মহিষের খাদ্য ও জলের অভাব খুব হয়। রিলিফ কার্য্যে ভারত সরকার প্রায় ৫৯ লক্ষ টাকা ব্যয় করেন ও ৭ লক্ষ টাকা সরকার কৃষকদের ধার দেন। এই গেল রাজপুতানা ও আজমীরের কথা। আগ্রা প্রদেশেও প্রায় সর্বসমেত ৩০ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হয়। বৃষ্টির অভাবে এই দুর্ভিক্ষ হয়।

১৮৭৩। বঙ্গ, বিহার, সংযুক্তপ্রদেশের পূর্বদিকে, মধ্যভারতে ও বুন্দেলখণ্ডে দুর্ভিক্ষ হয়। বুন্দেলখণ্ড অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ বড়ই নিদারুণ হইয়াছিল। সেবার বাঙ্গলার গভর্ণমেন্ট খুবই তৎপরতা ও দক্ষতার সহিত রিলিফ কার্য্য করিয়াছিলেন। সরকারের প্রায় ১ কোটি টাকা ব্যয় হয়। এবারে মানুষ বেশী মরে নাই।

১৮৭৬-৭৮। দক্ষিণ ভারতবর্ষ, মাদ্রাস, মৈশূর, হায়দ্রাবাদ

বোম্বাই অঞ্চলে ১৮৭৬ সালে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল ; পর বৎসরে এই মন্বন্তর মধ্যপ্রদেশ, যুক্তপ্রদেশ ও পঞ্জাবে ছড়াইয়া পড়ে। ইতিপূর্বে এরূপ অন্নাভাব কখনো হয় নাই। দুঃখের বিষয় প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট সমূহ রিলিফ কার্য্য সুচারুরূপে চালাইতে পারেন নাই। সরকার বাহাদুর বলিলেন যে মানুষের প্রাণরক্ষা করা কখনই সরকারের দায় বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না। খরচের দিকে না তাকাইয়া জীবনরক্ষার ভার লওয়া সরকারের সাধ্যের বাহির। কাহাকেও অলস হইয়া থাইতে দেওয়াটা নীতিবিরুদ্ধ ; সুতরাং এবিষয়ে খুব কড়াক্কড়ি হওয়াতে ফলটা হইল ভীষণ। দুর্ভিক্ষ কমিশন (১৮৭৮-৮০) অনুমান করেন যে. কেবলমাত্র বৃটীশ ভারতে খুব কম করিয়া ৫২ লক্ষ ৫০ হাজার লোক এই দুই বৎসরে অনাহারে বা অনাহারজনিত পীড়ায় মারা পড়ে। এক মৈশূরেই ১১ লক্ষ লোক মরিয়াছিল।

১৮৭৮-১৮৯৬ সাল পর্যান্ত ভারতে দুইটি দুর্ভিক্ষ ও পাঁচটী অকাল হয় ; তবে সেগুলি সমস্ত দেশব্যাপী হয় নাই, অনাহারে মৃত্যুও হইয়াছিল বলিয়া খবর পাওয়া যায় না।

১৮৯৬-৯৭। বৃষ্টির অভাবে যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বেরার, মাদ্রাস, বোম্বাই, বাংলা, বিহার, মধ্যভারত, রাজপুতানা, পঞ্জাব, বর্মা প্রভৃতি দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। বৃটীশভারতেই ৬ কোটি ২৫ লক্ষ লোক অভাব-গ্রস্ত হয়। সরকার প্রায় ৭১/২ কোটি টাকা রিলিফে, ১১/৪ কোটি টাকা খাজনা মাপে, ১১/৪ কোটি টাকা ঋণদানে ব্যয় করেন। এক মধ্যপ্রদেশ ব্যতীত অন্য সকল প্রদেশেই রিলিফের কার্য্য খুব ভাল হইয়াছিল। কেহ কেহ অনুমান করেন বৃটীশভারতে ৫০ লক্ষ লোক মরিয়াছিল। সরকারী কমিশন বলেন এরূপ দুর্ভিক্ষ পূর্বে ভারতে কখনো হয় নাই। সরকারী ইংরাজ কর্মচারীগণ দুর্ভিক্ষের সময়ে কলেরা প্রভৃতি মহামারী ব্যাধির সহিত কি ধীরভাবে সংগ্রাম করিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে বিস্ময়

লাগে। সমস্ত কর্ম্মচারী প্রাণভয়ে পলাইয়াছে কিন্তু ইংরেজ কর্ম্মচারী প্রাণ দিয়া নিজের কর্ত্তব্য করিয়াছেন।

১৮৯৯-১৯০০। পূর্ব্বোক্ত দুর্ভিক্ষের জের মিটিতে না মিটিতে ১৮৯৮ সালে আজমীঢ়ে অকাল দেখা দিল ও পর বৎসরে মৈসুমবায়ুর অভাবে পশ্চিম ও মধ্যভারতে ভীষণ রকম দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। দেশীয় রাজ্যদের মধ্যে হায়দ্রাবাদ, কাথিবাড়ে দুর্ভিক্ষ হয়। বৃষ্টি অন্যান্য বৎসরের তুলনায় ১১ ইঞ্চি কম হয়। ১৯০০ সালে এপ্রিল মাসে প্রায় ৬২ লক্ষ লোককে রিলিফকাজ দিতে হইয়াছিল। সরকারী কমিশন অনুমান করিলেন প্রায় ১২ লক্ষ ৩৫ হাজার লোক মারা পড়ে, গো-মহিষও বিস্তর মরে। সরকারের প্রায় ১০ কোটি টাকা ব্যয় হয়।

১৯০১-১৯০৭। পর্য্যন্ত আট বৎসরের মধ্যে বড় রকমের দুর্ভিক্ষ না হইলেও প্রাদেশিক দুর্ভিক্ষ ও অন্নাভাব অনেকবার হইয়াছিল। ১৯০৭ সালে ভারতে প্রায় ৭০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য কম উৎপন্ন হয়। সরকার বাহাদুর ২ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা চাষীদের অগ্রিম দেন।

বিংশ শতাব্দীতে ছোট ছোট দুর্ভিক্ষ অনেকগুলি হইয়াছে। ১৯১৩-১৪ সালে যুক্তপ্রদেশে যথাসময়ে বৃষ্টি না হওয়ায় ১৭ হাজার বর্গ মাইল স্থানে দুর্ভিক্ষ ও ৩০ হাজার বর্গ মাইল ব্যাপিয়া অকাল দেখা দেয়; কিন্তু সরকারী রিলিফের কার্য্য খুবই ভাল চলিয়াছিল বলিয়া ইহা মারাত্মক হয় নাই। ১৯১৪ সালে বাংলাদেশের বাঁকুড়াজেলার দুর্ভিক্ষের কথা অনেকের স্মরণ আছে। যুদ্ধের কয়েক বৎসর দেশের চারিদিক হইতে নিদারুণ অভাবের কথা শোনা গিয়াছিল। ১৯২০ সালের পুরীর দুর্ভিক্ষ সেদিন শেষ হইয়াছে।

পূর্ব্বোল্লিখিত বর্ণনা হইতে দেখা যায় যে দুর্ভিক্ষ ভারতবর্ষে চিরদিন হইয়া আসিতেছে এবং এখন পর্য্যন্ত তাহা কমে নাই। ১৮৮০ সালের দুর্ভিক্ষ কমিশন বলেন যে গড়ে প্রত্যেক সাতটি সুবৎসরে দুইটি করিয়া

দুর্বৎসর হয়। আর দুর্ভিক্ষের সময়ে প্রায় বারভাগের একভাগ লোক অভাবগ্রস্ত হয়। কতকগুলি প্রদেশে সহজেই অভাব হয়, কিন্তু ভারতবর্ষে এমন বৎসর যায় না যখন কোথায় না কোথায় দুর্ভিক্ষ অল্প বিস্তর না থাকে। বড় বড় দুর্ভিক্ষ কয়েক বৎসর অন্তর হয়, কিন্তু সেইরূপ ভীষণ মন্বন্তর হইবার পূর্ব্বে আভাষ পাওয়া যায়।

দুর্ভিক্ষের প্রধান ও প্রথম কারণ বৃষ্টির অভাব; যেবার সময় মতো বৃষ্টি হইল না অথবা বারিপাত কম হইল সেবারই শস্যের অভাব হয়। শস্যের দাম চড়িতে থাকে, এবং শ্রমজীবিদের মধ্যে যাহারা সাধারণতই শ্রমবিমুখ তাহারা গিয়া ভিক্ষুকের দল পুষ্টি করে। সঙ্গে সঙ্গে ঋণ দুর্লভ হয় ও ভিক্ষার অভাব দেখা দেয়। চুরি ডাকাতি বাড়িতে থাকে এবং বেশ একটা চঞ্চলতা দেখা যায়। খাদ্যাভাবে দেশের স্বাস্থ্যহানি এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে কোনো প্রকার সংক্রামক ব্যাধির আগমন দুর্ভিক্ষের প্রথম সূচনা জানাইয়া দেয়।

সরকার বাহাদুর বহুবার দুর্ভিক্ষের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। বর্ত্তমানে কোন্ প্রদেশের কোথায় দুর্ভিক্ষ হইলে কি ব্যবস্থা করিতে হইবে, তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দুর্ভিক্ষ আইন পুস্তকে (Famine Code) লিপিবদ্ধ আছে। ইহাতে প্রত্যেক সরকারী কর্ম্মচারীর কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত আছে। দুর্ভিক্ষের সূচনা হইলেই সরকার নিম্নলিখিত কার্য্যগুলি করেন। পুরাণো কূপগুলি ঝালাই, নূতন কূপ খনন ও গ্রামের অন্যান্য উন্নতির জন্য সরকার বাহাদুর প্রচুর অর্থ অগ্রিম দেন; বে-সরকারী সাহায্য লাভ করিবার জন্য জেলার কর্ম্মচারীরা চেষ্টা করেন; আগামী বৎসরের জন্য বীজ কিনিতে টাকা অগ্রিম দেওয়া হয়; অসহায় পথিককে উদ্ধারের জন্য পুলিশের হাতে কিছু টাকা দেওয়া থাকে; লোকের যথার্থ অভাব হইয়াছে কি না জানিবার জন্য সরকার বাহাদুর কাজ করিতে ডাকেন; ইহাকে Test work বা

'যাচাই কাজ' বলা হয়। বড় বড় সহরে দরিদ্রাবাস খোলা হয়। রাজস্ব মাপ সম্বন্ধে খোঁজ খবর লওয়া সুরু হয়; প্রত্যেক জেলা বা প্রদেশের মধ্যে রিলিফ-এলাকা তৈয়ারী করা হয়। গো-মহিষাদির খাদ্য বা জলাভাব হইলে সরকার বাহির হইতে পশুখাদ্য আমদানী করিবার ব্যবস্থা করিয়া সাহায্য করেন।

'যাচাই কাজের' উদ্দেশ্য দুর্ভিক্ষ দমন নয়, লোকের যথার্থ অবস্থা জানিবার ইহাই একমাত্র উপায়। অভাব যদি সত্য হয় তবে সেই যাচাই কাজকে রিলিফ-কাজে পরিণত করিয়া যথাবিধি সাহায্য দান করা হয়। যাহারা কাজ করিতে আসে তাহাদের সামর্থ্য ও প্রয়োজন অনুসারে ফুরান বা মজুরী হিসাবে পয়সা দেওয়া হয়। দুর্ভিক্ষের সময়ে যে মজুরী দেওয়া হয়, তাহা দেহকে কোনো প্রকারে বাঁচাইয়া রাখিবার পক্ষেই উপযুক্ত। এ ছাড়া অনেক লোককে বিনাশ্রমেই খাইতে দেওয়া হয়। এই শ্রেণীর দরিদ্রাবাসে অনাথ ও অক্ষম লোকে আহার্য্য বা খোরাকী পায়। দরিদ্রাবাসে বহু ভিক্ষুক সেই সময়ে আসিয়া জোটে; এ ছাড়া অনেকে জাত্যাভিমানে শারীরিক শ্রম করে না—তাহারা দরিদ্রাবাসে আসিয়া জোটে।

সরকারী এই সব কাজ ছাড়া খৃষ্টান মিশন, ব্রাহ্ম মিশন, রামকৃষ্ণ মিশন আর্য্য মিশন ও অন্যান্য অনেক ভারতীয় সেবাসমিতি দুর্ভিক্ষের সময়ে কাজ করেন। বৃষ্টি আরম্ভ হইলে সরকার কৃষকদের টাকা কর্জ্জ দিয়া আস্তে আস্তে রিলিফ কাজ ওঠান।

ভারতবর্ষের দুর্ভিক্ষের কারণ প্রাকৃতিক ও আর্থিক। প্রাকৃতিক কেন তাহা আমরা পূর্ব্বে বহুবার বলিয়াছি। বৃষ্টিই কৃষির প্রাণ; সেই বৃষ্টি কম হইলে দুর্ভিক্ষ অনিবার্য্য হয়। সেই হেতু জলসেচনের ব্যবস্থা করিবার জন্য খাল তৈয়ারীর প্রয়োজন এত অধিক। ১৯০১ সালের দুর্ভিক্ষ কমিশন বলিয়াছিলেন যে, সকল প্রদেশে বড় বড় খাল খনন করা সম্ভব না হইলেও ছোট ছোট খাল ও জলাশয় খনন করিবার অনেক কাজ

বাকি আছে। এ ছাড়া 'শুষ্কচাষ,' বৈজ্ঞানিক উপায়ে দেশমধ্যে প্রবর্ত্তনের চেষ্টা হওয়া দরকার। অনেক সময়ে ভীষণ বন্যায় শস্য ক্ষেত নষ্ট হইয়া যায় ; জল চলাফেরার পথ পরিষ্কার থাকিলে এমন বন্যা হইতে পারে না। পঙ্গপালের উৎপাতেও বহুবার শস্য নষ্ট হইয়াছে।

দুর্ভিক্ষের প্রাকৃতিক কারণগুলি খুব বড় হইলেও এই গুলিই প্রধান নয়,—ইহার প্রধান কারণ আর্থিক। শস্যের অভাব স্থানে স্থানে হয়—কিন্তু শস্যের অভাবে লোকে মরে না, লোকে মরে শস্য কিনিবার টাকার অভাবে। বস্ত্রের অভাবে যখন কোনো স্ত্রীলোক আত্মহত্যা করে, তখন স্থানীয় বাজারে কাপড়ের অভাব দেখা যায় না, তেমনি অর্থের অভাবে লোকে শস্য কিনিতে পারে না। শস্যের অভাবে মরে না। সুবৎসরে চাষী বাঁচিয়া থাকে, অকালের দিনে তাহার বাঁচিবার উপায় নাই। ভারতবর্ষের দারিদ্র্য প্রবাদগত। দুর্ভিক্ষের সময়ে ভিক্ষা দেয় নাই এমন সুসভ্যজাতি পৃথিবীতে নাই। ১৯১৮ সালের দুর্ভিক্ষের সময়ে কানাডার টরেণ্টোবাসীরা অভাবগ্রস্ত লোকের জন্য টাকা তুলে; কিন্তু তাহারা ভারতের দারিদ্র্যের চিত্র নাকি খুব অতিরঞ্জন করিয়া বর্ণনা করিয়াছিল বলিয়া ভারত-সচিব তাঁহাদের দান গ্রহণ করেন নাই। ভারতবর্ষের সাধারণ লোকের একমাত্র ব্যবসায় ও উপজীবিকা কৃষি। কেবল কৃষি করিয়া জাতি বাঁচিতে পারে না। আমাদের শিল্পকলা ধ্বংস হইয়াছে—তাঁতি;কামার, কুমার, ছুতার সকলেই চাষ করিতেছে। শিল্প ও কৃষির মধ্যে সামঞ্জস্য নাই। একজন কৃষক বৎসরের অধিকাংশ সময় হয় বসিয়া না হয় সামান্য দিন মজুরী করিয়া কাটায়—কোনো শিল্প তাহার জানা নাই। এমন কি তাঁতির ছেলে তাঁতের কাজ জানে না বা শিখিতে চায় না ; কারণ কাপড় বুনিয়া তাহার পোষায় না। কয়েকজন মাত্র লোক ধনী ও ব্যবসায়ী হইলে ভারতের এই দারিদ্র দুঃখ দূর হইবে না। যুদ্ধের

সময়ে অনেকে ধনী হইয়াছেন। তাহাদের অর্থ দেখিয়া যদি কেহ বলেন যে দেশের দারিদ্র কমিয়াছে তবে তাঁহারা সত্যদৃষ্টি হইতে বঞ্চিত হইলেন। সরকার বাহাদুর দেশের দারিদ্র্য যাহাতে দূর হয় সে জন্য জলসেচনের জন্য বিস্তর টাকা ব্যয় করিয়াছেন; শিল্পবিভাগ উন্নতিকল্পেও বহু অর্থ ব্যয় করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন; কৃষির দিকে তাঁহাদের সুদৃষ্টি পড়িয়াছে; কিন্তু সরকার বাহাদুর যেমন চেষ্টা করিতেছেন দেশের লোকেও তাহার উপযুক্ত হইবার চেষ্টায় পিছপাও হইলে চলিবে না। সেই চেষ্টার নাম 'কো-অপারেশন' বা সমবায় বা একজোট হইয়া লেন-দেন করিবার শক্তির বিকাশ।

১৯০০ সালে জয়পুরের মহারাজা ১৬ লক্ষ টাকা সরকার বাহাদুরের হাতে দিয়া একটি দুর্ভিক্ষ-তহবিল খুলিতে বলেন। সেই টাকা হইতে দুর্ভিক্ষ আক্রান্ত প্রদেশগুলিকে রক্ষার চেষ্টা হয়। বর্ত্তমানে সেই তহবিলে প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা জমিয়াছে।

১০। সমবায় ও যৌথ ঋণদান সমিতি

জগতের অতীত ইতিহাস—প্রতিদ্বন্দ্বিতা, প্রতিযোগিতা ও বলবানের উৎকর্ষ সাধনের ইতিহাস। জগতের ভবিষ্যৎ ইতিহাস সহকারীতা, সহযোগিতা ও আপমর সাধারণের আনন্দ দিবার জন্য প্রয়াসের ইতিহাস। বর্ত্তমানজগৎ অতীতের দ্বন্দের যুগ ত্যাগ করিয়া ভবিষ্যতের সাম্যের যুগে যাইতেছে বলিয়া চারিদিকে এমন বিভীষিকা। ভারতবর্ষেরও উন্নতি নির্ভর করিতেছে সেই সময়ায় ও সহকারিতার উপর।

ভারতবর্ষ দরিদ্র দেশ, এখানকার শতকরা ৭২ জন লোক কৃষি-জীবি, সুতরাং তাহাদের উন্নতিতেই জাতির কল্যাণ। কৃষি ও কৃষকের দশা আমাদের দেশে ভাল নয়। টাকা ধার করিবার সুযোগ সুবিধা না থাকিলে কেনো দেশেই চাষের কাজ ভালরূপে চলিতে পারে না। ছোট ছোট জোতদার ও কৃষকের টাকার প্রয়োজন খুবই বেশী এবং সেই জন্যই দেখা যায় পৃথিবীর সর্বত্র তাহারাই দুঃসহ ঋণের ভারে মারা পড়ে। যাহারা জমির মালিক ও চাষী আমাদের দেশে সেই শ্রেণীর ছোট ছোট জোতদারের সংখ্যাই বেশী এবং অধিকাংশ কৃষকই মহাজনের কাছে ঋণী। আমাদের চাষীদের শতকরা ৭৪ জনের কিছু না কিছু ঋণ আছে। পঞ্জাবের কো-অপারেটিভ সোসাইটির রেজিষ্ট্রার কৃষিজীবিগণের ঋণবৃদ্ধি সম্বন্ধে তদন্ত করিয়া দেখিয়াছেন যে বড় বড় জমিদারগণ যে পরিমাণে রাজস্ব গভর্ণমেণ্টকে দিয়া থাকেন, তাঁহাদের দেনা তাহার সাত গুণ। কিন্তু ছোট ছোট জমিদারের (অর্থাৎ যাহাদের পঁচিশ বিঘা জমি আছে) দেনা তাহাদের দেয় রাজস্ব হইতে আটাশ গুণ বেশী! সমগ্র পঞ্জাবের কৃষিজীবিদের দেনার সমষ্টি ত্রিশ হইতে পঁয়তাল্লিশ কোটি টাকা। ১৮৯৫ সালে মাদ্রাস প্রদেশ সম্বন্ধে ঐরূপ তদন্তের ফলে জানা গিয়াছিল যে দেনার সমষ্টি ছিল এক কোটি ত্রিশ লক্ষ পাউণ্ড বা ১৩ কোটি হইতে ১৯ কোটি টাকা। ভারতবর্ষের ঠিক দেনার সমষ্টি কত হইবে তাহা জানা নাই, তবে কেহ কেহ অনুমান করেন মোট ঋণ প্রায় পাঁচ শত কোটি টাকা হইবে। ইহা অসম্ভব নয়, কারণ বাংলাদেশের এক ফরিদপুর জেলার কৃষিজীবির মোট ঋণ দেড় কোটি টাকা বা প্রতি কৃষক পরিবারের ঋণ গড়ে প্রায় ১২১৲ টাকা ছিল —সেও ১৯০৬ সালে। বোম্বাই প্রদেশের একটি কৃষিপল্লীর অবস্থা তদন্ত করিয়া তৎকালীন কৃষিবিভাগের অধ্যক্ষ ম্যান্ সাহেব বলিয়াছিলেন যে প্রত্যেক কৃষক পরিবারের ঋণ ১১৮৲ টাকা। ব্যাপারটি খুব ভাবনার

বিষয় বলিয়া সরকার বাহাদুর খুবই চিন্তিত ; কেন না যতদিন কৃষক ঋণভারে প্রপীড়িত থাকিবে, ততদিন তাহাদের আর্থিক বা নৈতিক উন্নতির আশা অল্প। অথচ মূলধন নাই বলিয়া তাহাদের ঋণ করা ছাড়া কোনো উপায় নাই। মহাজনকে বাদ দিয়া ভারতবর্ষে কৃষিকর্ম চলিতে পারে না। সকল প্রকার সুখ দুঃখের এক মাত্র সহায় গ্রামের 'মহাজন।' মহাজন সম্বন্ধে অনেক বিরুদ্ধ কথা শুনা যায়—কিন্তু এই মহাজনের অভাবে চাষ বন্ধ হইয়া যায়। চাষীরা মহাজনের কাছ হইতে কখন টাকা বা কখন বীজ কর্জ করে। অধিকাংশ প্রজা মাঠের ফসল বন্ধক দিয়া টাকা লয়। ধান উঠিলে ঋণশোধ করিয়া যদি কিছু থাকে ত' সে ঘরে তোলে, তারপর সারা বৎসর মজুরী করিয়া কোনো রকমে চালায়; আবার চাষের সময় ঋণ করে। এইরূপেই তাহার জীবন কাটে। যাহাদের অল্পস্বল্প জমি আছে, তাহারা মহাজনের কাছে সহজেই ঋণ পায়। অনায়াসে ঋণ করিবার সুযোগ পাইয়া ইহারা অমিতব্যয়ী হইয়া পড়িয়াছে এবং ইহার ফলে ঋণের দায়ে সমস্ত জমি মহাজনের হাতে পড়িয়াছে।

মহাজন সাধারণত কৃষকের নিকট হইতে অতিরিক্ত হারে সুদ আদায় করিয়া থাকে। সুদের হার স্থান ও পাত্রভেদে কমবেশী হয়; সুদ শতকরা বার্ষিক ৩৭৷৷০ টাকা হইতে ১৫০্ পর্য্যন্ত আদায় করা হয়। কোনো কোনো অঞ্চলে ১৮্ হইতে ৩০্ টাকার বেশী লওয়া হয় না। মহাজনের কাছ হইতে ৯৯্ টাকা লইয়া ৬,০০০্ টাকা ডিক্রি পাইয়াছে, ৯৯্ টাকা ধার দিয়া ৪,০০০্ সুদে আসলে দাবী করিয়া ৫৮৫্ টাকা ডিক্রি পাইয়াছে এরূপ আরও অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়।

চাষবাসের ফলাফলটা কিছু অনিশ্চিত এবং কৃষকের ঋণ শীঘ্র আদায় না হইবার আশঙ্কা থাকায় তাহাকে টাকা ধার দিতে গিয়া

মহাজন অধিক সুদ হাঁকিয়া বসে। তা ছাড়া অধিকাংশ মহাজনের মূলধনও অল্প। ভাল করিয়া চাষবাস করিতে যে টাকা প্রয়োজন হয় মহাজন তাহা দিতে পারে না বা দেয় না। এই কারণে ইচ্ছা থাকিলেও চাষী কৃষি-উন্নতির জন্য কিছু করিতে পারে না।

বহুকাল হইতে ভারতীয় কৃষকের ঋণভার লাঘব করিবার নানা প্রকার প্রস্তাব গভর্ণমেণ্টের মনে উদয় হইয়াছে। বিশেষতঃ যতবার দুর্ভিক্ষ হইয়াছে ততবারই তাঁহারা একটা কিছু করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়াছেন; কিন্তু ঠিক পথ নির্দেশ করিতে না পারিয়া অন্ধকারে পথ হাতড়াইয়া বেড়াইয়াছেন। ১৯০১ সালে লর্ড কর্জ্জনের আমলে দুর্ভিক্ষ কমিশন বলিলেন যে কৃষকের ঋণভার লাঘব করিবার জন্য ও চাষ বাসের উন্নতির জন্য টাকা ধার দিবার সহজ পথ করিয়া দেওয়ার প্রয়োজন। ইহার পূর্বে যেসকল আইন কানুন হইয়াছিল তাহাতে দেশের ব্যাধির যথার্থ প্রতিকার হয় নাই তাহা সাময়িক উপশমের জন্য প্রলেপের মতো কাজ করিত। লর্ড কর্জ্জন ১৯০৪ সালে যৌথ-ঋণদান সমিতি স্থাপনের এক আইন মঞ্জুর করিলেন।

প্রধানতঃ কৃষকদের পক্ষে সহজে ঋণ পাওয়ার কিছু সুবিধা করিয়া দেওয়াই এই আইনের উদ্দেশ্য। যাহাতে পল্লীর সূত্রধর, কর্মকার কুম্ভকার প্রভৃতি শিল্পীগণও টাকা পাইতে পারে সেই দিকে দৃষ্টি রাখা হইল। প্রত্যেক প্রদেশে একজন করিয়া 'রেজিষ্ট্রার' নিযুক্ত হইল এবং কাজ সুরু করার মত মূলধন ভারত সরকার দান করিলেন। তবে ব্যাঙ্কের অংশ বিক্রয় করিয়া ও জনসাধারণের গচ্ছিত টাকা লইয়া উহাকে চালাইবার ইচ্ছা সরকারে ছিল। ১৯১৫-১৬ সালে মোট মূলধন ছিল ১০, ৩২, ৬৭, ১৪৯ টাকা; ইহার মধ্যে ১১ লক্ষ টাকা রাজকোষ হইতে ধার দেওয়া হইয়াছিল, বাকি সমস্তই অংশ বিক্রয়লব্ধ ও গচ্ছিত টাকা। ১৯০৪ সালের পর ১৯১২ সালে কো-অপারেটিভ বা সমবায় সম্বন্ধে আইন নূতন

করিয়া প্রণীত হয়। আমরা নিম্নে সরকারী পুস্তক 'ভারত বিবরণী' হইতে যৌথ-সমাজ সম্বন্ধে কিছু অংশ উঠাইয়া দিতেছি :—এই যৌথ সমাজ অনুষ্ঠানটির বিস্তৃতির কোন সীমা নাই বলিলে চলে। এখনও সমগ্র ভারতবর্ষে তেত্রিশ হাজার সমাজও স্থাপিত হয় নাই। ইহাদের মধ্যে ২৯,০০০ সমাজ কৃষিকার্য্য সংক্রান্ত। ভারতবর্ষে অনেক বিষয় ভাঙ্গিয়া নূতন গড়িতে হইবে, সেই পুনর্গঠনে যৌথ-সমাজ অনেক কাজে লাগিবে। অবশ্য এই অনুষ্ঠান যাহাতে ঠিক পথে চালিত হয় তজ্জন্য গভর্ণমেণ্ট সর্ব্বশেষে দায়ী। কিন্তু সাধারণের মনে একটা ইচ্ছা জাগিয়াছে, যে ইহা বেসরকারী ব্যক্তিদিগের দ্বারাই পরিচালিত হয়। এটা সুলক্ষণ সন্দেহ নাই। মান্দ্রাজে অস্পৃশ্য জাতিবর্গের মধ্যে ইহার বিশেষ প্রসার হইতেছে। এ প্রদেশে যৌথ সমাজগুলির সভ্যসংখ্যা আড়াই লক্ষ * * বঙ্গপ্রদেশে যৌথসমাজের সংখ্যা ছিল ৩৯২৩; পূর্ব্ব বর্ষাপেক্ষা ৫০০ বাড়িয়াছিল। সভ্যসংখ্যা ১লক্ষ ৩৫ হাজার। পঞ্জাবপ্রদেশে কৃষিজীবিগণের যৌথ সমাজের সংখ্যা ৩৯৩৭ হইতে ৫২২৮ উঠিয়াছিল। উক্ত প্রদেশে ১৪টি জেলায় ১৪৮টি যৌথসমাজ দশ বৎসর হইতে কাজ করিতেছে। ইতিমধ্যে সভ্যগণের মধ্যে সিকি ভাগের অধিক এখন সমবায়ের কল্যাণে সম্পূর্ণ রূপে ঋণমুক্ত হইয়াছে। লাহোর জেলার মধ্যে অনেকগুলি যৌথসমাজ সামাজিক ব্যাপারে কতকগুলি অসঙ্গত ধুমধামে অন্যায় ব্যয় করিতে নিষেধ করিয়া আইন করিয়াছে। এইরূপ অনেক জনহিতকর নিয়ম দেশের নানা স্থানে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। বোম্বাইএ যৌথ সমাজের সংখ্যা ও তাহাদিগের মূলধন দ্রুত বাড়িয়া চলিয়াছে। ১৯১৯ সালে সমাজের সংখ্যা দুই হাজারের অধিক ছিল ও মূলধন এক হইতে দেড় কোটির মধ্যে। এখানে অনেক বেসরকারী দক্ষ লোক পাওয়া যায় ও সেইজন্য উক্ত প্রদেশে এই শুভ অনুষ্ঠানের এত প্রসার হইয়াছে। যুক্ত প্রদেশে ২৮৭৬ হইতে ৩১৮৬ তে উঠিয়াছিল, কিন্তু সভ্যসংখ্যা ৯২

হাজারাই আছে, তবে তাহাদের টাকা বাড়িয়াছে। বিহার-উড়িষ্যা প্রদেশে যৌথ-সমাজের সংখ্যা ছিল ২০৪৪। বস্তুতঃ যৌথ সমাজের স্থাপনা কেবল টাকা ধার দিবার জন্য নহে, অন্যান্য উদ্দেশ্যে উৎসাহ প্রাপ্ত হইয়াছিল। দোকানদার জিনিষ পত্রের দাম অত্যন্ত বাড়াইয়া দিলে, যৌথসমাজ মাল কিনিয়া গুদমজাত করিয়া সস্তায় বেচিয়া সভ্যগণকে অনেক সুবিধা করিয়াছিল।'

যৌথসমাজের একমাত্র কাজ ঋণদান নয়; চাষীরা জোট বাঁধিয়া সার, লাঙ্গল, বীজ খরিদ করিতে পারে; ব্যয়সাপেক্ষ বৈজ্ঞানিক কৃষিপদ্ধতি অনুসরণ করিতে পারে; ফসল গোলাজাত করিতে, গরু বাছুরের উন্নতি বিধান করিতে পারে। দালাল আসিয়া তাহাদের মধ্যে দাঁড়াইয়া বেশীর ভাগ লাভ করে, চাষীরা একত্র হইয়া এক স্থান হইতে অন্য স্থানে ধান, গম, শস্য, তরীতরকারি, ডিম প্রভৃতি জিনিষ চালান করিতে পারে। আবার সহর হইতে জিনিষ পত্র কিনিয়া নিজেদের জন্য আনিতে পারে। এই বেচা ও কেনা দুইই যৌথ সমাজের দ্বারা হইতে পারে। মাঝে পড়িয়া যাহারা কৃষকের সর্বনাশ করিতেছে তাহাদের সুদিন চলিয়া যাইবে; প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও প্রতিযোগিতায় পৃথিবীর মুক্তি নাই, ভারতেরও নাই। সহকারিতা ও সমবায়তায় ভারতের মুক্তি।

"সমবায়তা একদিকে রাষ্ট্রপ্রধান সমাজতন্ত্রের নির্জীব অবিচ্ছন্নতায় অপরদিকে একান্ত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের নিষ্ফলতায় আঘাত করে, একদিকে রাষ্ট্রচেষ্টার মধ্যে মানুষের স্বচেষ্টার অবসাদকে অপরদিকে ব্যক্তিগত দৌর্বল্যের মধ্যে সমষ্টিগত শক্তির বিক্ষেপকে নিরস্ত করিয়া দেয়।"

* Co-operation strikes at the same time at the dead abstractions of the socialistic State and at the sterility of individualism, that corrosion of energy, that dispersion of collective force in individual frailties.—Romain Rolland. কৃষি উন্নতি হইতে উদ্ধৃত।

এই পুস্তক রচনা করিতে যে যে পুস্তকের সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে তাহাদের তালিকা।

সাধারণ।

1. Imperial Gazeteers Vols. I—IV (Physical, Historical, Economic, Administrative).
2. Indian Year Book 1915-1921 (Times of India).
3. Economics of British India (4th Ed.) Jadunath Sirkar.
4. Indian Economics—Pramathanath Banerji.
5. The Foundations of Indian Economics—Radhakamal Mukherji.
6. Indian Economics—V. G. Kale.
7. Census Reports—India 1901, 1911.
8. Census Reports of Bengal 1901, 1911.
9. Statement of Moral and Material Progress (1901-1911)—Decennial Report (Blue book).
10. India in 1917-18, 1919, 1920—Rushbrook Williams.

প্রাকৃতিক।

11. India—T. H. Holdwich (Oxford, 1904).
12. Bengal, Bihar, Orissa & Sikkim—T. S. O'Malley (Cambridge, 1917).
13. The Oxford Survey of the British Empire (Asia).

14. Peoples of India—H. H. Risley.
15. Indo-Aryan Races, Part I—R. P. Chanda.
16. Castes (E. R. E.)—E. A. Gait.
17. প্রবাসী ভারতবাসী (হিন্দি)।
18. Population Problem in India.
19. Indentured Labour in Fizi.
20. Essays on Indian Economics—M. G. Ranade.
21. Report of the Commission sent to Trinidad, British Guinea etc. (2 Vols).
22. Public Service Commission Report.

দ্বিতীয় ভাগ।

23. Indian Unrest—Valentine Chirol.
24. History of Indian Nationalist Movements —Lovet Fraser.
25. Sedition Committee Report.
26. How India wrought her freedom—Annie Besant.
27. Uplift of India—Annie Besant.
28. Indian National Evolution—A. C. Mazumdar.
29. Bengal under Lieutenant Governors (2 Vols) —Buckland.
30. Oxford History of India—V. A. Smith.
31. Indian National Congress—published by Natesan & Co.
32. মহাত্মা গান্ধী।
33. রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ-সমাজ—শিবনাথ শাস্ত্রী।

34. Modern Religious Movement of India—Farquhar.
35. History of the Brahmo Samaj—Sivanath Sastri.
36. Arya Samaj—Lala Lajpat Rai.
37. বাঙ্গলা সামায়িক সাহিত্য—কেদারনাথ মজুমদার।
38. Hundred years of Bengali Press—P. N. Bose.
39. Centenary Volume of the Asiatic Society of Bengal (1887).

তৃতীয় ভাগ।

40. Indian Administration—V. G. Kale.
41. Report of Indian Constitutional Reforms (1918).
42. Franchise Committee Report.
43. Joint Committee Report.
44. বঙ্গে ইংরাজ শাসন—চন্দ্রনাথ কর।
45. Baroda Administration Reports.
46. Mysore Administration Reports.
47. Village Comunity in India—Badenpowel.
48. Village Self-Government in India—John Mathai.
49. Economic History of British India (2 vols.)—R. C. Dutt.
50. Poverty and Un-British Rule in British India—Dadabhai Naoroji.
51. Prosperous British India!—W. Digby.

52. হিন্দুজাতির শিক্ষা (২য় খণ্ড)—উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।
53. Reconstructing India—Sir M. Visveswarray.
54. The Indian Annual Register (1919).
55. Quinqennial Reports on Education of India.
56. Esher Committee Report,
57. History of Indian Shipping—R.K. Mukherji.
58. Prices and Wages of India—K. L. Dutt.
59. Ways & Works of India—G. W. MacGregor
60. ভারতবর্ষের কৃষি উন্নতি—নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।
61. Hondbook of Indian Munitions Board—T. Hoiland.
62. Handbook of Commercial Intelligence—W. E. Cotton.
63. Industrial Commission Report & Appendices.
64. Railway Administration Report (1915). (Indian Railway Series by Fardun K. Darchanji) No. I.
65. Indian Railway Policy—Sir G. L. Moles-Survey worth.
66. Quinquennial Reports of the Geological of India.
67. Geology of India—D. N. Wadia.
68. Dictionary of Economic Products—Watt.
69. Co-operation in India—H. Wolff.
70. Deccan Village—Harold Mann.

71. The Economic life of a Bengal District—Jack.
72. ভারত বিবরণী।
73. Open letters to Lord Curzon—R. C. Dutt.
74. প্রবাসী।
75. Modern Review.

তৃতীয় ভাগ

১। ভারত শাসন প্রণালী

ইষ্টইণ্ডিয়ান কোম্পানীর জন্ম।

১৬০০ খৃষ্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বর অর্থাৎ ইংল্যাণ্ডের রাণী এলিজাবেথ ও ভারতের সম্রাট আকবরের মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্বে লণ্ডন নগরের দুই শত লোক 'ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী' নামে একটী যৌথকোম্পানী প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহারা রাণী এলিজাবেথের নিকট উত্তমাশা অন্তরীপ হইতে ম্যাগেলান প্রণালী পর্য্যন্ত সমগ্র প্রদেশের একচেটিয়া বাণিজ্যের অনুমতি প্রাপ্ত হন।

ইংরাজ সম্বন্ধের যুগ-বিভাগ।

তারপর হইতে আজ পর্য্যন্ত ইংল্যাণ্ডে ও ভারতবর্ষের সম্বন্ধের ইতিহাসকে নিম্নলিখিত তিনভাগে ভাগ করা যায়:—

(১) ১৬০০-১৭৫০। এই দেড় শত বৎসর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতীয় রাজাদের অনুগ্রহে ফরাসী, পর্ত্তুগীজ ও ওলন্দাজ কোম্পানী সমূহের প্রতিযোগিতায় কোন প্রকারে কেবলমাত্র বাণিজ্য ব্যবসায়ে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছিল।

(২) ১৭৫০-১৮৫৭। ইংরাজ বণিক ক্রমশঃ রাজ্য জয় করিতে লাগিল এবং ইংরাজ রাজার সঙ্গে অংশী বা প্রতিনিধি ভাবে এই রাজ্য শাসন করিতে লাগিল। ধীরে ধীরে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্য অধিকার ও উপযোগিতা চলিয়া গেল।

(৩) ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের পর ইংরাজ রাজ নিজেই রাজ্যশাসনের সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করেন।

---

* শাসন-সংস্কার হইবার পূর্বের অবস্থা এখানে বর্ণিত হইয়াছে।

এই ইতিহাসের প্রথম দেড়শত বৎসর এই অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় নয়—কারণ এই সময় ইংরাজ বণিক; ভারত শাসনের কোন অধিকার পায় নাই।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতে মোগল রাজত্ব টলটলায়মান; ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে মোগল সম্রাটের প্রতিনিধি এবং অধীনস্থ রাজগণ এবং নব উদীয়মান যোদ্ধৃরাজগণ স্বাধীনতা ঘোষণায় ব্যস্ত এবং স্বীয় স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষার জন্য পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যাপৃত। ভারতের এই অরাজকতা এবং বহু রাজকতার সময় ইংরাজ বণিকও আত্ম-রক্ষা বা আত্মোন্নতির জন্য সর্ব্বদাই কোন না কোন পক্ষ অবলম্বন করিতেন।

ইংরাজ বণিকের রাজ্যজয়

এই সময় হইতেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সৈন্য এবং সেনাপতি দ্বারা ভারতীয় প্রাদেশিক রাজাদিগকে সাহায্য করিতে লাগিল এবং যুদ্ধ জয়ের সঙ্গে সঙ্গে রাজ্য শাসনেও সংশ্লিষ্ট হইয়া পড়িল। লর্ড ক্লাইভ এই বিষয়ের প্রথম পথপ্রদর্শক, পণ্ডিচেরী অধিকারের পরই পলাশীর যুদ্ধ (১৭৫৭)। এই সময়েই কোম্পানীর প্রধান কার্য্য-কেন্দ্র মাদ্রাজ হইতে কলিকাতায় স্থানান্তরিত হইল। কিন্তু তখনও নিজের নামে রাজ্য শাসন করিবার সাহস ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হয় নাই; একজন কাহাকেও নবাব রূপে সিংহাসনে বসাইয়া রাখিতে হইত। কিন্তু এই বন্দোবস্তে শাসন ও রাজকর আদায়ের বিশৃঙ্খলা হইতে লাগিল। ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর উপাধি-সম্বল সম্রাটের নিকট হইতে ক্লাইভ বাংলা বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী (রাজস্ব আদায়ের ভার) গ্রহণ করিলেন, কিন্তু ফৌজদারী ও পুলিশ ইংরাজের ক্রীড়াপুতুল নবাবের অধীনেই রহিল। রাজস্ব আদায়ের বন্দোবস্ত দেশীয় কর্মচারীদের হাতেই ছিল; কিন্তু ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে কোম্পানী নিজেই সেই ভার গ্রহণ করিল এবং দেওয়ানীর সঙ্গে সঙ্গে

ফৌজদারী ও পুলিশ ক্রমশঃ তাহাদের হাতে আসিয়া পড়িল। কার্য্যত কোম্পানীই বাংলা দেশ শাসন করিতে লাগিল।

এই সময় হইতেই ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ ইংরাজ শাসনের অন্তর্ভুক্ত হইতে লাগিল এবং অন্যান্য রাজারা জ্ঞাতিকলহ জনিত দুর্বলতা হেতু ইংরাজ-রাজের সার্বভৌমিক অধিকার স্বীকার করিতে বাধ্য হইল। কিরূপে ধীরে ধীরে ভারতে ইংরাজ শাসন-প্রণালী প্রবর্ত্তিত এবং পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল এখন আমরা তাহারই আলোচনা করিব।

রাণী এলিজাবেথের অনুমতি পত্রে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে নিজেদের কার্য্য-প্রণালী পরিচালনার জন্য একটি "কোর্ট" স্থাপন করিবার হুকুম দেওয়া হইয়াছিল। এই কোর্টের একজন সভাপতি এবং চব্বিশ জন নির্বাচিত সভ্য নিযুক্ত হইত। প্রতি বৎসর নূতন নির্বাচন হইত। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে এই শাসন-যন্ত্র একটি "অংশীদার সভা" (General Court of Proprietors) "ডিরেক্টর সভায়" (Court of Directors) পরিণত হয়। প্রতিবৎসর অংশীদারগণ কর্ত্তৃক চব্বিশ জন ডিরেক্টর নির্বাচিত হইত। কিন্তু অংশীদারগণের সভা ইচ্ছা করিলে ডিরেক্টর সভা প্রবর্ত্তিত যে কোন নিয়ম বাতিল করিতে পারিত।

কোম্পানীর বিচার সভা

এই সময় বোম্বাই মাদ্রাজ ও কলিকাতা এই তিন স্থানে কোম্পানীর কার্য্য-কেন্দ্র ছিল। প্রত্যেক জায়গায় একজন সভাপতি এবং উচ্চতন কর্মচারি-গঠিত একটি সভার দ্বারাই সমস্ত কার্য্য পরিচালিত হইত। ভোটদ্বারা সমস্ত বিষয় মীমাংসিত হইত। বোম্বাই, মাদ্রাজ, কলিকাতার কেন্দ্র, সবই স্বস্ব প্রধান ছিল; তিনটি প্রদেশ কেহই কাহারও অধীন ছিল না।

কিন্তু রাজ্যজয়ের সঙ্গে সঙ্গে কোম্পানীর দায়ীত্ব যতই বাড়িতে

লাগিল ততই বুঝিতে পারা গেল যে এই রকম বড় সভা এবং স্ব স্ব স্বাধীন তিন কেন্দ্র দ্বারা রাজ্য শাসন এবং বাণিজ্য পরিচালন অসম্ভব। কোম্পানীর আর্থিক অবস্থা খারাপ হইতে লাগিল কিন্তু তাহার কর্মচারীরা প্রভূত ধন সম্পত্তি লইয়া দেশে ফিরিতে লাগিল। ক্লাইভের যুদ্ধজয়, ভারত প্রত্যাগত ধনমদ মত্ত ইংরাজদের ঔদ্ধত্য এবং কোম্পানীর আর্থিক অবনতি এই তিন কারণে প্রথমতঃ পার্লিয়েমেণ্টর দৃষ্টি এই দেশের প্রতি আকৃষ্ট হইল এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কার্য্য-প্রণালী পরীক্ষা করার জন্য পার্লিয়েমেণ্ট কর্তৃক একটি কমিটি গঠিত হয়। তাহারই অনুসন্ধানের ফলে ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে (লর্ড নর্থের মন্ত্রীত্বের সময়) কোম্পানীর কার্য্য সুচারুরূপে পরিচালনার জন্য "রেগুলেটিং অ্যাক্ট" (Regulating Act of 1773) প্রবর্ত্তিত হয়।

ভারত শাসনের প্রতি পার্লিয়েমেণ্টের দৃষ্টিপাত

ইহার দ্বারা পার্লিয়েমেণ্ট বাংলা দেশের জন্য একজন গভর্ণর জেনারেল ও বারজন মন্ত্রী নিযুক্ত করেন। কিন্তু ভবিষ্যতে মন্ত্রী-নির্বাচনের ভার কোম্পানীর হাতেই রহিল। ইহাতে মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ের গভর্ণরদের শক্তি খর্ব করা হইল। আকস্মিক প্রয়োজন না ঘটিলে তাঁহারা বাংলার গভর্ণর জেনারেলের অনুমতি ব্যতীত যুদ্ধ ঘোষণা করিতে বা সন্ধি পত্র স্বাক্ষর করিতে পারিতেন না। কিন্তু তখনকার দিনের যাতায়াতের অসুবিধা হেতু এই নিয়ম পালিত হওয়া শক্ত ছিল।

রেগুলেটীং অ্যাক্ট

অন্যান্য কারণেও এই প্রকারের শাসন-প্রণালী বলা অসম্ভব হইয়া উঠিল। গভর্ণর জেনারেল নিজের মন্ত্রী-সভার অধিক সংখ্যক সভ্যের সম্মতি ভিন্ন কোন কাজ করিতে পারিতেন না। মন্ত্রীসভা ও গভর্ণর জেনারেল উভয়েই বিলাতে কোম্পানীর ডিরেক্টর-সভার অধীন অথচ পার্লিয়েমেণ্টের নিকট ভারত শাসনের জন্য গভর্ণর জেনারেল ও তাহার

মন্ত্রীসভাই দায়ী। এই অসম্ভব সম্বন্ধ-সূত্রে গঠিত শাসন প্রণালীর দোষ পদে পদে ধরা পড়িতে লাগিল। অন্যায় ও অত্যাচারের জন্য পার্লিয়ে-মেণ্ট যখন ওয়ারিন হেষ্টিংসকে বরখাস্ত করিবার হুকুম দিলেন তখন ডিরেক্টর-সভা এই আজ্ঞা উপেক্ষা করিয়া হেষ্টিংসকে গভর্ণর জেনারেল পদে বাহাল রাখিলেন। এই প্রকার অনিয়ম দূর করিবার জন্য পিট্ (Pitt) ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে আর একটি আইন প্রস্তুত করেন।

এই আইনানুসারে মান্দ্রাজ ও বোম্বাইএর গভর্ণরের ক্ষমতা খর্ব্ব করিয়া বড়লাটের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়। এছাড়া বম্বে মাদ্রাজের গভর্ণরগণের শাসন বিষয়ে পরমর্শ দিবার জন্য তিনজন করিয়া মন্ত্রীর সাহায্য গ্রহণের প্রথা-প্রবর্ত্তন এই আইনের আর একটি বড় কাজ।

পিটের ভারত সম্বন্ধীয় আইন

এই আইনের সর্বাপেক্ষা বড় কাজ হইল বোর্ড অব্ কণ্ট্রোল (Board of Control) নামে একটি তত্ত্বা-বধায়ক সভা গঠন। বাংলাদেশের শাসন পূর্বের মত গভর্ণর জেনারেল ও তাহার মন্ত্রীসভার হাতেই রহিল এবং পার্লিয়েমেণ্টের নির্বাচিত ছয় জন সভ্য লইয়া সভা গঠিত হইল। ভারতবর্ষের শাসন বিষয়ে এই সভারই সর্বোচ্চ ক্ষমতা রহিল। কাজেকাজেই এখন হইতে ভারত-শাসন-ভার পার্লিয়েমেণ্ট ও কোম্পানী এই উভয়ের হাতেই ন্যস্ত থাকিল। এই প্রকারের ডবল শাসন প্রণালী সিপাহী বিদ্রোহ পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল।

লর্ড কর্ণওয়ালিসের সময় হইতে (১৭৯৩) গভর্ণর জেনারেল ও তাঁহার কাউন্সিলের শাসনকার্য্য, রাজ্যাধিকার প্রভৃতি ব্যবস্থার চরম মীমাংসা পার্লিয়েমেণ্টের নির্বাচিত শাসন সভার (বোর্ড অব্ কণ্ট্রোল) দ্বারাই হইত। কিন্তু সাধারণ রাজকার্য্য কোম্পানীর ডিরেক্টরদের হাতেই ছিল। প্রত্যেক কুড়ি বৎসর অন্তর পার্লিয়েমেণ্টের নিকট হইতে নূতন সনদ (charter) লইবার সময় কোম্পানীর কার্য্যাবলী বিশেষভাবে পরীক্ষিত হইবার নিয়ম হইল।

১৮১২ খৃষ্টাব্দের সনদ পুনঃ প্রাপ্তির সময় কোম্পানীর কার্য্যাবলীর যে বিবরণ দেওয়া হয় তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, কারণ ইহারই ফলে ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে "চাটারঅ্যাক্‌টে" চা এবং চীনদেশের সহিত বাণিজ্য ভিন্ন আর সর্বপ্রকার বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার কোম্পানীর নিকট হইতে কাড়িয়া লওয়া হয় এবং কোম্পানীর অধিকৃত সমস্ত রাজ্য বৃটিশরাজের এই সময়ই প্রথমবার বিজ্ঞাপিত হয়।

চার্টারঅ্যাক্ট, ১৮১৩

১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের চার্টারঅ্যাক্টে কোম্পানীকে সমস্ত ব্যবসায় বাণিজ্য ত্যাগ করিতে হইল। এই সময় হইতে কোম্পানী কেবলমাত্র রাজ্যশাসনকার্য্যে ব্যাপৃত রহিল এবং বৃটিশরাজের ভৃত্য বা প্রতিনিধিরূপে ভারত শাসন করিতে লাগিল।

চার্টাঘ্যারক্ট, ১৮৩৩

১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের চার্টারঅ্যাক্টে ডিরেক্টর সভার ক্ষমতা আরও কাড়িয়া লইয়া পার্লিয়েমেণ্টের নিয়োজিত ভারত-শাসন-সভার (Board of Contıol) হাতে দেওয়া হয়। কিন্তু তখনও ডিরেক্টরদের প্রভূত ক্ষমতা ছিল ; কারণ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে খুঁটিনাটি সমস্ত সংবাদ তাঁহারাই রাখিতেন। সুতরাং কোন প্রকার নূতন অনুষ্ঠান বা পরিবর্ত্তনের কর্ত্তা তাঁহারাই ছিলেন।

চার্টারঅ্যাক্ট, ১৮৩৬

ইহারই চারিবৎসর পরে সিপাহী বিদ্রোহ হয় ও তাহারই ফলে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট কোম্পানীর হাত হইতে শাসনভার কাড়িয়া স্বয়ং পরিচালনের ভার লইলেন। ইহাতে শাসন প্রণালীর বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হইল না। গভর্ণর জেনারেল তখন হইতে Viceroy (রাজপ্রতিনিধি) নামে অভিহিত হইলেন। এই পর্য্যন্ত ডিরেক্টর সভার এবং পার্লিয়েমেণ্টের শাসন-সভার(Board of Control) যে যে ক্ষমতা ছিল তাহা ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের হাতে দেওয়া হইল।

কোম্পানীর হাত হইতে পার্লিয়েমেণ্টের শাসন ভার গ্রহণ, ১৮৫৮

লণ্ডনে ইহার আপিস এবং ("সেক্রেটারী অব ষ্টেট্ ফর্ ইণ্ডিয়া") ইহার প্রধান কর্ত্তা। তিনি ইংল্যাণ্ডের মন্ত্রীসভার একজন সদস্য এবং অন্যান্য মন্ত্রীর ন্যায় নিজের কাজের জন্য অর্থাৎ ভারতশাসনের জন্য পার্লিয়েমেণ্টের নিকট দায়ী। ক্ষমতা হিসাবে ইনি একাধারে আমাদের পূর্ববর্ণিত কোম্পানীর ডিরেক্টর-সভা ও পার্লিমেণ্টের শাসন-সভার (Board of Control) উত্তরাধিকারী।

ইণ্ডিয়া কাউন্সিল
ভারতসচিব

ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের সদস্য সংখ্যা দশের কম এবং চৌদ্দের অধিক হইতে পারিত না। প্রত্যেক সদস্যের কার্য্যকাল সাত বৎসর; তবে বিশেষ কোন কারণ থাকিলে পার্লিয়েমেণ্টের অনুমতি লইয়া আরও পাঁচ বৎসর বাড়াইতে পারা যায়। অধিকাংশ সদস্যেরই ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা থাকা চাই। দশবৎসর ভারতে অবস্থিতি এবং ইহার পর পাঁচ বৎসরের অধিক কাল ভারত হইতে অনুপস্থিতিই অভিজ্ঞতার নিদর্শন। সাধারণতঃ ভারতের প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা, গভর্ণর জেনারেলের শাসন সভার সদস্য, ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের নামজাদা লোক, ব্যাঙ্কার, প্রসিদ্ধ বণিক, রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তিরাই বিলাতে প্রত্যাগমন করিলে এই কাউন্সিলের সদস্য মনোনীত হন। ভারত সচিব নিজে ভারতশাসনে অনভিজ্ঞ; কাজেকাজেই এই রকম লোক কাউন্সিলে না রাখিলে কাজ চলিতে পারে না। ১৯০৭ সাল হইতে দুইজন ভারতবাসীকে এই কাউন্সিলের সদস্য ভাবে রাখা হইতেছে।

ভারতসচিবের ক্ষমতা

নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে ভারতসচিবের অনুমতি দরকার।

(১) গভর্ণর জেনারেলের কাউন্সিলে বা প্রাদেশিক কাউন্সিলে কোন আইন পাশ করা।

(২) রাজস্বের বিশেষতঃ শুল্কের কোন পরিবর্ত্তন ঘটে এইরূপ কোন বন্দোবস্ত।

(৩) শাসন প্রণালীর কোন পরিবর্ত্তন।

(৪) নূতন বৃহৎ ব্যয়।

(৫) বড় চাকুরীর সৃষ্টি।

(৬) রেল পথ নির্ম্মাণ।

(৭) নির্দিষ্ট বেতনের (মাসিক ২৫০। ৩০০ টাকা) উপরের পদে কোন লোক নির্ব্বাচন।

(৮) খনি ইজারা দেওয়া।

(৯) দেশীয় রাজাকে টাকা ধার দেওয়া।

(১০) দেশীয় রাজার সঙ্গে নূতন সন্ধি স্থাপন।

এই প্রকার অনেক বিষয়েই গভর্ণর জেনারেলকে ভারত-সচিবের অনুমতি লইতে হয়।

কোন বৃহৎ ব্যয়, নূতন ট্যাক্স স্থাপন, শুল্কবৃদ্ধি ইত্যাদি রাজস্ব এবং আয়ব্যয় সংক্রান্ত ব্যাপারে ভারতসচিবকে তাঁহার কাউন্সিলের অধিকাংশের মত অনুসারে চলিতে হয়, কিন্তু অপর সকল বিষয়ে সকলের মত না লইয়া করিবার অধিকার তাঁহার আছে।

এই আপিসের খরচের জন্য ভারবর্ষের রাজস্ব হইতে বৎসরে প্রায় পঞ্চান্ন লক্ষ টাকা দিতে হইত।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনকালে প্রত্যেক কুড়ি বৎসর অন্তর নূতন সনদ দেওয়ার সময় পার্লিয়েমেন্ট পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে কোম্পানীর শাসনকার্য্য পরীক্ষা করিতেন; কিন্তু বৃটিশরাজ নিজের হাতে শাসন ভার লওয়ায় এই বিষয়ে পার্লিয়েমেণ্টর আগ্রহও কমিয়া গিয়াছে,—যেন নিজের হাতে শাসনভার লওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সকল প্রকার জবাবদাহির ভাব গিয়াছে।

পার্লিমেণ্টের ক্ষমতা।

বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় ভারতবর্ষ শাসনেও পার্লিয়েমেণ্টের ক্ষমতাই সবচেয়ে বেশী; কিন্তু পার্লিয়েমেণ্ট বিশেষভাবে ভারত-শাসনে হস্তক্ষেপ করেন না।

ভারত-সচিব বিলাতের মন্ত্রী-সভার একজন সদস্য এবং ভারত শাসনের জন্য তিনি এবং মন্ত্রী-সভাই পার্লিয়েমেণ্টের নিকট দায়ী। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে পার্লিয়েমেণ্টে কোন প্রশ্ন উঠিলে তিনি অথবা তাঁহার সহকারী সেই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়া থাকেন।

পার্লিয়েমেণ্ট বিশেষভাবে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে দুই রকমের আইন প্রস্তুত করেন—(১) ভারত-শাসন-প্রণালীর পরিবর্ত্তন (২) ভারতবর্ষের জন্য ভারত সচিবকে ইংল্যাণ্ডে ঋণ গ্রহণ এবং ভারত-সীমান্তের বাহিরে যুদ্ধ ব্যয়ের জন্য ভারত-গভর্ণমেণ্টকে অনুমতি দান। ভারতবর্ষের রাজস্ব এবং আয় ব্যয় সম্বন্ধে পার্লিয়েমেণ্ট কখনও হস্তক্ষেপ করেন না। তবে ভারতের আয়ব্যয়ের হিসাব এবং আর্থিক ও নৈতিক উন্নতির প্রতিবেদন প্রতি বৎসর পার্লিয়েমেণ্টে পেশ করিতে হয়। ভারত সচিব এবং ইণ্ডিয়া-আপিসের কর্ম্মচারীদের বেতন এবং সেখানকার সমস্ত ব্যয় ভারতবর্ষের রাজস্ব হইতে দেওয়া হইয়া থাকে।

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কোন প্রকার আন্দোলন উপস্থিত হইলে পার্লিয়ে-মেণ্টের যে কোন সভ্য প্রতিকারের আন্দোলন উপস্থিত জন্য প্রস্তাব করিতে পারেন।

সমগ্র ভারতের শাসন-কার্য্য দুইভাগে বিভক্ত (১) ভারত গভর্ণমেণ্ট (২) প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট সমূহ। ভারত গভর্ণ-মেণ্টে একটি কার্য্য-নির্ব্বাহক সভা ও আর একটি ব্যবস্থাপক সভা আছে। (Governor General's Executive Council and the Imperial Legislative Council)। বড় লাটের কার্য্যনির্ব্বাহক বা অধ্যক্ষ সভার ইতিহাস এই:—১৭৭৩ খৃষ্টাব্দের রেগুলেটিং অ্যাক্ট অনুসারে ভারতবর্ষ ও বাংলাদেশের জন্য এক জন গভর্ণর জেনারেল ও

গভর্ণরজেনেরেলের অধ্যক্ষসভার ক্ষমতা ও কার্য্য

গভর্ণর জেনারেল কার্য্য-নির্ব্বাহক সভা (Executive Council)

চারজন সদস্য লইয়া কার্য্য করিতে হইত। এই কাউন্সিলই গভর্ণর জেনারেলের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার প্রথম অবস্থা। বোম্বাই এবং মান্দ্রাজের গভর্ণরগণ গভর্ণর-জেনারেল ও তাঁহার কাউন্সিলের অধীন ছিলেন। ওয়ারেন হেষ্টিংস যখন গভর্ণর-জেনারেল তখন কাউন্সিলের সঙ্গে প্রায়ই তাঁহার মতের অমিল হইত। সেইজন্য লর্ড কর্ণওয়ালিস্ যখন ভারতের গভর্ণর-জেনারেল হইয়া আসেন তখন তিনি বিলাতের ডিরেক্টর সভা ও পার্লিয়েমেন্টের বোর্ড-অব কন্ট্রোলের নিকট হইতে কাউন্সিলের অধিক সংখ্যক সদস্যের মতের বিরুদ্ধেও কাজ করিবার অধিকার লইয়া আসেন। এখনও গভর্ণর জেনারেল বিশেষ প্রয়োজনে সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারেন। গভর্ণর জেনারেলের সভা প্রত্যক্ষভাবে নিম্ন-লিখিত বিভাগগুলি হাতে লইয়াছেন। (১) বৈদেশিক সম্বন্ধ (২) সৈনিক বিভাগ (৩) সাধারণ কর স্থাপন (৪) টাঁকশাল (৫) জাতীয় ঋণ (৬) শুল্ক (৭) ডাক ও টেলিগ্রাফ (৮) রেলওয়ে (৯) ভারতবর্ষের জরীপ ও ভূতত্ত্ব বিভাগ। শিক্ষাবিস্তার, চিকিৎসা বিভাগ, স্বাস্থ্য বিভাগ, কর আদায়, কৃষিকার্য্যের সুব্যবস্থার জন্য খাল নির্ম্মাণ, পূর্ত্ত-বিভাগের কিয়দংশ প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের হাতে থাকে; কিন্তু ভারত গভর্ণমেণ্ট এই সমস্ত বিভাগেরই কার্য্য-প্রণালী মোটামুটী বলিয়া দেন, এবং তাঁহাদের নির্দ্ধারিত প্রণালীঅনুসারে কাজ সম্পন্ন হইতেছে কিনা তাহা বার্ষিক বিবরণী হইতে বুঝিতে পারেন। প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের হস্তে ন্যস্ত কৃষি, পূর্ত্ত, চিকিৎসা ইত্যাদি বিভাগের জন্য ইণ্ডিয়া-গভর্ণমেণ্ট কয়েকজন পরিদর্শক নিযুক্ত করেন।

অধ্যক্ষ সভার সদস্য

গভর্ণর-জেনারেল ও তাঁহার অধ্যক্ষসভার সাধারণ (ordinary) সদস্যগণ স্বয়ং সম্রাট্ কর্ত্তৃক নিয়োজিত হন। সাধারণত তাঁহাদের শাসন কাল পাঁচবৎসর। সাধারণ

সদস্য সংখ্যা ছয়; ইহার মধ্যে তিন জনের নিয়োগের পূর্ব্বে অন্ততঃ দশবৎসর কাল গভর্ণমেণ্টের অধীনে কাজকরা চাই। বাঁকী তিনজনের একজনের অন্ততঃ পাঁচ বৎসরের পুরাতন ব্যারিষ্টার হওয়া দরকার, অন্য দুইজনের বিষয়ে কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। ভারতবর্ষের প্রধান-সেনাপতি শাসন-সভার একজন বিশেষ (extraordinary) সদস্য। কাজে-কাজেই গভর্ণরজেনারেল সমেত অধ্যক্ষসভার মোট সদস্য সংখ্যা আট, এতদ্ব্যতীত বোম্বাই, মাদ্রাজ বা বাংলাদেশে যদি অধ্যক্ষসভার অধিবেশন হয় তবে সেখানকার গভর্ণর তখনকার জন্য অধ্যক্ষ সভার একজন বিশেষ সদস্য ভাবে কাজ করেন। কিন্তু সাধারণতঃ অধ্যক্ষ সভার অধিবেশন দিল্লী বা সিমলায়ই হইয়া থাকে।

কার্য্যবিভাগ

লর্ড ক্যানিং এর সময় হইতে শাসন সভার প্রত্যেক সদস্যের উপর কয়েকটী বিভাগের ভার দেওয়া হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে শাসনসভার কার্য্যও সেইরূপভাবে বিভক্ত আছে।

১। ভারতীয় (Home) আভ্যন্তরীন কার্য্য
২। আইন (Law)
৩। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য (Education)
৪। রাজস্ব (Revenue)
৫। অর্থ বিভাগ (Finance)
} ছয়জন সদস্যের অধীন।

৬। বৈদেশিক (Foreign) বড়লাট স্বয়ং ইহা দেখেন।
৭। সৈনিক (Military) জঙ্গীলাট স্বয়ং ইহা দেখেন।

ব্যবস্থাপক সভা।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যখন ভারতবর্ষে আসে তখন তাহারা পালিয়ে-মেণ্টের নিকট হইতে এই ক্ষমতা আনিয়াছিল যে কোম্পানীর সমস্ত কর্ম্মচারীদের বিচার বিলাতের আইন অনুসারেই হইবে। কিন্তু বাংলা বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী পাওয়ার পর দেশীয় লোকদের বিচারের ভার ইংরাজদের হাতে পড়িল। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দের এক আইন অনুসারে স্থির হইল যে হিন্দু এবং মুসলমানের বিচার তাহাদের শাস্ত্র এবং প্রথা অনুসারেই হইবে। এতদ্ব্যতীত দেওয়ানী পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শাসন কার্য্যের সুবিধার জন্য কোম্পানীকে সময়ে সময়ে নূতন আইন প্রণয়ন করিতে হইবে।

গভর্ণরজেনারেলের ইতিহাস

১৭৭৩ খৃষ্টাব্দের অ্যাক্ট অনুসারে গভর্ণর জেনারেল ও তাঁহার অধ্যক্ষ সভা আইন প্রণয়নের ক্ষমতা পাইলেন; কিন্তু উহা বাহাল হইবার পূর্ব্বে সুপ্রিম কোর্টের অনুমোদন প্রয়োজন হইত। সুপ্রিম কোর্ট উচিত মনে করিলে গভর্ণর-জেনারেল প্রবর্ত্তিত যে কোন আইন কার্য্যকারী না হইতে দিতে পারিতেন। এই লইয়া ওয়ারেন হেষ্টিংসের সঙ্গে সুপ্রিম কোর্টের জজদিগের মতান্তর ঘটিতে লাগিল। এই প্রকার বিসদৃশ কাণ্ড দূর করিবার জন্য ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে একটী অ্যাক্ট করা হয়। ইহা দ্বারা গভর্ণরজেনারেল ও তাহার শাসন সভা সুপ্রিম কোর্টের অনুমোদন ব্যতীত যে কোন নূতন আইন প্রবর্ত্তনের ক্ষমতা পাইলেন।

১৭৭৩

১৭৮১

১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে আর একটী অ্যাক্ট দ্বারা গভর্ণর-জেনারেলের আইন প্রণয়ন ক্ষমতা আরও স্পষ্ট ভাবে ঘোষিত হইল। ১৮০০ এবং ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজ ও বোম্বাইএর গভর্ণর ও তাঁহাদের অধ্যক্ষ সভাকেও আইন প্রণয়-

মাদ্রাজ ও বোম্বে আইন প্রণয়নের আইন

গের ক্ষমতা দেওয়া হয়। এইরূপে ভারতবর্ষের মধ্যে বৃটিশ রাজ্যের তিন প্রদেশে তিন প্রকার আইন প্রচলিত হইতে লাগিল। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাংলার জন্য গভর্ণর জেনারেল, বম্বে মাদ্রাজের জন্য গভর্ণর এবং তাঁহাদের নিজ নিজ অধ্যক্ষ-সভার সহযোগে আইন প্রণয়ন করিতে লাগিলেন। এই নিয়মে বিস্তর অসুবিধা হইতে লাগিল। তিন প্রদেশের তিন রকম আইন, এতদ্ব্যতীত ইংলণ্ডের আইন, হিন্দু ও মুসলমানী আইন, কোম্পানী-প্রবর্ত্তিত আইন, এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া কোন রায় দেওয়া জজদিগের পক্ষে খুব শক্ত হইয়া উঠিল। এই প্রকার অব্যবস্থা বা বহু ব্যবস্থা দূর করিবার জন্য ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের চার্টার অ্যাক্টে বোম্বাই ও মাদ্রাজ গভর্ণমেন্টের আইন প্রণয়ন ক্ষমতা তুলিয়া লওয়া হয় এবং কেবলমাত্র গভর্ণরজেনারেল ও তাঁহার অধ্যক্ষ-সভার হাতে এই ক্ষমতা ন্যস্ত হইল। তাঁহাদিগের সাহায্যের জন্য একজন 'ল' মেম্বর (Law Member) নিযুক্ত হইলেন। লর্ড মেকলে ভারতের প্রথম আইন-সদস্য। তিনি কোম্পানীর কর্ম্মচারী ছিলেন না, এবং আইন প্রণয়ন ব্যতীত আর কোন বিষয়ে তাঁহার কোন ক্ষমতা ছিল না। এই সভায় প্রস্তুত আইন কোম্পানীর রাজ্যের অন্তর্গত সমস্ত প্রদেশে সমান ভাবে প্রযুক্ত হইত। গভর্ণর জেনারেল তখন বাংলাদেশে থাকিতেন এবং তাঁহার সভার সদস্যগণেরও কেবল মাত্র বাংলাদেশের শাসন সম্বন্ধেই অভিজ্ঞতা ছিল। কাজেকাজেই তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত আইনে মাদ্রাজ ও অন্যান্য প্রদেশের অসুবিধা হইতে লাগিল। ইহা দূর করিবার জন্য ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের চার্টার অ্যাক্টে আইন-প্রণয়ন করিবার জন্য এক ব্যবস্থাপক সভা গঠন করা হয়। এই সভা অধ্যক্ষ-সভার পাঁচজন ব্যতীত আরও বারজন লইয়া গঠিত হইত।

১৮৩৩ চার্টার অ্যাক্ট

১৮৫৩ ব্যবস্থাপকসভা

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে Indian Councils Act, 1861 নামে একটী

Indian Councils Act, 1861.

অ্যাক্ট পাশকরা হয়। ইহাতে আইন বা ব্যবস্থা সভার কার্য্য ও ক্ষমতা স্পষ্টরূপে নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া হয়। মাদ্রাজ ও বোম্বাইএর প্রাদেশিক আইন-সভা প্রবর্ত্তিত আইন ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের পূর্বে বড় লাটের বিনা অনুমতিতেও পাশ হইতে পারিত কিন্তু এখন হইতে তাঁহার অনুমতি ব্যতীত কোন আইনই পাশ হইতে পারিবে না ঠিক হইল। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের অ্যাক্টে সমস্ত ব্যবস্থাপক সভার কার্য্যের উপরে পার্লিয়েমেণ্টের ক্ষমতা বিশেষভাবে নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া হয়। এতদ্ব্যতীত গভর্ণর জেনারেল আইন সভার অতিরিক্ত সদস্য সংখ্যা ছয় হইতে বারো পর্য্যন্ত নির্দ্ধারিত হইল এবং ইহার মধ্যে অন্ততঃ অর্দ্ধেক বেসরকারী হওয়ার নিয়ম প্রচলিত হইল। এই বেসকারী সভ্যদিগের মধ্যে কয়েকজন ভারতবাসীও থাকিতেন; তখন সমস্ত সভ্যই গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মনোনীত হইতেন। প্রত্যেক সদস্যের কার্য্যকাল দুইবৎসর ছিল। এখন পর্য্যন্ত ভারতীয় আইন সভার কার্য্যাবলী অনেক পরিমাণে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের অ্যাক্ট অনুসারেই চলিতেছে।

১৮৯২

১৮৯২ খৃষ্টাব্দে যে অ্যাক্ট পাশ হয় তাহাতে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার অতিরিক্ত (additional) সদস্য সংখ্যা ১৬ করা হইল। মোটের উপর অধিকাংশ সদস্য যাহাতে গভর্ণমেণ্টের লোক হয় সেইজন্য বেসরকারী সভ্যের সংখ্যা দশের বেশী করা হইল না। এই দশজনের মধ্যে চারজন চারটী প্রধান প্রাদেশিক আইন সভার বেসরকারী সভ্যকর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইতেন; কলিকাতা চেম্বার অব্ কমার্স (Calcutta chamber of commerce) অর্থাৎ কলিকাতার বিদেশীয় বণিকসভা একজনকে নির্ব্বাচন করিতেন এবং বাকী পাঁচজনকে গভর্ণর জেনারেল নিজে বাছিয়া লইতেন। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ভারতীয়-আইন-সভায় যে কয়েকজন বেসরকারী সভ্য ছিলেন তাহারা সকলেই গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মনোনীত হইতেন। এই

অ্যাক্ট অনুসারে অন্ততঃ পাঁচজন সভ্য প্রজাগণের দ্বারায় পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হইয়া প্রতিনিধিরূপে আইন সভায় কাজ করিতে লাগিলেন। ভারতীয়-আইনসভার সদস্যদিগকে বাজেট সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিবার এবং শাসন সম্বন্ধীয় ব্যাপারে প্রশ্ন করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইল।

১৯০৯
মর্লি-মিণ্টো-রিফর্ম

ইহার পর প্রায় ১৭ বৎসরের মধ্যে ভারত-শাসনে বিশেষ কোনো পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। কিন্তু দেশের মধ্যে জনমত স্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছিল বলিয়া শাসন কার্য্যের সংস্কার একান্ত প্রয়োজন হইল।

১৯০৯ খৃষ্টাব্দে তৎকালীন ভারতসচিব মর্লি ও বড়লাট বাহাদুর মিণ্টো কতকগুলি সংস্কার সংঘটিত করেন। বর্ত্তমানে আমরা ভারতীয় আইন সভার যে গঠন ও কার্য্যপ্রণালী দেখিতে পাইতেছি তাহা এই সংস্কারেরই ফল। এই সংস্কারের উদ্দেশ্য দুইটী; (১) দেশে যে সব বৃহৎ জনসঙ্ঘ বা প্রতিষ্ঠান আছে তাহাদিগকে প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের ক্ষমতা দান, (২) দেশের শাসনে আইনসভার সভ্যদের মতামত প্রকাশ ও প্রশ্নোত্থাপনের অধিকতর ক্ষমতা দান। এই দুই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আইন সভার অতিরিক্ত সদস্য সংখ্যা ৬০ করা হইল। এতন্মধ্যে গভর্ণরজেনারেল নিজে ৩৫ জন বাছিয়া লইয়া থাকেন এবং বাকী ২৫ জন বিশেষ বিশেষ সভা-সমিতি কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হন। গভর্ণমেণ্ট যে ৩৫ জন নির্ব্বাচন করেন তাহার মধ্যে ২৮ জনের বেশী সরকারী কর্ম্মচারী হইতে পারেন না; আইন-সভার সদস্যগণের কার্য্যকাল তিনবৎসর। পরিশিষ্টের তালিকায় ১৯১৯ সালের আইনসভার গঠন দেখান হইয়াছে।

ব্যবস্থাপক সভার ক্ষমতা

পূর্ব্বোক্ত সংস্কারের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত আইন-সভার সভ্যদিগের ক্ষমতাও বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। এখন সদস্যগণ বাজেট সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন করিতে ও বাজেটের কোন কোন বিষয়ে পরিবর্ত্তনের জন্য প্রস্তাব উপস্থিত করিতেও

পারেন, এবং সেই প্রস্তাবের উপর ভোট দিতে পারেন। কিন্তু গভর্ণমেন্ট ইচ্ছা না করিলে কোন প্রস্তাবই পাশ হইতে পারে না, কারণ ভারতীয় আইন-সভায় গভর্ণমেন্টের সদস্য সংখ্যাই বেশী এবং গভর্ণর জেনারেল বিশেষ অনুমতি না দিলে সরকারী সভ্যেরা গভর্ণমেন্টের মতের বিরুদ্ধে ভোট দিতে পারে না।

বাজেট ভিন্ন অন্য বিষয়েও সদস্যগণ আইন-সভার যে-কোন বৈঠকে যে-কোন প্রস্তাব উপস্থিত করিতে পারেন। শাসন সংক্রান্ত প্রশ্ন করার ক্ষমতাও বাড়ান হইয়াছে; এখন একটী প্রশ্নের সঙ্গে সে বিষয়ে আরও কয়েকটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে পারা যায়। কিন্তু গভর্ণমেন্ট ইচ্ছা করিলে এই সব প্রশ্নের উত্তর নাও দিতে পারেন।

পার্লিয়েমেণ্ট কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত যে সব অ্যাক্টের দ্বারা ভারত শাসন চলিতেছে তাহার বিরুদ্ধে বা পার্লিয়েমেণ্টের ক্ষমতা অথবা সম্রাটের বশ্যতার খর্ব হয় এইরূপ কোন আইন এই সভায় পাশ হইতে পারে না।

গভর্ণর জেনারেলের অনুমতি ব্যতীত রাষ্ট্রীয় ঋণ, ভারতীয় রাজস্ব, প্রজাগণের ধর্ম, সৈনিক বা নৌবিভাগের নিয়মাবলী ইত্যাদি বিষয় সংক্রান্ত কোন প্রস্তাব আইন সভায় উপস্থাপিত করা যায় না।

বিশেষ বিশেষ সময়ে গভর্ণর জেনারেল নিজের ও অধ্যক্ষ সভার দায়ীত্বে আইন-সভার মত না লইয়াও যে কোন আইন (ordinance) প্রচার করিতে এবং ছয় মাসের জন্য তাহা বাহাল রাখিতে পারেন।

বঙ্গদেশ, মাদ্রাজ ও বম্বে ইংরাজদের রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়া উঠে। বাংলাদেশ প্রথমে বড়লাট বাহাদুরের নিজ অধীনে ছিল; ১৮৫৪ সালে ইহার শাসন একজন ছোটলাটের হাতে অর্পিত হয়। ১৮৩৬ সালে যুক্তপ্রদেশ পৃথক করিয়া একজন ছোটলাটের হাতে দেওয়া হইয়াছিল। রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে নূতন নূতন শাসন কেন্দ্র স্থাপনের

প্রয়োজন অনুভূত হইতে লাগিল এবং গত দেড়শত বৎসরের মধ্যে প্রদেশের আকার ও আয়তনের অনেক উলোট্ পালট্ হইয়াছে। উত্তর-পশ্চিম-সীমান্তে আফগানিস্থানের দিকে ইংরাজদের রাজ্য বিস্তৃত হইতে থাকিলে ১৯০১ সালে সেখানে একটি নূতন প্রদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯০৫ সালে বঙ্গদেশকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া দুটি প্রদেশে পরিণত করা হয়—পশ্চিম বঙ্গ ও বিহার-উড়িষ্যা একদিকে—পূর্ববঙ্গ ও আসাম অপরদিকে। এই বঙ্গচ্ছেদের বিরুদ্ধে যে ভীষণ আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল তাহা এখনো সকলের মনে নবীন রহিয়াছে। ১৯১১ সালে আমাদের সর্বজনপ্রিয় সম্রাট বাহাদুরের শুভাগমন উপলক্ষে দিল্লীতে যে দরবার হয় তাহাতে তিনি ঘোষণা করিলেন যে বঙ্গচ্ছেদ রদ্ হইল। তবে আসামকে পৃথক্ করিয়া একজন চীফ-কমিশনরের হাতে দেওয়া হইল, এবং বিহার-উড়িষ্যাকে একত্র করিয়া নূতন একটি প্রদেশ গঠন করিয়া একজন ছোটলাটের শাসনাধীনে সমর্পণ করা হইল। এইবারে কলিকাতা হইতে ভারতের রাজধানী দিল্লীতে স্থানান্তরিত হইল।

প্রাদেশিক ভাগ-বিভাগ।

প্রাদেশিক সরকার সমূহ বড়লাট ও তাঁহার সদস্যগণের সম্পূর্ণ অধীন। বড়লাটের নির্দেশ মত ইঁহাদের চলিতে হয় এবং তাঁহাদের কার্য্যপ্রণালী যথানিয়মে ভারত-শাসন কেন্দ্রে পাঠাইতে হয়। তবে দেশের শাসন সম্বন্ধে প্রত্যেক সরকারকেই বড়লাট কতকটা স্বাধীনতা দিয়াছেন। প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাদের শাসনকালের সময় সাধারণত পাঁচ বৎসর।

প্রাদেশিক শাসন।

ভারতবর্ষের মধ্যে বম্বে, মাদ্রাজ ও বাংলা প্রদেশে শাসনকর্ত্তারা অপরদের অপেক্ষা উচ্চস্থান অধিকার করেন। প্রত্যেক প্রদেশ গভর্ণর ও মন্ত্রীসভা কর্ত্তৃক শাসিত হয়; স্বয়ং সম্রাট্ ইঁহাদিগকে নিযুক্ত করেন। কোনো কোনো বিষয়ে স্বয়ং ভারত-সচিবের সহিত পত্র ব্যবহার করিয়া

কার্য্য করিবার অধিকার কেবলমাত্র গভর্ণরদের আছে। ছোটলাট যাহাই কেন করুন না বড়লাট বাহাদুরের অনুমতি ছাড়া সবই বাতিল হইয়া যায়। গভর্ণরগণের মন্ত্রী সভার সদস্য সংখ্যা চারিজন হইতে পারে তবে এখন সর্বত্র তিন জনই আছেন। ইহার মধ্যে দুইজন সিভিলসার্ভিসের লোক ও একজন ভারতবাসী। গভর্ণরের বাৎসরিক মাহিনা ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা ও প্রত্যেক সভ্যের বেতন ৬৪ হাজার করিয়া। বোম্বাই, মাদ্রাজ ও বাংলাদেশ গভর্ণরের শাসনাধীন।

লাটের শাসন।

লেফনেণ্ট গভর্ণর বা ছোটলাটেরা বড়লাট বাহাদুর কর্তৃক মনোনীত হন, অবশ্য সম্রাটের অনুমোদন না হইলে তাহা পাকা হইতে পারে না। গভর্ণরদের ন্যায় তাঁহাদিগকে খাস বিলাত হইতে আমদানী করা হয় না, এদেশে দশ বৎসর কাজ করিলে, তবেই তাঁহারা মনোনীত হইতে পারেন। সকল ছোটলাটের মন্ত্রীসভা নাই। এক বিহার-উড়িষ্যার ছোটলাটের মন্ত্রীসভাতে দুইজন সিভিল সার্বিসের লোক ও একজন ভারতবাসী ছিলেন। ছোটলাটদের বাৎসরিক বেতন ১ লক্ষ টাকা। বিহার-উড়িষ্যা সংযুক্ত প্রদেশ, পঞ্জাব, বর্ম্মা ছোটলাটের অধীন।

ছোটলাটের শাসন।

চীফ-কমিশনরগণ গভর্ণর জেনারেল বা বড়লাট বাহাদুরের প্রতিনিধিরূপে রাজ্য শাসন করেন। গভর্ণর ও ছোটলাট হইতে ইঁহাদের ক্ষমতা অল্প। ইঁহাদের বেতন বাৎসরিক ৫০ হাজার টাকা, কেবল মধ্য-প্রদেশের সহিত বেরার বিভাগ যুক্ত হওয়ায়, সেখানকার চীফকমিশনরের কার্য্য বেশী বলিয়া তাঁহার বেতন ৬২ হাজার। আসাম, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, বেলুচিস্থান, কুর্গ, আজমীর-মেওয়ার, আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ চীফ-কমিশনের অধীন।

চীফ-কমিশনরের শাসন

ভারতের শাসন প্রণালীর মধ্যে অনেক ভাগ ও স্তর আছে।

প্রত্যেকটি শাসন-বিভাগ এক একজন করিয়া কর্মচারীর উপর ন্যস্ত তিনিই সেই স্থানের শাসনের জন্য দায়ী। প্রত্যেক প্রদেশ কতকগুলি জেলাতে বিভক্ত; ভারতের এই জেলাগুলিকেই শাসনের যথার্থ কেন্দ্র বলা যাইতে পারে। সমগ্র দেশে ২৬৭টি জেলা আছে এবং প্রত্যেকটির পরিমাণ গড়ে প্রায় ৪,৪৩০ বর্গ মাইল ও জন সংখ্যা গড়ে ৯ লক্ষ। মাদ্রাজ ব্যতীত অপর সব প্রদেশেই চারিটি হইতে ছয়টি জেলা লইয়া এক একটি বিভাগ গঠিত হইয়াছে; এই বিভাগের কর্মচারীকে কমিশনর বলে। বাংলাদেশে এইরূপ পাঁচজন কমিশনর আছেন।

বিভাগ ও কমিশনর

জেলার সর্বোচ্চ কর্মচারীকে আমরা ম্যাজিষ্ট্রেট বলিয়া জানি—তিনি ভারত-সরকারের প্রতিনিধি এবং তাঁহার উপর সরকার প্রভূত ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছেন। জেলার খাজনা তিনি আদায় করেন বলিয়া তাঁহার অপর নাম কলেক্টর সাহেব। স্থানীয় শাসন, আবগারী, আয়কর, ষ্ট্যাম্প-কর, বন্দুকের পাশ, বিদেশ যাওয়ার পাশ দেওয়ার অধিকার সমস্তই তাঁহার হাতে। এছাড়া কলেক্টর সাহেব জেলার সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য দায়ী। দেশের বড় বড় কাজ, বিদ্যা শিক্ষা, হাঁসপাতাল, স্বাস্থ্য, কৃষি, কারবার, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি সকল কাজে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার তাঁহার আছে। জেলার সমস্ত ম্যুন্সিপালটি তাঁহারই তত্ত্বাবধানে; জেলা-বোর্ডের সভাপতিও তিনি। এইরূপে তিনি শত কর্মের স্রষ্টা ও নিয়ন্তা।

জেলা ও ম্যাজিষ্ট্রেট

অন্যান্য বড় বড় সরকারী কর্মচারীর মধ্যে পুলিশ সাহেবের (সুপারিণ্টেডেণ্ট) পদ খুব উচ্চ। জেলার সমগ্র পুলিশ বাহিনীর কর্তা তিনি—তাঁহারই অধীনে থানা ও ইন্সপেক্টর, চৌকি ও সুব-ইন্সপেক্টরগণ। জেলার স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার পর্য্যবেক্ষণের জন্য সিবিলসার্জ্জেন আছেন। তিনি জেলার প্রধান সহরে

অন্যান্য কর্মচারী

থাকেন। এইরূপ আরও অন্যান্ত বিষয় যেমন পূর্ত্ত-কার্য্য কৃষি, বন-বিভাগ, শিক্ষা প্রভৃতি তদারক করিতে প্রতি জেলায় কর্মচারী আছেন।

জেলাগুলি পুনরায় দুই বা ততোধিক মহকুমাতে বিভক্ত। প্রত্যেক মহকুমাতে একজন করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট থাকেন, তাঁহারা হয় সিবিল সার্ভিসের লোক না হয় দেশীয় ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট। বম্বে, মাদ্রাজ, প্রভৃতি প্রদেশে জেলাগুলি তালুক বা তহশিলে বিভক্ত। সেখানে গ্রাম্য পঞ্চায়েতের সাহায্যে অনেক কাজ হয়; বাংলা দেশে সে প্রকার গ্রাম্য পঞ্চায়েৎ প্রথা নাই বলিলে চলে। তবে যাহাতে গ্রামে পুনরায় পঞ্চায়েৎ প্রথা পুনঃ প্রবর্ত্তিত করা যায় ও স্থানীয় লোকের সহায়তার দ্বারা শাসন কার্য্য সুচারুরূপে চলে তদ্বিষয়ে সরকার খুবই মনোযোগ দিয়াছেন।

স্থানীয় শাসন

ভারতবর্ষের স্বায়ত্ব শাসনের কথা উঠিবার পর হইতে সরকার বাহাদুর স্থানীয়-শাসন-কেন্দ্রগুলির উপর ক্রমশই ক্ষমতা ন্যস্ত করিতে-ছেন এবং স্থানীয়-শাসন পরিচালনার মধ্য দিয়া লোকের সংহত ও একত্র হইয়া কার্য্য করিবার শক্তি যাহাতে বৃদ্ধি পায় সেই দিকে দৃষ্টি দিয়াছেন। লর্ড রিপনের সময় হইতে এই কার্য্য সুরু হইয়াছে। এই শক্তি যাহাতে বৃদ্ধি পায় তাহাই ইংরাজ শাসন-নীতির মূল কথা। একদিকে ইংরাজ সরকার যেমন আমাদিগকে অধিকার দিতে ইচ্ছুক, ভারতবাসীগণও উত্তরোত্তর এই শক্তি প্রচুর পরিমাণে পাইবার জন্য উদ্‌গ্রীব। এই উভয় ইচ্ছা পুরণ করিবার জন্য ১৯১৭ সালে ২০শে আগষ্ট তারিখে ভারত সচিব মিঃ মণ্টেগু ঘোষণা করিলেন যে ভারতকে ধীরে ধীরে স্বায়ত্ব-শাসনের পথে চালিত করিতে হইবে।

পরিশিষ্ট—১

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা নির্বাচিত সভ্য

(১) প্রাদেশিক আইন সভার বেসরকারী সভ্যগণ কর্ত্তৃক নির্বাচিত

(ক) বোম্বাই, মাদ্রাস, বাংলা, যুক্তপ্রদেশ ৪ × ২ = ৮

(খ) পঞ্জাব, বর্মা, বিহার-উড়িষ্যা, আসাম ৪ × ১ = ৪

(২) মধ্যপ্রদেশের ডিষ্ট্রিক্ট-বোর্ড ও মিউনিসিপ্যালটি কর্ত্তৃক নির্বাচিত ১ = ১

(৩) প্রাদেশিক জমিদার সভা

বাংলা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, যুক্তপ্রদেশ, বিহার ও উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ ৬ × ১ = ৬

(৪) মুসলমান সমাজ :—

বোম্বাই, বাংলা, মাদ্রাজ, যুক্তপ্রদেশ, বিহার ও উড়িষ্যা ৫ × ১ = ৫

(৫) চেম্বার অব্ কমার্স বাংলা, বোম্বাই ২ × ১ = ২

(৬) যুক্তপ্রদেশের মুসলমান জমিদার সভা ১ × ১ = ১

২৭

গভর্ণমেণ্ট নির্বাচিত সভ্য।

(১) প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট হইতে আনীত—

মাদ্রাজ, বোম্বাই, বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা, যুক্তপ্রদেশ, পঞ্জাব, ব্রহ্মদেশ, মধ্যপ্রদেশ, আসাম, উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশ ১০ × ১ = ১০

(২) গভর্ণমেণ্ট অব্ ইণ্ডিয়ার নিজের লোক ১৭

(৩) বেসরকারী সভ্য :—(ক) ভারতীয় বণিক সমিতি		
(খ) পঞ্জাবের মুসলমান সমাজ		৪
(গ) জমিদার সভা		
(ঘ) অন্যান্য		

সরকারী—(১) শাসন সভার সভ্য	৭
(২) যে প্রদেশে সভার অধিবেশন হয় তথাকার শাসনকর্ত্তা	১
(৪) গভর্ণমেণ্টের নিজের নির্ব্বাচিত সভ্য	২৭
	৩৫

বেসরকারী—(১) প্রজাগণ নির্ব্বাচিত	২৭
(২) গভর্ণমেণ্ট মনোনীত	৪
	৩১

অ্যাডিসন্যাল (additional) সদস্যের সংখ্যা :—	২
সরকারী—	২৭
বেসরকারী—	৩১
	৫৮
	খালি—২
	মোট—৬০

পরিশিষ্ট—৩

ভারতশাসন ও প্রাদেশিক শাসনের ব্যবস্থ

প্রদেশ	শাসন কর্ত্তা	অধ্যক্ষ সভা সদস্য সংখ্যা	শাসন সভার Ex-officio সদস্যগণ	ব্যবস্থাপক সভার সদস্য সংখ্যা: সরকার মনোনীত		প্রজাগণ নির্বাচিত	মোট সরকারী মনোনীত
				সরকারী কর্মচারী	বেসরকারী	বেসরকারী	
বঙ্গদেশ	গভর্ণর	৪+১	৪+১	১৬	৪	২৮	২০
বম্বে প্রদেশ	”	৪+১	৪+১	১৪	৭	২১	২১
মান্দ্রাজ	”	৪+১	৪×১	১৬	৫	২১	২১
যুক্তপ্রদেশ	ছোটলাট	নাই		২০	৬	২১	২০
পঞ্জাব	”	নাই		১১	৬	১১	১৭
বিহার উড়িষ্যা	”	৩+১	৪+১	১৫	৪	২১	১৯
মধ্য প্রদেশ ও বেরার	চীফকমিশনার	নাই		১০	৭	৭	১৭
আসাম	”	নাই		৯	৪	১১	১৩
আজমীর মেবার	”						
উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	”						
ভারত সাম্রাজ্য	বড়লাট	৬×১	৬+১	২৮	৫	২৭	৩৩

* শাসন সংস্কার হইবার পূর্ব্বের অবস্থা।

† শাসন কর্ত্তা

পরিশিষ্ট—২

বাংলার ব্যবস্থাপক সভা

(১)	কলিকাতা করপোরেশন হইতে ...	১ জন
(২)	,, বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ...	১ ,,
(৩)	কতগুলি নির্দ্দিষ্ট ম্যুন্সিপালটি হইতে—	৫ ,,
(৪)	জেলা-বোর্ড ও লোকাল-বোর্ড, পাঁচটি বিভাগ	৫ ,,
(৫)	প্রেসিডেন্সি, বর্দ্ধমান, রাজসাহী, ঢাকার, জমিদারগণের মধ্য হইতে	৪ ,,
(৬)	চট্টগ্রামের ম্যুন্সিপালটির কমিশনরগণের দ্বারা ঐ বিভাগের জমিদারগণের দ্বারা একবার অন্তর	১ ,,
(৭)	মুসলমানদের দ্বারা	৫ ,,
(৮)	বেঙ্গল চেম্বার অব্ কর্ম্মাস ...	২ ,,
(৯)	কলিকাতা বণিক সঙ্ঘ ... (Trades Association)	১ ,,
(১০)	চট্টগ্রামের বন্দরের কমিশনরগণ কর্ত্তৃক	১ ,,
(১১)	কলিকাতার কর্পোরেশনের কতকগুলি কমিশনর ... কর্ত্তৃক	১ ,,
(১২)	চা-বাগিচা-ওয়ালাদের দ্বারা	১ ,,
		২৮ জন
	মনোনীত	২০ ,,
	মন্ত্রী ও গভর্ণর ...	৫ ,,
		৫৩ জন

এতদ্ব্যতীত আরও দুইজন বিশেষ সভ্যকে গভর্ণর মনোনীত করিতে পারেন।

২। নূতন শাসন সংস্কার

১৯১৭ সালের ২০শে আগষ্ট তারিখে ভারত-সচিব মিঃ মণ্টেগু হাউস্ অব্ কমন্সের সভায় নিম্নলিখিত ঘোষণা প্রচার করেন :—

মিঃ মণ্টেগুর ঘোষণাপত্র ২০শে আগষ্ট ১৯১৭

ভারতের শাসনতন্ত্রের প্রত্যেক বিভাগে ভারতবাসীদের সহায়তা ক্রমশঃই বৃদ্ধি করিতে হইবে; এ সম্বন্ধে ভারত গভর্ণমেণ্টের সহিত ইংলণ্ডের গভর্ণমেণ্টের মত সম্পূর্ণ এক হইয়াছে; বৃটীশ সাম্রাজ্যের অন্তরঙ্গ অংশরূপে ও ভারতে দায়ীত্ব-পূর্ণ গভর্ণমেণ্টের ক্রমিক বিকাশের জন্য স্বশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলিকে ধীরে ধীরে উন্নত করা সম্বন্ধেও উভয়ে একমত হইয়াছেন। ভারত ও বৃটীশ সরকার স্থির করিয়াছেন যে এই বিষয়ে রীতিমত ব্যবস্থা করিবার সুযোগ শীঘ্র উপস্থিত হইলেই তাহা করিবেন; এই ব্যবস্থা কিরূপ হইবে তাহা প্রথমে জানা বিশেষ প্রয়োজন, এবং সেইজন্য ভারতের ও ইংলণ্ডের কর্তৃপক্ষের মধ্যে খোলাখুলি আলোচনা হওয়া বাঞ্ছনীয়। বৃটীশ সরকার সম্রাটের অনুমোদন লইয়া স্থির করিয়াছেন ভারত-সচিবের ভারতে গমন সম্বন্ধে বড়লাট বাহাদুরের যে নিমন্ত্রণ আসিয়াছে তাহা তিনি গ্রহণ করিবেন; তথায় বড়লাট ও ভারত সরকারের সহিত এই সকল বিষয়ের আলোচনা ও প্রাদেশিক শাসনসরকার গুলির মতামত বিবেচনা করিবেন ও উভয়ে প্রতিনিধি সভা সমিতির বক্তব্য শ্রবণ করিবেন। ভারত-সচিব বলেন যে এই নীতি অনুসারে উন্নতি ধীরে ধীরেই হইতে পারে। বৃটীশ ও ভারতীয় শাসন সরকারের উপর ভারতীয় জনসঙ্ঘের কল্যাণ ও উন্নতি নির্ভর করিতেছে বলিয়া কোন সময়ে কি ব্যবস্থা করিতে হইবে তাহা তাঁহারাই বিচার করিয়া বলিবেন; যাহাদের উপর দেশ সেবার এই নূতন সুযোগ সমর্পিত হইবে

তাহাদের নিকট হইতে সহায়তা লাভ করিয়া ইঁহারা চলিবেন; এবং যে পরিমাণে সহায়তা পাওয়া যাইবে তাহাই দেখিয়া তাঁহাদের দায়ীত্ব-বোধের উপর আস্থা স্থাপন করা হইবে। শাসন সংস্কার বিষয়ে প্রস্তাব সমূহের আলোচনার জন্য সাধারণকে যথেষ্ট সুযোগ দেওয়া হইবে; এবং উহা পরে যথাসময়ে পার্লামেন্টের নিকট পেশ করা হইবে।

পূর্বোল্লিখিত ঘোষণা অনুসারে মিঃ মণ্টেগু ১৯১৭ সালের শেষাশেষি ভারতে আগমন করিলেন। ১৯১৮ সালের জুলাই মাসে ভারতীয় শাসন পদ্ধতি সংস্কারের প্রতিবেদন প্রকাশিত হইল। মোটামুটি চারিটি কথা মনে রাখিয়া সংস্কারের খসড়া তৈয়ারী হয়। নিম্নে সেইগুলি সংক্ষেপে বিবৃত হইল।

মণ্টেগু চেমস ফোর্ট সংস্কার প্রতিবেদন ১৯১৮ জুলাই।

১। স্থানীয় সভাসমিতিসমূহ যতদূর সম্ভব জনসাধারণের মতে চলিবে, এবং বাহিরের সকল প্রকার শাসন হইতে সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন হইয়া চলিবে।

২। সর্বপ্রথমে প্রদেশগুলিতে ক্রমশলভ্য দায়ীত্বপূর্ণ শাসন পদ্ধতির প্রবর্ত্তন করা হইবে। দায়ীত্ব গ্রহণের কতকগুলি পন্থা অবিলম্বে গৃহীত হইবে। বৃটীশরাজের উদ্দেশ্য অবস্থা অনুকূল হইলেই সম্পূর্ণ শাসন-দায়ীত্ব ভারতবাসীর উপর অর্পণ করা। ইহার জন্য প্রদেশগুলিকে অবিলম্বে আইন প্রণয়ন বিষয়ে, শাসন ও অর্থ সম্বন্ধীয় অনেক ব্যাপারে স্বাধীনতা দান করিবার প্রয়োজন; ইহাতে ভারত গভর্ণমেন্টের নিজ দায়ীত্ব বজায় রাখিবার কোনই বাধা ঘটিবে না।

৩। পার্লামেন্টের নিকট ভারত গভর্ণমেন্টই শাসনের জন্য দায়ী থাকিবেন; এবং এই দায়ীত্ব ব্যতীত সমস্ত বিষয়ে তাঁহাদের ক্ষমতা অক্ষুন্ন থাকিবে। ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য সংখ্যা বর্দ্ধিত করিয়া জনমত জানিবার ব্যবস্থা করা হইবে।

৪। পূর্বোক্ত পরিবর্ত্তনগুলি যেমন যেমন কার্য্যে পরিণত হইতে থাকিবে ভারতীয় ও প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের উপর পার্লামেণ্টের ও ভারত সচিবের ক্ষমতাও তেমনি হ্রাস পাইবে।

মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড প্রতিবেদনের সার আমরা নিম্নে দিতেছি। স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন পদ্ধতি যথার্থভাবে এই সকল প্রস্তাবের অন্তর্গত হইতে পারে না; যেহেতু এই শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানগুলি সম্পূর্ণরূপে জন-ব্যবস্থার উপর ছাড়িয়া দেওয়াই সরকার বাহাদুরের ইচ্ছা। ইহা সকলেই স্বীকার করেন যে স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসনের উন্নতির সহিত শিক্ষা বিস্তার ও শিক্ষা সংস্কার অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। এই শিক্ষা বিভাগ ক্রমে ক্রমে ভারতবাসীদের স্বহস্তে যাইবে ইহাই ভাবী সংস্কারের অন্যতম উদ্দেশ্য। নির্বাচকদের সংখ্যা বৃদ্ধি ও তাহাদের শক্তির সদ্ব্যবহারের উপর উন্নতি নির্ভর করিতেছে। উপযুক্ত সভ্যপদপ্রার্থী নির্বাচন করিতে ও সভাতে কার্য্য-প্রণালী কিরূপ ভাবে চলিতেছে, তাহা লোককে শিক্ষা করিতে হইবে এবং সেই শিক্ষাই তাহাদিগকে যোগ্য নির্বাচক হইবার পক্ষে সহায় হইবে।

প্রাদেশিক শাসন।

দায়ীত্বপূর্ণ গভর্ণমেণ্টের ক্রমশঃ উন্নতি বিধান করাই বর্ত্তমান সংস্কারের উদ্দেশ্য। দায়ীত্বপূর্ণ গভর্ণমেণ্ট বলিতে দুইটি জিনিষ বুঝায়; প্রথমত কার্য্যনির্ব্বাহক গভর্ণমেণ্টের সভ্যগণ তাঁহাদের নির্ব্বাচকদের নিকট দায়ী থাকিবেন; দ্বিতীয়ত নির্ব্বাচকগণ সভাতে তাঁহাদের প্রতিনিধিদের সাহায্যে তাঁহাদের শক্তি প্রয়োগ করিবেন। এই দুই সর্ত্তের অর্থ দাঁড়ায় এই যে প্রজাদের এমন শক্তি থাকা চাই যাহাতে তাহারা ভোট দিয়া নিজেদের স্বার্থরক্ষা করিতে পারে ও নিজ নিজ প্রতিনিধিগণকে বিবেচনাপূর্ব্বক নির্ব্বাচন করিতে পারে। দ্বিতীয় কথা এই যে কার্য্যনির্ব্বাহক সভ্যগণ সাধারণ সভার অধিকাংশের

সংস্কারের উদ্দেশ্য

সহায়তা লাভ হইতে বঞ্চিত হইলে তাঁহাদের কর্ম্মত্যাগ করাই শাসন বিভাগের চল্‌তি প্রথা। ভারতে এ সর্ত্তগুলি কার্য্যে পরিণত হইতে পারে না। এই আদর্শ লাভ করিবার পূর্ব্বে ভারতকে কিছুকাল ধরিয়া রাজনীতিক্ষেত্রে দায়ীত্ব ভার শিক্ষার চর্চ্চা প্রয়োজন। নানা কারণে এই মুহূর্ত্তেই ভারতবাসীদের হস্তে সম্পূর্ণ দায়ীত্ব ছাড়িয়া দেওয়া অসম্ভব। সেইজন্য গভর্ণমেণ্ট দেশীয়দের হাতে কতকগুলি বিষয় সমর্পণ করিয়া নিজের হাতে কতকগুলি রাখিয়া দিবেন; এই সঙ্গে প্রাদেশিক শাসন বিভাগের স্বাধীনতা যথেষ্ট দান করা হইবে।

প্রাদেশিক আত্মকর্ত্তৃত্ব লাভকেই বাস্তব করিয়া তোলাই বর্ত্তমান শাসন সংস্কারের উদ্দেশ্য; সুতরাং প্রাদেশিক উন্নতির জন্যও ভারত গভর্ণমেণ্টের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকা উচিত হইবে না। ভারতবাসীদের ব্যবস্থা-এক্তিয়ারের মধ্যে যে সব বিষয় পড়িবে সে গুলির জন্য কি পরিমাণ ব্যয় পড়িবে তাহা অনুমান করাই এই প্রস্তাবের অন্তর্গত। ভারত গভর্ণমেণ্টের ব্যয়ের জন্য কতকগুলি আয় বাঁধা থাকিবে। অবশিষ্ট রাজস্ব প্রাদেশিক শাসন সরকারের হস্তে সমর্পিত হইবে এবং তাঁহাদের নিজ নিজ প্রদেশিক শাসন ও সুব্যবস্থার জন্য দায়ী থাকিবেন। ভারতীয় ও প্রাদেশিক আয় ব্যয়ের বর্ত্তমানের ব্যবস্থা থাকিবে, ভারত সরকারের রাজস্বের মধ্যে ইন্‌কম্ ট্যাক্স ও সাধারণ ষ্ট্যাম্পের আয় যাইবে; প্রাদেশিক আয়ের অন্তর্গত হইবে জমির রাজস্ব, জলসেচনের আয়, আব্‌গারী ও কোর্টফির ষ্ট্যাম্প। দুর্ভিক্ষ প্রভৃতির জন্য প্রাদেশিক সরকারই দায়ী থাকিবেন।

রাজস্বের ভাগ

উপযুক্ত বন্দোবস্তের ফলে ভারত সরকারের অনেক টাকার অকুলান হইবে; সেই জন্য প্রাদেশিক সরকার হইতে মোট আয় ও মোট ব্যয়ের উদ্‌বৃত্তের কিয়দংশ ভারতসরকার দাবী করিবেন।

ভারত সরকার প্রাদেশিক সরকার সমূহের সহিত এক হইয়া কোন্ কোন্

প্রাদেশিক কর ধার্য্য

বিষয়ে ট্যাক্স করা যাইতে পারে তাহার একটি ফর্দ তৈয়ারী করিবেন। এই ফর্দের অন্তর্গত বিষয়ের উপর প্রাদেশিক সরকারের ট্যাক্স করিবার অধিকার থাকিবে। কিন্তু বিলটিকে একবার বড়লাটের সভায় দেখাইয়া আনিয়া কার্য্যকারী করিতে হইবে।

প্রাদেশিক সরকারের অর্থ কর্জ্জ করিবার অধিকার থাকিবে; কিন্তু সমস্ত কর্জ্জ ভারত সরকারের মারফৎ করিতে হইবে; ভারতসরকারের অনাবশ্যক হস্তক্ষেপ হইতে প্রাদেশিক সরকারকে স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে। প্রাদেশিক শাসনের খুঁটিনাটি কোনো বিষয়ে বড়লাট সহজে হস্তক্ষেপ করিবেন না বলিয়া প্রস্তাব হইয়াছে।

প্রাদেশিক কার্য্য নির্ব্বাহক সভা

সকল প্রদেশেই লাটসাহেব কার্য্য-নির্ব্বাহক সভার সাহায্যে শাসন করিবেন। লাটসাহেব এই সভার প্রধান; তাঁহার দুইজন মন্ত্রী সাহায্য করিবেন, একজন সাহেব, এক-জন ভারতবাসী; উভয়েই শাসনকর্ত্তা কর্ত্তৃক মনোনীত হইবেন। এতদ্ব্যতীত ব্যবস্থাপক সভার নির্ব্বাচিত সভ্যশ্রেণী হইতে কয়েক জন মন্ত্রীকে গভর্ণর মনোনীত করিয়া লইবেন; এই মন্ত্রীগণ "অর্পিত" বিষয় সমূহের জন্য দায়ী।

কর্ত্তৃপক্ষ বলেন যে ভারতের বর্ত্তমান শিক্ষা ও শক্তি বিচার করিলে দেখা যাইবে যে তাহাদের উপর সম্পূর্ণরূপে দায়ীত্ব ছাড়িয়া দিলে সমস্ত শাসন কার্য্য এককালেই ভাঙ্গিয়া পড়িবে। কতকগুলি দায়ীত্ব ভারত-বাসীর উপর এখন দিতে হইবে। সেইজন্য ভারতবাসীদের হাতে কি কি বিষয় অর্পিত হইবে ও কোন্ কোন্ বিষয় সরকারী পক্ষ হইতে রক্ষিত হইবে তাহার তালিকা প্রস্তুত করা প্রয়োজন। এই ভাগকে আমরা 'অর্পিত' বিষয় ও 'রক্ষিত' বিষয় বলিব। প্রাদেশিক সাশনে গভর্ণর ও তাঁহার কার্য্যনির্ব্বাহক সভার উপর 'রক্ষিত' বিষয়গুলির ভার থাকিবে। গভর্ণর দেশীয় মন্ত্রীদের লইয়া "অর্পিত" বিষয়গুলি তদারক করিবেন।

সাধারণ কার্য্যনির্ব্বাহক সভায় সকল সদস্যের সহিত সকল বিষয়েরই আলোচনা হইবে; কিন্তু প্রয়োজন মত 'রক্ষিত' বিষয়ের আলোচনা কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সরকারী মনোনীত সভ্যদের সহিত হইবে ও 'অর্পিত' বিষয় সম্বন্ধে দেশী মন্ত্রীদের সহিত আলোচনা হইবে; এবং প্রত্যেক বিষয়ের চরম মীমাংসা লাটসাহেব নিজ নিজ বিষয়ের মন্ত্রীদের সহিত পরামর্শ করিয়া করিবেন।

নির্ব্বাচকদের ইচ্ছার উপর মন্ত্রীদের কার্য্যকাল নির্ভর করিবে। তাঁহাদের কার্য্যকালের বেতন নির্ব্বাচকদিগকেই ঠিক করিতে হইবে। "অর্পিত" বিষয়ের জন্য দায়ী বলিয়া প্রথম হইতেই যে তাঁহাদের পরামর্শেই গভর্ণর চলিবেন তাহা নহে, কারণ শেষ পর্য্যন্ত তিনিই সমস্ত শাসনের জন্য দায়ী; আবার সকলের মত অগ্রাহ্য করিয়া তিনি চলিবেন তাহাও বাঞ্ছনীয় নহে। গভর্ণরের স্থানীয় অবস্থাদির অজ্ঞতার জন্য তিনি দুই একজন অতিরিক্ত সভ্য কার্য্যনির্ব্বাহক সভায় আনিতে পারেন; তবে তাঁহাদের কোন আপিষের কাজে থাকিবেন না, তাঁহারা কেবলমাত্র পরামর্শ দিবেন।

বৃহত্তর প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভা

প্রত্যেক প্রদেশেই বৃহত্তর ব্যবস্থাপক সভা প্রতিষ্ঠিত হইবে। এই সব সভায় নির্ব্বাচিত সভ্যের সংখ্যাই অধিক হইবে এবং সভ্যগণ সাধারণ লোকের দ্বারা নির্ব্বাচিত হইয়া ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত হইবেন। কোন্ প্রদেশের কতজন সভ্য হইবেন, কতজন নির্ব্বাচক হইবে, কাহার ভোট দিবার অধিকার হইবে ইত্যাদি বিচার করিবার জন্য এক কমিশন বসিবে; সেই কমিশনের মন্তব্য দেখিয়া ভারত সচিব ও বড়লাট ব্যবস্থা করিবেন।

ধর্ম্মগত নির্ব্বাচন দায়ীত্বপূর্ণ স্বায়ত্ব-শাসন লাভের পরিপন্থী, কিন্তু তথাচ মুসলমানদের জন্য পৃথক্ নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা থাকিবে। শিখ্‌দিগকেও এই অধিকার দিতে হইবে।

কথা হইয়াছে যে একটি বা কয়েকটি করিয়া বিষয় কার্য্যনির্ব্বাহক সভার এক এক জন সভ্যের উপর অর্পিত হইবে এবং প্রত্যেক বিষয়ের জন্য একটি করিয়া স্থায়ী কমিটি থাকিবে ; ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণ আপনাদের মধ্য হইতে প্রত্যেক কমিটির সদস্য নির্ব্বাচন করিয়া দিবেন। এই কমিটি পরামর্শ দিবেন। কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্য বা মন্ত্রী যাহার উপর বিভাগের ভার তিনিই সভাপতি হইবেন।

ব্যবস্থাপক সভায় 'অর্পিত' বা 'রক্ষিত' বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা হইয়া যদি কোনো প্রস্তাব অধিকাংশের মতে গৃহীত হয় তথাচ উহা যে লাটসাহেবকে মানিয়াই যাইতে হইবে তা নহে। প্রত্যেক সভ্যেরই প্রশ্ন করিবার ক্ষমতা আছে এবং পূর্ব্বের অপেক্ষা নূতন নিয়মানুযায়ী সভ্যদের প্রশ্ন-বিষয়ে ক্ষমতা বাড়িয়াছে।

গভর্ণরের ক্ষমতা

নূতন কৌন্সিল গঠিত হইলে নির্ব্বাচিত সভ্যের সংখ্যা অধিক হইবে ; তখন সরকারী কোনো আইন পাশ্ করাইতে হইলে কর্ত্তৃপক্ষের অসুবিধা হইতে পারে ; এই জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সরকারী "রক্ষিত" বিষয় সম্বন্ধে কোনো আইন পাশ করিবার পূর্ব্বে প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাকে বলিতে হইবে যে দেশের শান্তি ও সুব্যবস্থার জন্য তিনি দায়ী বলিয়া তাঁহাকে এই আইন পাশ করাইতে হইবে। ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণ ভারতসরকারের কাছে ইহার ব্যবস্থার জন্য প্রস্তাব করিতে পারেন ও সম্বহুলতার (vote) দ্বারা তাহা কার্য্যকারী করিতে পারেন। ভারত-সরকারের বিবেচনায় যদি উহা সমীচিন হয় তবে প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা বিলটিকে ব্যবস্থাপক সভার গ্র্যাণ্ড কমিটিতে (Grand Committee) উপস্থিত করিবেন।

সরকারী বিল ও গ্র্যাণ্ড কমিটী

প্রত্যেক প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার সভ্যদের মধ্য হইতে শতকরা ৪০ হইতে ৫০ জন সভ্যকে আংশিকভাবে নির্ব্বাচিত ও মনোনীত করিয়া

বিলের আলোচনার জন্য আহ্বান করা হইবে। গভর্ণর এই সভার মনোনীত সভ্যের সংখ্যা সামান্য অধিক রাখিবেন ও ইহাদের মধ্যে সরকারী লোক তিনভাগের দুইভাগ থাকিবে। গ্রাণ্ড কমিটির নির্ব্বাচিত সভ্যেরা ব্যবস্থাপক সভার নির্ব্বাচিত সভ্যগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইবেন। এই কমিটিতে বিল্ সম্বন্ধে আলোচনা, তর্ক চলিতে পারে; কিন্তু কোনো প্রস্তাব বা সংশোধন-প্রস্তাব কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্য ব্যতীত অপর কাহারো দ্বারা উত্থাপিত হইতে পারিবে না। এইখানে আলোচনার পর বিল্ আপনা হইতে পাশ্ হইয়া আইনে পরিণত হইবে।

ব্যবস্থাপক সভা বন্ধ করিয়া দিবার অধিকার প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তার থাকিবে। প্রত্যেক প্রাদেশিক বিল্ পাশ হইবার পূর্ব্বে বড়লাট ও সম্রাটের অনুমোদন সাপেক্ষ।

প্রাদেশিক আয় ব্যয়ের খসড়া কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সকল সদস্যে মিলিয়া করিবেন। রাজস্বের আদায় হইতে ভারত সরকারকে সর্ব্বপ্রথমে টাকা দিতে হইবে; তৎপরে সরকারী 'রক্ষিত' বিষয়গুলির জন্য টাকার ব্যবস্থা করিতে হইবে। "অর্পিত" বিষয়ের অর্থ সম্বন্ধে মন্ত্রীরা ভাবিবেন; যদি উদ্বৃত্ত রাজস্ব অধিক না থাকে তবে পুনরায় ট্যাক্স করিবার কথা গভর্ণর ও মন্ত্রীগণ বিবেচনা করিয়া ঠিক করিবেন। এই খসড়া তৈয়ারী হইলে উহা ব্যবস্থাপক সভায় পেশ করা হইবে; সেখানে বাজেট সম্বন্ধে আলোচনা হইবে; কিন্তু "রক্ষিত" বিষয়ের জন্য যে টাকা ধার্য্য হইয়াছে সে বিষয় যদি কোন কথা উঠে তবে লাটসাহেব তাঁহা প্রয়োজনীয় বলিয়া জ্ঞাপন করিলে তাহা পূর্ব্বোল্লিখিত উপায়ে পাশ্ করিতে পারিবেন।

রাজস্বের ব্যয়

ভারতের এই নূতন শাসন পদ্ধতিকে ঠিক পথে চালিত করিবার জন্য মাঝে মাঝে বাহির হইতে কমিশন আসিয়া গভর্ণমেন্ট ও ব্যবস্থাপক সভার কার্য্যাবলী পরীক্ষা

বাহিরের কমিশন

করিবেন। এই কমিশনের নিকট উভয় পক্ষের শুনানী হইবে; গভর্ণমেণ্ট "রক্ষিত" বিষয়গুলির জন্য অতিরিক্ত টাকা অপব্যয় করিয়াছেন কিনা, সকৌন্সিল গভর্ণর অযথাভাবে ব্যবস্থাপক সভার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করিয়াছেন কিনা অথবা ব্যবস্থাপক সভা "রক্ষিত" বিষয়গুলির জন্য অর্থাদি দিতে অত্যন্ত কার্পণ্য প্রকাশ করায় তাঁহাদের অধিক দায়ীত্বপূর্ণ কার্য্য অর্পণ করা যুক্তিসঙ্গত কিনা ইত্যাদি লইয়া আলোচনা হইবে। প্রথমে নূতন কৌন্সিল হইবার দশ বৎসর পরে এই কমিশন আসিবে। এই কমিশন পার্লামেণ্ট কর্তৃক মনোনীত হইবেন। কোন্ প্রদেশ উন্নতিলাভ করিয়াছে কাহারা পিছাইয়া পড়িয়াছে তাহা ইঁহারাই বিচার করিবেন।

ভারতবাসীরা রাজনৈতিক ব্যাপারে দক্ষতা লাভ করিতে থাকিলে তাঁহাদের হাতে একটি একটি করিয়া রক্ষিত বিষয় অর্পণ করাই বর্ত্তমান শাসন সংস্কারের উদ্দেশ্য। ক্রমে 'রক্ষিত' বিষয় আর থাকিবে না, সমস্তই ভারতীয়দের হাতে যাইবে ও সম্পূর্ণ দায়ীত্বপূর্ণ শাসনপদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইবে। পাঁচ বৎসর পরে "রক্ষিত" বিষয় সম্বন্ধে আবেদন বড়লাটের নিকট পেশ করিবার অধিকার কৌন্সিলের থাকিবে।

ভারত সরকার (India Government)

মন্ত্রীসভা, ব্যবস্থাপক, সমিতি

অধিক সংখ্যক সভ্য নির্বাচন করিয়া বৃহত্তর ব্যবস্থাপক সভা স্থাপন করা এখানেও হইবে। প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার Grand Committeeর ন্যায় এখানেও একটি কৌন্সিল অব্ ষ্টেট্ গঠিত হইবে, একটী প্রিভি কৌন্সিল তৈয়ারী হইবে। যতদিন না প্রাদেশিক স্বায়ত্ব শাসনের শক্তি আরও বৃদ্ধি পায় ততদিন ভারতসরকার পার্লামেণ্টের নিকট সকল বিষয়ে দায়ী থাকিবেন। বর্ত্তমান কার্য্যনির্বাহক সভার ন্যায় বড়লাট ও তাঁহার ছয় বা সাতজন মন্ত্রী লইয়া নূতন সভা গঠিত হইবে; তবে সিবিল

সার্ভিসের লোকেদের সংখ্যা কমানো হইবে। এখন একজন মাত্র দেশীয় সভ্য কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সদস্যরূপে আছেন, কথা হইয়াছে অচিরে আরও একজন দেশীয় সভ্যকে নিযুক্ত করা হইবে।

ব্যবস্থাপক সভা Legislative Assembly বলিয়া অভিহিত হইবে। এই সভার সভ্য সংখ্যা হইবে ১৮০ জন। ইহার মধ্যে ৬৬ জন নির্বাচিত হইবে এবং অবশিষ্ট বড়লাট কর্তৃক মনোনীত হইবে; এই সভায় সভ্যগণ তিন বৎসর কাল সভ্য থাকিবেন।

বে-সরকারী সভ্য মনোনীত করিবার ক্ষমতা গভর্ণর জেনারেলের বিশেষ "রক্ষিত" ক্ষমতার অন্তর্গত; ব্যবস্থাপক সমিতিতে অসামঞ্জস্য বা সকল প্রকারের ত্রুটি দূর করিবার জন্যই বড়লাট বাহাদুর সাধারণ নির্বাচন হইয়া যাইবার পর প্রাদেশিক শাসন কর্ত্তাদের সহিত পরামর্শ করিয়া বে-সরকারী সভ্য মনোনীত করিবেন।

মনোনীত সভ্যসংখ্যা।

মনোনীত সভ্যদের সংখ্যা $\frac{1}{5}$ এর বেশী হইবে না এবং এই সংখ্যক মনোনীত সভ্য সর্বদা আহ্বান করিবেন কিনা ইহা বড়লাট স্বয়ং বিচার করিবেন। কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্যগণ ব্যতীত অপর সরকারী সভ্যদের নিজ নিজ মত দিবার ও নিজ মতানুযায়ী ভোট দিবার অধিকার থাকিবে, অবশ্য গভর্ণর সরকারী পক্ষে মত দিতে বলিলে তাঁহারা তদ্রূপ করিতে বাধ্য।

সরকারী আইন ও Council of State.

শাসন সংস্কারের পরিবর্ত্তনের সন্ধিস্থলে ভারতের সুশাসনের জন্য সরকারের নিজ অভিপ্রায় কার্য্যে পরিণত করার প্রয়োজন। এই জন্য কৌন্সিল্ অব্ ষ্টেট্ নামক একটি দ্বিতীয় সভা প্রতিষ্ঠিত হইবে। প্রাদেশিক গ্রাণ্ড কমিটির ন্যায় Council of Stateও ব্যবস্থা বিষয়ে চরম নিষ্পত্তি করিবেন। এই সভার সভ্যসংখ্যা কতজন হইয়াছে তাহা পরে বলিব। এই সভায় সভ্যগণ পাঁচবৎসর কাল সভ্য থাকিবেন।

সাধারণত সরকারী বিল ব্যবস্থাপক সমিতিতে প্রবর্ত্তিত হইবে; এবং সেখানে যথারীতি পাশ-হইয়া গেলে কৌন্সিল অব্ ষ্টেটের সমক্ষে বিচারের জন্য উপস্থিত করা হইবে। কৌন্সিল অব্ ষ্টেট্ যদি প্রস্তাবিত বিলের এমন সব সংশোধন প্রস্তাব যোজনা করেন যাহা ব্যবস্থাপক সমিতি গ্রহণ করিতে অক্ষম তখন বিচারের ভার উভয় সভার সম্মিলিত অধিবেশনের উপর অর্পিত হইবে। আর যদি গভর্ণমেণ্ট মনে করেন যে কৌন্সিল অব্ ষ্টেট্ যে সংশোধন প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা ন্যায্য ও যুক্তিযুক্ত তাহা হইলে বড়লাটকে ঘোষণা করিতে হইবে যে সাম্রাজ্যের মঙ্গল ও সুব্যবস্থার জন্য ইহা নিতান্তই প্রয়োজনীয়। তখন ব্যবস্থাপক সভার আর কোনো প্রতিবাদ করিবার অধিকার থাকিবে না এবং উভয় সভার সম্মিলিত বিচারের ও কোন প্রয়োজন হইবে না।

বে-সরকারী সভ্যেরা উভয় সভাতেই বিল বা নূতন ব্যবস্থা করিবার প্রস্তাব আনয়ন করিতে পারিবেন। প্রস্তাব সভায় পাশ হইবার পর অপর সমিতিতে তাহা সমালোচনা ও বিচারের জন্য যাইবে। মতান্তর হইলে উভয় সভার সম্মিলিত অধিবেশনে তাহার বিচার হইবে; এক্ষেত্রে বড়লাটের ইচ্ছানুযায়ী তাহা তদ্দণ্ডেই আইনে পরিণত হইতে পারিবে।

বড়লাট যে কোনা সময়ে যে কোনো সভা বা উভয় সভাই বন্ধ করিয়া দিতে পারেন। কোনো আইনে মত বা অমত দিবার সম্পূর্ণ অধিকার ভারতসচিব ও বড়লাটের থাকিবে।

রাজস্ব সম্বন্ধে প্রস্তাব গভর্ণমেণ্ট তরফ হইতে হইবে; এবং বাজেট বা আয়ব্যয় সম্বন্ধে হিসাব ব্যবস্থাপক সমিতির সমক্ষে পেশ্ করা হইবে কিন্তু তাঁহাদের ভোট দিবার কোনো অধিকার থাকিবে না। সভ্যেরা কোনো প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া তাহা সমবহুলতার দ্বারা গভর্ণমেণ্টকে করিতে বাধ্য করিতে পারিবেন না; তাঁহাদের প্রস্তাব পরামর্শের ন্যায় গৃহীত হইবে।

ভারত-সরকারেও পূর্বোল্লিখিত স্থায়ী কমিটি বা Standing Committee থাকিবে। উভয় সভার সভ্যগণের যে কোনো প্রশ্ন করিবার অধিকার থাকিবে; বর্ত্তমানে অনেক বিষয়ে প্রশ্ন করিতেই দেওয়া হয় না। কতকগুলি প্রশ্ন সাম্রাজ্যের ক্ষতিকর বলিয়া তাহা না উঠিতে দিবার অধিকার বড়লাটের এখনো থাকিবে।

সম্রাটের আদেশক্রমে বিলাতের অনুরূপ একটি প্রিভিকৌন্সিল ভারতে স্থাপিত হইবে; এই কৌন্সিল বৃটীশভারত ও করদরাজ্যগুলির মধ্য হইতে জ্ঞানে গুণে শ্রেষ্ঠব্যক্তিদের লইয়া গঠিত হইবে; সভ্যগণ চিরজীবনের মত মনোনীত হইবেন। বড়লাটকে উপদেশ ও পরামর্শ দান ছাড়া ইহার আপাতত আর কোনো কর্ত্তব্য থাকিবে না।

ইণ্ডিয়া অপিষ। (India Office)

India office ও ভারত সচিব

ভারতবাসীদের হস্তে যে সকল বিষয় অর্পিত হইবে সেগুলি সম্বন্ধে পার্লামেণ্ট কোনোপ্রকার হস্তক্ষেপ করিবেন না; কারণ তাঁহারা নিজেরাই ভারতবাসীকে অধিকার দিয়াছেন। কিন্তু সরকারী "রক্ষিত" বিষয়গুলি সম্বন্ধে পার্লামেণ্টের দায়ীত্ব ষোল আনা। তথাচ সকৌন্সিল বড়লাটের উপর দায়ীত্ব পূর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে প্রদত্ত হইবে; এখন যেসকল বিষয় ভারত সচিবের অনুমত্যনুসারে করিতে হয় ভবিষ্যতে সেরূপ করিতে হইবে না। ভরতসচিব ক্রমে ক্রমে তাঁহার দায়ীত্ব ও কর্মভার কমাইয়া আনিবেন। পূর্বোল্লিখিত প্রস্তাবানুসারে ইণ্ডিয়া অপিষ সংস্কার করিবার জন্য একটি কমিটি গঠিত হইবে এবং অপিষের কাজকর্ম যাহাতে শীঘ্র সম্পন্ন হয় সেজন্য তাঁহারা উপায় উদ্ভাবন করিবেন।

ভারত-সচিবের বেতন ভারতীয় রাজকোষ হইতে আর প্রদত্ত হইবে

না; ইংলণ্ডের রাজস্ব হইতে প্রতিবৎসর তাঁহার বেতন দিবার ব্যবস্থা পার্লামেণ্ট করিবেন।

সঙ্গত সমালোচনা ও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে প্রশ্নাদি লইয়া বিতর্কের জন্য হাউস অব্‌ কমন্সের মধ্য হইতে একটি সিলেক্ট কমিটি গঠিত হইবে। এই কমিটির সভ্যগণ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে প্রশ্ন তন্ন তন্ন করিয়া বিচার করিয়া দেখিবেন ও প্রতিবৎসর পার্লামেণ্টে আলোচনা কালে তাঁহাদের প্রতিবেদন পেশ করিবেন; তাঁহারা ভারত-সচিবকে প্রশ্নাদি করিয়া, কাগজপত্র তলপ্‌ করিয়া ভারত সংক্রান্ত বিষয় সকল জানিয়া রাখিবেন।

ভারতের এই সব শাসনসংস্কারের প্রস্তাব করদ রাজাদের পূর্বের সনদ, সন্ধি প্রভৃতির সর্তের সহিত কোনো প্রকারে গণ্ডগোল সৃষ্টি করিবে না।

করদরাজ্যওনূতনসংস্কার

আরও কথা হইতেছে যে ভারতের করদ রাজাদের লইয়া একটি সভা গঠিত হইবে; সাধারণত বৎসরে একবার করিয়া এই সভার অধিবেশন হইবে এবং বৃটীশভারত বা ষ্টেট সংক্রান্ত আলোচনা সেখানে হইবে। ইহাদেরও একটি স্থায়ী কমিটি থাকিবে, বড়লাট সচরাচর সেই কমিটির সহিতে আলোচনা করিবেন।

দুই বা ততোধিক ষ্টেটের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে অথবা কোনো ষ্টেটের সহিত বৃটীশ সরকারের বিবাদ উপস্থিত হইলে বড়লাট এবিষয়ে তদন্ত করিবার জন্য এক কমিশন বসাইতে পারেন; এই কমিটিতে একজন হাইকোর্টের জজ ও উভয় পক্ষের এক একজন প্রতিনিধি সভ্য হইবেন।

পূর্বোল্লিখিত রাজাদের সভা, প্রিভিকৌন্সিল ও কৌন্সিল অব্‌ ষ্টেট্‌ কখনো কখনো একত্র মিলিত হইয়া আলোচনা আহ্বান করিতে পারিবেন।

নূতন বিধি অনুসারে সরকারী কার্য্যের মধ্যে অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিবে। যে সকল চাকুরীর জন্য বিলাতে লোক জোগাড় করা হয় এদেশেও সেই কাজের জন্য লোক যোগাড় করিতে হইবে। সিবিল সার্বিসের উচ্চতন

কাজের শতকরা ৩৩ ভাগ ভারতবর্ষ হইতে সংগৃহীত হইবে; এবং প্রতিবৎসর শতকরা ১½ করিয়া বৃদ্ধি পাইবে; ইহাদের বেতন ও পেনশন সম্বন্ধে সংস্কারের প্রয়োজন হইয়াছে। ভারতীয় সৈন্যবিভাগে উচ্চকর্মচারী হইবার অধিকার ভারতবাসীদের দেওয়া হইয়াছে এবং কাহারো বর্ণ ভবিষ্যতে উন্নতির অন্তরায় হইবে না।

পূর্বোল্লিখিত সংস্কারের উদ্দেশ্য ক্রমশ স্বায়ত্বশাসন দান।

Franchise কমিটি।

১৯১৯ সালে পূর্বোল্লিখিত নিয়ম-ব্যবস্থা প্রণয়ন করিবার জন্য কমিশনের প্রতিবেদন প্রকাশিত হইল। লর্ড সাউথবরা ইহার সভাপতি ছিলেন বলিয়া এই কমিশন তাঁহার নামে সুপরিচিত।

নূতন সংস্কার বিধি অনুসারে ভারতের সাধারণ লোকে সাক্ষাৎভাবে নিজ নিজ প্রতিনিধি নির্বাচন করিবে। উক্ত কমিটির মন্তব্যানুসারে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ নির্বাচনকারী হইতে পারিবেন। আমরা বাংলাদেশের নিয়মটি নিম্নে দিলামঃ—

নির্বাচক হইবার যোগ্যতা।

(১) কলিকাতা সহরের মধ্যে যাঁহারা মুন্সিপালটির ভোট দিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন; (২) হাওড়া কিম্বা কাশীপুর মুন্সিপালটিতে যাঁহারা ৩৲ টাকা ট্যাক্স দেন; (৩) অন্যান্য মুন্সিপালটি ও ক্যাণ্টনমেণ্টে যাঁহারা বাৎসরিক ১৷৹ টাকা হিসাবে ট্যাক্স দেন; (৪) যাঁহারা অন্ততপক্ষে বাৎসরিক ১৲ টাকা রোড বা পাবলিক সেস্ দেন; (৫) যাঁহারা বাৎসরিক ২৲ টাকা চৌকীদারী ট্যাক্স দেন; (৬) যাঁহারা ইনকম্ ট্যাক্স দেন বা (৭) ভারতীয় সৈন্যবিভাগের হইতে অবসরপ্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে সকলেই নির্বাচনের ক্ষমতা পাইবেন। তবে তাঁহাদের বাসস্থান সেই জেলা বা মুন্সিপালটি পরিচালিত সহরের সীমার দুই মাইলের মধ্যে হওয়া চাই। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি ভিন্ন

ভিন্ন ধর্মাবলম্বীর জন্য পৃথক্ পৃথক্ নির্বাচনকারীর সংখ্যা নির্দিষ্ট হইবে। জমিদারের স্বার্থরক্ষার জন্য পৃথক্ প্রতিনিধি থাকিবে। নিম্নে কোন্ প্রদেশে কত লোক ভোট দিবার অধিকার পাইবে তাহার তালিকা প্রদত্ত হইতেছে।

	নির্বাচক	ব্যবস্থাপক সভার সভ্য
বাংলাদেশ	১২,২৮,০০০	১২৫
মাদ্রাস	৫,৪২,০০০	১১৮
বোম্বাই	৬,৫৩,০০০	১১১
যুক্তপ্রদেশ	১৪,৮৩,৫০০	১১৮
পঞ্জাব	২,৩৭,০০০	৮৩
বিহার-উড়িষ্যা	৫,৭৬,০০০	৯৮
মধ্য-প্রদেশ	১,৫৯,৫০০	৭০
আসাম	৩,০০,০০০	৫৩

এই কমিটির প্রস্তাবানুসারে কোন্ দেশের ব্যবস্থাপক সভাতে কতজন করিয়া সভ্য হইবে তাহাও উর্দ্ধে প্রদত্ত হইয়াছে।

নির্বাচন ব্যতীত গভর্ণমেণ্ট কতকগুলি অপেক্ষাকৃত দুর্বল বা অল্পসভ্য সংখ্যক সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার জন্য কয়েকজন বে-সরকারী সভ্য মনোনীত করিবেন। (১) পঞ্জাব ব্যতীত সকল প্রদেশের অন্তজ জাতিদের মধ্য হইতে, (২) মান্দ্রাজ ও বাংলাদেশ ব্যতীত অপর সকল প্রদেশেরই ইঙ্গ-ভারতীয়দের মধ্য হইতে, (৩) মান্দ্রাজ ও মধ্য-প্রদেশ ব্যতীত অন্য প্রদেশের ভারতীয় খৃষ্টানদের স্বার্থরক্ষার জন্য প্রতিনিধি নির্বাচিত হইবে। (৪) বোম্বাই, বাংলা, বিহার-উড়িষ্যা, ও আসামের শ্রমজীবিদের মধ্য হইতে, (৫) পঞ্জাবের যোদ্ধৃ সম্প্রদায়, (৬) বাগিচা ও খনির কাজ ব্যতীত অন্যান্য শিল্পের জন্য, (৭) আদিমজাতি ও প্রবাসী অধিবাসী ও (৮) বিহারের বাঙ্গালীর জন্য পৃথক সভ্য সরকার মনোনীত করিবেন। আমার পরিশিষ্ট বাংলাদেশের ব্যবস্থাপক সভা সম্বন্ধে বিষদ্ বর্ণনা দিয়াছি।

মনোনীত সভ্য।

পূর্বোল্লিখিত কমিটির মতে নিম্নলিখিত কোনো ব্যক্তি সভ্যপদপ্রার্থী হইতে পারিবে না :—

সভ্যহইবার অধিকার।

১। কোনো স্ত্রীলোক; ২। যিনি বৃটীশভারত বা বৃটীশভারতের অন্তর্ভুক্ত কোনো রাজ্যের প্রজা নহেন; ৩। কোনো সরকারী কর্মচারী; ৪। যিনি আদালত হইতে বিকৃত মস্তিষ্ক বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছেন; ৫। পঁচিশ বৎসরের অনধিক বয়স্ক কোনও ব্যক্তি; ৬। সার্টিফিকেট হীন দেনাদার বা কোনও ইন্‌সলভেণ্ট। ৭। সকৌন্সিল গভর্ণরের মতে নৈতিক অক্ষমতা প্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি কিম্বা কারাদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তি। তবে দণ্ড রহিত হইলে বা উক্ত আদালত দ্বারা মুক্তি পাইলে সভ্য হইতে পারিবেন। ৮। উপযুক্ত আদালত কর্ত্তৃক কার্য্যচ্যুত বা কিছুদিনের জন্য অবসরপ্রাপ্ত কোনো আইন ব্যবসায়ী। ৭।৮। দফার লিখিত ব্যক্তিগণকে সকৌন্সিল গভর্ণর বাহাদুর ইচ্ছা করিলে সভ্যপদ প্রার্থী হইবার অনুমতি দিতে পারেন। নির্বাচনকারী ব্যতীত অপর কেহ সভ্য হইতে পারিবেন না।

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সমিতি।

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সমিতি হইতে সভ্য নির্বাচিত হইয়া প্রেরিত হইবেন; বর্ত্তমানে ৬৮ জন সভ্য ভারতীয় ব্যবস্থাপকসভায় সভ্য; নূতন প্রস্তাবানুসারে ১২০ জন হইবে; ইহার মধ্যে ৮০ জন নির্বাচিত সভ্য ৪০ জন মনোনীত সভ্য; তন্মধ্যে ১৪ জন বে-সরকারী ও ২৬ সরকারী সভ্য। পরিশিষ্টে ব্যবস্থাপক সভার তালিকা প্রদত্ত হইল।

গভর্ণমেণ্টের করণীয় সমস্ত কার্য্য তিনভাগে প্রথমত ভাগ করা হইয়াছে।

"অর্পিত"বিষয়ের তালিকা

প্রথম কতকগুলি কাজ খাশ ভারত গভর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত। অবশিষ্ট কাজগুলি প্রাদেশিক শাসনের উপর অর্পিত হয়। এই কাজগুলি বাছিয়া দেশীয়দের উপর দেওয়া হইয়াছে, ইহাকেই আমরা "অর্পিত" বিষয় বলিয়াছি। সকল প্রদেশেই নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অর্পিত হইয়াছে।

স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসন (Local Self Government) অর্থাৎ ম্যুন্সিপালটি, Improvement Trust, জেলা-বোর্ড, স্বাস্থ্যবোর্ড ইত্যাদি।

পাউণ্ড (যেখানে ছাড়া গরু ছাগল আটকাইয়া রাখা হয়) ইহার অন্তর্গত হইবে।

চিকিৎসা বিভাগ হাসপাতাল, ডিস্‌পেন্সারী, আতুরাশ্রম। অবশ্য চিকিৎসাবিভাগের উচ্চতন বিভাগগুলি বর্ত্তমানে রিজার্ভ থাকিবে। সাধারণের স্বাস্থ্যোন্নতি ও স্যানিটেশন, জন্মমৃত্যুর তালিকাদি প্রণয়ন প্রভৃতি কার্য্য।

বৃটীশভারতের অন্তর্গত তীর্থস্থানগুলির ভার।

প্রাথমিক ও মধ্য-বাংলা শিক্ষা।

'অর্পিত' বিষয়গুলি সংক্রান্ত সরকারী ইমারত ও পূর্ত্ত বিভাগ।

রাস্তা, সেতু, খেয়াঘাট প্রভৃতি; ইহার মধ্যে যে সবগুলির যুদ্ধের দিক হইতে বিশেষত্ব আছে সেগুলি "রক্ষিত" থাকিবে।

ম্যুন্সিপালটির মধ্যস্থিত ট্রামপথ। (শেষ তিনটি আসামে অর্পিত হইবে না)।

কৃষি বিভাগ ও পশু চিকিৎসা বিভাগ। আসাম ব্যতীত অন্য সর্বত্র মাছের কারবার অর্পিত বিষয়ের অন্তর্গত।

কো-অপারেটিভ্‌ সোসাইটি বা সমবায়।

আসাম ব্যতীত অন্য সর্বত্র নিম্নলিখিত বিষয় অর্পিত হইয়াছে। আব-

পারী বিভাগ; ইহার মধ্যে ভারত গভর্ণমেণ্টের হাত দিবার অনেকখানি ক্ষমতা আছে কারণ ইহার সহিত শুল্কাদি নানারূপ বিষয়ের সম্বন্ধ আছে।

রেজিষ্টারী (দলিল উইল ইত্যাদি) বিভাগ; জন্মমৃত্যু বিবাহের তালিকা প্রস্তুত; দান; খাদ্যাদি ভেজাল সম্বন্ধীয়, ওজন, মাপ সকল প্রদেশেই 'অর্পিত' বিষয়। কলিকাতার যাদুঘর, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল ও যুদ্ধ-মিউজিয়ম ব্যতীত অন্যান্য মিউজিয়ম ও চিড়িয়াখানা প্রাদেশিক 'অর্পিত' বিষয়।

সাউথবরো কমিশন প্রকাশিত হইবার পর প্রাদেশিক ও ভারত সরকার তাঁহাদের মতামত বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছিলেন,

বিলাতের জয়েণ্ট কমিটি ও ১৯১৯ সালের আইন

তৎপরে বিলাতের পার্লামেণ্টের হাউস অব্ লর্ডস্ ও হাউস্ অব্ কমন্সের ৭ জন করিয়া সভ্য লইয়া এক কমিটি গঠিত হয়। ভারতবর্ষ হইতে ডেপুটেশন গিয়া এদেশের আশা ও আকাঙ্ক্ষার কথা জ্ঞাপন করেন; ৭০ জন সাক্ষীর এজাহার শুনানি হয়। পার্লামেণ্টে তর্ক বিচার, সাক্ষীর শুনানি, মন্তব্য, বিলের প্রত্যেকটি বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা তিন খণ্ডে ছাপা হইয়াছে। গত ১৭ই নবেম্বর ১৯১৯ এই সব আলোচনা শেষ হয় এবং দুইদিন পরে উহা বিল সমেত প্রকাশিত হয়।

পরিশিষ্ট—১

বাংলাদেশের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য।

ক—নির্বাচিত সভ্য।

	সভ্য সংখ্যা
গ্রাম—	
মুসলমান	৩৩
মুসলমান ব্যতীত সাধারণ	৩৩
সহর—	
মুসলমান	৬
অমুসলমান	১১
জমিদার	৫
বিশ্ববিদ্যালয়	২
ভারতীয় বাণিজ্য	৩
য়ুরোপীয়—	
বাণিজ্য	১২
সাধারণ য়ুরোপীয়	৬
ইঙ্গ ভারতীয়	৩
শ্রমজীবি	২
	১১৬

খ—মনোনীত সভ্য।

অস্ত্যজ জাতি	১
ভারতীয় খৃষ্টান	১
অন্যান্য	২
সরকারী সভ্য	২৩
বিশেষজ্ঞ	২
	২৯
মোট—	১৪৫

পরিশিষ্ট—২

স্থানীয় নির্বাচন।

বর্দ্ধমান বিভাগ—	মুসলমান	অমুসলমান	মোট
[illegible]মান জিলা		২	
বীরভূম	(তিন জেলার)	১	
বাঁকুড়া	১	২	
			৬
মেদিনীপুর		৩	
হুগলি হাওড়া জিলা	১	১	৫
হুগলী ম্যুন্সিপালটি		১	
হাওড়া ম্যুন্সিপালটি	১	১	৩
মোট	৩	১১	১৪
প্রেসিডেন্সী বিভাগ			
২৪ পরগণা	১	৩	৪
ম্যুন্সিপালটি	২	২	৪
নদীয়া	১	১	২
মুর্শিদাবাদ	১	১	২
যশোহর	২	২	৪
খুলনা	১	১	২
কলিকাতা	২	৬	৮
মোট	১০	২৬	২৬

ঢাকা বিভাগ—			
ঢাকা জিলা	২	১	৩
ঢাকা সহর	১	১	২
মৈমনসিং	৪	২	৬
ফরিদপুর	২	২	৪
বাখরগঞ্জ	৩	২	৫
মোট	১২	৮	২০
চট্টগ্রাম বিভাগ—			
চট্টগ্রাম	২	১	৩
ত্রিপুরা	২	১	৩
নোয়াখালি	২	১	৩
মোট	৬	৩	৯
রাজসাহী বিভাগ—			
রাজসাহী	২	১	৩
দিনাজপুর	১	১	২
রঙপুর	২	১	৩
বগুড়া	১	১ (বগুড়া ও পাবনা)	৩
পাবনা	১		
মালদহ	১ (মালদহ ও জলপাইগুড়ি)	১	৩
জলপাইগুড়ি		১	
মোট	৮	৬	১৪
সর্ব্বসমেত	৩৯	৪৪	৮৩

পরিশিষ্ট—৩

শিল্প ও বাণিজ্যের প্রতিনিধি সভ্য।

নির্বাচক মণ্ডলী	সংখ্যা
য়ুরোপীয়—	
বেঙ্গল চেম্বার অব্ কমার্স	৬
পাটের কল	২
চা-বাগিচা	১
খনিওয়ালাদের সভা	১
কলিকাতা ট্রেড্ এসোসিয়েশন	২
মোট	১২
ভারতীয়—	
বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অব্ কর্মাস	১
মাড়োবারী এসোসিয়েশন	১
মহাজন সভা	১
সর্ব্বসমেত	১৫ জন।

পরিশিষ্ট—৪

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সমিতি

প্রদেশ	সাধারণ	ধর্মগত		জমিদার			য়ুরোপীয় বাণিজ্য	দেশীয় বাণিজ্য	মোট
		মুসলমান	শিখ	অমুসলমান	মুসলমান	শিখ			
বঙ্গদেশ	৬	৬		১			৩	১	১৭
মাদ্রাজ	১০	৩		১			১	১	১৬
বোম্বাই	৭	৪		১			২	২	১৬
যুক্তপ্রদেশ	৮	৬		১			১		১৬
পঞ্জাব	৩	৫	২	১					১১
বিহার উড়িষ্যা	৬	৩		১					১০
মধ্যপ্রদেশ	৩	১		১					৫
আসাম	২	১					১		৪
দিল্লী	১								১

বর্মার জন্য ৪ — মোট ১০০

মোট		
	অমুসলমান	৪৯
	মুসলমান	২৯
	শিখ	২
	জমিদার	৭
	য়ুরোপীয়	৯
	ভারতীয় বাণিজ্য	৪
		১০০
	সরকারী	৩৪

৩। স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন

ভারতবর্ষের সহিত অন্যান্য দেশের শাসন বিষয়ে প্রধান পার্থক্য এই যে এদেশের শতকরা ৯০. জনের উপর লোক গ্রামের বাসিন্দা ও তাহাদের অধিকাংশের পেশা ও উপজীবিকা কৃষি। সেইজন্য ভারতের শাসন কেন্দ্রের মূল হইতেছে গ্রাম। তৎপরে তহশিল বা মহাকুমা, জেলা ইত্যাদি। সেই জন্য আমরা গ্রাম হইতেই আরম্ভ করিব।

লক্ষাধিক লোক বাস করে এমন সহর ভারতের ন্যায় প্রকাণ্ড প্রদেশে মাত্র ৩৯টি। নগর ও সহরের শ্রীবৃদ্ধির কারণ,—শিল্প ও বাণিজ্য বৃদ্ধি এবং শিক্ষা ও চাকুরী লাভের উপায় সহজ। ভারতে কোন্ প্রদেশে জনসংখ্যা কিরূপভাবে ছড়ানো আছে তাহা নিম্নের তালিকা হইতে বুঝা যাইবে।

প্রদেশ	সহর	গ্রাম	গ্রাম প্রতি গড়লোকের বাস
বঙ্গদেশ	৬.৫	৯৩.৫	৩৫৫
বিহার উড়িষ্যা	৩.৭	৯৬.৩	৩৫৫
বোম্বাই	১৯.০	৮১.০	৬১২
বর্মাপ্রদেশ	৯.৩	৯০.৭	২২২
মধ্যপ্রদেশ	৮.৫	৯১.৫	৩৩৭
মান্দ্রাস	১১.৮	৮৮.২	৬৭৮
পঞ্জাব	১১.৯	৮৮.১	৫৩১
যুক্ত প্রদেশ	১০.২	৮৯.৮	৪০০
বৃটীশ ভারত	৯.৩	৯০.৭	৪১২

হিন্দু শাশনকালে গ্রাম শাসনের যে সুন্দর ব্যবস্থা ছিল তাহার বর্ণনা মেগেস্থানীস করিয়া গিয়াছেন। তারপর ভারতের উপর দিয়া পাঠান

মোগলের শাসন চলিয়া গিয়াছে, তথাচ গ্রামের সেই সংহতভাব নষ্ট হয় নাই। কিন্তু বর্ত্তমানে বাহিরের সভ্যতা ও সংঘাত আসিয়া গ্রামের সেই নিষ্ক্রিয় জড়ত্ব নষ্ট করিয়া নূতন সমস্যা সৃষ্টি করিয়াছে।

ভারতের গ্রাম দুই শ্রেণীর (১) উত্তর ভারতবর্ষের গ্রামগুলি দাক্ষিণাত্য হইতে পৃথক্; উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত-প্রদেশ, পঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশে 'মহলবারী' বা জমিদারী প্রথার ব্যবস্থা আছে। পূর্বে এইখানে সমগ্র গ্রামের উপর রাজস্ব ধার্য্য করা হইত, এবং এখন পর্য্যন্ত এই প্রথা কিয়দ-পরিমাণে বিদ্যমান আছে। গ্রামের মালিকরা সমস্ত গ্রামের অধিপতি এবং তাহারাই চাষী, শিল্পীকারিগর, বণিকদের জমি বিলি ব্যবস্থা করিয়া দেয়। পতিত জমির মালিক গ্রাম এবং উহা চাষ হইলে সকল অংশীদারই তাহার মুনফা পায়। কয়েকটি পরিবারের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি লইয়া প্রতি গ্রামেই একটি পঞ্চায়েৎ পায়। ক্রমে সরকারী কার্য্যের সহিত গ্রামের যোগ আরম্ভ হইলে নূতন নূতন কর্মচারী নিযুক্ত হইল; ইহার মধ্যে 'লম্বরদার' আজ কাল উত্তর-পশ্চিমের গ্রামে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। 'মহলবারী' গ্রামের কয়েক ঘর লোকের অধীনই সমগ্র গ্রাম।

বাংলাদেশের গ্রামের মধ্যে এক প্রকার সংহত ভাব ছিল; প্রত্যেক গ্রামে কয়েকটি পাড়া থাকিত: বামুনপাড়া, কায়েতপাড়া, তাঁতিপাড়া, কামারপাড়া, চুণারীপাড়া, দুলেপাড়া, মুসলমানপাড়া ইত্যাদি, সকল প্রকার বর্ণেরেই বাস ছিল; প্রত্যেক বর্ণের নিজ নিজ পঞ্চায়েৎ ছিল এবং 'জাতের পাঁচজনের' সালিসে বিচার হইত। গ্রামের জমিদার ছিলেন দেওয়ানী, ফৌজদারীর বিচারক।

(২) মান্দ্রাজে ও দক্ষিণের অপরাপর স্থানে 'রায়তারী' বন্দোবস্ত প্রচলিত; এই ব্যবস্থা ইংরাজ শাসনকালে গভর্ণর মন্‌রো কর্তৃক প্রবর্তিত হয়। এখানে সমগ্র গ্রাম শাসন বা রাজস্বের জন্য সরকারের নিকট দায়ী নহে; প্রত্যেক ব্যক্তির সহিত গভর্ণমেণ্ট রাজস্বের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইংরাজ

শাসনের পূর্বেও এদেশে গ্রাম্য-শাসনের ব্যবস্থা ছিল; প্রত্যেক গ্রামে বার জন করিয়া "অগ্‌গণ্ডির" ছিল—ইহাদের মধ্যে নানারূপ কাজ বিভক্ত থাকিত; মুকদ্দম, পোটাইল, রাপোদ, রেড্ডি প্রভৃতি গ্রাম্য কর্মচারীর উপাধি; রেড্ডি ছিলেন গ্রামের মোড়ল। রেড্ডিই গ্রামের রাজস্ব সংগ্রহ ও শান্তির জন্য বর্ত্তমানে সরকারের কাছে দায়ী।

একশত বৎসর পূর্বে তৎকালীন গভর্ণর এলফিন্‌ষ্টোন সাহেব বোম্বাই অঞ্চলের গ্রামের বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন তাহারই সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নে সঙ্কলিত হইল। "গ্রামের অধিকাংশ লোকই কৃষক; তাছাড়া কয়েক ঘর বেনিয়া ও কারিগরও গ্রামে বাস করে। গ্রামের মোড়লকে "পাটেল" বলে। ইহারই অধীনস্থ চৌগুল্লা তাঁহার সহকারী 'কুলকরণী' গ্রামের লেখক। এ ছাড়া প্রত্যেক গ্রামে বারজন কর্মচারী থাকিত; ইহারা 'বার বালুতি' নামে খ্যাত। গণক, পুরোহিত, ছুতার, নাপিত প্রভৃতি কয়েকটি বর্ণের প্রতিনিধি এই এই 'বার বালুতির' অন্তর্গত। সোণার বা পোদ্দার ও 'মহর' বা গ্রামের চৌকিদারকেও গ্রাম-শাসনের প্রধান ব্যক্তিদের মধ্যে ধরা হয়।

"পাটেলদের উপর শাসনের সর্বপ্রকার গুরুভার অর্পিত আছে। বোধ হয় মোগল সম্রাটদের নিকট হইতে পাঞ্জা পাইয়া তাঁহারা এই কার্য্য আরম্ভ করেন। তাঁহাদের কাজ বংশপরম্পরায় চলে; তবে সরকারী মত লইয়া সেই অধিকার বিক্রয়ও করা যায়। গ্রামের চৌকিদারীও বিচারের ভার পাটেলের উপর; ইনি ছোটখাটো ভাবে জেলার কলেক্টর যাহা করেন তাহাই করিতেন। বর্ত্তমানে 'পাটেল'রা প্রজার প্রতিনিধি মাত্র—পূর্বের সে ক্ষমতা এখন নাই।"

সর্বত্রই গ্রামের পূর্বের 'পঞ্চায়েৎ' বা অন্যবিধ শাসনপদ্ধতি ক্ষীণপ্রভ হইয়াছে। সরকারী নানা বিভাগ এখন নানাপ্রকার কার্য্য করিতেছে। বর্ত্তমানে সরকারী ও বেসরকারীর মধ্যে ভেদ খুব বেশী। বর্ত্তমানে

কোথায় কিরূপ গ্রাম্য শাসন এখনও চলিতেছে তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি। মান্দ্রাজে গ্রামের কর্মচারী বংশ-পরম্পরায় কার্য্য করে; গ্রামের রেড্ডি গ্রামের রাজস্ব আদায়, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিচার ও দণ্ডের ভার প্রাপ্ত আছেন। বোম্বাইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামে পাটেলই রাজস্ব আদায় ও পুলিশের কার্য্যের জন্য দায়ী। ইহাদের কাজ পুরুষানুক্রমে চলে।

বাংলাদেশ সরকারের দ্বারা ভারপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি মোড়লের কাজ করে না। তবে চৌকিদারী ইউনিয়ন আছে। আসামে গৃহস্থেরা (মেল) মিলিত হইয়া 'মণ্ডল' নির্বাচন করে। ইহাদের অস্তিত্ব ও শক্তি সরকার অস্বীকার করেন না; কিন্তু রাজস্ব আদায় প্রভৃতির ভার ইহাদের উপর অর্পিত নাই। যুক্তপ্রদেশে যথার্থভাবে গ্রাম-মণ্ডল নাই; পঞ্জাবেও তদ্রূপ। এই দুই স্থানে 'লম্বরদার'ই সরকারী পক্ষ হইতে কাজকর্ম করে। মধ্য-প্রদেশে ভূস্বামীদের প্রতিনিধি 'মুকুদ্দম' গ্রামের সর্দ্দার। বেরার মহারাষ্ট্র দেশ বলিয়া সেখানে দক্ষিণী 'পাটেল' প্রথাই চলে। মান্দ্রাজে পথঘাট, স্বাস্থ্য প্রভৃতি দেখিবার জন্য সরকার লোকাল ফণ্ড ইউনিয়ন নামে কৃত্রিম একটি প্রতিষ্ঠান আধুনিক কালে গড়িয়াছেন; যুক্ত-প্রদেশ, বোম্বাই ও মধ্যপ্রদেশে স্বাস্থ্যোন্নতি বোর্ড আছে।

ভারতের এই প্রাচীন প্রতিষ্ঠানগুলি উঠিয়া যাওয়ায় বা অর্দ্ধমৃত হওয়ায় সরকারকে অসংখ্য কাজের জন্য অনেক সময় ও অর্থ ব্যয় করিতে হয়; দেশের লোকেরও নূতন কাজে হস্তক্ষেপ করিবার সাহস থাকে না। সেইজন্য ১৯০৮ সালে সরকার এক কমিটি বসান। সরকারী শাসন অত্যন্ত কেন্দ্রীভূত হইয়া পড়িয়াছে; সেইজন্য উহাকে দেশের মধ্যে ছড়াইয়া না দিলে সুশাসন আশা করা যায় না। তাঁহাদের প্রতিবেদনের উপর সরকার ১৯১২ সালে এক আইন প্রণয়ন করিয়া স্বায়ত্ব শাসনের ভিত্তি স্থাপন করিলেন।

এই কমিটির উপদেশানুসারে সরকার বাহাদুর ভারতের প্রাচীন গ্রাম্য

শাসন ও বিধি পুনর্প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন; অনেকে মনে করেন স্থানীয় শাসন গ্রামবাসীদের সহায়তা ব্যতীত কখনই সুচারুরূপে নির্বাহিত হইতে পারে না। কমিটি নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, (১) 'পঞ্চায়েৎ' জেলার কর্ত্তৃপক্ষদের অধীন থাকিবে,—স্থানীয় বোর্ডের (Local Board) কর্ত্তৃত্বাধীনে নহে। (২) প্রত্যেক গ্রামে পৃথক পঞ্চায়েতের ব্যবস্থা থাকিবে। (৩) গ্রামের মাতব্বর পঞ্চায়েতের সভাপতি হইবেন (৪) অন্যান্য সভ্যদের নির্বাচন পাঁচজনের মত লইয়া হইবে। (৫) পঞ্চায়েতের উপর খুবই সাবধানতার সহিত দায়ীত্ব ও কর্ত্তব্যভার অর্পিত হইবে। (৬) ছোট খাটো ব্যাপারে পঞ্চায়েতের উপর দেওয়ানী ফৌজদারী বিচারের ভার অর্পিত হইবে। তবে প্রথম প্রথম দলাদলি, স্বার্থপরতা প্রভৃতির দ্বারা এই সব কার্য্য বাধা পাইবে, কিন্তু ক্রমে শিক্ষা বিস্তারের সহিত এসব দূর হইবে। (৭) পঞ্চায়েতের উপর গ্রামের স্বাস্থ্য, পূর্ত্তবিভাগ, স্কুলবাড়ী প্রভৃতির ভার অর্পিত হইবে। (৮) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সরকারী কর্মচারীদের অযথা হস্তক্ষেপ হইতে বাঁচাইতে পারিলে তবে ইহা কৃতকার্য্য হইবে। (৯) কৃত্রিম গ্রাম-ইউনিয়ন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন হইবে না।

ম্যুন্সিপালটি

স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন।

ইংরাজ-শাসনের প্রথমে শাসনতন্ত্রকে কেবলই কেন্দ্রীভূত করিবার দিকেই শাসকদের দৃষ্টি ছিল; সেইজন্য গ্রাম্য-শাসনতন্ত্র অর্দ্ধমৃত হইয়া গিয়াছিল। ইংরাজ এদেশীয় নিজস্ব পদ্ধতি বর্জন করিয়া কৃত্রিম বিভাগাদি সৃষ্টি করিয়া দেশশাসনের সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ম্যুন্সিপালটি, লোকাল-বোর্ড বা জেলা বোর্ড ইংরাজ শাসনের ফলে হইয়াছে।

কলিকাতা, বোম্বাই ও মান্দ্রাজ এই তিনটি সহরে ইংরাজ আগমনের প্রথম হইতেই কোনো না কোনো প্রকারের মুন্সিপাল বন্দোবস্ত ছিল; এছাড়া ১৮৪২ সালের পূর্ব পর্য্যন্ত আর কোথাও কোনো প্রকার ব্যবস্থা করিবার চেষ্টা হয় নাই। ১৮৫৬ সালের পূর্বে বাংলাদেশের কোথাও মুন্সিপালটি ছিল না। এই সময় হইতে ১৮৭০ সাল পর্য্যন্ত সকল প্রদেশেই কতকগুলি মুন্সিপালটি স্থাপিত হইয়াছিল। ১৮৭০ সালে লর্ড মেয়ো প্রাদেশিক শাসন বিভাগগুলিকে ভারত-সরকার হইতে পৃথক্ করিয়া দিয়া তাহাদের নিজ নিজ ব্যয় করিবার জন্য টাকার ব্যবস্থা করিয়া দেন। ১৮৭১ হইতে ১৮৭৪ সাল পর্য্যন্ত ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে মুন্সিপাল আইন পাশ হয়; কিন্তু মধ্য-প্রদেশ ব্যতীত আর কোথায়ও ইহা সুচারুরূপে পরিচালিত হয় নাই। লর্ড রীপনের শাসনকালে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন অগ্রসর হয়, ১৮৮৪ সালের আইনানুসারে মুন্সিপালটিতে নির্বাচনের শক্তি বৃদ্ধি পায়; কমিশনর বা সভ্যদের অর্দ্ধেক নির্বাচিত হন; সভাপতি জনসঙ্ঘের দ্বারা নির্বাচিত হইতে পারেন, অথবা সরকার কর্তৃক মনোনীত হইতে পারেন; এই মনোনীত সভাপতি সরকারী কর্মচারী হইলে লোকে একজন ভাইস্‌-চেয়ার মান্ নির্বাচন করিতে পারে।

মুন্সিপালটি।

মুন্সিপালটির দুইপ্রকার কর সহরবাসিন্দাকে দিতে হয়; এক ব্যক্তিগত অর্থাৎ গৃহস্থের আয় অনুসারে স্থিরীকৃত, আর গৃহাদি সম্পত্তির মূল্যানুসারে নির্দ্ধারিত। ব্যক্তিগত করের সর্বোচ্চ পরিমাণ বার্ষিক ৮৪৲ টাকা বা প্রতি তিনমাসে ২১৲ টাকা। সম্পত্তির বার্ষিক মূল্যের উপর কর শতকরা ৭॥০ সাড়েসাত টাকা। ঢাকা, হাব্‌ড়া ও দার্জ্জিলিং সহরে এই কর শতকরা ১০৲ টাকা পর্য্যন্ত হইতে পারে। প্রত্যেক মুন্সিপালটিতেই এই দুই প্রকারের এক প্রকার কর ধার্য্য হয়।

মুন্সিপালটির কর।

ম্যুন্সিপালটির সভ্যদিগের মধ্যে অধিকাংশই অধিবাসীদিগের দ্বারা নির্বাচিত। সরকার সাধারণতঃ এক তৃতীয়াংশ মাত্র নিয়োগ করিতে পারেন। সভ্যের সংখ্যা ৯ হইতে ১০।১২।১৫।১৮ এইরূপ হইয়া থাকে। যাহাতে সকল শ্রেণীর লোকের প্রতিনিধিই "এই সমিতিতে থাকে গভর্ণমেণ্টের তাহাই ইচ্ছা। পূর্বে অনেক ম্যুন্সিপালটির সভাপতি বা চেয়ারম্যান গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক নিযুক্ত হইতেন; এখন অধিকাংশ স্থলেই নির্বাচিত বা নিযুক্ত সভ্যগণ দ্বারা সভাপতি মনোনীত হইয়া থাকেন।

১৯১৪-১৫ সালে সমগ্র বৃটীশভারতে ম্যুন্সিপালটির সংখ্যাছিল ৭১২। ১ কোটি ৭০ লক্ষ লোক ম্যুন্সিপাল সীমানার মধ্যে বাস করিত। ৯৭৭৫ জন সভ্যের মধ্যে ৫০৬৯ জন জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত। বহুবৎসর হইতে ম্যুন্সিপালটির সংখ্যা প্রায় একইভাবে আছে; কতকগুলি সহর ছাড়া আর অতি অল্পস্থানেই ইহার ব্যবস্থা আছে। বাংলাদেশে ১৯১৪-১৫ সালে ১১৬টি ম্যুন্সিপালটি ছিল, ১৯১৬-১৭ সালে দেখা যায় সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ১১২টিতে। বাংলাদেশের কোনো কোনো জিলায় ম্যুন্সি-পালটির সংখ্যা অত্যন্ত অধিক, আবার কোনো কোনো জেলায় অত্যন্ত কম। ২৪—পরগণায় ২৮টি ম্যুন্সিপালটি, নদীয়া জেলায় ৯টি, হুগলীও মৈমনসিংহে ৮টি করিয়া, ঢাকা, রাজসাহী, পাবনা, বগুড়া, দার্জ্জিলিং প্রভৃতি কয়েকটি জিলায় ২টি করিয়া এবং নোয়াখালি, রঙপুর প্রভৃতি জিলায় ম্যুন্সিপালটির সংখ্যা ১টি করিয়া। ১৯১৪।১৫ সালে কলিকাতা ছাড়া বঙ্গের সমস্ত ম্যুন্সপালটির প্রাপ্তি হইয়াছিল ৯৩, ৬৪, ৮৩৬ টাকা, আর সবশুদ্ধ খরচ হইয়াছিল। ৭২ লক্ষের কিছু উপর।

ম্যুন্সিপালটির কর্ত্তব্য ও আয়ের উপায়গুলি এইখানে প্রদত্ত হইতেছে;—(১) সহরের পথঘাট নির্ম্মাণ, সংস্কার, ও আলোকিত করিবার ব্যবস্থা; সরকারী ও ম্যুন্সিপাল গৃহাদি মেরামত। (২) সাধারণের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্ম চিকিৎসার ব্যবস্থা, টীকা দেওয়া প্লেগ প্রভৃতির ব্যবস্থা ও জল

সরবরাহ। (৩) শিক্ষা বিশেষত প্রাথমিক শিক্ষার ভার। মুন্সিপালটির প্রধান প্রধান আয়ের সংস্থান :—

(১) অক্‌ট্রয়:—উত্তর ভারতবর্ষ, বোম্বাই ও মধ্যপ্রদেশে ইহা প্রচলিত আছে (২) মান্দ্রাজ, বোম্বাই বঙ্গদেশে ও মধ্যপ্রদেশে বাড়ী ও জমির উপর ট্যাক্স (৩) মান্দ্রাজ ও যুক্ত-প্রদেশে ব্যবসায় ও পেশার উপর ট্যাক্স। (৪) মান্দ্রাজ, বোম্বাই ও আসামে রাস্তার টোল (৫) গাড়ীর ও অন্য সকল প্রকার যানের উপর ট্যাক্স; (৬) পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, জল সরবরাহ, হাট ও স্কুল হইতে আয় অনেক সময়ে জলের কল প্রভৃতি বড় বড় কাজ করিবার জন্য মুন্সিপালটি টাকা ধার করে।

১৯১৩-১৪ সালে মাথাপিছু কোন্ প্রদেশে কি পরিমাণ ট্যাক্স পড়িয়াছিল তাহা নিম্নে দিতেছি; সমগ্র ভারতের মুন্সিপালটি অধিবাসী লোকদের গড়ে মাথাপিছু প্রায় ৩।০ ট্যাক্স পড়ে।

	টাকা		টাকা
বোম্বাই সহর	১১·৬৭	ব্রহ্মদেশ	২·৩৯
রেঙ্গুন	১০·৫৩	মধ্যপ্রদেশ	২·১৬
কলিকাতা	৯·৭২	বঙ্গদেশ	২·০৪
মান্দ্রাজ	৩·৫৫	উত্তরপশ্চিমপ্রদেশ	১·৮১
উত্তর পশ্চিম সীমান্ত	৩·০৬	আসাম	১·৭৬
দিল্লী	২·৭০	মান্দ্রাজ প্রদেশ	১·৫১
পঞ্জাব	২·৫৮	কুর্গ	১·১৭
বোম্বাই প্রেসিডেন্সি (সহর ছাড়া)	২·৫২	বিহার-উড়িষ্যা	১·১৬

লোকাল বোর্ড।

সহরের ব্যবস্থার জন্য যেমন মুন্সিপালটির স্থাপিত হইয়াছে তেমনি

জেলা ও লোকালবোর্ড

গ্রামের ব্যবস্থার জন্য জেলা-বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বিভিন্ন প্রদেশে লোকাল ও জেলা বোর্ডের গঠন প্রণালী পৃথক। সরকারের মূল প্রস্তাব-অনুযায়ী একমাত্র মান্দ্রাজ প্রদেশে গ্রাম্যশাসনের ব্যবস্থা আছে। উক্ত প্রদেশে কয়েকটি করিয়া গ্রাম লইয়া একএকটি ইউনিয়ন গঠিত হইয়াছে; ইউনিয়নের শাসন ও ব্যবস্থার ভার পঞ্চায়েতের উপর ন্যস্ত। বাড়ীর উপর সামান্য কর ধার্য্য করিয়া যে আয় হয় তাহা ইউনিয়নের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য ব্যয়ীত হয়।

ইহার উপর তালুক বোর্ড; কয়েকটি গ্রাম-ইউনিয়ন লইয়া ইহা গঠিত; কয়েকটি 'তালুক বোর্ড লইয়া জেলা-বোর্ড গঠিত।

বোম্বাইতে কেবল দুই শ্রেণীর বোর্ড আছে জেলাবোর্ড ও তালুক বোর্ড বাংলাদেশে পঞ্জাবে ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে আইনানুসারে প্রত্যেক প্রদেশে জেলা-বোর্ড স্থাপিত করিতে হইবে; কিন্তু লোকাল বোর্ড সম্বন্ধে ব্যবস্থাভার প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তর উপর অর্পিত। বাংলাদেশে গ্রাম-ইউনিয়ন ও জেলা-বোর্ড উভয়ই আছে। যুক্ত প্রদেশে মহকুমার বোর্ড উঠাইয়া কেবল জেলাবোর্ড রাখা হইয়াছে; মধ্যপ্রদেশের ব্যবস্থা মান্দ্রাজের অনুরূপ। আসামে জেলাবোর্ড নাই, সেখানে মহকুমা বোর্ডই প্রচলিত। বেলুচিস্থান ও বর্মায় জেলা বা লোকাল-বোর্ড কিছুই নাই। লর্ডরীপনের সময়ে বর্মা দেশে জেলা-বোর্ড স্থাপিত হইয়াছিল, কিন্তু বর্মনদের এই সব প্রতিষ্ঠানের প্রতি কোনো প্রকার টান না থাকায় তাহা উঠিয়া যায়।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত-প্রদেশ ব্যতীত অন্য সর্বত্রই জেলা ও লোকাল বোর্ডের সভ্যগণ নির্বাচিত হইয়া থাকেন, তবে বিভিন্ন প্রদেশে এই নিয়ম পৃথক।

লর্ড রীপনের স্বায়ত্তশাসন বিষয়ক আইন প্রবর্ত্তিত হইলে বাংলাদেশের প্রতি জেলায় একটি জেলা-বোর্ড এবং প্রায় প্রত্যেক মহাকুমায়

লোকাল-বোর্ড বা স্থানীয় সমিতি গঠিত হয়। জেলার পরিমাণ ও গুরুত্ব অনুসারে বোর্ডের সভ্য-সংখ্যা স্থির হয়। এই সংখ্যা কোথায় ৯এর কম হইতে পারে না। সাধারণত সভ্যসংখ্যা ১২, ১৪, ১৭, ২১, ২৪ এইরূপ হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে অন্ততঃ অর্দ্ধেক বা তদধিক সভ্য সাধারণ প্রজা কর্ত্তৃক নির্বাচিত ও অবশিষ্ট সভ্য সরকার কর্ত্তৃক মনোনীত হন।

প্রথমতঃ প্রত্যেক মহাকুমায় যাহারা মত দিবার উপযুক্ত লোক তাহাদের একটি তালিকা প্রস্তত হয়, এবং এক এক স্থানের অথবা থানার নির্বাচনের জন্য এক একটি দিন স্থির হয়। যাহারা বৎসরে অন্ততঃ ১৲ টাকা পথ-কর দেন অথবা কোনো প্রকার ইন্‌কম্‌ট্যাক্স বা আয়কর দেন, কিংবা যাঁহাদের আয় ২০০৲ টাকা অপেক্ষা কম নহে, তাঁহারাই নির্বাচন করিবার অধিকারী। গ্রামের কো-অপারেটিভ সভার সভ্যেরা মত দিতে পারেন। যে কোনো একান্নবর্ত্তী পরিবারের পূর্বোক্তরূপ আয় বা সম্পত্তি আছে, সেই পরিবারের যে কোনো যুবক বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্য বা উপাধি পরীক্ষা পাশ করিলে মত দিতে পারেন।

সভ্য হইতে হইলে বৎসরে অন্ততঃ ৫৲ পাঁচ টাকা পথকর দিবার মত সম্পত্তি অথবা এক সহস্র টাকার আয় থাকা চাই। আর পূর্বোক্ত প্রকারে শিক্ষিত যুবকও সভ্য হইতে পারেন।

নির্দিষ্ট দিনে কোনো রাজকর্মচারী বা শিক্ষিত ভদ্রলোক নির্বাচন কেন্দ্রে উপস্থিত হইয়া নির্বাচনকারীদিগের মত লইয়া কে সভ্য হইবেন তাহা স্থির করেন। এই নির্বাচিত সভ্যগণের দ্বারা লোকাল-বোর্ড বা স্থানীয় সমিতি গঠিত হয়, এবং এই সমিতির মধ্য হইতে কে কে জেলা-সমিতিতে যাইবেন তাহা সম্বহুলতার দ্বারা স্থির হয়। এইরূপ নির্বাচিত সভ্য এবং গভর্ণমেন্টের নিযুক্ত সভ্যের দ্বারা জেলা-সমিতি গঠিত হয়। এতদিন সকল জেলাতেই জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট জেলা-সমিতির সভাপতি

হইতেন। অধুনা সরকার কয়েকটি জেলার জেলা-বোর্ডের সভ্যদিগকে স্বীয় সভাপতিনির্বাচন করিবার অধিকার দিয়াছেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় কোনো কোনো স্থলে অযোগ্য সভ্যপতি নির্বাচনের ফলে সরকারকে বাধ্য হইয়া হস্তক্ষেপ করিতে হইয়াছে। সমগ্র বৃটীশ ভারতবর্ষে ১৯৯টি জেলা-বোর্ড ও ৫৩৭টি লোকাল-বোর্ড আছে। এ ছাড়া মান্দ্রাজে ৩৯৫টি ও বঙ্গদেশে ৬৬টি ইউনিয়ন্ কমিটি আছে। ভারতের প্রায় ২ কোটী লোক এই স্থানীয় শাসনের সুখ ও সুবিধা উপভোগ করিতেছে।

১৯১৫ সালে সরকার স্থানীয় শাসনের সর্বতোভাবে উন্নতির জন্য দীর্ঘ এক প্রস্তাব প্রকাশ করেন। সেই প্রস্তাবানুসারে কার্য্য সামান্য আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া এখানে তাহার বিস্তৃত আলোচনা করিলাম না।

নিম্নে জেলা, লোকাল-বোর্ড ও ইউনিয়নের তালিকা প্রদত্ত হইল।

জেলা ও লোকাল বোর্ডের তালিকা।

	বোর্ডের সংখ্যা	সভ্য সংখ্যা		আয়		মোট ব্যয়
		নির্ব্বাচিত	সরকারী মনোনীত	মোট	মাথা-পিছু	
				পাউণ্ড	পেন্স	পাউণ্ড
বঙ্গদেশ	৯৭	৬৪০	৭৩৪	৭০৭,৩৩১	৩ ৩/৪	৭৩৩,৬৬০
বিহার উড়িষ্যা	৫৯	২৭০	৬০৮	৫৭৪,৭৪৪	৪	৫৬৭,৯৫৩
যুক্ত প্রদেশ	৪৮	৮০৭	২৭২	৭৪৪,৩৪৮	৩ ৩/৪	৭৩৫,৬২৮
পঞ্জাব	৪৭	৫৪৫	৮৫২	৫৩৯,০৯৬	৮ ১/২	৫৫০,৫২৬
দিল্লী	১	X	২০	৭,৭৮৮	১০ ১/২	৭,০৯৫
উপ-সীমান্ত প্রদেশ	৫	X	২১৮	৩৯,৩৯৩	৫	৩৭,০৮৩
মধ্যপ্রদেশ	১০২	১,৩৬৮	৪৯৬	২৮২,২১৮	৫	২৮৩,০৬০
আসাম	১৯	২০২	১২১	১৪৪,২৫৩	৫ ১/২	১৪১,৮৪৮
আজমীড়	১	১৩	২৫	৪,৩৬২	৩	৪,১১৮
কুর্গ	১	২	১৭	৬,১৮৩	৮ ১/২	৫,৭৬৬
মান্দ্রাজ	৫৩২	১,১৭৩	৫,১৪৯	১,৬২৪,৫৪৮	৫ ৩/৪	১,৫৯৮,৪২৪
বোম্বাই	২৪১	১,৭০৩	১,৯৪৮	৫৭৮,২৮৩	৭ ৩/৪	৫৪৪,০০৬
মোট ১৯১৬—১৭	১,১৫৩	৬,৭২৯	১০,৪৫৯	৫,২৫২,৫৫০	৫ ১/৪	৫,২০৯,৫৪০

৪। করদ ও মিত্র রাজ্য

সমগ্র ভারত-সাম্রাজ্যের পরিমাণ ফল ১৭ লক্ষ ৭৩ হাজার বর্গ মাইল ও জনসংখ্যা ৩১ কোটি ৫১ লক্ষ। এই সমগ্র দেশ ইংরাজদের খাস্ অধীন নহে; প্রায় ৬ লক্ষ ৭৫ হাজার বর্গ মাইল দেশ ও ৭ কোটি লোক দেশীয় রাজাদের অধীন। এই সকল করদ-মিত্র রাজ্যের সংখ্যা ৭০৩। তবে ইহাদের আকার, আয়তন, জনসংখ্যা, সম্মান, সমৃদ্ধি, অধিকার এত বিচিত্র যে সবগুলিকে এক কোঠায় ফেলা যায় না। জন সংখ্যা, সম্মান ও সমৃদ্ধি অনুসারে ইহাদের পাঁচটি শ্রেণী করা হইয়াছে।

প্রথম শ্রেণী (১) হায়দ্রাবাদ দাক্ষিণাত্যের নিজামের রাজ্য।

দ্বিতীয় শ্রেণী (২) মৈশূর দাক্ষিণাত্যে।

তৃতীয় শ্রেণী (৩) ত্রিবঙ্কুর (৪) গবালিয়র সিন্ধিয়ার রাজ্য। (৫) কাশ্মীর ও জম্মু; (৬) জয়পুর বা অম্বের (৭) বড়োদা বা গায়কাবাড়ের রাজ্য (৮) যোধপুর বা মেরবার (৯) পাতিয়ালা (১০ রেওয়া (১১) উদয়পুর।

চতুর্থ শ্রেণী (১২) কোল্হাপুর (১৩) ইন্দোর বা হোলকারের রাজ্য (১৪) আলবার (১৫) কোচীন (১৬) বহবলপুর। ১৭) ভোপাল (১৮) ভরতপুর (১৯) ময়ূরভঞ্জ (২০) বিকাণীর (২১) কোচবিহার (২২) কোঠা [রাজপুতানা] (২৩) রামপুর।

পঞ্চম শ্রেণী—অবশিষ্ঠ ৬৭৮টি রাজ্য; তন্মধ্যে বম্বে গভর্ণমেণ্টের অধীনে গুজরাট ও কাথিবাড়েই ৩৫৪টি রাজ্য। ভারত গভর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে মধ্যভারতীয় এজেন্সীর অন্তর্গত ১৪৮টি; ৫২টি বর্মা সরকারের

অধীন; ৪৩টি পঞ্জাব গভর্ণমেণ্টের অধীনে, এবং রাজপুতানা এজেন্সীর অন্তর্ভুক্ত ২০টি।

উপরোক্ত রাজ্যগুলির মধ্যে ত্রিবঙ্কুর, কোচীন, মৈশূর, ও রাজপুতানার রাজ্যগুলি প্রাচীন; এ ছাড়া অধিকাংশই আধুনিক কালে উঠিয়াছে। ইংরাজদের অভ্যুদয়ের পূর্বে কাহারও অস্তিত্বের ইতিহাস পাওয়া যায় না। ভারত-ইতিহাসের সেই ভাঙ্গা গড়ার যুগে পুরাতন অনেক রাজ্যের পতন ও নূতন অনেক রাজ্যের গঠন হইয়াছিল; যে দেশে বিপ্লব যত দীর্ঘকাল ধরিয়া ছিল সেইখানেই দেশীয় রাজাদের প্রাদুর্ভাব তত বেশী দেখা যায়।

মারকুইস্ অব্ হেষ্টিংসএর শাসন সময় (১৮১৩-২৩) পর্য্যন্ত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কাগজে কলমে সর্বত্রই দেশীয় রাজ্যের পৃথক্ অস্তিত্ব ও স্বাধীনতা স্বীকার করিতেন তাহাদিগকে যুদ্ধে যতই অপদস্থ করুন না কেন সন্ধি করিবার সময় সমানের চোখে দেখিতেন। হেষ্টিংস বুঝিলেন যে, এ সকল রাজা শূন্য কুম্ভ সদৃশ, ইহাদের সহিত সহযোগীর ন্যায় ব্যবহার করা বৃটীশ শক্তির অবমাননা বৈ আর কিছু নয়। তিনিই প্রথমে দেশীয় রাজ্যগুলিকে পরিষ্কার ভাষায় বুঝাইয়া দিলেন যে তাহারা সরকারের অধীন। লর্ড ডালহৌসীর সময়ে নিয়ম হইল যে অপুত্রক রাজার রাজ্য খাস্ বৃটীশ শাসনাধীনে আসিবে; তাহারই ফলে নাগপুর, সাতারা, অযোধ্যা প্রভৃতি অনেকগুলি রাজ্য বাজায়প্ত হয়। সিপাহী বিদ্রোহের পর যখন ভারতের শাসন ভার কোম্পানীর হাত হইতে পার্লামেণ্টের হাতে আসিল তখনও তাঁহারা দেশীয় রাজ্যসমূহের উপর তাঁহাদের শক্তির দাবী সম্পূর্ণভাবে অক্ষুণ্ণ রাখিলেন এবং যখনই ঐ সব রাজ্যে অন্যায় অত্যাচার, ষড়যন্ত্র হইয়াছে তখনই কঠিন হস্তে তাহা দমন করিতে বৃটীশরাজ পশ্চাৎপদ হন নাই। ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট এপর্য্যন্ত কখনো কোনো দেশীয় রাজার রাজ্য আক্রমণ বা অযথাভাবে বাজায়প্ত করেন নাই। মৈশূরের আভ্যন্তরীণ বিবাদাদির জন্য ১৮৩১ সালে ঐ

দেশ ইংরাজ সরকার নিজ শাসনাধীনে লন; তারপর ৫০ বৎসর পরে ১৮৮১ সালে লোকে যখন ইহার স্বাধীন অস্তিত্বের কথা প্রায় ভুলিয়া গিয়াছে তখন পুনরায় তাঁহারা প্রাচীন রাজপরিবারের যোগ্য রাজপুত্রের হাতে রাজ্যভার সমর্পণ করেন। ১৯০১ সালে কাশীর রাজাকে করদ-রাজ্য বলিয়া সরকার ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় দেশীয় রাজাদের ও তদীয় কর্মচারীদের অকর্মণ্যতা হেতু দলাদলি রেষারেষি নীচতার জন্য একাধিকবার নানাস্থানে সরকার স্বয়ং শাসন ভার লইয়াছেন।

গত দেড়শত বৎসর ধরিয়া বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অবস্থায় উপর্যুক্ত সাত শত রাজ্য ইংরাজ সরকারের সহিত সন্ধি সর্ত্তে আবদ্ধ হইয়াছেন; সুতরাং কাহারও সর্ত্তের সহিত কাহার সর্ত্ত মিলিবার কথা নয়। হায়দ্রাবাদের ন্যায় প্রকাণ্ড দেশের সহিত যে সর্ত্ত, দুই একটি গ্রামের নামে মাত্র সর্দারের সহিত সে সর্ত্ত নয়। কাথিবাড়ের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজাদের কেবল খাজনা আদায় ছাড়া আর কোনোই ক্ষমতা নাই। সরকারের সহিত করদ রাজ্যগুলির রাজনৈতিক সম্বন্ধ কিরূপ তাহা প্রদত্ত হইতেছে।

১। (ক) ১৭৫টি রাজ্যের সহিত খাস্ ভারত গভর্ণমেণ্টের সম্বন্ধ। ইহার মধ্যে হায়দ্রাবাদ, মৈশূর, বড়োদা, কাশ্মীরের রাজনৈতিক কার্য্যাবলী গভর্ণর জেনারেল বা বড়লাট বাহাদুর স্বয়ং পরিদর্শন করেন।

(খ) বড়লাট বাহাদুর স্বয়ং সবগুলি দেখিতে পারেন না বলিয়া কতকগুলি রাজ্য একত্র করিয়া এক একটি এজেন্সী গঠন করিয়াছেন। যথাঃ—(১) বেলুচিস্থান এজেন্সীর অন্তর্গত ৩টি রাজ্য। (২) রাজপুতানা এজেন্সীর অন্তর্গত ২০টি করদরাজ্য; (৩) মধ্য-ভারতীয় এজেন্সীর অন্তর্গত ১৫৩টি রাজ্য। (৪) সিকিম ১৯০৬ সাল পর্য্যন্ত বঙ্গীয় গভর্ণ-মেণ্টের অধীন ছিল; উক্ত বৎসর হইতে ভারতীয় গভর্ণমেণ্টের অধীন হইয়াছে। (৫) ভুটান ও নেপাল।

২। অবশিষ্ট ৫২৬টি করদ রাজ্যের সহিত প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের সম্বন্ধ। লাটসাহেব, ছোটলাট ও চীফ্ কমিশনরগণ নিজ নিজ প্রদেশস্থিত করদরাজ্য পর্য্যবেক্ষণ করেন। প্রদেশস্থ সকল করদরাজ্যের সহিত লাটসাহেবদের যে সাক্ষাৎভাবে সম্বন্ধ আছে তাহা নহে; কোথাও বা বিভাগীয় কমিশনর, কোথাও বা জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট্ এবং বড় বড় ষ্টেটে পোলিটিক্যাল এজেন্ট সরকারের প্রতিনিধিরূপে কাজ করেন।

দেশীয় রাজা ও ইংরাজ সরকারের মধ্যে পরস্পরের অধিকার ও এক্তার লইয়া বেশ বুঝাপড়া আছে। কাহারও সন্ধির সর্ত্তের মধ্যে কোনো অস্পষ্টতা নাই। বড় বড় রাজ্যগুলির আভ্যন্তরীণ শাসন সম্বন্ধে ইংরাজ সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়াছেন; কিন্তু কোনো ২ ক্ষেত্রে ইংরাজের কাছারীও অতিরিক্ত আছে। দেশীয় রাজ্যের প্রজারা স্থানীয় রাজাদেরই সম্পূর্ণ অধীন; বৃটীশ ভারতের প্রজাদের উপর তাঁহাদের কোনো অধিকার নাই। তেমনি দেশীয় রাজ্যের প্রজাদের উপর বৃটীশ সরকারের ক্ষমতাও অসীম নহে। বৃটীশ রাজ্যের চোর ডাকাত বা অন্য কোনো শ্রেণীর অপরাধী দেশীয় রাজ্যে আশ্রয় লইলে তথাকার পুলিশ তাহাদিগকে ধরিয়া দিতে বাধ্য। এইরূপ কতকগুলি সাধারণ নিয়ম উভয় পক্ষই মানিয়া চলেন।

বৈদেশিক বা আন্তর্জাতীয় নিয়ম বিষয়ে দেশীয় রাজ্যগুলির উপর যেসব বিধি নিষেধ আছে সেগুলি যাহাতে দৃঢ়ভাবে পালিত হয় তাহার দিকে পোলিটিক্যাল এজেন্ট, রেসিডেন্ট প্রভৃতি প্রতিনিধিদের বিশেষ-ভাবে দৃষ্টি রাখিতে হয়। দেশীয় রাজা অপর বিদেশীয় রাজ্যের সহিত স্বাধীনভাবে কোনো প্রকার সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারেন না; সমস্ত আলোচনাদি রেসিডেন্ট বা এজেন্টের হাত দিয়া সরকারের কাছ হইতে পাশ হইয়া নির্বাহিত হইতে পারে। বৃটীশরাজ বহিশ্শক্রর আক্রমণ হইতে রাজ্যগুলিকে রক্ষা করিতেছেন, সুতরাং তাঁহাদের স্বার্থের ও দেশের শান্তির কোনো প্রকার বাধা জন্মিতে পারে এমন কোনো সুযোগ

নরপতিগণকে দেওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। পার্শ্বস্থ রাজ্যের সহিত কাহারও কোনো বিষয় লইয়া মতদ্বৈত বা বিবাদ উপস্থিত হইলে বৃটীশ রাজের নিকট তাহা অবিলম্বে জানাইতে তাঁহারা বাধ্য। বড় ২ দেশীয় রাজাদের অধিকাংশেরই কিছু ২ সৈন্য আছে; তাহাদের প্রধান কর্ত্তব্য পুলিশ প্রহরীর কার্য্যসম্পাদন ও রাজসভার শোভাবর্দ্ধন। অধিকাংশ স্থলেই সৈন্যগণের শিক্ষা কিছুই নাই—অস্ত্রশস্ত্র এত সে-কেলে ধরণের যে বাহিরে কোথায় গমন করিলে লোকে তাহাদিগকে দুই শতাব্দী পূর্বের লোক ভাবিয়া সন্দেহ করিতে পারে। বর্ত্তমানে কোনো কোনো রাজ্যে কিছু উন্নতি হইতেছে।

বৃটীশরাজের সহিত দেশীয় রাজগণের সম্বন্ধ ক্রমেই ঘনিষ্ট ও আন্তরিক হইতেছে। রাজপুত্রগণের শিক্ষার জন্য সরকার বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছেন। বিলাতের বড় ২ বিদ্যালয়ের অনুকরণে লক্ষ ২ টাকা ব্যয় করিয়া আজমীর, রাজকোট, ইন্দোর, লাহোর ও মাদ্রাজে রাজপুত্রদের বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে। সেখানে সিভিল সার্বিসের বা বিলাতী কলেজের বিচক্ষণ শিক্ষকদের হস্তে এই রাজকুমারদের বিদ্যাশিক্ষার ভার অর্পিত হইয়াছে। রণনীতি শিক্ষা দিবার জন্য দেরাদুনে ইম্পিরিয়াল কাডেট-সংলগ্ন একটি কলেজে কেবলমাত্র রাজপরিবারের বালকদিগকেই শিক্ষা দেওয়া হয়।

ভারতবর্ষের ভিতরে বাহিরে বা সীমান্তে যখনই কোনো অশান্তির সৃষ্টি হইয়াছে দেশীয় রাজগণ তাঁহাদের সমস্ত রণ-শক্তি বৃটীশরাজের হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন। এই সৈন্যকে ইম্পিরিয়াল সার্বিস ট্রুপস্ (Imperial Service Troops) বলে। বর্ত্তমানে প্রায় বাইশ হাজার সৈন্য এই দলে আছে। প্রত্যেক ষ্টেটের উপর নিজ নিজ বাহিনী প্রতিপালনের ভার। গত যুদ্ধের সময়ে দেশীয় রাজগণ তাঁহাদের ধনজন সমস্ত বৃটীশরাজের হাতে দিয়াছিলেন। বৃটীশ-শাসনের ইতিহাসে ও সর্ব প্রথম বার দিল্লীতে

বড়লাট দেশীয় রাজাদের একত্র করিয়া দেশের মঙ্গলের কথা আলোচনা করিয়াছিলেন। এই সভাটিকে স্থায়ী করিবার কথা চলিতেছে।

বড়োদা

দেশীয় রাজ্যগুলির মধ্যে বড়োদা সকল বিষয়ে সকলের চেয়ে আগাইয়া চলিতেছে। গত চল্লিশ বৎসরের মধ্যে এই ক্ষুদ্র রাজ্য কি প্রকারে উন্নতি লাভ করিয়াছে তাহা দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়।

বড়োদারাজ্য বম্বে প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত; কিন্তু বম্বে গভর্ণমেণ্টের সহিত ইহার কোনো সম্পর্ক নাই; ইহার যোগ খাস ভারত সরকারের সহিত। বড়োদা রাজ্য এক-সংলগ্ন নহে, চারিটা স্থানে ছড়াইয়া আছে, মধ্যে মধ্যে ইংরাজদের রাজ্য। এই চারিটি বিভাগের নাম বড়োদা, কাদি, নওসারী, অমরেলী। প্রত্যেকটি বিভাগ ১০।১২টি করিয়া তালুকে বিভক্ত। সমগ্র রাজ্যের পরিমাণ ৮,১৮২ বর্গ মাইল; ১৯১১ সালের আদম-সুমারীর গ্রহণকালে এখানকার জনসংখ্যা ছিল ২০ লক্ষ ৩২ হাজার, ১৯০১ সালের জন সংখ্যা হইতে প্রায় শতকরা ৪ জন বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এই বৃদ্ধি খুবই কম। বহুবার নিদারুণ দুর্ভিক্ষে বহু সহস্র লোকের প্রাণ গিয়াছিল।

অবস্থান ও প্রাকৃতিক অবস্থা

বড়োদার অধিবাসীদের শতকরা ৮০ জন লোক এখনো গ্রামের মধ্যে বাস করিতেছে। অন্যান্য স্থানের ন্যায় সহরে যাইবার জন্য উন্মত্তা যদি লোককে পাইয়া না বসে তবেই যথার্থ কল্যাণ হইবে বলিয়া আশা করা যায়। বড়োদারাজ গ্রামের উন্নতির দিকে যে প্রকার দৃষ্টি দিয়াছেন তাহাতে মনে হয় জাতির যথার্থ শক্তি জাগিবে।

গ্রাম ও নগর

মোগল সাম্রাজ্যের ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে মহারাষ্ট্র ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। আরঙ্গজেবের মৃত্যুর সময় গুজরাট মোগলদের হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে, মহরাঠারা সেখানে আপনাদের প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছে। সেই সময়ে পিলাজী গায়কবাড় নামে একজন বীর বহুযুদ্ধে ও অভিযানে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়া যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করেন। ইহাকেই বড়োদা রাজ্যের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা বলিতে পারা যায়। ১৭৬৬ সাল পর্য্যন্ত সোনগড় তাঁহাদের প্রধান আবাস স্থান ছিল। পিলাজী বহুকাল ধরিয়া গুজরাটে চৌথ আদায় করেন এবং তাঁহার পুত্র দামজী ১৭৩৪ সালে বড়োদা অধিকার করেন এবং সেই হইতে গায়কবাড়রা বড়োদার অধীশ্বর। মোগল শক্তি গুজরাট হইতে তখনো সম্পূর্ণ ভাবে অস্তমিত হয় নাই। আহমাদাবাদের পতনের সঙ্গে সঙ্গে দাক্ষিণাত্য হইতে মোগলশক্তি একেবারে লোপ পাইল; তখন কেবল মাত্র পেশোয়া ও গায়কবাড়ের শক্তি গুজরাটে নিজ নিজ প্রভুত্ব স্থাপনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিল। বালাজী বাজিরাও যখন পাণিপথের শেষ যুদ্ধে সবংশে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলেন, দামাজী সেই ভীষণ যুদ্ধে যোগদান করিয়া মহারাষ্ট্রের নাম রাখিয়াছিলেন। এই যুদ্ধে সমগ্র মহারাষ্ট্র শক্তি চূর্ণ হইল বটে কিন্তু গায়কাবাড়ের শক্তি বৃদ্ধি পাইল। দামাজীর মৃত্যু হইল ১৭৬৮ সালে। ইহার পর ১৮০২ পর্য্যন্ত ভায়ে ভায়ে বিবাদ আত্মদ্রোহ কলহে কাটিয়া যায়। এই সময়ে বৃটীশ গভর্ণমেণ্ট সর্ব প্রথম গায়কাবাড়ের রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে হস্তক্ষেপ করিয়া কলহকারীদের মধ্য হইতে আনন্দরাওকে রাজগদীতে বসাইয়া দিলেন। ১৮০৫ সালে লর্ড হেষ্টিংসের সময়ে বড়োদার সহিত ইংরাজ সরকারের সন্ধি স্থাপিত হয় এবং বড়োদার বহির্রাজনীতি ইংরাজের দ্বারা পরিচালিত হইবে এই সর্ত্তে গায়কাবাড় আবদ্ধ হন ও

ইংরাজের সহিত সম্পর্ক

পেশোয়ার সহিত মতদ্বৈধ ও বিবাদ মীমাংসার ভার ইংরাজের উপর অর্পিত হইল। বাজীরাওয়ের সহিত ইংরাজের ভীষণ দ্বন্দের সময়ে বড়োদা ইংরাজদের পক্ষ ত্যাগ করেন নাই। পিণ্ডারী সমরেও ইংরাজদের প্রধান সহায় ছিলেন গায়কাবাড়।

কিন্তু ১৮২০ হইতে ১৮৪১ সাল পর্য্যন্ত দ্বিতীয় সাহজীরাওএর রাজত্ব কালে উক্ত রাজ্যের মধ্যে অনেক বিষয়ে বিবাদ আরম্ভ হয়; এবং বম্বের গভর্ণর শেষকালে সন্ধি ও শান্তি স্থাপন করিয়া দেন। ১৮৪৭ সালে গনপৎরাও রাজা হন। তাঁহার রাজত্বকালে বড়োদার সহিত ইংরাজ সরকারের রাজনৈতিক যোগ বম্বে হইতে খাস ভারত সরকারের হাতে যায়। সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে তৎকালীন গায়কাবাড় খাণ্ডেরাও ইংরাজদের প্রভূত উপকার করিয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রাতা মলহর রাও ১৮৭০ সালে গদীতে বসেন; কিন্তু তাঁহার মত অকর্মণ্য, কুচক্রী, স্বেচ্ছাচারী রাজা দেশের অকল্যাণ বলিয়া পরিগণিত হইল। অবশেষে রেসিডেন্টকে বিষদানের চেষ্টার অপরাধে তিনি রাজ্যচ্যুত হন; কিন্তু এ পর্য্যন্ত এ অভিযোগ সপ্রমাণিত হয় নাই। ১৮৭৫ সালে এই রাজপরিবারের বহুদূর সম্পর্কীয় একটি ১৩ বৎসরের বালককে গদীতে সায়জীরাও উপাধি দিয়া বসাইয়া দেওয়া হইল।

বর্ত্তমান গায়কাবাড়ের রাজ্য প্রাপ্তি

ইনিই বর্ত্তমান গায়কাবড়; ১৮৮১ সালে বর্ত্তমান গাওকাবাড় রাজ্যভার স্বয়ং গ্রহণ করেন। ইঁহার সম্পূর্ণ নাম ও উপাধি শ্রীল শ্রীযুক্ত ফরজন্দ-ই-খাশ-ই-দৌলত-ই-ইংলিশিয়া মহারাজা স্যার সায়জী রাও গায়কাবাড় সেনা খাস খেল, সমশের বাহাদুর, জি, সি, এস, আই ইত্যাদি।

বর্ত্তমান গায়কাবাড়ের সময় হইতেই বড়োদার সর্ব বিষয়ে উন্নতি আরম্ভ। যদিও মাহারাজ দেশের সর্বেসর্বা তথাচ তিনি তাঁহার ক্ষমতা

শাসন বিধি

আপনার হস্তে আবদ্ধ রাখেন নাই। মন্ত্রী ও দুইজন নায়েব-দেওয়ানকে লইয়া একটি কার্য্য-নির্বাহক সভা গঠিত হইয়াছে। বৃটীশ ভারতের ন্যায় নানা বিভাগ খোলা হইয়াছে এবং সেগুলি সুচারুরূপে সম্পন্ন করিবার জন্য যথাসাধ্য আয়োজন হইয়াছে। সমগ্র রাজ্য চারিটী প্রান্তে এবং সে গুলি ৪২ মহল ও পেটামহলে বিভক্ত হইয়াছে।

গ্রাম পঞ্চায়েৎ

বড়োদার শাসন সংস্কারের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় কাজ হইয়াছে গ্রাম্য পঞ্চায়েৎ প্রথার পুনরুত্থান। যে কারণেই হোক গত শতাব্দীর মধ্যে গ্রামের স্বায়ত্বশাসন শক্তি সম্পূর্ণরূপে লোপ পাইয়াছিল। কেন্দ্রগত শক্তি দেশের সর্বব্যাপী শক্তিকে প্রায় মারিয়া ফেলিয়াছিল। মহারাজের একান্ত ইচ্ছার জোরে মৃতপ্রায় গ্রাম গুলিতে প্রাণ আসিতেছে। প্রতি গ্রামে পঞ্চায়েৎ প্রথা প্রবর্ত্তিত হইতেছে। গ্রাম্য-কর্মচারী নিযুক্ত করিবার জন্য গ্রামের সরকারী খাজনা কমাইয়া দেওয়া হয়। এই সকল পঞ্চায়েৎ সরকারী মনোনীত ব্যক্তিরাই হইত—কিন্তু ১৯০৪ সালে মহারাজ মনোনয়ন প্রথা উঠাইয়া দিয়া নির্বাচন প্রথা প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। মহারাজের ইচ্ছা যে সমগ্র দেশে প্রতিনিধিমূলক শাসন প্রচলিত হয়; এই জন্য গ্রাম হইতে তালুকে, তালুক হইতে জিলায়, ও জিলা হইতে রাজ্যের ব্যবস্থাপক সভায় প্রতিনিধি প্রেরণের ব্যবস্থা হইতেছে। পঞ্চায়েতের জন্য নূতন নূতন বিধি প্রণীত হইয়াছে সহস্রাধিক অধিবাসীর গ্রামে নিজ পঞ্চায়েৎ আছে; কিন্তু হাজারের কম হইলে কয়েকটি গ্রাম একত্র হইয়া পঞ্চায়েৎ গঠন করিয়া থাকে। পঞ্চায়েতে ৫ জন হইতে ৯ জন সভ্য থাকেন। ইহার অর্দ্ধেক স্থানীয় নায়েব-সুবা মনোনীত করেন অপরার্দ্ধ কৃষকেরা নির্বাচন করে। পাটেল গ্রামপঞ্চায়েতের সভাপতি; তলতাই বা হিসাবরক্ষক ও পণ্ডিত মহাশয় ইহার সভ্য। এই পঞ্চায়েতের

উপর গ্রামের রাস্তা কূপ, পুষ্করিণী, বিদ্যালয়, ধর্ম্মশালা, দেবস্থান, আদর্শ-খামার এবং সরকারী ও সাধারণের সমস্ত সামগ্রী তদারকের ভার। দুর্ভিক্ষের সময়ে পঞ্চায়েৎ সেবার ও ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া থাকে; তাহারা গ্রামের মুন্সিফের সহিত মোকর্দ্দমায় ও সাব-রেজিষ্টারের কার্য্যে সাহায্য করিয়া থাকেন। এককথায় গ্রামের স্বাস্থ্য শিক্ষা ও সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গলের জন্য পঞ্চায়েৎ দায়ী। প্রতিমাসে ইহাদের সভা বসে এবং কতকগুলি গ্রাম হইতে একজন করিয়া সভ্য তালুক-বোর্ডে প্রেরিত হন।

তালুক-বোর্ডে মনোনীত ও নির্ব্বাচিত দুই শ্রেণীর সভ্য থাকে।

তালুক বোর্ড।

কতকগুলি গ্রাম-পঞ্চায়েৎ হইতে ও ম্যুন্সিপালটী হইতে অর্দ্ধেক সভ্য নির্ব্বাচিত হয়, অবশিষ্ট সরকারী তরফ হইতে মনোনীত হয়। নায়েব-স্থবা এই সভার সভাপতি।

বড়োদায় চারিটি জেলা আছে এবং প্রত্যেক জেলায় একটি করিয়া বোর্ড আছে। প্রত্যেক তালুক-বোর্ড হইতে এক বা ততোধিক সভ্য

জেলা-বোর্ড।

জেলা-বোর্ডে প্রেরণ করা হয়; তাঁহারা প্রজার প্রতিনিধিরূপে সেখানে উপস্থিত হন। দশহাজারী সহরের প্রতিনিধিগণ জেলা-বোর্ডে উপস্থিত হইয়া আপনাদের শাসন ব্যবস্থা পর্য্যালোচনা করেন। জেলা-বোর্ডের অর্দ্ধেক সভ্য সরকার কর্ত্তৃক মনোনীত হন। (মনোনীত সভ্যের অর্দ্ধেক সরকারী লোক) জেলার সরকারী কর্ত্তা এই সভার সভাপতি এবং বোর্ড কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত একজন ভাইস-চেয়ারম্যান তাঁহার সহকারী। জেলা-বোর্ডকে পূর্ত্ত-বিভাগের অন্তর্গত রাস্তা তৈয়ারী, জলাশয় ও কূপ খনন, ধর্ম্মশালা, চিকিৎসালয় বাজার পর্য্যবেক্ষণ, টীকা দেওয়া, স্বাস্থ্যরক্ষা, প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা, বন-বিভাগের রক্ষণাবেক্ষণ প্রভৃতি কার্য্য দেখিতে হয়। লোকে যথার্থ স্বায়ত্ত-শাসনের শিক্ষা পাইয়া গ্রাম হইতে নিজেদের দায়ীত্ব বুঝিতে

শিখিতেছে এবং বৎসরের পর বৎসর নূতন অধিকার পাইয়া যথার্থ স্বাধীনতার দিকে অগ্রসর হইতেছে।

এই প্রতিনিধি দ্বারা রাজ্য শাসনের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করিবার জন্য গায়কবাড় ১৯০৮ সালে ব্যবস্থাপক সভা স্থাপন করেন। যেমন গ্রাম-পঞ্চায়েৎ তালুক-বোর্ডে প্রতিনিধি সভ্য নির্বাচন করিয়া প্রেরণ করেন, তালুক-বোর্ড পুনরায় জেলা বোর্ডে প্রতিনিধি প্রেরণ করেন, তেমনি জেলা-বোর্ড হইতে ব্যবস্থাপক সভায় প্রতিনিধি প্রেরিত হয়। বড়োদার ব্যবস্থাপক সভায় দেওয়ানকে লইয়া ২৬ জন সভ্য। ১০ জন সভ্য জেলা-বোর্ড কর্ত্তৃক নির্বাচিত হইয়া থাকেন, অবশিষ্ট সরকারী বেসরকারী সভ্যগণ সরকার কর্ত্তৃক মনোনীত হইয়া থাকেন। ব্যবস্থাপক সভায় বিল পাশ হইয়া রাজার অনুমতি পাইলে তবেই তাহা কার্য্যকারী আইন হইবে নতুবা নহে।

ব্যবস্থাপক সভা।

গ্রামে স্বায়ত্ত-শাসন প্রবর্ত্তিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে সহরে মুন্সিপালটি প্রবর্ত্তিত হয়। বড়োদার মুন্সিপালটি চেয়ারম্যান নির্বাচন করেন সরকারী মনোনীত লোক সভাপতি হন না। বড়োদা ব্যতীত আরও ১০টি সহরে মুন্সিপাল স্বায়ত্ত-শাসন প্রচলিত আছে এখানে একটি কথা বলিয়া রাখা উচিত যে বড়োদা তাহার স্বায়ত্ত-শাসন দেশ মধ্যে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য বঙ্গদেশের উজ্জ্বল রত্ন স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের নিকট প্রচুর পরিমাণে ঋণী।

মুন্সিপালটি।

বড়োদার অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা ৬০ জন কৃষিজীবি; সুতরাং তাহাদের শ্রীবৃদ্ধি রাজ্যের কল্যাণ, রাজার কল্যাণ। সমবায় ঋণদান সমিতি সম্বন্ধে যে সকল নিয়ম হইয়াছে তাহাতে প্রজার যথার্থ কল্যাণ হইতেছে। বর্ত্তমানে প্রায় (৩০০) তিন শত সমবায়ে দশ হাজার মেম্বরের ৯ লক্ষ টাকা মূলধন খাটিতেছে এবং এক লক্ষ টাকা রিজার্ভ ভাণ্ডারে জমিয়াছে। মোটের

সমবায় ঋণদান সমিতি।

উপর গ্রামের মধ্যে আত্মনির্ভরশীলতা, মিতব্যয়ীতা এবং সহযোগীতা প্রতিষ্ঠিত হইতেছে।

কেবল শাসনের সুব্যবস্থা ও ঋণদান সমিতি স্থাপন করিলে প্রজার উন্নতি হইবে না একথা বর্ত্তমান গায়কাবড় বহুকাল হইতে বুঝিয়াছেন। য়ূরোপ ও আমেরিকা ভ্রমণ করিয়া আসিয়া মহামতি গায়কবাড় ১৮৯৩ সালে অবৈতনিক বাধ্যতা মূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। তখন ৮ হইতে ১২ বছরের বালক ও ৭ হইতে ১০ বছরের যাবতীয় বালিকাকে শিক্ষার জন্য বাধ্য করিলেন। বহু প্রতিকূলতার মধ্যে তাঁহাকে এই ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করিতে হইয়াছিল। ১৮৭১ সালে বড়োদার রাজ্যে একটি ইংরাজী ও ৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল এবং শিক্ষার জন্য বছরে ১৩ হাজার টাকা মাত্র খরচ হইত। সরকারী লোকের মধ্যেও দুই চারিজন ব্রাহ্মণ ও লেখক শ্রেণীর লোক ছাড়া লেখাপড়া অতি অল্পই জানিত। কিন্তু এক্ষণে ৩০৬৭টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৩৯টি মাইনর স্কুল, ১৩টি হাইস্কুল, একটি কলেজ, দুইটি শিক্ষক-দের কলেজ হইয়াছে। এছাড়া টেকনিক্যাল শিক্ষার জন্য কলাভবন, সঙ্গীত-বিদ্যালয় ও নৈশ-স্কুল স্থাপিত হইয়াছে। অন্ত্যজ জাতির সন্তান সন্ততি সাধারণ বিদ্যালয়ে পাঠ করিতে পারে; কিন্তু এ ছাড়াও তাহাদের জন্য বিশেষ শিক্ষালয় স্থাপিত হইয়াছে। অসভ্য পার্ব্বত্য জাতির ছেলেদের জন্য বোর্ডিং এ থাকা, খাওয়া ও শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে।

বাধ্যতা মূলক অবৈতনিক শিক্ষা।

১৯১৩ সালের ২½ লক্ষ বিদ্যার্থী বড়োদার বিদ্যালয়ে পড়িতে-ছিল। ইংরাজী শিক্ষার জন্য বড়োদায় আয় ৯৬ হাজারের কিঞ্চিদধিক কিন্তু সরকারী ব্যয় ইহার চতুর্গুণ। ১৯১৭ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৩,০৬৭। ইহার জন্য ব্যয় হইয়াছিল প্রায় ১১ লক্ষ টাকা—অর্থাৎ স্কুল প্রতি ৪৪২৲ টাকা।

ছাত্র সংখ্যা।

বালিকাদের শিক্ষার জন্য বড়োদারাজ যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করিতেছেন; ৪১৪টি স্কুল বালিকাদের জন্য চলিতেছে। এই সকল বিদ্যালয়ে প্রায় ৪০ হাজার বালিকা পড়িতেছে; এবং ইহার সহিত আর ৪৫ হাজার বালিকা যাহারা ছেলেদের সঙ্গে পাঠশালায় পড়িতেছে তাহাদিগকে যোগ দিলে সংখ্যা নিতান্ত মন্দ হয় না।

বালিকা বিদ্যালয়।

অন্ত্যজ শ্রেণীর বাস বড়োদায় ১ লক্ষ ৭৪ হাজারের অধিক; ইহাদের সন্তানদের শিক্ষার জন্য ২৭৫টি পৃথক্ বিদ্যালয় আছে। ইহার মধ্যে ৫টি শিক্ষালয় মেয়েদের জন্য। ১৯১৭ সালে প্রায় ১১ হাজার অন্ত্যজ বিদ্যার্থী এই সকল বিদ্যালয়ে ও আরও ৬½ হাজার বিদ্যার্থী বিদ্যালয়ে পাঠ করিতেছিল। অন্ত্যজদের প্রায় শতকরা ১০ জন এখন বিদ্যালাভ করিতেছে।

অন্ত্যজ-বিদ্যালয়।

কলাভবন ভারতবর্ষের মধ্যে একটি বিখ্যাত টেক্‌নিক্যাল বিদ্যালয় বলিয়া বর্তমানে গণ্য হইয়াছে। এই বিদ্যালয়ে ৪৩৩ জন ছাত্র। এখানকার অধিকাংশ ছাত্রই বাহিরের, বড়োদায় ছাত্র একশতও হইবে না। কলাভবন ব্যতীত আরও দুইটি শিল্প বিদ্যালয় আছে। কলাভবনে ছাত্রপিছু সরকারী বাৎসরিক ব্যয় ১৫৮৲ টাকা। বড়োদারাজ তাঁহার রাজস্বের বার ভাগের এক ভাগ বিদ্যার জন্য খরচ করেন অর্থাৎ ২০ লক্ষ টাকা। ফলে ৪০ বৎসরে নিরক্ষর দেশে শতকরা ১০ জন এখন লেখা পড়া শিখিয়াছে এবং ত্রিবঙ্কুর ও কোচীন ছাড়া সমগ্র ভারতের আর কোথাও শিক্ষিতের সংখ্যা এত অধিক নয়।

কলাভবন
টেক্‌নিক্যাল শিক্ষা।

মহারাজ বুঝিয়াছেন যে কেবলমাত্র বিদ্যালয় স্থাপন করিলে বিদ্যা বিস্তারলাভ করিবে না। বিদ্যা প্রচারের প্রধান সহায় পুস্তক প্রচার।

পুস্তক মুদ্রন।

এইজন্য রাজকোষ হইতে বহু সহস্র টাকা খরচ করিয়া নানা বিষয়ে বই গুজরাটী ও মারাঠী ভাষায় লিখিত হইতেছে। কিন্তু আবার পুস্তক লিখিত হইলেই লোকের জ্ঞান বাড়ে না। তাহার প্রচারও প্রয়োজন। সেইজন্য গায়কাবাড় আমেরিকা হইতে মিঃ বোর্ডেন নামক জনৈক লাইব্রেরী বিশেষজ্ঞকে এদেশে আনয়ন করেন। তিনি বড়োদা রাজ্যে পুস্তক প্রচারের জন্য লাইব্রেরী স্থাপন করেন। গায়কাবাড় বড়োদা সহরের নিজ লাইব্রেরী এখন সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য ছাড়িয়া দিয়াছেন। এই প্রকাণ্ড লাইব্রেরীতে এখন বিভিন্ন শাখা খোলা হইয়াছে; (১) পাঠাগার, সেখানে আড়াই শতের উপর কাগজ ও পত্রিকা আসে; (২) পুস্তক প্রচার করিবার জন্য একটি বিভাগ; (৩) কোষাদি দেখিবার জন্য; (৪) শিশু বিভাগ; (৫) মহিলা বিভাগ; (৬) সংস্কৃত লাইব্রেরী। জেলা লাইব্রেরীর অধীনে ৭৯৬টি শাখা-লাইব্রেরী ও ৫২টি পাঠাগার রাজ্যের নগরে ও গ্রামে চলিতেছে। ইহার মধ্যে ৩টি প্রান্ত লাইব্রেরী, ৩৯টি নগর-লাইব্রেরী ও ৭৫৪টি গ্রাম্য-লাইব্রেরী। তৃতীয় আর এক শ্রেণীর লাইব্রেরী আছে সেগুলি গ্রামে ২ ঘুরিয়া বেড়ায়। ৪৪৪টি বাক্সে বই সারা বৎসর দেশময় ঘুরিতে থাকে। এই বিভাগের জন্য প্রায় ১৪ হাজার বই পৃথক আছে এবং প্রতি বৎসর ১০,০০০ বই লোকের মধ্যে প্রচার হইয়া থাকে।

লাইব্রেরী।

বায়স্কোপ।

লোকশিক্ষার চতুর্থ উপায় সচল-চিত্র প্রদর্শন বা বায়স্কোপ। বায়স্কোপের দ্বারা যে সাধারণ লোকের চিত্তের শিক্ষা হয় তাহা আমাদের দেশে এখনো কেহ জানেন না বলিলেই হয়। আমেরিকা ও পাশ্চাত্য দেশ সমূহে ইহার যথার্থ সদ্ব্যবহার হইয়াছে; গায়কাবাড় শিক্ষার সেই সুযোগ তাঁহার রাজ্য মধ্যে গ্রহণ করিয়াছেন। ১৯১৭ সালে লাইব্রেরীর জন্য প্রায় ১ লক্ষ ৫০০০ টাকা ব্যয় হইয়াছিল।

মহারাজ নিজে শিক্ষা বিষয়ে যথেষ্ট উৎসাহ দেখান। তিনি নিজে পুস্তক ও চিত্র ভাল বাসেন এবং তাঁহার প্রজারা ইহা হইতে জ্ঞান ও আনন্দ পায় ইহাই তাঁহার ইচ্ছা। লাইব্রেরী সম্বন্ধে বিলাতে ও আমেরিকায় অনেকগুলি পত্রিকা বাহির হইয়া থাকে, কিন্তু ভারতে বড়োদার হইতে লাইব্রেরী সম্বন্ধে "লাইব্রেরী মিসলেনী" নামে একখানি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ইহা ইংরাজী ও গুজরাটী বা মারাঠী ভাষায় লিখিত। * ব্যবসায়ী, শিল্পী, কারিগরগণের সুবিধার জন্য লাইব্রেরীতে পৃথিবীর প্রধান ২ শিল্পীকারিগরগণের তালিকা রক্ষিত হয়। বড়োদায় শীঘ্রই একটি বাণিজ্য বিষয়ক যাদুঘর নির্মিত হইবে। ফলে লোকে পৃথিবীর বাণিজ্যের আন্দোলনের সহিত যুক্ত থাকিবে।

শিল্পোন্নতি।

দেশীয় শিল্পের উন্নতির জন্য বড়োদার বিশেষ দৃষ্টি আছে। বর্ত্তমান বাণিজ্যের এই অধোগতির প্রধান কারণ আমাদের বুদ্ধি ও বল একত্র কাজ করিতেছে না। আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকের শারীরিক বল নাই ও শ্রমজীবির বুদ্ধি নাই। এই জন্যই কলাভবন স্থাপিত হয় এবং এই ২৮ বৎসর এই বিদ্যালয় ইহার কার্য্য পুরাদমে করিতেছে। অনেকগুলি শিল্পে রাজসরকার সাহায্য দান করিয়াছেন। কিন্তু শিল্পকার্য্যে সামান্য লোকই নিযুক্ত, অধিকাংশই কৃষিকার্য্যে রত। সুতরাং যেখানে শতকরা ৬০ জন লোক কৃষিকার্য্যে লাগিয়া রহিয়াছে সেখানে কৃষির উন্নতি সর্ব্বপ্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হওয়া উচিত। য়ুরোপে ও বিশেষভাবে আমেরিকায় কৃষিবিজ্ঞান যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছে। বড়োদার মহারাজ পাশ্চাত্য আদর্শ অনুসারে চারিটী 'মডেল' ফার্ম স্থাপন করিয়াছেন। এখানে বিশেষজ্ঞেরা নানা বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া তাহার ফল কৃষকদিগকে

---

* দুঃখের বিষয় এই কাগজখানি গত বৎসর হইতে উঠিয়া গিয়াছে।

দেখাইয়া থাকেন। কৃষি পর্য্যবেক্ষকগণ প্রায় দুই শত গ্রামে কৃষির উন্নতি, কৃষি সমিতি, সমবায় স্থাপন সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ভাল ভাল যন্ত্রপাতির ব্যবহার ও উপকারিতা দেখাইয়া কর্ম্মচারীরা বেড়াইয়া থাকেন। কৃষি-বিজ্ঞান অধ্যয়ন করিবার জন্য কতকগুলি বৃত্তি ছাত্রদের দেওয়া হইয়া থাকে।

১৯১৭ সালে বড়োদার কৃষি ও শিক্ষা প্রদর্শনী হয়; ইহাতে কৃষি, বন, বাগান, শিক্ষা ও শিল্প বিষয়ক প্রায় ৩০ হাজার সামগ্রী দেখানো হয়। এই প্রদর্শনীর প্রধান বিশেষত্ব হইতেছে যে এখানে হাতে কলমে অনেক পরীক্ষা দেখানো হয় ও অনেক বক্তৃতাও করা হয়।

কৃষকের প্রধান সহায় গো-মহিষ; তাহাদের উন্নতি ও বৃদ্ধির দিকে সরকারের বিশেষ দৃষ্টি আছে। এইরূপে রাজদৃষ্টি কৃষি বিভাগের সকল শাখায় পড়িয়াছে।

ধর্ম্ম ও পুরোহিতদের শিক্ষা

প্রজার অন্যান্য কল্যাণের জন্য রাজার মন সর্ব্বদাই ব্যাকুল। ধর্ম্ম বিষয়ে তিনি যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছেন; মন্দিরের অর্থাদি যাহাতে সদ্‌ভাবে ব্যয়িত হয় তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন; সংস্কৃত পাঠশালা, পুরোহিতদের ক্লাস, তাহাদের সার্টিফিকেট, অল্পবয়সে বালিকা বিবাহ বন্ধ বিষয়ে নিয়ম প্রনয়ণ প্রভৃতি শত জন হিতকর কর্ম্মে তাঁহার সম্পূর্ণ সহানুভূতি ও অনুরাগ দেখা যায়।

আয় ব্যয়।

বড়োদার আয় দুই কোটি দুই লক্ষ টাকা ও ব্যয় হইয়াছিল ১ কোটি ৫৫ লক্ষ। এই ব্যয়ের মধ্যে ১৯১৬-১৭ সালে পূর্ত্ত বিভাগে ২৬ লক্ষ, রাজস্ব বিভাগে ২০ লক্ষ ব্যয়িত হয়; ইহার পরেই শিক্ষার জন্য ২০ লক্ষ ৪৩ হাজার টাকা খরচ হয়। সৈন্য বিভাগ, জেলপুলিশ, রাজার নিজের ব্যয় সমস্তই শিক্ষার অপেক্ষা নীচে স্থান পাইয়াছে।

হায়দ্রাবাদ

ভারতের সবৃবৃহৎ দেশীয় রাজ্য হায়দ্রাবাদ দক্ষিণাত্যে অবস্থিত। এই রাজ্য নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে, য়ুরোপের ইতালির মত বৃহৎ। আয়তন প্রায় ৮২, ৭০০ বর্গ মাইল এবং জনসংখ্যা ১ কোটি ৩৩ লক্ষ ৭৪ হাজারের উপর। এই দেশটি ভৌগলিক ভাবে দুইটি ভাগে বিভক্ত। জাতিতত্বের দিক হইতেও দুইটি পৃথক্ ধারায় বিভক্ত। উত্তর-পশ্চিম অংশ মারাঠাদের বাস এবং দক্ষিণ-পূর্ব্বদিক তেলেগুজাতির বাস। কিন্তু হায়দ্রাবাদ মুসলমান রাজ্য বলিয়া এখানকার রাজভাষা উর্দ্দু।

ইতিহাস।

হায়দ্রাবাদ মুসলমান রাজ্য। আরংজেব তাঁহার সেনাপতি আসফ্ জাকে এখানকার শাসনকর্ত্তা করিয়া দেন; মোগল সম্রাটের মৃত্যুর পর ভারতে যে অরাজকতা আরম্ভ হয় তাহারই সুযোগে যে সকল স্বাধীন রাজ্য স্থাপিত হয় হায়দ্রাবাদ তাহাদের অন্যতম। দাক্ষিণাত্যে ইংরাজ ও ফরাসীদের সহিত যখন বিবাদ চলিতেছিল সেই সময়ে নিজাম ইংরাজদের সহিত মিত্রতা সূত্রে আবদ্ধ হন; ভীষণ সিপাহী বিদ্রোহের সময়েও নিজামের রাজভক্তি কিছুমাত্র বিচলিত হয় নাই। বর্ত্তমান নিজামের নাম শ্রীলশ্রীযুক্ত স্যার উসমন আলি খাঁ বাহাদুর ফতে জঙ্গ।

বেরারের ইতিহাস।

বেরার হায়দ্রাবাদের অন্তর্ভূক্ত দেশ ছিল; ১৯১২ সালে তাহা ইংরাজদের খাস হইয়া যায়। ইহার ইতিহাস সংক্ষেপে এই রূপ। হায়দ্রাবাদের একদল সৈন্যের ভার ইংরাজদের উপর ন্যস্ত ছিল; তাহাদের পোষণ করিবার খরচ বাঁকি পড়ায় নিজাম ১৮৫৩ ও ১৮৬০ সালে সন্ধি করিয়া বেরারের জেলাগুলির পরিচালনার ভার ইংরাজদের উপর দিলেন। সৈন্যদের খরচ যোগাইয়া যদি কিছু টাকা বাঁচিত তবেই তাহা নিজাম পাইতেন। ইতিমধ্যে দেখা

গেল যে হায়দ্রাবাদের ঐ সৈন্যবাহিনী রক্ষাকরা নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন; এবং বেরারকে পৃথক ভাবে শাসন করা হায়দ্রাবাদের পক্ষে ব্যয় সাপেক্ষ। তাহা ছাড়া বেরার হইতে বাৎসরিক আয়ের কোনো বাঁধাবাঁধি ছিল না; যে বৎসরে যাহা পাওয়া যাইত তাহা নিজাম-সরকার উপরির মতো পাইতেন। এই সকল প্রশ্ন বিচার করিয়া ১৯০২ সালে বেরারের জেলাগুলি ইংরাজসরকারের হাতে সমর্পণ করা হইল; ঠিক হইল নিজাম বৎসরে ২৫ লক্ষ টাকা ভারত সরকারের কাছ হইতে পাইবেন। কিন্তু কিছু টাকা ধার করিয়াছিলেন বলিয়া বর্ত্তমানে এই রাজস্ব বৃটীশ সরকারকে দিতে হয় না, সেই ঋণই শোধ হইতেছে। ১৯০৬ সালে হায়দ্রাবাদ সৈন্যবাহিনীর পৃথক অস্তিত্ব আর থাকিল না, ভারতীয় সৈন্যের সহিত তাহা মিলিত হইয়া গেল। বেরার তুলার চাসের জন্য বিখ্যাত, সেখানকার আয় নিতান্ত সামান্য নয়; সুতরাং আমাদের সরকার ইহাতে লাভবান হইয়াছেন। তবে হায়দ্রাবাদের হাতে থাকিলে এ প্রকার উন্নতি হইত কিনা তাহা সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে।

নিজাম রাজ্যের মধ্যে সর্বময় কর্ত্তা, প্রজার দণ্ড মৃত্যুর কর্ত্তা তিনিই।

শাসন।

কিন্তু রাজ্যের ভার দেওয়ানের উপর ন্যস্ত; তিনিই নিজামের নামে কাজ চালান। তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য চারিজন সহকারী আছেন, তাঁহারা অর্থ-বিভাগ, বিচার, সৈনিক ও ধর্ম-বিভাগের ভার প্রাপ্ত সদস্য রূপে কার্য্য করেন। রাজ্যের যাবতীয় কার্য্য কৌন্সিলতে হয়; দেওয়ান সভাপতি ও অন্যান্য সহকারী দেওয়ানগণ সভার সদস্য। কৌন্সিলতে গৃহীত প্রস্তাবাদি নিজামের নিকট প্রেরিত হয়।

এই সকল কার্য্যের ব্যবস্থার জন্য ছয়জন সম্পাদক ও তাঁহাদের অপিষ আছে। সমস্ত রাজ্য ১৫টি জেলা ও ৮৮টি তালুকে বিভক্ত।

দেশের আইন প্রনয়ণের জন্য একটি ব্যবস্থাপক সভা আছে। ২৩

জন লোক ইহার সভ্য, ইহার মধ্যে ১২ জন সরকারী ও ১১ জন বেসরকারী সভ্য। নিজামের নিজ টঁ্যাকশালে টাকা পয়সা তৈয়ারী হয়। তথাকার ১১৫ টাকা আমাদের ১০০ টাকার সমান। রাজ্যের নিজ ডাকঘর ও ষ্ট্যাম্প আছে এবং রাজ্যময় তাহাই ব্যবহৃত হয়। রাজ্যে ১৭,৩৪৭ জন সৈনিক আছে; ইহার মধ্যে প্রায় ছয় হাজার মাত্র রেগুলার।

রাজস্ব। নিজামের রাজ্য বহু পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া আসিয়া এক্ষণে ভাল অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। ১৯১৮ সালের আয় ছিল ৬ কোটি ৫ লক্ষ ও ব্যয় ৫,২০ লক্ষ। রাজস্ব হইতে ২,৯৩ লক্ষ, বেরার হইতে ২৫ লক্ষ, শুল্ক হইতে ৭০ লক্ষ, আবগারী হইতে ১ কোটি ২ লক্ষ ও সুদ ৩৫ লক্ষ টাকা আয়।

হায়দ্রাবাদের অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবি; কিন্তু কৃষি-বিভাগের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়; কর্ত্তৃপক্ষ যে সামান্য ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা মোটেই সন্তোষজনক নহে। রাজ্যের মধ্যে খনি আছে। সিংঙ্গারলিতে যে কয়লার খনি আছে তাহা নিতান্ত ছোট নহে। গোলকুণ্ডের হীরার খনি এখন অতীতের কথা; সে সকল স্থানের খনিতে সামান্যই লাভ হয়।

শিক্ষায় হায়দ্রাবাদ খুব পিছাইয়া আছে। মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন একটি প্রথমশ্রেণীর কলেজ হায়দ্রাবাদে আছে। এতবড় দেশে মাত্র একটি কলেজ ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। এখানে প্রাচ্য শিক্ষার জন্য যে কলেজ আছে তাহাতে স্থানীয় মৌলভী ও মুন্সীরা পরীক্ষা দেয়। এতবড় রাজ্যে মাত্র ২১টি হাই স্কুল, ৮০ টি মধ্য-ইংরাজী স্কুল, ১০৪১ টি পাঠশালা ও ২৩টি বিশেষ বিদ্যালয় আছে। বড়োদার জন সংখ্যা ইহার এক ষষ্টাংশ, অথচ সর্ব্বশ্রেণীর বিদ্যালয়ের সংখ্যা তিন হাজারের উপর। এই তুলনা হইতেই বুঝা যায় যে নিজামের এ দিকে দৃষ্টি কত কম। নিজামের নিজের বার্ষিক আয় প্রায় ৭০ লক্ষ টাকা। তাঁহার ৪০০ খানি

মোটরকার আছে; প্রাসাদের জন্য লক্ষ ২ টাকা ব্যয়িত হয়। বিশিষ্ট অতিথিদের জন্য একটি বাড়ীতে শব্দহীন রবারের মেঝে করিতে ৭৫ হাজার টাকা ব্যয় করিতে তিনি দ্বিধা বোধ করেন নাই। এইরূপ অপব্যয়ে অনেক অর্থ যায়; শিল্পোন্নতি, কৃষির উন্নতির দিকে তাঁহার দৃষ্টি নিতান্ত কম। গত দুই তিন বৎসর হইতে হায়দ্রাবাদে শিক্ষার জন্য চেষ্টা দেখা যাইতেছে ও ওস্‌মেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয় নামে এক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এখানকার শিক্ষা দিবার ভাষা হইয়াছে উর্দ্দু।

মহীশূর

মহীশূরই ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ হিন্দুরাজ্য। এখানকার শতকরা ৯২ জন অধিবাসী হিন্দু; অধিবাসীদের ভাষা কানাড়ী। সমগ্র দেশের আয়তন ২৯, ৪৬১ বর্গ মাইল, এবং জনসংখ্যা ১৯১১ সালে ৫৭ লক্ষ ৫ হাজার ছিল। বহু প্রাচীনকাল হইতে দাক্ষিণাত্যে হিন্দু শাসন ছিল। বিজয়নগরের সম্রাটের সামন্ত নরপতি হইয়া মহীশূর বহুকাল ছিল; তারপর ১৫৬৫ সালে বিজয়নগরের ধ্বংস হইলে মহীশূর আপনার স্বাধীনতা ঘোষণা করে। অষ্টাদশ শতব্দীর শেষভাগে হায়দার আলি ও তাঁহার পুত্র তিপুসুলতান মহীশূরের সিংহাসন অধিকার করিয়া বসেন সে কথা ইতিহাসে সকলেই পাঠ করিয়াছেন। ১৭৯৯ সালে সেরিঙ্গপটমের পতনের সময়ে তিপুর মৃত্যু হইল; ইংরাজ হিন্দু রাজপরিবারের হাতে রাজ্যশাসন ভার সমর্পণ করিলেন। কিন্তু কয়েক বৎসরের মধ্যে দেশের আভ্যন্তরীন অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিল, রাজ্যের মধ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত হইল; তখন ব্রিটীশরাজ বাধ্য হইয়া মহীশূরের শাসন ভার নিজহস্তে লইলেন (১৮৩১)। ইহার পর পঞ্চাশ বৎসর মহীশূর ইংরাজদের খাস শাসনে ছিল। লোকে প্রায় ভুলিয়া গেল যে মহীশূর বলিয়া কোনো স্বাধীনরাজ্য ছিল। ১৮৮১

সালে মহীশূর সিংহাসনে পুনরায় প্রাচীন হিন্দু রাজবংশকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ইংরাজ সকলের শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন।

মহীশূরের রাজধানী মহীশূর তবে বাঙ্গলোরই রাষ্ট্রীয় কাজ কর্মের প্রধান কেন্দ্র। মহারাজাই রাজ্যের সর্বময় কর্তা; কিন্তু শাসন কার্য্যের তত্ত্বাবধান দেওয়ান ও তিনজন সভ্যের উপর ন্যস্ত। রাষ্ট্রীয় বিচারের মীমাংসের ভার মহারাজ নিজের হাতে না রাখিয়া তিনজন জজের উপর তাহার শেষ নিষ্পত্তিভার সমর্পণ করিয়াছেন।

বৎসরে দুইবার করিয়া একটি প্রতিনিধি সভা মহীশূরে মিলিত হয়।

প্রতিনিধি সভা।

সর্ব শ্রেণীর লোকের নিজ নিজ স্বার্থরক্ষার জন্য এই প্রতিনিধি সভা আহূত হইয়া থাকে। আশ্বিনমাসের প্রতিনিধি সভায় দেওয়ান পূর্ববৎসরের আয় ব্যয়ের হিসাবনিকাশ দাখিল করেন এবং রাজ্যের মঙ্গলের জন্য শাসন প্রণালীর মধ্যে কি কি পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে তাহা আলোচনা করেন; দেশের লোকের অভিযোগ, আবেদন শোনা হয় এবং তা লইয়া আলোচনা ও তর্কবিতর্ক চলে। বৈশাখের সভায় আগামী বৎসরের ভাবী আয়ব্যয়ের খশড়া হিসাব বা বাজেট প্রতিনিধিদের নিকট উপস্থিত করা হয়। লোকে এখানে তাহাদের মতামত প্রকাশ করে। আশ্বিনের সভায় সময়াভাবে যে সকল বিষয়ের আলোচনা হয় নাই সেগুলি নূতন প্রস্তাব সমূহের সহিত ভাল করিয়া আলোচিত হয়। এ ছাড়া আর একটী ব্যবস্থাপক সভা আছে।

ব্যবস্থাপক সভা।

ইহার সভ্য সংখ্যা ২৫। ইহার মধ্যে ১২ জন সরকারী ও ১৩ জন বে-সরকারী সভ্য (৮ জন নির্বাচিত, ৫ জন মনোনীত)। আমাদের ব্যবস্থাপক সভায় যেমন প্রশ্ন করিতে পারা যায় এখানকার সভাতেও সভ্যগণ রাষ্ট্রীয় আয় ব্যয়, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে প্রশ্ন করিতে পারেন। এই অধিকার পাওয়াতে প্রজাদের

যে কত সুবিধা হইয়াছে তাহা বলা বাহুল্য। রাষ্ট্র পরিচালনার সুবিধার জন্য বিবিধ বিভাগে কাজগুলিকে ভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

মহীশূর রাজ্য ৮টী জেলা বা ৬৮টি তালুকে বিভক্ত। প্রত্যেক জেলা এক একজন ডেপুটি-কমিশনার বা ম্যাজিষ্ট্রেটের অধীন এবং প্রত্যেক তালুক একজন আমিলদার বা ডেপুটি-ম্যাজিষ্ট্রেটের তত্ত্বাবধানে শাসিত হয়। সরকারী ৩৬৮০ জন সৈনিক আছে।

মহীশূর রাজ ব্রিটীশরাজকে বৎসরে ৩৫ লক্ষ টাকা নগদ রাজকর রূপে দিয়া থাকেন। ১৯১৭ সালে মহীশূরের আয় হইয়াছিল ২,৯৩ লক্ষ ও ব্যয় ২,৯২ লক্ষ টাকা।

মহীশূর সরকার দেশের আর্থিক উন্নতি করিবার জন্য খুবই চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছেন। ১৯১১ সালে দেশের যথার্থ উন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া মহারাজ এক নূতন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। ইহাতে দেশের জ্ঞানী, গুণী, বণিক, মহাজন, শিল্পী, সরকারের কর্মচারীগণ মিলিত হন এবং দেশের শিক্ষা, শিল্প, ব্যবসার সম্বন্ধে আলোচনা করেন। মহারাজের জন্মদিনের উৎসবের সময়ে এই সভা বৎসরে একবার করিয়া মহীশূরে মিলিত হয়। দেওয়ান বাহাদুর এই সভার স্থায়ী সভাপতি। তিনটি শাখায় এই সভার কার্য্য বিভক্ত যথাঃ—কৃষি, শিক্ষা ও শিল্প-বাণিজ্য। প্রতি জেলায় উপর্য্যুক্ত বিষয়গুলির উন্নতি সাধনের জন্য পৃথক পৃথক প্রতিষ্ঠান আছে। ঐ সকল বিষয়ে কিরূপ উন্নতি হইতেছে তাহা লিপিবদ্ধ করিবার জন্য প্রতি তালুকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমিতি আছে। এই কনফারেন্সের পৃষ্ঠপোষকতায় একখানি মাসিক ইংরাজী কাগজ বাহির হয় এবং কানাড়ী ভাষায় একখানি সাপ্তাহিক কাগজ বাহির হয়।

মহীশূর অর্থনৈতিক কনফারেন্স।

মহীশূরের শতকরা প্রায় ৭৫ জন লোক কৃষি করে। ধান, জোয়ার,

উৎপন্ন সামগ্রী ও কৃষি বিভাগ।

ছোলা, আক, তুলা, শন এখানকার প্রধান কৃষি-জাত সামগ্রী। মহীশূরের রেশম বিখ্যাত। এখানে প্রায় ২৮ হাজার একার জমিতে রেশমের জন্য তুঁত গাছের চাষ হয়। কৃষি-বিভাগ মোটেই অলসভাবে দিন কাটান না। তাঁহারা বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষির উন্নতি করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। হেবাল নামক স্থানে সকল প্রকার রবি শস্যের উন্নতির জন্য একটা খুব বড় ফার্ম আছে, তাহা ছাড়া অল্প বৃষ্টিতে যে সকল শস্য ও গাছপালা বাড়িতে পারে সেই শ্রেণীর উদ্ভিদ ও তুলার উন্নতির জন্য বিশেষ একটি ফার্ম আছে। অধিক বৃষ্টিতে কি কি গাছ ভাল হইতে পারে, আকের চাষের উন্নতি কেমন করিয়া হইতে পারে এজন্য দুইটি কেন্দ্রে পরীক্ষা চলিতেছে।

শিল্প ও বাণিজ্য।

১৯১৩ সালে মহীশূর সরকার শিল্প ও বাণিজ্যের একটি বিশেষ বিভাগ খোলেন। এই বিভাগের উদ্দেশ্য যে যাহারা শিল্প বিষয়ে কিছু জানিতে চায় তাহাদের সাহায্য করা। কোথায় কোন্ জিনিষ পাওয়া যায়, কেমন করিয়া পাওয়া যায়, কি দরে পাইলে সুবিধা হয়, ইত্যাদি সকল প্রকারের প্রশ্নের উত্তর তাঁহারা দিয়া থাকেন। কলকব্জা, যন্ত্রাদি কিনিতে যারা অক্ষম তাহাদিগকে টাকা ধার দিবার জন্য একটি শাখা আছে। দেশীয় রাজ্যগুলির মধ্যে শিল্পে ও বাণিজ্যে মহীশূর এখন সর্বশ্রেষ্ঠ। এখানে ২টি কাপড়ের কল, পশমের কল, তুলা পিঁজা কল (১২টি), তুলা-প্রেস (৩টি), রেশমের কল (৩টি) আছে। তাহা ছাড়া সাধারণ সভ্য মানুষের যাহা প্রয়োজন হয় তাহার অধিকাংশই এখন মহীশূরে তৈয়ারী হইতেছে। কিছুকালে পূর্বে চন্দন তৈলের একটি কারখানা স্থাপিত হয়, এখন সেই কারবারটি খুবই ভাল চলিতেছে। বাঁশ হইতে কাগজ তৈয়ারীর উপাদান প্রস্তুত করিবার জন্য একটি কোম্পানী সরকারের নিকট হইতে অনুমতি পাইয়াছে। কাঠ চোলাই, লোহার কাজও

শীঘ্রই আরম্ভ হইবে। বোতামের কারখানা খোলা হইয়াছে এবং সাবানের কারখানা যাহাতে ভাল করিয়া চালানো হয় তাহার ব্যবস্থা শীঘ্রই হইবে আশা করা যাইতেছে। সুকুমার শিল্পগুলির উন্নতিসাধনের জন্য একটি ডিপো খোলা হইয়াছে। কুটীর-শিল্প ভারতে প্রায় উঠিয়া গিয়াছে তাহার পুনরুদ্ধারের জন্য বাঙ্গালোরে বিশেষ একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে। মহীশূরে শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক একটি যাদুঘর আছে; এছাড়া জিলার প্রধান সহরগুলিতে যাদুঘর করিবার জন্য অর্থ ধার্য্য করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

১৯১৩ সালে সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত এক ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়; প্রধান প্রধান প্রায় সকল স্থানেই ইহার কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। এছাড়া দুইটি জেলা-ব্যাঙ্ক, ১৫টি-ফেডারেল ব্যাঙ্কিং, ৮০০ সমবায় সমিতি আছে। * এই সকল ব্যাঙ্ক ও সমবায় সমিতি হওয়ায় দেশের মধ্যে আত্মনির্ভরশীলতা. পরস্পরের সহিত যোগরক্ষা করিয়া কার্য্য ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ব্যাঙ্ক ও সমবায়।

এই সকল বাহিরের জিনিষের সহিত মানুষকে যথার্থভাবে বড় করিবার একমাত্র উপায় শিক্ষা; সেই শিক্ষা সঙ্গে সঙ্গে উন্নতি লাভ করিতেছে। ১৯১৬ সালে মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে বাঙ্গালোরের 'সেণ্ট্রাল কলেজ' ও মহীশূরের 'মহারাজা কলেজ' এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত হইয়াছে। শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রীদের শিক্ষার জন্য ২টি বিশেষ কলেজ আছে।

মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়।

* ১৯১৮-১৯ সালে মহীশূরে ১,২৩৩টি সমবায় সমিতির; ৭০,৯৮,৩২৭ টাকা মূলধন; মোট কারবার ২,৪২,৩১,৮৬৫ টাকা; লাভ ও ৩৮,৫০৪ টাকা; মোট রিজার্ভ ৪,৩৯,০৮৭ টাকা। Report of the Co-operative Societies in Mysore 1918-19; page 3.

প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের দিকে মহীশূর সরকারের দৃষ্টি আছে। বিশেষ ২ স্থানে শিক্ষা বাধ্যতামূলক হইয়াছে এবং প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে ইহা প্রায় দেশব্যাপী হইয়া দাঁড়াইবে। কৃষি বাণিজ্য ইঞ্জিনীয়ারিং এবং অন্যান্য টেক্‌নিক্যাল শিক্ষা দিবার জন্য বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। বয়স্ক লোকদের শিক্ষার ব্যবস্থা শিক্ষাবিভাগ করিতেছেন। ১৯১৬-১৭ সালে ৯৬৩৩টি সরকারী ও ১,১০৭টি বে-সরকারী বিদ্যালয় ছিল। প্রায় প্রত্যেক ২¼ বর্গ মাইলে ৫৩১ জন লোকের জন্য একটি করিয়া বিদ্যালয় আছে। মহীশূর শিক্ষাবিভাগের আর একটি বিশেষত্ব হইতেছে সংস্কৃত পুস্তক মুদ্রণ ও প্রচার। অনেক মহামূল্যবান্ পুস্তক রাজ-অর্থে প্রতিবৎসর মুদ্রিত হইতেছে। তাঁহাদের সংগৃহীত পুঁথির যে তালিকা ছাপা হইয়াছে তাহা সংস্কৃত পণ্ডিতদের খুবই উপকার সাধন করিয়াছে।

শিক্ষা বিস্তার।

কাশ্মীর।

দেশীয় লোকের কাছে কাশ্মীর জম্মু নামে পরিচিত। পঞ্জাবের সংলগ্ন দেশ ছাড়া সমগ্র কাশ্মীর পার্বত্য। থাকে থাকে পর্বত উঠিয়াছে, মাঝে মাঝে উপত্যকায় মানুষের বাস। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপত্যকায় বাস করিয়া নানা জাতির মধ্যে পৃথক পৃথক আচার ব্যবহার, রাষ্ট্রতন্ত্র গড়িয়া উঠিয়াছে। কাশ্মীরি, পঞ্জাবী, ও ডোগরী এ প্রদেশের প্রধান ভাষা; এ ছাড়া উপভাষা অনেক আছে। ১৯১১ সালে জনসংখ্যা লক্ষের কিছু উপর ছিল, ইহার মধ্যে অধিকাংশ মুসলমান; কাশ্মীর বিভাগে দশ হাজার লোকের মধ্যে ৫২৪ জন মাত্র হিন্দু, লদাক ও গিলগিটে দশ হাজারে ১০, হিন্দু অবশিষ্ট প্রায় সবই মুসলমান। হিন্দুদের মধ্যে ব্রাহ্মণ রাজপুত ক্ষত্রিয় ও ঠকারই প্রধান জাতি; প্রত্যেক জাতিই আবার অসংখ্য ক্ষুদ্র ২ উপ-

জাতিভাগ ও সামাজিক অবস্থা।

জাতিতে বিভক্ত। ডোগরা রাজপুত যুদ্ধবিদ্যায় ও সাহসিকতায় খুবই বিখ্যাত; জাতিভেদ, আচার ব্যবহার সম্বন্ধে তাহারা অত্যন্ত কড়া। কাশ্মীরের হিন্দুগণকে পণ্ডিত বলে। অশিক্ষিত হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সাধারণত যে বিদ্বেষ ভাব আজকাল দেখা যায় কাশ্মীরে এই উগ্রতা নাই। সেখানকার মুসলমানেরা উৎকটরূপে মুসলমান নহে, হিন্দু ও যথেষ্ট পরিমাণে হিন্দু নয়; সেইজন্য বিরোধ কম। কাশ্মীরি হিন্দুদের সহিত ভারতের অন্যান্য ক্ষত্রিয়দের বিবাহাদি সাধারণত হয় না।

কাশ্মীরের উপত্যকায় কৃষিই লোকের প্রধান উপজীবিকা। ধান গম ভুট্টা তামাকু জাফরণ যব আফিম তুলা প্রভৃতি নানাপ্রকার শস্য উৎপন্ন হয়। রাজ্যের বন বিভাগ খুবই বিস্তৃত এবং বহুমূল্য বৃক্ষ পাওয়া যায়। কাশ্মীরে শাল যে কেবল ভারতেই বিখ্যাত তা নয়, য়ুরোপে ও আমেরিকার সর্বত্র এই সামগ্রীর আদর দেখা যায়। এ ছাড়া কাশ্মীরের শিল্পের কাজ ও বর্তমানে খুবই খ্যাতি লাভ করিয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় পৃথিবীর মধ্যে সর্ব প্রধান শিল্পের কারখানা ১৯১২ সালে আগুনে পুড়িয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

উপজীবিকা।

কাশ্মীরকে ভারতের নন্দন কানন বলা হয়; কাশ্মীরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য চিরকাল রসজ্ঞ লোকদিগকে টানিয়াছে। মোগল সম্রাট্‌গণ সেখানে বহুবার গিয়াছেন; শ্রীনগরের হ্রদের তীরে সাহজাহান মর্ম্মর প্রস্তরের গৃহ, চত্বরাদি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন তাহা এখনো বিদ্যমান রহিয়াছে। য়ুরোপ ও আমেরিকা হইতে কত পরিব্রাজক কেবলমাত্র কাশ্মীর দেখিবার জন্যই আসিয়া থাকেন। কিন্তু এখানকার পথ ঘাট মোটেই এদেশের মত নয়। সমতলের উপর মাত্র ১২ মাইল রেল আছে, আর ৮৪ হাজার বর্গ মাইল পরিমাণের প্রকাণ্ড রাজ্যে আর রেল নাই। বিতস্তাই একমাত্র নৌতার্য্য নদী; শ্রীনগরে বহু লোক নৌকাতেই বাস করে। মারী (Muree) পর্য্যন্ত

ভ্রমণ ও পথ।

রেল আছে, তাহার পর মোটর বা একা করিয়া শ্রীনগর পর্য্যন্ত যাওয়া যায়; কিন্তু ইহার পর আর ভিতরে প্রবেশ করা সহজ সাধ্য নয়। বহুকাল হইতে কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগর পর্য্যন্ত রেলপথ খুলিবার কথা চলিতেছে; মাঝে ২ শোনা যায় জামু হইতে রাজধানী পর্য্যন্ত দড়ির সাহায্যে গাড়ী চালাইবার পথ হইবে।

কাশ্মীরের ইতিহাস।

কাশ্মীরের ইতিহাস 'রাজরতঙ্গিনী' পণ্ডিত কহ্লনের লিখিত। দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই গ্রন্থ লিখিত হয়। বাংলা ভাষায় এই গ্রন্থের অনুবাদ হইয়াছে সুতরাং পাঠকগণ কাশ্মীরের ইতিহাস কিয়ৎপরিমাণ ইহা হইতে জানিতে পারেন। মুসলমানদের মধ্যে আকবরই প্রথম এই দেশ জয় করেন; কিন্তু ইতঃপূর্বে বহুবার পাঠান ও অন্যান্য মুসলমান রাজারা এদেশ আক্রমণ করিয়া এখানকার অনেক প্রাচীন কীর্ত্তি ধ্বংস করিয়াছিলেন। সিকান্দর সাহের সময়ে কাশ্মীরের অধিকাংশই এক প্রকার মুসলমান হইয়া যায়। আকবরের উদারনীতির ফলে এই উপত্যকার ক্রমোন্নতি আরম্ভ হয়; তিনি স্বয়ং তিনবার কাশ্মীরে গিয়াছিলেন। জাহাঙ্গীর ইহার সৌন্দর্য্য বর্দ্ধনের যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন; কিন্তু আরঙজেবের পর ভারত ব্যাপী যে বিশৃঙ্খলা আরম্ভ হয় কাশ্মীরও উহা হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীতে কাশ্মীরের সহিত দিল্লীর বাদসাহের সকল প্রকার বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়। ইহার পর ১৮১৯ সাল পর্য্যন্ত আফগনদের উৎপাতে ও পীড়নে কাশ্মীরের লোকেরা জর্জ্জরিত হইতে থাকে। শিখরাজা রণজিৎ সিংহ ঐ বৎসরে কাশ্মীর জয় করেন। গোলাব সিং নামক একজন ডোগ্‌রা রাজপুত জম্মুর রাজা ছিলেন; শিখদের তিনি নানা সময়ে সাহায্য করেন এবং কিছু কিছু জয় করিয়া তাঁহার রাজ্য ও শক্তি দুইই বাড়াইয়াছিলেন। কিন্তু রণজিতের মৃত্যুর পর ইংরাজ ও শিখদের মধ্যে যুদ্ধের সময়ে তিনি কোনো পক্ষই অবলম্বন করেন নাই। ১৮৪৬

সালের সোবরাঁওএর যুদ্ধের পর তিনি মধ্যস্থ থাকিয়া শান্তি স্থাপন করিলেন। এই জন্য ইংরাজ তাঁহার কাছ হইতে ৭৫ লক্ষ টাকা লইয়া বর্ত্তমান কাশ্মীর রাজ্য দিয়াদেন। এই রাজ্যরক্ষা করিতে তাঁহাকে সামান্য যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। রাজনৈতিক দিক হইতে কাশ্মীরের খুবই বিশেষত্ব আছে। তিব্বত, আফগানিস্থান, চীন, তাতার, ও রুশিয়া রাজ্যের সীমানা দূরে নয়। এই সকল কারণের জন্য ইংরাজ রেসিডেণ্ট, এজেণ্ট সীমান্তে পর্য্যন্ত আছেন। বর্ত্তমান মহারাজ স্যর প্রতাপ সিং ১৮৭৫ সালে সিংহাসনে বসেন। তাঁহার পুত্র যুবরাজ হরি সিং বর্ত্তমান রাজকার্য্য দেখেন।

রাজকার্য্য সুচারুরূপে চালাইবার জন্য কাশ্মীর চারিটি বিভাগে বিভক্ত। কিন্তু যথার্থ শাসক হইতেছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্ম্মচারী-তহশিলদাররা; পূর্ব্বেই বলিয়াছি কাশ্মীরের পথঘাট দুর্গম; কাজেকাজেই শ্রীনগরে বসিয়া সমগ্র দেশের শাসন-শৃঙ্খল চালনা করা খুবই কঠিন। ফলে দূরের গ্রামে বিচার ভাল না হইলে প্রতীকারের আশা কমই থাকে। কাশ্মীররাজের প্রায় সাত হাজার সৈন্য আছে তন্মধ্যে প্রায় সাড়েতিন হাজার ভারতীয় সার্বিস ট্রুপের অন্তর্গত।

শাসন ব্যবস্থা।

কাশ্মীরের আর্থিক অবস্থা বেশ ভাল; ৪৬ লক্ষ টাকা ভারতীয় গবর্ণমেণ্টের কাছেই গচ্ছিত আছে। রাজ্যের এত অর্থ অথচ দেশের উন্নতির জন্য সামান্যই ব্যয়িত হয়। শিক্ষা বিষয়ে কাশ্মীর সবচেয়ে পিছাইয়া আছে; এবং ১০০ জন লোকের মধ্যে ২ জন মাত্র লিখিতে পড়িতে পারে। ১৮৯১ সালে ৪৫টি বিদ্যালয় ছিল; ২০ বৎসর পরে ১৯১১ সালে ৩০৯টি হইয়াছিল।

শিক্ষার অভাব।

৫। জমি বন্দবস্ত

আমাদের দেশের ভূমির অধিকারী রাজা; সেই জন্য রাজার অপর নাম ভূস্বামী। তিনি সর্বপ্রধান জমিদার, প্রজারা তাঁহারই জমিতে চাষবাস করে এবং সেই জন্য রাজাকে খাজনা দেয়। আবার কেহ কেহ বলেন জমিতে প্রজার সত্ত্বই অধিক, তবে দেশরক্ষা ও রাজকার্য্যাদি চালাইবার জন্য প্রজার আয়ের কিয়দংশ সরকারকে দেওয়া তাহার ব্যক্তিগত ও সামাজিক স্বার্থ। কিন্তু তাহা বলিয়া রাজা সমস্ত জমির মালিক হইতে পারেন না।

জমির মালিক কে?

প্রাচীন হিন্দু সমাজে জমিজমা ও শাসনের মূল ভিত্তি ছিল গ্রাম; গ্রামের কোনো ব্যক্তিবিশেষের উপর এ শাসনের ভার অর্পিত ছিল না, সমগ্র গ্রাম গ্রামের শাসন ও রাজস্বের জন্য দায়ী। অধিপতি, নিকাশ-নবীষ, চৌকিদার, পুরোহিত, গুরুমহাশয়, গণক বা পাঠক, কর্মকার, সূত্রধর, রজক, নরসুন্দর, গোরক্ষক, চিকিৎসক, গায়ক প্রভৃতির উপর গ্রামের এই ভার অর্পিত ছিল। যোগ্যতা থাকিলে মণ্ডল বা মাতব্বরের পুত্র সে কার্য্য পাইত। রাজ-প্রতিনিধির হাতে মণ্ডলই গ্রামের খাজনা অর্পণ করিত। জমিদার শব্দটি পার্সী; মুসলমানদের পূর্বে এ শ্রেণীর লোক ছিল না।

হিন্দুযুগে

মুসলমান শাস্ত্রানুসারে শাসনকর্ত্তাই ভূমির একমাত্র সর্ব্বাধিকারী।

মুসলমান আমলে জমি বন্দবস্ত।

ভারতবর্ষের যে-যে স্থানে মুসলমান অধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল, সেই প্রদেশের ভূমির উপর বাদশাহের সত্ব স্থাপিত হইল। কৃষকগণের নিকট হইতে যাহা কিছু আদায় হইত তৎসমস্তই রাজস্ব, সমস্তই রাজকোষে প্রেরিত হইত। রাজা ভিন্ন অপর কেহ তাহার অংশীদার ছিল না।

রাজস্ব আদায় করিবার জন্য বহুবিধ কর্মচারী নিযুক্ত ছিল; যেমন আমিল, জমিদার, তালুকদার, ইত্যাদি। জমিদারগণ কেবলমাত্র রায়ত দিগের নিকট হইতে খাজনা আদায় করিয়া সুবাদারের হাতে সমর্পণ করিতেন; সুবাদার তাহা পুনরায় রাজধানীতে পাঠাইতেন। মুসলমান শাসনের ভাল সময়ে এই পরগণাদারী বন্দবস্ত বেশ চলিয়া ছিল। নিজ নিজ জমিদারীর প্রজাগণের মধ্যে বিবাদ জমিদারগণ মীমাংসা করিয়া দিতেন। সুতরাং প্রজাগণের রক্ষণাবেক্ষণ, জমিদারীর তত্ত্বাবধান ও রাজস্ব সংগ্রহের ভার জমিদারের উপর ন্যস্ত থাকিত। কিন্তু ভূমিতে তাঁহাদের কোনো সত্ত্বাধিকার ছিল না। মুসলমানদিগের প্রবল আধিপত্য কালে বাদশাহ ও প্রজার মধ্যে কোনো মধ্যসত্ত্বাধিকারী জাগিয়া উঠে নাই; কিন্তু রাজক্ষমতার ক্রমিক হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে অনেকে ক্ষমতাশালী হইয়া উঠেন ও এইরূপে প্রাচীন হিন্দু যুগের ন্যায় পুনরায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্তরাজের উদয় হয়। সেই হইতে আধুনিক জমিদার শ্রেণীর অভ্যুদয়। হিন্দুগণের প্রায় সমস্ত পদই বংশানুগত হইত বলিয়া এই জমিদার পদ্ধতিও কালক্রমে বংশানুগত হইয়া উঠিল।

মুসলমান আমলে মহামতি আকবরের সময়ে তাঁহার বিচক্ষণ হিন্দুমন্ত্রী তোডরমল্লের চেষ্টায় রাজস্বের ও জমি বিলির সুবন্দবস্ত হয়। ভূমি পরিমাপ করিবার জন্য "এলাকা গজ" নামে এক মানদণ্ড প্রচলিত করেন ও ভূমির উৎপাদিকা শক্তি অনুযায়ী উহা পুলি, পরবতী, চেঞ্চর ও বঞ্জর এই চারিশ্রেণীতে ভাগ করেন। তাঁহার সময়ে বাংলাদেশ ১৮টি সরকার

ও ৬৮২টি মহুলে বিভক্ত হয়। কিন্তু বাংলাদেশকে বেশীকাল অধীন রাখা মোগলদের পক্ষে খুবই কঠিন ব্যাপার ছিল। মোগল রাজধানী হইতে দূরে অবস্থিত বলিয়া এবং এখানকার নদীর গতি ও মতি চিরদিন সমান থাকে না বলিয়া এখানে একদল লোক সপ্তদশ শতাব্দীতে খুব পরাক্রমশালী হইয়া উঠেন; বাংলাদেশের ভুঁইয়ারা ইতিহাসে বিখ্যাত। মোগলদের সুখশান্তি ভাঙ্গিতে পশ্চিমে ছিল মরুভূমিবাসী রাজপুত, পূর্বে ছিল জলভূমি বাসী বাঙ্গালী, আর দক্ষিণে ছিল পাহাড়চর মহরাঠা।

ইংরাজেরা ১৭৫৭ সালে বাংলাদেশের নবাবকে পলাশীর যুদ্ধে হারাইয়া দিলেন। তারপর ১৭৬৫ সালে দিল্লীর বাদসাহের নিকট হইতে তাঁহারা এদেশের দেওয়ানী পাইলেন। বাংলাদেশের জমিদারগণের উপর যথা সময়ে খাজনা দেওয়ার ভার ন্যস্ত ছিল মাত্র তাহাতে তাঁহাদের স্থায়ীসত্ত্ব ছিল না। কিন্তু তথাচ তখন এখানে অনেকগুলি বনিয়াদী পরিবার নানা জায়গার জমিদার ছিলেন।

দেওয়ানী পাইয়া কোম্পানীর পরিচালকগণ কিছুতেই ঠিক করিতে পারিলেন না যে ভারতে কিরূপ ভূমি-বন্দবস্ত করিলে সব দিক বজায় থাকে। হেষ্টিংসের সময়ে রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য যে সকল পন্থা অবলম্বিত হইয়াছিল তাহা সে যুগে ও পরযুগে খুবই নিন্দিত হইয়াছে, তাহা সাধারণ ইতিহাস-পাঠক মাত্রেই জানেন। তিনি জমিদারী নিলামে চড়াইতেন এবং যে অধিক টাকা খাজনা দিবে বলিয়া প্রতিশ্রুত হইত তাহাকেই জমিদারী দিয়া দিতেন। নূতন মালিক জানিত আগামীবারে তাহার জমিদারী নিলামে চড়িতে পারে অতএব এই কয়দিনের মধ্যে যাহা করিয়া লওয়া যায় তাহাই লাভ। প্রজার সঙ্গে তাহার হৃদয়ের কোনো যোগ ছিল না। হেষ্টিংসের আদায় উশুল নিয়মকানুনের কড়াকড়ির ফলে অনেক বড় বড় পরিবার নষ্ট হয় প্রজারাও সর্বস্বান্ত হয়। অবশেষে ৭৬ এ মন্বন্তরে দেশের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ লোক ধ্বংস হয়। লর্ড কর্ণওয়ালিশ গভর্ণর

হইয়া আসিয়া লিখিলেন হিন্দুস্থানের এক-তৃতীয়াংশ ভাগ জঙ্গলে পরিণত হইয়াছে ও হিংস্র জন্তুর আবাসস্থান হইয়াছে।

ইংরাজেরা রাজস্ব আদায়ের সুনিয়ম করিবার জন্য প্রথমতঃ প্রত্যেক পরগণায় কোন মৌজায় বা গ্রামে কত খাজনা আদায় হয়, অর্থাৎ প্রজার নিকট হইতে পাওয়া যায়, তাহার পাঁচবৎসরের একটা হিসাব প্রস্তুত করান। এই হিসাবের উপর নির্ভর করিয়া ১৭৯০ ১লা ডিসেম্বর তারিখে লর্ড কর্ণওয়লিস্ বাংলাদেশের ভূস্বামীদিগের সহিত দশশালা বন্দবস্ত করিলেন। ১৭৯৩ সাল ২২ শে মার্চ তারিখে বাংলাদেশে ঘোষণা করা হয় যে নূতন বন্দবস্তে যে রাজস্ব ধার্য্য করা হইল তাহা কখনও বর্দ্ধিত বা পরিবর্ত্তিত হইবে না; জমিদার মহলের সত্বাধিকারী, সেই সত্ব পুরুষানুক্রমে উত্তরাধিকারীগণ পাইবে; জমিদার দান বিক্রয় উইল প্রভৃতি দ্বারা স্বীয় জমিদারী হস্তান্তর করিতে পারিবেন; জমিদার জমিদারীর যতই উন্নতি করুন না কেন সরকার সেজন্য কোনো অতিরিক্ত খাজনা চাহিবেন না।

গভর্ণমেণ্ট নিয়ম করিলেন যে রাজস্ব বাকী পড়িলে জমিদারী বিক্রয় করিয়া তাহা তুলিয়া লওয়া হইবে; নূতন ক্রেতা পূর্ব্বের ধার্য্য রাজস্বই দিতে থাকিবেন। জমিদার যদি তাঁহার অধীনে কোনো মধ্যস্বত্ব সৃষ্টি করেন তাহা হইলে তাহা দশবৎসরের অধিককালের জন্য স্থায়ী হইবে না। ইহাতে গভর্ণমেণ্টের সহিত জমিদারদের সম্বন্ধ স্থির ও পাকা হইল বটে, কিন্তু মধ্যস্বত্বের জন্য বা কৃষকদের স্থায়ী-বন্দবস্ত সম্বন্ধে কোনোই সুব্যবস্থা তখন হয় নাই। ১৮১৯ সালের আইনানুযায়ী জমিদারেরা তাঁহাদের অধীনে যে কোনো স্থায়ী স্বত্ব সৃষ্টি করিতে পারিবেন ঠিক হয়; এবং যথা সময়ে খাজনা জমিদারীর কাছারীতে না পাঠাইতে পারিলে পত্তনীদারদের পত্তনী বিক্রয় হইয়া যাইবে।

বাংলার জমিদার ও কৃষকের মধ্যে অনেক মধ্যস্বত্ব আছে। এক জমিতে

জমিদার এবং প্রজার মধ্যে বহুপ্রকার স্বত্বাধিকার থাকিতে পারে যথা,—

(ক)	জমিদার	দেয় রাজস্ব	৪০০০৲
(খ)	পত্তনীদার	জমিদারকে দেয় খাজনা	৫০০০৲
(গ)	দরপত্তনীদার	,,	৬০০০৲
(ঘ)	সে-পত্তনীদার	,,	৭০০০৲
(ঙ)	জোতদার বা গাঁতিদার	,,	৮০০০৲
(চ)	কৃষক প্রজা	,,	১২০০০৲

১৭৯৩ সাল হইতে ১৮৫৯ সাল পর্য্যন্ত জমিদার, মধ্যস্বত্ব ও কৃষকদের পরস্পর সম্বন্ধ বিষয়ক অনেক আইন জারী হয়। ১৮৫৯ সালের ১১ আইনই সবচেয়ে বিখ্যাত। গভর্ণমেণ্ট রাজস্ব আদায়ের জন্য বৎসরে চারিটা সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। ২৮শে জুন বা তৎপূর্বে, ২৮শে সেপ্টেম্বর বা তৎপূর্বে, ১২ই জানুয়ারি বা তৎপূর্বে এবং ২৮শে মার্চ বা তৎপূর্বে। সকল জমিদারকে নির্দ্দিষ্ট তারিখে খাজনা কলেক্টরীতে পাঠাইতে হয়, যথাসময়ে না দিতে পারিলে জমিদারী লাঠে ওঠে অর্থাৎ নিলামে চড়ে। শেষদিনের পরেও জরিমানা দিয়া রাজস্ব দেওয়া যায় তবে তাহা সম্পূর্ণরূপে কলেক্টর সাহেবের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। রাজস্ব আদায়ের এই আইনকে সূর্য্যাস্ত আইন (Sunset Law) বলে; অর্থাৎ নিরূপিত দিনের সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত টাকা খাজাঞ্চী খানায় গৃহীত হয়।

মধ্যস্বত্ব প্রজাসত্ব রক্ষা করিবার জন্য বহু আইন প্রণীত হইয়াছে। প্রথম ১৮৫৯ সালের ১১ আইন হয়; তারপর ঐ আইন পরিবর্ত্তিত করিয়া দশ বৎসর পরে ১৮৬৯ সালের ৮ আইন বা বেঙ্গল টেনান্সিঅ্যাক্ট্ বা প্রজা ভূম্যধিকারী সম্বন্ধীয় আইন পাশ হয়; ইহা পরিবর্ত্তিত হইয়া ১৮৮৫ সালের ৮ আইন হয়। এই আইনের ফলে প্রজাদের অনেক দুঃখ লাঘব হইয়াছে। কিন্তু সম্পূর্ণরূপে জমিদারদের খামখেয়াল এখনো দূর হয় নাই। কিছুকাল হইতে কাগজ পত্রে জমিদারদের বিরুদ্ধে আন্দোলন চলিতেছে।

নানাস্থানে রায়ত সভার অধিবেশন হইয়াছে এবং জমিদারদের সহিত চিরস্থায়ী বন্দবস্ত উঠাইয়া প্রজাদের সহিত প্রত্যক্ষভাবে বন্দবস্ত করিবার জন্য আন্দোলন চলিতেছে। জমিদারদের বিরুদ্ধে প্রজাদের যথেষ্ট অভিযোগ আছে; খাজনা ছাড়া ২০।২৫ প্রকারের বে-আইনী কর কোনো ২ জমিদার গ্রহণ করেন বলিয়া প্রকাশ। প্রজা ভূস্বামীর মধ্যে যাহাতে কোনো প্রকারের বিরোধ না ঘটে সেইজন্য গভর্ণমেণ্টের বিশেষ চেষ্টা। এই জন্যই জেলায় জেলায় সরকার সেটেলমেণ্ট বা ভূমির জরিপ বন্দবস্ত করিয়াছেন। ইহাতে প্রত্যেক প্রজার জমির বর্ণনা, চৌহদ্দী, স্বত্ব, খাজনা প্রভৃতি বিষয় নির্দ্ধারিত থাকে।

চিরস্থায়ী বন্দবস্তে বাংলাদেশে ৯১, ৮৯৫টি জমিদারী আছে এবং সরকারী আয় বার্ষিক ২, ১৫, ৩৮, ৩৩৮, টাকা।

বাংলাদেশের পর ১৮০১ সালে মান্দ্রাজ ইংরাজদের শাসনাধীন আসে। এখানকার ভূমিব্যবস্থা বাংলাদেশের চেয়ে জটিল ভাবে ইংরাজদের সমক্ষে প্রকাশিত হইল। এখানে প্রাচীন সময়ের তিন শ্রেণীর বন্দবস্ত ছিল।

(১) উত্তর-সরকারে জমিদারগণ, দক্ষিণ দেশীয় পলিগারগণ ও পাহাড়ী দেশে ছোট ছোট রাজারা ভূমির রাজস্ব সংগ্রহ করিতেন।

(২) কর্ণাট-প্রদেশের মিরাশ-গ্রাম আমাদের দেশের প্রাচীন আদর্শে গঠিত। এক একটি গ্রাম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাধারণ-তন্ত্রের ন্যায় নিজ শাসন সংরক্ষণ আয়-ব্যয়ের ব্যবস্থা সবই ভিতর হইতে করিত।

(৩) যেসব স্থানে পলিগারগণের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় নাই বা মিরাশি গ্রাম্য-তন্ত্র উদ্ভূত হয় নাই, সেখানেই প্রজারা একেবারে খোদ্ সরকারের কাছ হইতে জমি জমা ব্যবস্থা করিয়া লইত।

বাংলাদেশের জমিদার শ্রেণীর মত ভূস্বামীদিগকে মান্দ্রাজে পলিগার বলিত। তাহারা বহু শতাব্দী হইতে দাক্ষিণাত্যের অব্যবস্থা ও অত্যাচারের

মধ্যে প্রজাকে রক্ষা করিয়া আসিয়াছিল। কর্ণাটের নবাব ইংরাজ সৈন্যের সাহায্যে ইহাদের ধ্বংস সাধন করেন। বিলাত হইতে পরিচালকগণ মান্দ্রাজের শাসনকর্ত্তাকে লিখিলেন, "ইহাদের যেন ধ্বংস করা হয় না; তাহাদের এই নিদারুণ অবস্থা মনুষ্যত্বের দিক হইতে বড়ই নিন্দনীয় হইবে।" কিন্তু কর্ণাট-নবাব সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না। ইংরাজ তখনো রাজা হয় নাই; সুতরাং তাহারা সেখানে আর কি অধিক বলিতে পারে। অবশেষে পরিচালকগণ পুনরায় লিখিলেন শিল্পীগণকে ও বিশেষভাবে তন্তুবায়দিগকে যেন আশ্রয় দেওয়া হয়; পলিগারগণ তাহাদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন তাহাদের অভাবে শিল্প যেন ধ্বংস প্রাপ্ত না হয়। নবাবের মৃত্যুর পর ১৮৩১ সালে মান্দ্রাজ ইংরাজদের হাতে আসিল।

এইবার এখানকার ভূমি-বন্দবস্তের কথা উঠিল। ইতিপূর্বে লর্ড কর্ণওয়ালিস বাংলাদেশে চিরস্থায়ী বন্দবস্ত করিবার সময়ে মান্দ্রাজের উত্তর-সরকারের চিরস্থায়ী ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এই সময়কার গভর্ণর স্যর টমাস্ মন্‌রো খুব বিচক্ষণ কর্মবীর ছিলেন; তাঁহারই প্ররোচনায় ও জিদে মান্দ্রাজের প্রজাদের সহিত সরকারের খাস সম্বন্ধ স্থাপিত হইল। ইহাকে রায়তারী বন্দবস্ত বলে। তিনি প্রজাদের সহিত চিরস্থায়ী ব্যবস্থার পক্ষপাতী ছিলেন এবং রাজস্ব যাহাতে একেবারের মতো পাকাপাকি হইয়া যায় তাহাই তাঁহার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু পরে যতবার নূতন ২ সেটল্‌মেণ্ট বা বন্দবস্ত হইয়াছে প্রজাদের খাজনা ততবারই বাড়িয়াছে।

১৮১৭ সালে পেশোয়াদের পতনের পর বোম্বাই প্রদেশ ইংরাজদের করায়ত্ব হয়। মহারাষ্ট্রদের সময়ে বম্বেতে খুব সুন্দর ভূমি-ব্যবস্থা ছিল; মান্দ্রাজ বা অপর সকল স্থান হইতেই এখানকার গ্রাম্য শাসনতন্ত্র অনেক গুণে ভাল ছিল। এখানকার প্রথম গভর্ণর বিখ্যাত এল্‌ফিনষ্টোন সাহেব মহরাঠা দেশমুখ ও গ্রামপঞ্চায়েৎদিগকে পূর্বের ন্যায় রাখিবার পক্ষপাতী ছিলেন। এসব উঠাইয়া রায়তারী বন্দবস্তের তিনি বিরোধী ছিলেন বলিয়া তাঁহার

শাসনকালে প্রাচীন প্রতিষ্ঠানগুলি বজায় ছিল। কিন্তু কিছুকাল পরে এখানেও অস্থায়ী রায়তারী বন্দবস্ত প্রবর্ত্তিত হইল। ১৮৩৬ সালে প্রথম সেটেলমেণ্ট হয় তাহার পর ৩০ বৎসর অন্তর অন্তর ১৮৬৬, ১৮৯৬ সালে ভূমি ব্যবস্থা নূতন করিয়া হইয়াছে এবং প্রতিবৎসরই পূর্বতন বারের ব্যবস্থা হইতে খাজনা বৃদ্ধি করা হইয়াছে।

হিন্দুস্থান বা উত্তর ভারতবর্ষ নানা সময়ে ইংরাজদের হাতে আসিয়াছে। ১৮০১ সাল আগ্রা হইতে ১৮৫৬ সাল পর্য্যন্ত দিল্লী পঞ্জাব ও অযোধ্যা ইংরাজ রাজত্ব ভুক্ত হইয়াছে। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ যখন ইংরাজেরা অধিকার করেন তখন সেদেশে বড় বড় তালুকদার সর্বত্রই ছিল। গ্রাম্য-শাসনতন্ত্র তখনও বেশ এক প্রকার চলিতেছিল। এখন চিরস্থায়ী বন্দবস্তের কথা প্রথমে উত্থাপিত হয়। লর্ড কর্ণওয়ালিসের সময়ে কাশীতে বাংলার সঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দবস্ত হয়। লর্ড বেন্টিকের সময়ে ১৮৩৩ সালে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের ভূমি বন্দবস্ত হয় এবং ১৮৪৯ সালে পুনরায় ব্যবস্থা হয়। লর্ড ক্যানিং এ দেশেও চিরস্থায়ী ব্যবস্থা করিবার পক্ষপাতী ছিলেন; কিন্তু তাহা নানা কারণে বিশেষজ্ঞেরা পছন্দ করেন নাই।

ভারতবর্ষে স্থায়ী ও অস্থায়ী এই দুই প্রকারের ভূমি-বন্দবস্ত আছে।

১। জমির ও খাজনার স্থায়ী ব্যবস্থা বঙ্গদেশে লর্ড কর্ণওয়ালিসের সময়ে হয়; কাশী, বিহার, উড়িষ্যা ও মান্দ্রাজের উত্তরাংশেও পাকা বিধিব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হয়। প্রকৃত উড়িষ্যা ১৮০৩ সালে ইংরাজদের হাতে আসে এবং সেই সময়ে যে বন্দবস্ত হইয়াছিল তাহা ১৮৯৭ সাল পর্য্যন্ত চলিয়াছিল; তারপর ১৯০০ সাল হইতে নূতন ব্যবস্থানুসারে বন্দবস্ত অনুসারে খাজনা ৫২ হারে বাড়িয়া যায়। ১৮৫৯ সালে অযোধ্যার বিখ্যাত তালুকদারের সহিত জমির পাকা ব্যবস্থা হয়, কিন্তু রাজস্বের স্থায়ী বন্দবস্ত হয় নাই।

২। অস্থায়ী বন্দবস্ত দুই শ্রেণীর—

(ক) মহলবারী ব্যবস্থা—সমগ্র গ্রামের সহিত খাজনার ব্যবস্থা হয়। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ পঞ্জাব ও মধ্যপ্রদেশে এইরূপ সর্ত্ত। শেষোক্ত দেশ দ্বয়ে ২০ বৎসর অন্তর নূতন সেটেলমেণ্ট হয়। এই প্রথানুসারে সমগ্র গ্রামের খাজনা গ্রামের মণ্ডলদের হাত দিয়া কলেক্টরীতে যায়।

(খ) রায়তারী বন্দবস্ত—মান্দ্রাজ, বম্বে, বর্ম্মা ও আসামে রায়তারী বন্দবস্ত আছে। এখানে সরকারের সহিত প্রত্যেক প্রজার সম্বন্ধ—কোনো মধ্যবর্ত্তী জমিদার, তালুকদার এখানে নাই। রায়ত স্বয়ং কলেক্টারীতে খাজনা দিয়া আসে।

সমগ্র বৃটীশ ভারতের এক পঞ্চমাংশ স্থানে চিরস্থায়ী-বন্দবস্ত আছে। বাংলা-বিহারের ৫/৬ অংশ; আসামের ১/৮ অংশ; যুক্তপ্রদেশে ১/১০ অংশ; মান্দ্রাজে ১/৪ অংশে চিরস্থায়ী বন্দবস্ত, অপর অংশে অস্থায়ী ব্যবস্থা। ভারতের রাজস্বের শতকরা ৫৩ ভাগ চিরস্থায়ী ও মহলবারী ভূমি হইতে পাওয়া যায়; অবশিষ্ট ৪৭ ভাগ রায়তারী ভূমি হইতে উঠে।

চিরস্থায়ী বন্দবস্ত।

ভারতবর্ষের সর্বত্র চিরস্থায়ী বন্দবস্ত প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য অনেক লোকে বহুকাল হইতে অনেক আন্দোলন করিয়াছেন; কিন্তু সরকার বাহাদুর যে কেন সেসব কথায় কর্ণপাত করেন নাই তাহার কতকগুলি বিশেষ কারণ আছে। (১) সরকার ১৭৯৩ সালে যে রাজস্ব পাইতেন এখনো তাহাই পাইতেছেন; ইহার ফলে জমিদারগণের ভাগে প্রতি বৎসর ৪½ কোটি টাকা পড়িতেছে; অথচ ইহার যথার্থ মালিক সরকার এতগুলি টাকা হইতে বঞ্চিত হইতেছেন। (২) রাজস্বের এই ক্ষতি সরকার বাহাদুর অন্য জায়গা হইতে পোষাইয়া লইতেছেন। ফলে বাংলার বাহিরের প্রজাদের উপর খাজনার চাপ বেশী পড়িতেছে, অথচ বিনাশ্রমে

জমিদারগণ অনেক অর্থ পাইতেছেন। (৩) এই প্রভূত অর্থ জমিদারগণ জনহিতকর কাজে ব্যয় করেন না। কর্ণওয়ালিস আশা করিয়াছিলেন যে বাংলাদেশের জমিদারগণ নিজ নিজ গ্রামে বাস করিয়া গ্রামটিকে আদর্শ স্থান করিয়া তুলিবেন; তাঁহার জমিদারীর অন্তর্গত গ্রামসমূহের পথঘাট, জলাশয়, পুষ্করিণী, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্প সবদিকদিয়া উন্নতি লাভ করিবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় বাংলাদেশের জমিদারগণের দ্বারা এ আশা অনেকক্ষেত্রে পূরণ হয় নাই।

কিন্তু ইহার স্বপক্ষে বলিবারও কিছু আছে। (১) অন্যান্য প্রদেশে যেখানে কোনো পাকাপাকি বন্দবস্ত নাই রাজস্ব প্রতিবৎসরই হ্রাসবৃদ্ধি হয় সরকার জানিতে পারেন না কোন্ বৎসরে কি আয় হইবে; যে বৎসর অজন্মা হয় সে বৎসর সরকারকে খাজনা রদ করিতে হয়। কিন্তু বাংলা দেশের খাজনা বাঁধা। অজন্মা হইলেও সরকার নির্দ্দিষ্ট খাজনা পাইবেন। (২) অস্থায়ী-বন্দবস্ত-প্রদেশে ২০ বা ৩০ বৎসর অন্তর যে উৎপাত হয় তাহার স্থানে চিরস্থায়ী ব্যবস্থা করিলে কাহাকেও দুঃখ ভোগ করিতে হয় না। (৩) বাংলাদেশের জমিদারগণ যথেষ্ট পোড়োজমি আবাদ করিয়া থাকেন ও নূতন নূতন প্রজা বসাইয়া জলাজমি বা চর সাফ করাইয়া কৃষি সুরু করেন; ইহাতে জমিদারের লাভ হয়। কিন্তু বেতনভোগী সরকারী তহশীলদারগণ এমন প্রাণ দিয়া কার্য্য করিতে পারেন না; কারণ তাঁহাদের স্বার্থ এ সব ক্ষেত্রে খুব কম। (৪) বর্ত্তমানে গ্রামের লোকের কাছে যেটুকু বাহিরের খবর ও সভ্যতা পৌঁছায় তাহা জমিদারের কাছারী হইতে। বাংলাদেশের প্রায় জমিদারীতে পাঠশালা, স্কুল, দাতব্য-চিকিৎসালয় ও পোষ্ট আপিস আছে। জমিদারের বাড়ীর চণ্ডী-মণ্ডপ এখনো অনেক জায়গায় সামাজিক মজলিসের স্থান। এক কথায় বলিতে গেলে জমিদারের কাছারীবাড়ী গ্রামের সভ্যতার ও সামাজিক জীবনের কেন্দ্র। (৫) চিরস্থায়ী বন্দবস্তের ফলে বাংলাদেশে একদল ধনী সম্ভ্রান্ত লোক সরকার

ও সাধারণ লোকের মধ্যে উঠিয়াছেন যাঁহাদের দ্বারা সরকারের প্রভূত কল্যাণ হইতেছে। সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে, দেশের অন্যান্য অশান্তির সময়ে এবং গতযুদ্ধের জন্য সৈন্য সংগ্রহের সময়ে জমিদার ও তালুকদারগণ ব্রিটীশ রাজকে কিরূপ সাহায্যদান করিয়াছিলেন তাহা সরকারও স্বীকার করিয়া থাকেন। দেশে শিক্ষার প্রচার, স্বাস্থ্যোন্নতি, দুর্ভিক্ষদমন, সাহিত্য ও শিল্পকলার শ্রীবৃদ্ধি সমস্তই জমিদারগণের শুভ ইচ্ছার ফলেই হইয়াছে। (৬) এদেশের উত্তরাধিকার আইনে জ্যেষ্ঠপুত্র সর্বস্ব পাইবে এরূপ বিধি নাই, সকল পুত্রই সমান অংশ পায়। সেইজন্য বড় বড় জমিদারী কয়েক পুরুষের মধ্যে টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া যায় এবং মধ্যবিত্ত একশ্রেণীর লোক উঠিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে উচ্চ ভাব, উচ্চ আদর্শ, উচ্চ শিক্ষা প্রবেশ করায় দেশের অনেক কল্যাণ সাধিত হইয়াছে। বাংলাদেশে শিল্প বাণিজ্য অন্যান্য প্রদেশ হইতে পিছাইয়া থাকা সত্বেও অর্থে ও ঐশ্বর্য্যে যে সে কাহারও অপেক্ষা হীন নহে ইহার প্রধান কারণ বাংলাদেশের ভূমিকর একবারের মত ঠিক হইয়া যাওয়াতে জমিদারগণের হাতে যথেষ্ট টাকা জমিয়াছে। সরকারের হাতে সব টাকা গিয়া পড়ে না, কিছু টাকা জমিদার ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হাতে থাকিয়া যায়। কিন্তু রায়তারী ব্যবস্থাতে প্রজা ও সরকারের মাঝে আর কোথায়ও টাকা জমে না; ফলে সেসব স্থানে দুর্ভিক্ষ হইলে সরকারী সাহায্য পাইবার পূর্বে আর কোনো সহায়তালাভের উপায় থাকে না।

সমগ্র ভারতে চিরস্থায়ী বন্দবস্ত করিবার কথা বহুকাল হইতে চলিতেছে। ১৯০০ সালে স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় তৎকালীন বড়লাট লর্ড কর্জ্জনকে কয়েকখানি পত্রে ভারতের শোচনীয় আর্থিক অবস্থার কথা বহুযুক্তি ও প্রমাণের সহিত লিপিবদ্ধ করিয়া জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন যে সরকারী খাজনাদাবীর একটা কোথায় সীমা থাকা উচিত; সেট্‌লমেণ্ট আরও দীর্ঘকাল পরপর করিলে প্রজার সুবিধা হয়;

শস্যের মূল্য না বাড়িলে রাজস্ব বাড়িতে পারিবে না এবং কোনো প্রজা যদি মনে করে যে তাহার রাজস্ব অযথারূপে ধার্য্য করা হইয়াছে তবে সে আদালতে গিয়া নালিশ করিতে পারিবে। এইরূপ আরও কতকগুলি প্রস্তাব ও অনেকগুলি অভিযোগ তিনি উপস্থিত করিয়াছিলেন। সরকার প্রত্যেক প্রাদেশিক শাসনকেন্দ্রের নিকট হইতে নিজ নিজ প্রদেশের চাষীদের অবস্থা সত্যই মন্দ কি না তাহা জানিবার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করেন। তাঁহাদের চেষ্টার ফলে যাহা জানা যায় তাহতে তাঁহারা বলেন প্রজাদের অবস্থা তেমন শোচনীয় নহে; মুনফার শতকরা ৫০ ভাগের অধিক খাজনা কোথাও নাই, বরং কমই আছে; দীর্ঘকাল অন্তর সেটল্‌মেণ্ট ক্রমে ক্রমে প্রবর্ত্তিত হইতেছে; অধিক খাজনা ধরা ভারতের দুর্ভিক্ষের কারণ নহে; চিরস্থায়ী বন্দবস্তই দুর্ভিক্ষের প্রতিষেধক বলিয়া সরকার মনে করেন না। তবে যাহাতে প্রজাদের কষ্ট না হয় সে বিষয়ে তাঁহারা দৃষ্টি দিবেন একথা প্রতিশ্রুত হন। তবে এ বিবাদের মীমাংসা হয় নাই, একদল সরকারকে দোষী করেন আবার সরকার প্রতিবাদ করেন।

পূর্বেই বলিয়াছি ভারতে অস্থায়ী বন্দবস্ত জমি স্থায়ীর তুলনায় কম। অস্থায়ী শ্রেণীর মধ্যে মহলবারী-বন্দবস্ত অনুসারে ত্রিশবৎসরের মত জমির সেটলমেণ্ট হয় এবং তখন যে-খাজনা ধার্য্য হয় তাহা ঐ পর্বের মত পাকা। এই ব্যবস্থামত গ্রামের সমস্ত লোক এবং প্রত্যেক লোক ব্যক্তিগতভাবে দায়ী। গ্রামের মাতব্বরকে পশ্চিমাঞ্চলে 'নম্বরদার' বলে। সেই খাজনাপত্র যথাসময়ে কলেক্টরীতে পৌঁছাইয়া দিবার চুক্তি করিয়া লয়। সেটল্‌মেণ্ট অফিসার মহলের খাজনা প্রথমে ধার্য্য করিয়া দেন; পরে গ্রাম পঞ্চায়েৎ গ্রামের ব্যক্তিগত খাজনা ঠিক করিয়া দেয়; জমির দাম, শস্যের মূল্য ও পরিমাণাদি বিচার করিয়া খাজনা ঠিক হয়। তবে সে ধার্য্য ঠিক হইল কিনা তাহার চরম মীমাংসা সেইখানে হইয়া যায়।

পূর্বে সরকার প্রজার লাভের প্রায় ৯০ ভাগ ও লইতেন কিন্তু বম্বে ব্যতীত সর্বত্রই ৫০ ভাগের অধিক লওয়া হয় না।

উপর্যুক্ত খাজনা ছাড়া চাষীদের নিকট হইতে (১) পথ, পাঠশালা ও চিকিৎসা বলিয়া একটি কর বা সেস লওয়া হয়; (২) দ্বিতীয় সেস্ গ্রামের কর্মচারীদের পারিশ্রমিক, যেমন মাতব্বর নিকাশনবীশ চৌকি-দারের বেতন (৩) দুর্ভিক্ষের জন্য সংস্থান (১৯০৬ সালে উঠিয়া গিয়াছে)।

অযোধ্যার ভূমি বন্দবস্তের মধ্যে একটু বিশেষত্ব আছে। কয়েক খানি করিয়া গ্রাম লইয়া একটি তালুক সৃষ্টি করা হইয়াছে। সেই তালুকের খাজনা আদায়ের ভার ত্রিশবৎসরের জন্য তালুকদারের উপর ন্যস্ত হয়। তালুকদার রাজস্ব আদায় করিয়া সরকারের হাতে সমর্পণ করেন ও সরকার তাঁহার মন ও প্রাণ রক্ষার মত মুনফা দিয়া থাকেন। বাংলার জমিদারের তুলনায় তালুকদারের সম্মান ও স্থায়ীত্ব দুই কম হইবার কারণ তাঁহাদের স্থায়ীত্ব অনিশ্চিত এবং তালুকের উপর কোনো প্রকার অধিকারও তাঁহাদের নাই। এক হিসাবে ইহারা বড় রকমের গোমস্তা।

রায়তারী বন্দবস্তে স্বয়ং সরকারই জমিদার, চাষী-প্রজাদের সহিত জমিজমার তিনি ব্যবস্থা করেন। ইহাদের জমি কে কি সর্ত্তে লইয়াছে, কত করিয়া খাজনা ধার্য্য হইয়াছে, কতখানি কোন্ শ্রেণীর জমি আছে এই সমস্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লিপিবদ্ধ করা হইতেছে সেটল্‌মেন্ট বিভাগের কর্ত্তব্য। ভারতবর্ষের প্রায় অধিকাংশ স্থলেই প্রতি গ্রামের প্রত্যেকটি ক্ষেত, বিলের ম্যাপ সেটল্‌মেন্ট কর্ত্তৃক অঙ্কিত হইয়াছে। ইহা ইংরাজশাসনের সুদৃঢ় বিধি ব্যবস্থার আশ্চর্য্য ফল।

অস্থায়ী-বন্দবস্ত অনেকে পছন্দ করেন না তাহা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। ইহার কতকগুলি অসুবিধা আছে; (১) বিশ ত্রিশ বৎসর অন্তর রাজস্ব নির্ণয়ের জন্য যে তদারক চলে তাহাতে প্রজাদের

খুব অসুবিধা হয়। (২) সেটল্‌মেণ্টের সময়ে চাষীরা খাজনা বৃদ্ধির ভয়ে জমির অযত্ন করিতে আরম্ভ করে। সেটল্‌মেণ্টের নামে তাহাদের আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। ভয়ে অনেকে পয়সা কড়ি লুকাইয়া ফেলে, জমিজমাও ইচ্ছা করিয়া শ্রীহীন করিয়া ফেলে। (৩) কৃষকেরা সাহস করিয়া জমির উন্নতির জন্য বেশী পয়সা খরচ করিতে পারে না, সে জানে উন্নতি করিলেই তাহার খাজনা বাড়িবে। (৪) নিজের জিনিষ হইলে মানুষের কেমন একটা সহজ দরদ জন্মে; ত্রিশবৎসর ধরিয়া যে জমি খামার চাষী সযত্নে গড়িয়া তুলিতেছে তাহা তাহার বৃদ্ধ বয়সে নাও থাকিতে পারে একথা ভাবিয়া সে কখনো সুখী হইতে পারে না। (৫) রাজস্ব দিয়া প্রজার হাতে যাহা থাকে তাহাতে সুবৎসর চলিয়া যায় কিন্তু দুর্বৎসর কোনো মতেই চলে না। কিন্তু প্রজা ও সরকারের মধ্যে মধ্যবিত্ত কোনো লোক থাকিতে পারে না বলিয়া এসব দেশে কোনো বড় কাজে মূলধন পাওয়া কঠিন হয়।

জমিদার, তালুকদার বা মহাজনের হাত হইতে চাষীপ্রজারা যাহাতে রক্ষা পায় এজন্য ইংরাজ সরকার অনেক আইন জারী করিয়া এই অসংখ্য মূক মানবের নীরব আশীর্বাদ পাইয়াছেন।

জমিদারের সহিত সরকারের যেমন একটা পাকা রকমের ব্যবস্থা হইয়া গিয়াছে প্রজার সহিত জমিদারের তেমন কোনো কায়েমী বন্দবস্ত হয় নাই। খাজনা যতই বৃদ্ধি পাউক তাহার প্রতিবাদের বা বাধা দিবার কোনো উপায় ছিল না। চিরস্থায়ী বন্দবস্তের সময়ে জমিদারগণ প্রজাকে তাহার জমিজমার পরিমাণ ও সর্ত্তাদি উল্লেখ করিয়া এক "পাটা" লিখিয়া দিতেন ও তাহার নিকট হইতে ইহার এক 'কবুলয়ৎ' আদায় করিয়া লইতেন। কিন্তু কার্য্যত ইহা চলিত না এবং জমিদারগণ ইচ্ছা করিলেই যে কোনো প্রজার খাজনা বৃদ্ধি বা ভিটা ও জমি হইতে উচ্ছেদ করিতে পারিতেন, প্রজার আত্মরক্ষার কোনো উপায়ছিল না। ১৮৫৯ সালে জমিদারদের

এই খামখেয়ালী কাণ্ড বন্ধ করিয়া দিবার জন্য সরকার হইতে এক আইন পাশ হয়। সেই আইন অনুসারে বারবৎসর বাস বা চাষ করিলে জমিতে প্রজার পাকাসত্ব হইল এবং স্বেচ্ছামত খাজনা বাড়াইবার অধিকারও বন্ধ হইল। ১৮৮৫ সালে বেঙ্গল টেনান্সি আইনে প্রজাদের অধিকার ও সত্ব আরও পরিষ্কার করিয়া দেয়। ১৮৯৮ ও ১৯০৭ সালে আরও কতকগুলি আইন পাশ হয়। এইসব আইন পাশ হইবার ফলে জমির উপর প্রজার মন ও দরদ দুই বাড়িয়াছে। জমিদারদের উৎপাতে ১৮৭৭ সালে দেখা যায় বিহারের একটি জেলাতে স্থায়ী প্রজার সংখ্যা অতি সামান্যই ছিল; ১৯০০ সালে প্রজাদের শতকরা ৮৭ জন স্থায়ী হইয়াছিল।

১৮৮৬ সালে এক আইনে অযোধ্যাতে জমিদারদের প্রজাদিগকে উচ্ছেদ করিবার বা অযথা করবৃদ্ধির ক্ষমতা সঙ্কুচিত করা হয়। পঞ্জাবে দরিদ্রতার জন্য প্রজারা ক্রমেই মহাজনের হাতের মধ্যে পড়িতেছিল এবং কৃষকেরা ক্রমেই দিনমজুরে পরিণত হইয়া যাইতেছিল। মহাজনগণ জমির মালিক হইয়া কৃষকদিগকে মজুরের ন্যায় খাটাইয়া স্বয়ং মুনাফা পাইয়া থাকেন। লর্ড কর্জ্জনের সময়ে এক আইন জারী হয় যাহাতে টাকার জন্য প্রজার জমি নিলাম হইবার নিয়ম বন্ধ হইয়া যায়। এইরূপ বহু আইনের দ্বারা প্রজাদিগকে রক্ষা করা হইতেছে।

৬। আয়-ব্যয়

আয়

দেশের সুশাসনের জন্য যে অর্থের প্রয়োজন হয় তাহা রাজার ন্যায্য প্রাপ্য। ইহাকে রাজস্ব বলে। প্রাচীনকালে হিন্দুরাজগণ প্রজার নিকট হইতে আয়ের কুড়ির একভাগ কখনো বা বার বা ছয় ভাগের একভাগ পর্য্যন্ত রাজস্ব লইতেন। সে যুগে ভূমিকর ছিল রাজার প্রধান আয়। এখনো ভূমিকর হইতে বৃটীশভারতে বৃটীশ রাজের সবচেয়ে বেশী আয়। যে কয়টি উপায়ে রাজস্ব আদায় হয় প্রথমে তাহারই তালিকা দিতেছি, পরে তাহার বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিব। (১) ভূমিকর (২) করদ রাজ্যের কর (৩) অরণ্য, গোচারণ ভূমি, খনির ইজারার কর (৪) আফিম (৫) লবণ (৬) মাদক পদার্থ বা আবগারী (৭) বাণিজ্য-শুল্ক (৮) ইন্‌কম ট্যাক্স বা আয়কর (৯) প্রাদেশিক কর রাস্তাসেস, জলসেস্ প্রভৃতি (১০) ষ্ট্যাম্পের আয় (১১) দলিলাদি রেজিষ্টারী ফি (১২) রেলওয়ে, খাল, ডাক, তার প্রভৃতি, জনহিতকর কার্য্য হইতে সরকারী লাভ (১৩) ট্যাকশাল (১৪) বিবিধ।

ভূমিকর।

ভূমিকর সরকারের প্রথম ও প্রধান আয়; বাৎসরিক প্রায় ৩১ কোটি টাকা এই বাবদ আদায় হয়; ভারতের সকল প্রকার আয়ের প্রায় সিকি এই ভূমিকর। গত ২৫ বৎসরের ভূমিকর প্রায় ১০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। বাংলাদেশে চিরস্থায়ী বন্দবস্ত বলিয়া এখানকার কৃষকদের উপর ইহার ঝুঁকি বিশেষ নাই।

আফিম সরকারের একচেটিয়া কারবার; আফিম বিক্রয় করিতে হইলে গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে লাইসেন্স বা পাশ লইতে হয়; নতুবা কাহারও কাছে অসঙ্গত পরিমাণ আফিম থাকিলে তাহাকে পুলিস সোপারদ্দ করা হয়।

আফিম।

ভারতের মধ্যে বিহার ও মালব আফিম চাষের প্রধান স্থান। বিহার অঞ্চলে সরকার হইতে চাষীদের দাদন দিয়া আফিমের চাষ করানো হয়; চুক্তি অনুসারে সের প্রতি ৭।৷৹ টাকা দাম দেওয়া হয়। গাজীপুরে সরকারের আফিমের এক ফাক্টারী আছে; সেখানে সমস্ত আফিম প্রথমে জড় করা হয়। পরে দেশের নানাস্থানে চালান ও বিদেশে রপ্তানি করিবার মতো পৃথক্ পৃথক্ বাক্সে বন্ধ করা হয়।

'মালব' আফিম সাধারণত ইন্দোর, গবালিয়ার ভোপাল, জাওরা, ধর, রাতলাম, মেবার, কোটা প্রভৃতি করদ রাজ্যে উৎপন্ন হয়। মালব আফিম রপ্তানীর বন্দর বম্বে। বৃটীশ সরকারের রাজ্যের মধ্যদিয়া যাইতে হয় বলিয়া প্রতিসিন্ধুক পিছু পূর্বে ৬০০৲ টাকা ও বর্ত্তমানে ১২০০৲ টাকা শুল্ক দিতে হয়।

কয়েক বৎসর পূর্বেও আফিমের চাষ ও বাণিজ্য ছিল। ইহার প্রধান খরিদ্দার ছিল চীন। কিন্তু এই জগতবিদিত 'চণ্ডুখোর' চীন জাতির মধ্যে নবজীবনের সাড়া পড়ায় তাহারা আফিম খাওয়া ত্যাগ করিয়াছে। ১৯১৩ সালে চীনসরকার আফিমের আমদানী একেবারে বন্ধ করিয়াছেন। তখন সাংহাই হংকং এর বন্দরে হাজার হাজার বাক্স আফিম মজুত। ভারত গভর্ণমেণ্টে অগত্যা প্রায় ১১ হাজার বাক্স আফিম কিনিয়া চারিদিকের আসন্ন গণ্ডগোল নিটাইয়া দিলেন। ১৯১৬-১৭ সালে মাত্র ৮,৭১০ বাক্স বিদেশে রপ্তানী হয়; ইতিপূর্বে এত কম আফিম বিক্রয় কখনো হয় নাই। ফলে বিহারের আফিমের চাষ উঠিয়া গিয়াছে ও অন্যান্য স্থানে ইহার চাষ কমিয়াছে।

রাজস্বের ক্ষতি।

১৮৯০ সালে চীনে ৭৮,৩৬০ বাক্স ১৯১১ সালে ৩০,৬০০ বাক্স ও ১৯১৬ রপ্তানী একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। ইহাতে ভারতসরকারের রাজস্বের অত্যন্ত ক্ষতি হইয়াছে। ১৯১৭-১৮ সালে আফিম হইতে সরকারী আয় হইয়াছিল ১,৬৭,২৭,০০০ টাকা। এবৎসরে ইহা অপেক্ষা কিছু বেশী হইবে বলিয়া অনুমান হইতেছে।

লবণের সরবরাহ।

লবণের উপর শুল্ক ভারতে ইংরাজ আসিবার পূর্বেও ছিল। ভারতে চারি উপায়ে লবণ পাওয়া যায়। (১) পঞ্জাবের সল্ট্ পর্বত-শ্রেণী ও কোহাটের সৈন্ধব লবণের খনি (২) রাজপুতনার মধ্যস্থিত সম্বর হ্রদের লবণ (৩) গুজরাটের কচ্ছের রণ হ্রদের পাশে জমাট-বাধা লবণ ও (৪) বম্বে, মাদ্রাস ও সিন্ধুর মোহনায় সমুদ্র জলের লবণ।

লবণ সংগ্রহের উপায়

পঞ্জাবের লবণ পাহাড়ে অফুরন্ত সৈন্ধব পাথর পাওয়া যায়। লবণের স্তরে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গহ্বর কাটিয়া এই লবণ তোলা হয়। রাজপুতনার সম্বর হ্রদে বছরে নয়মাস কাজ চলে; বর্ষাকালে হ্রদে জল বাড়ে তখন কাজ করা যায় না। হ্রদের মাঝে মাঝে বাঁধ দিয়া চৌবাচ্ছা বানানো হয়। সেই জলের উপর সরের মত করিয়া লবণ জমাট বাঁধে। কচ্ছের রণসাগরেও অনেকটা উপর্য্যুক্ত উপায়ে লবণ সংগ্রহ করা হয়। বম্বে ও মাদ্রাস প্রদেশে সমুদ্রের তীরে খাল কাটিয়া লোণাজল আনা হয় এবং সেই জল শুকাইয়া লোকে লবণ করে। ভারতের অধিকাংশ স্থলে এই লবণ ব্যবহৃত হয়। নদীবহুল বাংলাদেশের ভিজামাটিতে সমুদ্রের জল হইতে লবণ করা যায় না বলিয়া এখানে লিভারপুল, জারমেনী ও এডেন হইতে বিদেশী লবণের আমদানী অধিক।

ভারতের প্রায় অর্দ্ধেক লবণ সরকারী লোকেরা তৈয়ারী করে। অবশিষ্ট অর্দ্ধেক লাইসেন্স প্রাপ্ত লোকে বা আবগারী বিভাগের তত্ত্বাবধানে

লবণ কর।

হয়। লবণ গভর্ণমেন্টের একচেটিয়া বলিয়া ইহার উপর শুল্ক আছে। ইহার উপরে শুল্ক থাকায় ধনী নির্ধন সকলকেই এই কর দিতে হয়। ১৮৮২ হইতে ১৯০৩ সাল পর্য্যন্ত লবণের কর মণপ্রতি ২৷৷০ টাকা ছিল। ১৯০০ সাল হইতে গোখ্‌লে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় এই লইয়া খুবই আন্দোলন চালাইতে থাকেন এবং তাঁহার চেষ্টার ফলে ঐ বৎসরে শুল্ক ২৲, ১৯০৫ এ ১৷৷০, ও পরে ১৯০৭ সালে ১৲ টাকায় পরিণত হয়। যুদ্ধের সময়ে রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য লবণের শুল্ক পুনরায় বাড়াইয়া ১।০ করা হয়। লবণের শুল্ক হ্রাস বৃদ্ধির ইতিহাসে দেখা গিয়াছে যে যখনই লবণের দাম কমিয়াছে তখনই ইহার ব্যবহার বাড়িয়াছে। ইহা হইতে বার্ষিক আয় প্রায় ৫ লক্ষ টাকা হয়।

আবগারী বিভাগ।

মদ, গাঁজা, গুলি, চরস, ভাঙ, আফিম প্রভৃতি সকল প্রকার মাদক পদার্থ আবগারী বিভাগের অন্তর্গত। আফিম আবগারীর মধ্যে পড়িলেও আফিমকে পৃথক করিয়া ধরা হয়। সরকার প্রতিবৎসর আবগারী বিভাগ হইতে প্রায় ১৩ কোটি টাকা আয় করেন এবং এই আয় বরাবরই বাড়িয়া চলিতেছে। ইহা দেখিয়া দেশের চিন্তাশীল লোকেরা খুবই ভীত হইয়া উঠিতেছেন; সরকার বলেন শুল্ক বৃদ্ধি করিলে লোকে মদ কম খাইবে। কিন্তু যে পরিমাণ মদ দেশে তৈয়ারী ও বিদেশ হইতে আমদানী হয় তাহা দেখিয়া কাহারও মনে হয় না যে এই অভ্যাস দেশমধ্যে কমিতেছে। ভূমিকরের পরেই সরকারের সবচেয়ে বেশী আয় আবগারী হইতে হয়। মাদক দ্রব্য বিক্রয় করিতে হইলে লাইসেন্স লইতে হয় এবং প্রতিবৎসর সরকারকে সেজন্য টাকা দিতে হয়। দেশীয় ভাঁটিয়ারেরা মদ চোলাইএর জন্য টাকা দেয়। এই দুই উপায়ে সরকারের বৎসরে ১৫ কোটি টাকা হয়।

দেশের আমদানী ও রপ্তানী মালের উপর যে শুল্ক সরকার ধার্য্য করেন তাহা কেবলমাত্র রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য, দেশের শিল্পবাণিজ্য রক্ষা বা বিদেশের বাণিজ্য বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে নয়। তাঁহারা বলেন এক পক্ষের লাভ আর একপক্ষের লোকসান হয় এমন কোনো অভিপ্রায় এই বাণিজ্য শুল্ক স্থাপিত হয় নাই।

বাণিজ্যশুল্ক।

আমদানী শুল্ক দেশের অবস্থান্তরের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। সিপাহী বিদ্রোহের পূর্বে আমদানী সামগ্রীর দামের শতকরা ৫৲ টাকা হারে শুল্ক দিতে হইত। তারপর বৃটীশ পার্লামেন্টের হাতে ভারত শাসনের ভার যখন অর্পিত হইল তখন ভারত সরকারের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়; সেই সময়ে জিনিষ বুঝিয়া শুল্ক শতকরা ১০ হইতে ২০ টাকা পর্য্যন্ত ধার্য্য করা হয়। ১৮৭৫ সালে শুল্ক কমাইয়া পুনরায় ৫৲ টাকা করা হয়। এই সময়ে ভারতের দেশীয় কাপড়ের মিলগুলি উন্নতি আরম্ভ করিতে থাকিলে ইংলণ্ডের ম্যানচেষ্টারের কল-ওয়ালারা খুব সরগোল তোলে কারণ তাহারা এদেশে যে কাপড় পাঠাইত তাহার উপর শতকরা ৫৲ টাকা কর দিতে হইত। অবশেষে ১৮৮২ সালে ভারত গভর্ণমেন্ট সমগ্র আমদানী শুল্ক একেবারে উঠাইয়া দিলেন। ইহাতে রাজস্বের খুব ক্ষতি হইতে লাগিল। ১৮৯৫ সালে ভারত সরকার নিরুপায় হইয়া পুনরায় শতকরা ৫৲ টাকা করিয়া শুল্ক বসাইলেন, তবে বিলাতী সুতা ও কাপড় চোপড়ের উপর শুল্ক রদ হইল। ম্যানচেষ্টারের কাপড়ওয়ালাদের জিদ্ বজায় রহিল। কিন্তু রাজস্বের অবস্থা এই সময় খুব অসচ্ছল হওয়ায় সরকার নূতন আয়ের জন্য চারিদিকে হাত বাড়াইতে লাগিলেন ও অবশেষে পুনরায় কাপড় চোপড়ের উপর শতকর ৩½% টাকা হারে শুল্ক বসাইলেন, সেই সঙ্গে দেশীয় মিলের উৎপন্ন কাপড়ের উপর ও ৩½ টাকা করিয়া ট্যাক্স ধার্য্য হইল। দেশীয় তাঁতিদের কাপড় ইহা হইতে বাদ পড়িল। দেশীয়

মিলের উপর এই ট্যাক্স ভারতে অত্যন্ত অপ্রিয় হইয়া উঠে। ১৯১৬ সালে বিদেশী সমস্ত আমদানী জিনিষের উপর সাধারণভাবে শুল্ক বৃদ্ধি করা হয়; সেই সময়ে বিদেশী কাপড়ের উপর ৭½ টাকা শুল্ক হয়; ভারতীয় মিলের উপর পূর্বের ন্যায় ৩½ থাকিল। যুদ্ধের সময়ে এই শুল্ক তালিকা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত করায় সরকারের আয় যথেষ্ট বৃদ্ধি হইয়াছে। যুদ্ধের পূর্বে শুল্ক হইতে আয় গড়ে ৯ কোটি টাকা ছিল; ১৯১৬-১৭ সালে ১৩ কোটি টাকা, ১৮-১৯ সালে শুল্ক হইতে ১৮ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছিল। ইহার মধ্যে আমদানী শুল্ক হইতে ১৩ কোটি ৫৭ লক্ষ; রপ্তানী শুল্ক হইতে ৩ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকা ও ভারতের বয়নশিল্প হইতে ১ কোটি ৪৩ লক্ষ আয় হয়।

কাঁচামাল রপ্তানীর উপর সামান্য কর আছে; চালের উপর মণপ্রতি তিন আনা, চায়ের উপর পাউণ্ড প্রতি সিকি পাই করিয়া শুল্ক ধার্য্য আছে; চায়ের শুল্ক হইতে যে আয় হয় তাহা চা-বাগিচার উন্নতির জন্য দেওয়া হয় সাধারণ তহবিলে যায় না।

আয়কর।

সিপাহী বিদ্রোহের পর ভারতীয় অর্থ ভাণ্ডারের অবস্থা খুবই শোচনীয় হয়। সেই অভাব পুরণের জন্য সরকার বাহাদুর রাজস্ব বৃদ্ধির নানাপ্রকার চেষ্টা করিয়াছিলেন; তার মধ্যে এই আয়কর স্থাপন একটি। ৫০০৲ টাকার উপর যে ব্যক্তির আয় তাহাকে শতকরা ৪৲টাকা করিয়া কর দিতে হইত; অর্থাৎ যে বক্তির আয় ছিল বার্ষিক ৫০০৲ তাহাকে আয়-কর দিতে হইত বছরে ২০৲ টাকা। ১৮৬০ সালে প্রথম এই কর স্থাপিত হয়। সময়ে সময়ে কাহারা কি পরিমাণে আয়কর দিবে, তাহার তালিকা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে ও ১৮৮৬ সালে যে তালিকা হয় তাহা যুদ্ধের সময় পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। ২০০০৲ টাকার আয়ে টাকায় ৫ পাই, তার নীচে টাকায় ৪ পাই করিয়া দিতে হয়। জমিদার ও

চাষীদের এই আয়কর দিতে হয় না; তাছাড়া গভর্ণমেন্টের কর্মচারী, আইন ব্যবসায়ী, শিক্ষক প্রভৃতি সকলকেই এই কর দিতে হয়। ১৯০৬ সালে ৫০০৲ টাকা হইতে ১০০০৲ টাকার আয়ের উপর এই কর ধার্য্য করা হইল। বিলাতে ১৬০ পাউণ্ড বা ২৪৮০৲ টাকার কম যাহার আয় তাহাকে এই কর দিতে হয় না। যুদ্ধের পূর্বে এই বিভাগ হইতে আয় ছিল প্রায় ৩ কোটি টাকা। ভারতবর্ষ যে কত দরিদ্র তাহা সহজেই বুঝা যায়; ত্রিশকোটি লোকের মধ্যে ১০০০৲ টাকার উপর বার্ষিক আয় এমন লোকের সংখ্যা যে কত কম তাহা এই সামান্য আয় কর হইতে বুঝা যায়। ইহার মধ্যে উচ্চ-সাহেব কর্মচারীরাও পড়েন।

১৯১৬ সালে যখন সরকার দেখিলেন যুদ্ধ সহজে থামিতেছে না এবং রাজস্ববৃদ্ধি না করিলে চারিদিকের খরচ চালানো অসম্ভব, তখন তাঁহারা পুনরায় আয়করের তালিকা বদলাইলেন। পূর্বে দুই হাজারের উপর যাহাদের বার্ষিক আয় ছিল তাহাদিগকে বার্ষিক টাকায় ৫ পাই দিতে হইত। নূতন বিধি অনুসারে ৫ হাজার আয়ের উপর টাকায় ৬ পাই, ১০ হাজারের উপর টাকায় ৯ পাই, ২৫ হাজারের উপর টাকায় ১ আনা কর সাব্যস্ত হইল।

১৯১৭ সালে পুনরায় অতিরিক্ত কর আদায়ের ব্যবস্থা হয়। পূর্বোল্লিখিত করের উপর এই কর দিতে হইতেছে। ৫০ হাজার হইতে ১লক্ষ টাকা আয়ে টাকায় এক আনা, ১ লাখের উপর টাকায় ১½ আনা, ১½ লাখের উপর টাকায় দুই আনা, ২ লাখের উপর টাকার ২½ আনা ২½ লাখের উপর টাকায় ৩ আনা কর ধার্য্য হইয়াছে। ১৯১৮-১৯ সালে সরকারী আয় সাড়ে তের কোটি টাকার উপর হইয়াছিল।

পথকর, জলকর, ও গ্রামের ছোটখাটো করকে প্রাদেশিক কর বলে। ১৯১২ সালে ইহার অনেকগুলি উঠিয়া যায়; ইহার আয় সামান্য।

প্রাদেশিক কর।

সরকারের সঙ্গে কোনো কাজকর্ম করিতে হইলে বা আদালতে মোকর্দ্দমা করিতে হইলে বাদী প্রতিবাদী উভয়কেই কাগজে ষ্ট্যাম্প লাগাইতে হয়; কাজের গুরুত্ব বা টাকার পরিমাণ অনুসারে এই কোর্ট ফি (Court Fee) কম বেশী হয়; কাহাকে রসিদ দিতে হইলে এক আনা, দলিল লিখিতে হইলে দুই আনা হইতে আড়াই টাকার কোর্ট ফি আমরা সর্বদা দিয়া থাকি; এই প্রকার আরও অনেকগুলি বিষয়ে টাকা দিতে হয়। ইহা হইতে সরকারী আয় ৮ কোটি টাকার উপর হয়।

ষ্ট্যাম্প।

কতকগুলি বিষয় পরস্পরের মধ্যে মীমাংসা করিতে হইলে আমাদিগকে রেজিষ্টারী অপিষে যাইতে হয় নতুবা সে ব্যবস্থা যে কেহ নামঞ্জুর করিতে পারে। জমিজমা, বিষয় সম্পত্তি হস্তান্তর করিবার সময় দলিলাদি লিখিয়া রেজিষ্টারী করিতে হয়। ইহা হইতে সরকারী আয় ৭০ লক্ষ টাকা।

রেজিষ্টারী।

বনগুলি সবই সরকারী; বনের কাঠ বিক্রয় বা জমা দিয়া, ঘাস বাঁশ, বেত বিক্রয় করিয়া, গোরু চরিবার অনুমতি দিয়া, সরকারের আয় প্রায় ৩½ কোটি টাকা হয়। বন বিভাগ সম্বন্ধ শিল্প পরিচ্ছেদে সবিস্তার বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে।

বনভূমি।

এগুলি ছাড়া রেলপথ, ডাক, তার মুদ্রা হইতে সরকারের যথেষ্ট লাভ হয়। এসকল বিষয় সম্বন্ধে যথাস্থানে বিস্তৃত আলোচনা হইয়াছে বলিয়া এখানে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। করদরাজ্য হইতে ৮৮,৮০,০০০ টাকা আয়।

বিবিধ।

সমগ্র ভারতের সকল দিক হইতে সরকারী আয় ১৯১৮-১৯ সালে ১৮৭,১৬,৬৭,৫০০, লক্ষ টাকা হইয়াছিল। গত পঞ্চাশ বৎসরে সরকারী রাজস্ব দ্বিগুণেরও অধিক হইয়াছে।

সমগ্র রাজস্ব।

ভারতবর্ষের এই বিপুল রাজস্ব দেখিয়া নানা লোকের মনে নানা কথা ওঠে। সরকার এই রাজস্ব বৃদ্ধিকে দেশের শ্রীবৃদ্ধির লক্ষণ বলিয়া নির্দেশ করেন; কিন্তু দেশীয় লোকেরা ইহার উল্টা কথা বলেন; তাঁহারা বলেন দেশের লোকের পক্ষে এই রাজস্ব বহন করা দুঃসাধ্য। সরকারী হিসাব মত মাথা পিছু ২৸৶৩ পাই কর আমাদের দিতে হয়; ইহা হইতে যদি ভূমিকর বাদ দেওয়া যায় ঐ কর ১৷৶ করিয়া মাথা পিছু পড়ে; সরকার বলেন এই কর সমগ্র আয়ের শতকরা ৯% ভাগ মাত্র, সুতরাং ইহা আদৌ অধিক নয়।

বৃটীশ দ্বীপপুঞ্জের ন্যায় ধনশালী দেশের বাৎসরিক রাজস্বের অপেক্ষা ভারতের রাজস্ব প্রায় দেড়গুণ অধিক। ব্রিটীশ দ্বীপের ধনের কাছে আমাদের রাজস্ব খুবই বেশী বলিয়া অনেকে মনে করেন। সরকারী তরফের উত্তর হইতেছে ভারতের লোক সংখ্যা গ্রেট্‌ব্রিটেন হইতে প্রায় পাচগুণ এবং ভারত সরকার দেশের জন্য এমন সব কাজ করেন যাহা বিলাতে সরকারকে করিতে হয় না। কিন্তু বিলাতের জাতীয় ধনবল ও ব্যক্তিগত আয় ভারতবর্ষ হইতে এত অধিক যে এখানকার রাজস্ব অত্যন্ত অধিক বলিয়া অনেকে মনে করেন। আর সরকার রেল খাল প্রভৃতি কাজ করিতেছেন তাহাতেও তাঁহাদের লাভ হইতেছে; বরং বিলাতে শ্রমজীবি ও কর্মচারীদের জন্য বৃদ্ধ বয়সের পেনশন্, বাধ্যতা মূলক জীবন বীমা ও শিক্ষা প্রভৃতি যেসব ব্যবস্থা করিয়াছেন—এদেশে তাহা করিতে হয় নাই। সুতরাং বিলাতের সহিত ভারতে তুলনা চলে না।

ব্যয়

রাজস্ব ব্যয়ের প্রথম কথা হইতেছে প্রজার হিত। আমাদের দেশে বলিত যে রাজা যেকর গ্রহণ করেন তাহা শতগুণ হইয়া প্রজার নিকট ফিরিয়া আসে।

১৯১৮-১৯ সালে ব্যয় প্রায় ১৬০ কোটি টাকা হইয়াছিল। তৎপূর্ব বৎসরে হইয়াছিল ১৫৬ কোটি টাকা। যুদ্ধের পূর্ব হইতে ব্যয় প্রায় ৩৩ কোটি টাকা বাড়িয়াছে। প্রধান প্রধান ব্যয়ের ফর্দ্দ:—(১) ঋণ (২) সামরিক বিভাগ (৩) রাজস্ব আদায় খাতে ব্যয় (৪) কর্মচারীদের বেতন (৫) দুর্ভিক্ষ নিবারণ (৬) সরকারী গৃহাদি, পথ ঘাট নির্মাণ (৭) বিবিধ ব্যয়।

ঋণ ও তাহার সুদ।

ভারতবর্ষকে অনেক সময়ে টাকা ধার করিতে হইয়াছে; আমাদের দেশে যে রেল বা খাল তৈয়ারী হইয়াছে সে সবের মূলধন বিলাত হইতে আনা। বিলাতে যাহারা টাকা দিয়াছে তাহারা সেই টাকার রীতিমত সুদ পাইয়া থাকেন। আমাদের সেই সুদ প্রতিবৎসর দিতে হয়। এই গেল দেশের বাহিরে ঋণ। দেশের মধ্যেও সরকার ঋণ করেন। কোম্পানীর কাগজ কিনিয়া আমরা সুদ পাই। পোষ্টাপিসের সেভিংস্ ব্যাঙ্কে টাকা রাখিয়া আমরা সুদ পাই; এও সরকারের ধার। সরকারী রাজস্ব হইতে এই সুদ আমরা পাই। এই সব টাকা ধার করিয়া সরকার নানা কাজে লাগান; যেমন দিল্লীতে যে নূতন সহর হইতেছে তাহার জন্য যে ব্যয় তাহা সরকারী তহবিল হইতে না করিয়া সরকার ধার করিয়াছেন। দেশীয় রাজারা অনেক সময়ে ঋণ গ্রহণ করেন। এই ধারের সুদ যাহাদের কাছ হইতে সেই টাকা লওয়া হয়, তাহাদিগকে দেওয়া হয়। ইহার মধ্যে সাধারণ ঋণগুলিকে শোধ করিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। প্রতি-বৎসর রাজস্ব হইতে সুদ দিয়া আসল শোধ বাবদ কিছু রাখা হয়।

যুদ্ধের পূর্বে ১৯১৪ সালে জাতীয়ঋণ ছিল প্রায় ৪১২ কোটি টাকা। ইহার মধ্যে ২৭০ কোটি বিলাতের লোকের কাছে ঋণ ছিল। যুদ্ধের সময়ে আমরা ১৫০ কোটি টাকা সাম্রাজ্যের রক্ষার জন্য ইংলণ্ডকে দান করিয়াছিলাম। ইহাতে জাতীয় ঋণ বৃদ্ধি পাইয়া ৫৬২ কোটি টাকা দাঁড়াইয়াছে।

জাতীয় ঋণ।

ভারতবর্ষের ন্যায় নির্ধন দেশের পক্ষে এই জাতীয় ঋণ খুবই বেশী; অধিকাংশই টাকা রেল খাল প্রভৃতি ভালরূপ কারবারের জন্য ব্যয়িত হওয়ায় চাপ খুব বেশী পড়ে না। ভারতবাসীদের মাথা পিছু ২৩৲ টাকা ঋণ পড়ে; অন্যান্য দেশের তুলনায় এই ঋণদায় খুববেশী নয়। ইহার কারণ ভারতসরকার বিনা কাজে কোনো ঋণ করেন নাই। যুদ্ধের পূর্বে ১৯১৪ সালে সাধারণ ঋণ মাত্র ১৯ কোটি টাকা ছিল; ইহার সুদ ছিল ১ কোটি টাকা। অবশিষ্ট ৩৯২ কোটি টাকার সুদ ১৩ কোটি। যুদ্ধের জন্য ১৫০ কোটি টাকা আমাদের ধার হয়; নতুবা এতদিনে অকেজো ঋণ ভারত সরকারের এক পয়সা থাকিত না।

গত ষাট বৎসরে জাতীয় ঋণ প্রায় ৫ গুণ বাড়িয়াছে। ১৮৫৮ সালের ১০৭ কোটি ছিল। ১৯১৮ তে ৫৫৮ কোটিতে দাঁড়াইয়াছে। * গত

জাতীয় ঋণ। *

	সাধারণ ঋণ	কাজের ঋণ			মোট জাতীয় ঋণ (কোটি টাকা)
		রেলওয়ে	খাল	মোট	
৩১শে মার্চ্চ					
১৮৫৮					১০৭ কোটি
১৮৬৮					১১৩ ,,
১৮৭৮					১৬৪ ,,
১৮৮৮	১০৯.৫		২৫.৯	১১৪.৭	১২৪.২ ,,
১৮৯৮	১০৫.০	১৫৯.০	৩২.৫	১৯১.৫	২৯৬.৫ ,,
১৯০৮	৫৬.১	২৬৬.৬	৪৪.৫	৩১১.৪	৩৬৭.৫ ,,
১৯১৪	১৯.২	৩৩৩.০	৫৯.১	৩৯২.১	৪১১.৩ ,,
১৯১৮	১৩৩.৩	৩৫৮.৪	৬৫.৯	৪২৪.৭	৫৫৮.০ ,,

পাঁচ বৎসরে সুদ ১০ কোটি টাকার উপর বৃদ্ধি হইয়াছে; ১৯১৮ তে ২৪ কোটি টাকা হইয়াছে।

সামরিক ব্যয়।

ভারতের সমগ্র আয় (১৯১৮-১৯) ১৬৫ কোটি টাকা; ইহার মধ্যে সামরিক বিভাগের জন্য প্রায় ৬৫ কোটি টাকা খরচ হইয়াছে। অর্থাৎ সমগ্র আয়ের শতকরা ৪৮ ভাগ বা প্রায় অর্দ্ধেক যুদ্ধের জন্য ব্যয়িত হইয়াছে। ভারতবর্ষের মধ্যে কোথায় কোনো যুদ্ধ নাই অথচ এই বিপুল ব্যয় প্রতিবৎসর কেন-যে করা হয় তাহা লইয়া বহুকাল হইতে তীব্র সমালোচনা চলিতেছে। জাপান এই বৎসরে ৪০ কোটি টাকা ব্যয় করিয়াছে অর্থাৎ তাহার আয়ের প্রায় শতকরা ৩৭ ভাগ সামরিক বিভাগে ব্যয়িত হইয়াছে; ইহার মধ্যে নৌবিভাগের ব্যয় ধরা হইয়াছে; কিন্তু ভারতের নিজের কোনো নৌ-বাহিনী নাই। জাপানের স্থল-সৈন্যের ব্যয় ১৭ কোটি টাকা—সুতরাং ভারতের এই স্থল সৈন্যের জন্য প্রায় জাপানের চারিগুণ ব্যয় হয়। ১৯১৯-২০ সালে মোট সরকারী আয় ১৩৫½ কোটি টাকা; ইহার শতকরা ৬৩% যুদ্ধের জন্য ব্যয়িত হইয়াছে।

গত মার্চ মাসে বড়লাটের সভায় ১৯১৯-২০ সালের আয় ব্যয়ের খসড়া হিসাব উপস্থিত করা হইয়াছিল। রেলওয়ের আয় ছাড়া এ বৎসর (১৯১৯-২০) প্রায় ১৩৫ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছে; ইহার মধ্যে ৬১, ৭৯, ২৫, ৮০০, টাকা সমর বিভাগের জন্য ধার্য্যকরা হইয়াছিল। কিন্তু ব্যয় হইয়াছে ৮৫ কোটি।

নিম্নে সমর-বিভাগের ব্যয়বৃদ্ধির তালিকা প্রদত্ত হইল।

১৮৮৪-৫	১৬, কোটি	৯৬ লক্ষ
১৮৯৪-৫	২৪ ,,	০৯ ,,
১৯০৪-০৫	২৪ ,,	৬৬ ,,
১৯১৫-১৬	৩৩ ,,	৩৯ ,,

১৯১৭-১৮	৪৩ কোটি	৫৬ লক্ষ
১৯১৮-১৯ (বাজেট)	৪৩ ,,	৫৬ ,,
১৯১৮-১৯ (যথার্থব্যয়)	৬৫ ,,	৯২ ,,
১৯১৯-২০ (বাজেট)	৬১ ,,	৭৯ ,,
১৯১৯-২০ (যথার্থ ব্যয়)	৮৫ ,,	৩৩ ,,

১৮৮৪-৮৫ সালে সামরিক ব্যয় ছিল ১৬ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকা, ৩৬ বৎসরে এই ব্যয় প্রায় পাঁচগুণ হইয়াছে। কিন্তু গত ছয়ত্রিশ বৎসরে ভারতের লোকের আয় বা সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধি ইহার অনুপাতে হয় নাই। ভারতবর্ষের শান্তিরক্ষার জন্য এত সৈন্যের প্রয়োজন হয় না। এই যুদ্ধের সময়ে সমগ্র ভারতে মাত্র ১৫,০০০ সৈন্য ছিল, কিন্তু কোথাও একদিনের জন্য কোনোরূপ অশান্তি বা বিদ্রোহের ভাব দেখা দেয় নাই।

রাজস্ব আদায়ের ব্যয়

রাজস্ব আদায় করিতে সরকারের খুব ব্যয় হয়; বৎসরে প্রায় ১৪।১৫ কোটি টাকা এই খাতে লাগে। সরকার ইচ্ছা করিলে এদিকে কিছু খরচ কমাইতে পারেন।

সরকারী কর্মচারীদের বেতন

ভারতবর্ষের সরকারী কর্মচারীর সংখ্যা নিতান্ত কম নয়; এই বিরাট যন্ত্রে অসংখ্য কর্মী নিয়ত কাজ করিতেছে। ইহাদের পোষণ করিতে সরকারের ব্যয় ১৯১৭-১৮ সালে ৩১ কোটি টাকা হইয়াছিল। এ বৎসরে ব্যয় আরও বাড়িয়াছে। গত ১৫ বৎসরে কর্মচারীদের বেতন দেড়গুণের উপর বাড়িয়াছে।

ভারতবর্ষের সিবিলিয়ানগণ যে পরিমাণে বেতন পাইয়া থাকেন পৃথিবীর আর কোনোদেশে ঐ শ্রেণীর কর্মচারীগণের এত বেতন নাই। বর্ত্তমানে উচ্চকর্মের জন্য কিরূপ ব্যয় বৃদ্ধি হইতেছে তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

ভারতীয় সিবিল সার্বিস		২ কোটি ৫৫ লক্ষ
পাব্লিক ওয়ার্কস বিভাগে		
(ইম্পিরিয়াল ও প্রভিন্সিয়াল)		৯৭ লক্ষ
ভারতীয় মেডিকল সার্ভিস		৪৮ লক্ষ
প্রাদেশিক সিবিল সার্ভিস		১ কোটি ১৫ লক্ষ
ভারতীয় পুলিস সার্ভিস		৫৮ লক্ষ
প্রাদেশিক পুলিস	,,	১২ ,,
ভারতীয় এডুকেশনল্	,,	২৭ ,,
প্রাদেশিক ,,	,,	২০ ,,
ভারতীয় বন বিভাগ	,,	২৪ ,,

উপর্যুক্ত ব্যয়ের উপর গতবৎসর হইতে (১৯২০) ভারতসচিব উক্ত কর্ম্মচারীদের যে বেতন বৃদ্ধি করিয়াছেন তাহার ফলে বার্ষিক ৮০ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় হইবে। উচ্চ কর্ম্মচারীদের বেতন অতিরিক্ত পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। জাপান ভারতবর্ষ হইতে অনেক ধনী দেশ; জাপানীদের মাথা-পিছু আয়ও ভারতবাসীদের অপেক্ষা অধিক। কিন্তু তথাকার প্রাদেশিক গবর্ণরেরা ৫।৬ হাজার টাকার বেশী বার্ষিক বেতন পান না। সর্বোচ্চ বেতন বার্ষিক ৬৭৫০ টাকা বা মাসিক ৫৬২॥০; আমাদের দেশের প্রথম শ্রেণীর ডেপুটিরা এর চেয়ে বেশী বেতন পান। আমাদের দেশের জজ ম্যাজিষ্ট্রেট, বড় বড় অধ্যাপক প্রভৃতির বেতন খুবই বেশী এবং নিম্নতন কর্মচারীদের বেতন তেমনি কম। বিদেশ হইতে কর্মচারী আনিতে হয় বলিয়া এত টাকা আমাদের দিতে হয়; দেশের লোক ক্রমে এই সকল কাজে ভর্ত্তি হইতে থাকিলে দেশের অর্থ দেশে থাকিবে। কিন্তু তাহাতে সরকারী ব্যয় কমিবে না। উপরের কর্মচারীদের বেতন না কমাইলে দেশের দরিদ্র শিক্ষক অধ্যাপক কর্মচারী চাপরাশী দারবান প্রভৃতিদের গতি নাই।

১৯১৯-২০ সালের বাজেটে ৮,৫৩ লক্ষ পাউণ্ড রাজস্ব আদায় হইবে। ইহার মধ্যে সামরিক বিভাগে ৪,১২ লক্ষ পাউণ্ড। ১,৭৭ লক্ষ নূতন রেলওয়েতে, ৬৯ লক্ষ পাউণ্ড রেলওয়ে সংস্কারাদি করিতে ব্যয়িত হইবে। শিক্ষার জন্য ৩,৬৭ হাজার পাউণ্ড বা ৫৪ লক্ষ টাকা, চিকিৎসার জন্য ১,৬৫ হাজার বা ১৯ লক্ষ টাকা ;—স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য ১,৪৫ হাজার পাউণ্ড বা ২১ লক্ষ টাকা ; কৃষির জন্য ৯৬ হাজার পাউণ্ড ১৪,৪০ হাজার টাকা ; বৈজ্ঞানিক ও বিবিধ ব্যয় ৩ লক্ষ ১১ হাজার পাউণ্ড ; দান ও ঐ প্রকার ব্যয় বাবদ ৪ লক্ষ পাউণ্ড বা ৬০ লক্ষ টাকা।

নূতন বাজেট

দিল্লীর নূতন রাজধানীর স্বাস্থ্যের জন্য এ বৎসরে প্রায় ৮ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইবে অথচ সমগ্র ভারতের জন্য হইবে মাত্র ২১ লক্ষ টাকা। লর্ড হার্ডিংজ নূতন দিল্লীর ব্যয় ৬ কোটি টাকা হইবে অনুমান করিয়াছিলেন। যখন ভারতের রাজকোষের অর্থের খুব টানাটানি তখনও ইহার কাজ কামাই যায় নাই। ১৯১৭-১৮ সালে ৩৭½ লক্ষ টাকা, ১৯১৮-১৯ সালে প্রায় ৪৩ লক্ষ টাকা ও ১৯১৯-২০ সালে ৪৫ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইবে বলিয়া গেজেট হইয়াছিল। ইতিমধ্যেই নূতন দিল্লীতে ৪½ কোটি টাকা ব্যয়িত হইয়াছে। এবং এখনো শোনা যাইতেছে কাজ তেমনভাবে আরম্ভই হয় নাই। এখনো কত কোটি টাকা লাগিবে তাহা কেহ বলিতে পারে না।

দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য একটি সরকারীফাণ্ড আছে ; এই ফাণ্ডে জাতীয় ঋণ শোধ করিবার জন্য ১½ কোটি টাকা করিয়া বৎসরে জমা রাখা হয়।

বিবিধ ব্যয়

এ ছাড়া বিবিধ ব্যয়ের মধ্যে কর্মচারীদের পেন্‌শন্, বিলাতে সিভিলিয়ানদের ফার্লোর টাকা, সরকারী আপিষ আদালতের মনোহারী জিনিষের বাবদ প্রায় ৮ কোটি খরচ হয়।

ভারত গভর্ণমেণ্টের ব্যয় অত্যন্ত বেশী বলিয়া অনেকে সমালোচনা করেন। এই বিপুল ব্যয় কমাইবার দিকে সরকার বাহাদুরের এখন সকল মনোযোগ দেওয়া উচিত, নতুবা ভারতের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি ও সামাজিক উন্নতি হওয়া সুদূরপরাহত।

১৯০০ সালে দুর্ভিক্ষের বৈঠকে অল্প সংখ্যক সভ্যেরা যে প্রতিবেদন পেশ করিয়াছিলেন তাহার সারাংশ নিম্নে দেওয়া হইতেছে।

দুর্ভিক্ষ বৈঠকে একদল সভ্যের মত

১। ভারতের রাজস্ব কেবল মাত্র বা প্রধানত ভারতের সুখ সুবিধার দিক হইতে তাকাইয়া ব্যয়িত হয় না ; ইহার উদাহরণ।

(ক) ভারত রক্ষা ;—ভারতের সীমান্ত নীতি বহুবার পরিবর্ত্তিত হইয়া ভারতের প্রাকৃতিক বাধা লঙ্ঘন করিয়াছে এবং যুদ্ধের ব্যয় ও দায়ীত্ব অসম্ভবরূপে বাড়াইয়া তুলিয়াছে। [পূর্ব্বে সিন্ধু প্রদেশের পর্ব্বত-মালা পশ্চিম-সীমান্তের চরম পংক্তি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট ছিল। পরে বেলুচিস্থান ভারত-সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হইয়াছে এবং দক্ষিণ পারস্যের মধ্যে ঠিক রাজনৈতিক শক্তি প্রতিষ্ঠা না হইলেও ব্যবসায় বাণিজ্য বিস্তৃত হইয়া সেখানে স্বার্থ সৃষ্ট হইয়াছে। এবং এই যুদ্ধের সময়ে মেসোপটেমিয়ার প্রায় সমস্ত ভারই ভারতবর্ষ বহন করিয়াছে এবং এখনো নানা বিষয়ে করিতেছে। ভারতের রাজনৈতিক সীমানা এখন (পারস্য বাদ দিলে) প্রায় তুরস্কে গিয়া লাগিয়াছে। সীমান্ত বৃদ্ধির ফলে ১৯০১ সালে উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশ নূতন সৃষ্টি করা হয়]

(খ) ভারতের রেলপথ বিস্তার দেশের প্রয়োজন বা তাহার সাধ্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কখনো হয় নাই। [১৯১৮-১৯ সাল পর্য্যন্ত ভারতের রেলপথে ব্যয় হইয়াছে ৫৮০ কোটি টাকা, ১৯১৯-২০ সালে পুনরায় ৩৬ কোটি টাকা ব্যয়িত হয়। রেলওয়ে হইতে লাভ সরকার কয়েক বৎসর হইতে পাইতেছেন। গত শতাব্দীতে রেলপথ খাতে ৫২ কোটি

টাকা লোকশান হইয়াছিল অর্থাৎ গড়ে বৎসরে ১ কোটি টাকা। ১৯০৯ সালে অর্থাৎ রেলপথ সৃষ্টি হইবার ৬০ বৎসর পরে ভারতীয় রেলওয়ে হইতে শতকরা ১½% ভাগেরও কম আয় হইত। গত কয়েক বৎসর যে লাভ হইতেছে তাহা ৬০ বৎসরের বিপুল লোকশানকে এখনো পূরণ করিতে পারে নাই।

(গ) সৈনিক বা শাসন বিভাগের য়ুরোপীয় কর্ম্মচারীদের বেতন, প্রমোশন, পেনশন, ফার্লো সম্বন্ধে যে সকল নিয়ম আছে তাহাতে সাধারণ লোকের ভ্রম হইতে পারে ভারতবর্ষ কর্মচারীদের জন্য, কর্মচারীরা ভারতবর্ষের জন্য নহে।

[ভারতের ব্যয় বৃদ্ধির প্রাধন কারণগুলি উপরে প্রকাশ পাইয়াছে। সাম্রাজ্যবৃদ্ধি, ব্রিটীশ বাণিজ্য-বিস্তার এবং য়ুরোপীয় কর্মচারীদের সুবিধা সুযোগ দিবার দিকে সরকারের অধিক দৃষ্টি সম্বন্ধে অপবাদ যে কোনো কোনো স্থলে নিতান্ত মিথ্যা নয় তাহা যুদ্ধের পূর্ব্বে দেখা যাইত। পাবলিক সার্বিস কমিশনের প্রতিবেদন সম্পূর্ণরূপে গৃহীত হইলে এ ধারণা আরও দৃঢ় হইত। কিন্তু বর্ত্তমানে সরকার বাহাদুরের দৃষ্টি ও নীতি উদারপথ অবলম্বন করিয়াছে।]

২। ভারতের ব্যয় হ্রাস করিবার জন্য যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া হয় নাই তাহার উদাহরণ প্রদত্ত হইতেছে :—

(ক) শাসন-বিভাগ পরিচালনের জন্য দেশের উপযুক্ত শিক্ষিত লোকদের নিয়োগ না করিয়া অপেক্ষাকৃত অনেক উচ্চ বেতন দিয়া বিদেশী কর্মচারী পোষণ করায় অনেক টাকা ব্যয়িত হইতেছে।

(খ) যথার্থ কর্মের অপেক্ষা কর্মচারীদের তদারক ও প্রতিবেদন প্রেরণ এবং শাসন কেন্দ্রের পর্য্যবেক্ষণের বাহুল্য অধিক।

(গ) যুদ্ধ না থাকিতেও সর্বদা যুদ্ধের উপযোগী করিয়া স্থায়ী সৈন্য রক্ষা করার বৃথা ব্যয় বহন ; ইহার বদলে স্থানীয় লোককে সৈনিক কার্য

শিক্ষাদান অধিক প্রয়োজনীয়। য়ুরোপে এত স্থায়ী সৈন্য রক্ষা করার প্রথা উঠিয়া গিয়াছে। [ইহার ফল বিগত যুদ্ধের সময়ে দেখা গিয়াছিল। শিক্ষিত সৈন্য মরিয়া গেলে তাহাদের স্থান পূরণ করিবার জন্য আর কেহই ছিল না; তখন তাড়াতাড়ি সৈন্য সংগ্রহ করিবার প্রয়োজন হইয়াছিল]

(ঘ) দেশীয় সৈন্যের অনুপাতের অনেক বেশী বিদেশী সৈন্য রক্ষার ব্যয় সহজে হ্রাস করা যায়। [যুদ্ধের সময়ে কেবলমাত্র ১৫,০০০ সৈন্য ভারতে ছিল; কিন্তু সে সময়েও ভারতবাসীরা কোনো প্রকার উপদ্রব করে নাই।]

(ঙ) দেশীয় সৈন্য-বিভাগে য়ুরোপীয় কর্মচারী নিয়োগ; এবং ভারতীয়দের উচ্চকর্মচারী হইবার অধিকার না থাকায় অনেক য়ুরোপীয়কে অধিক বেতন দিয়া পোষণ করিতে হয়। ইহাতে ব্যয় খুবই করিয়া গিয়াছেন। [এই যুদ্ধের সময়ে কয়েকজন ভারতবাসীকে উচ্চ কর্মচারী হইবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে।]

(চ) কোম্পানীর সাহায্যে রেলপথ খুলিবার ব্যবস্থা করিয়া ও তাহা দিগকে বিবিধ প্রকারের সুযোগ দিয়া সরকারের লোকশান হয়। [যেমন ই, আই, রেলওয়ের ১৯১৯ সালে চুক্তি শেষ হইবার কথা; ভারতীয় রাজনীতিজ্ঞেরা বেসরকারী কোম্পানীগুলিকে খাস সরকারী করিবার জন্য বহুকাল হইতে পীড়াপীড়ি করিতেছেন।]

৩। ভারতীয় রাজস্বের বণ্টন ঠিক ভাবে করা হয় না।

(ক) তথাকথিত দেশরক্ষার জন্য অপেক্ষাকৃত অধিক অর্থ ব্যয়িত হয়; দেশের আর্থিক ও নৈতিক উন্নতির জন্য (যেমন শিল্প, কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা) যে অর্থ ব্যয় হয় তাহা নিতান্ত সামান্য।

(খ) প্রাদেশিক রাজস্ব হইতে প্রদেশের প্রয়োজনীয় কাজে অপেক্ষাকৃত কম অর্থ ব্যয়িত হয়; ভারতীয়-সরকারের ব্যয়ের কথা প্রাদেশিক

শাসনকেন্দ্রগুলিকে সর্বপ্রথম ভাবিতে হয়। [উদাহরণ স্বরূপ নূতন দিল্লীর স্বাস্থ্যের জন্য ব্যয়ের সহিত সমগ্র ভারতের স্বাস্থ্যের জন্য খরচ তুলনা করিতে পারা যায়।]

(গ) ভারতবর্ষের লোকের আর্থিক অবস্থার উন্নতির চেয়ে যাওয়া আসার রেল পথ প্রভৃতির উন্নতির দিকে সরকারের দৃষ্টি অধিক। [অথচ দেশের মধ্যে বড় বড় রাস্তা নাই বলিলেই হয়; এবং গ্রামের পথ ঘাটের কথা সকলেরই জানা আছে; এদিকে সরকারের দৃষ্টি দিলে দেশের যথার্থ উপকার হইত।]

ভারতের বর্ত্তমান ব্যয়ভার বহন করা ভারতবাসীদের সামর্থ্যের বাহির।

আয় ব্যয়।

(হোমচার্জ্জ)

উপর্য্যুক্ত ব্যয় ব্যতীত বিলাতের খাতে কিছু ব্যয় প্রতিবৎসর হইয়া থাকে। ইহাকে হোমচার্জ্জ বলা হয়। বৎসরে প্রায় ৩০ কোটি এই বাবদ বিদেশে যায়। পূর্বোল্লিখিত রেল ও খালাদির জন্য ঋণের সুদ, সরকারী কর্মচারীদের বেতন, ইণ্ডিয়া আপিষের (ভারত সচিব ও তাঁহার কৌন্সিল ইত্যাদিদের বেতন) খরচ, গোরা সৈন্য পাঠাইবার ও শিক্ষা দিবার, ও নৌ-বিভাগ রক্ষার ব্যয়, সরকারী জিনিষ পত্রের দাম, কর্মচারীদের ফার্লো পেনশন, দান খাতে ব্যয় এই হোমচার্জ্জের মধ্যে পড়ে। বিংশশতাব্দীর প্রথম হইতে এ পর্য্যন্ত বিলাতে ব্যয় প্রায় ৬ কোটি টাকার উপর বাড়িয়াছে।

এই হোমচার্জ্জ লইয়া বহুকাল হইতে ভীষণ বাক্‌বিতণ্ডা চলিতেছে। অধিকাংশ ভারতবাসী এবং কোনো কোনো ইংরাজ অর্থনৈতিক পণ্ডিত এই হোমচার্জ্জকে ভারতের দারিদ্র্যের কারণ বলিয়া নির্দেশ করেন;

অনেকে ইহাকে শোষণ বলিয়াও অভিহিত করিতেন। ভারতবর্ষ প্রতি বৎসর ৩০ কোটি করিয়া টাকা দিতেছে ও তাহার বদলে এমন কিছুই পাইতেছে না ; এই জন্য কোনো ইংরাজ এই হোমচার্জ্জকে করের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন।

হোমচার্জ্জের খাতে যে কয়টি বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে তাহা দেখিলে বুঝা যাইবে যে এক-তৃতীয়াংশ ব্যয় ভারতের সহিত ইংলণ্ডের রাজনৈতিক সম্বন্ধের জন্য, অপর অংশ আর্থিক সম্বন্ধজনিত ; সুতরাং হোমচার্জ্জকে শোষণ বলিয়া উল্লেখ করা যায় না। তবে মোটের উপর ভারতের সমগ্র রাজস্বের শতকরা ৪০% ভাগ বিলাতে এই বাবদ চলিয়া যায় ইহার মধ্যে অনেকগুলি খরচ কমানো যায় ; যেমন অধিক ভারতবাসী শাসন ও সামরিক বিভাগে নিযুক্ত হইতে থাকিলে এখন যে টাকা ফার্লো পেনশন্ বাবদ বিলাতে যাইতেছে তাহা তখন এখানেই থাকিবে। প্রতি বৎসরে প্রায় ২½ কোটি টাকার সরকারী জিনিষ ও আসবাবপত্র বিলাতে কেনা হয় ; এসব জিনিষ শিল্পোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এদেশে তৈয়ারী হইতে থাকিলে এ খরচ বাঁচিয়া যাইবে। নূতন শাসন সংস্কারের প্রস্তাবানুসারে ভারত সচিবের বেতন আর ভারতকে দিতে হইবে না। অবশিষ্ট থাকিল রেলওয়ে খাল বাবদ ৫০০ কোটি টাকার ঋণের সুদ ; ক্রমে ক্রমে এ গুলিকে ভারত-সরকার নিজস্ব করিয়া লইলে এ দায় হইতেও আমরা মুক্ত হইতে পারি।

৭। শিক্ষার ইতিহাস।

শিক্ষার তিনটি ধারা।

ইরাংজের দেশজয় ও বাণিজ্যবিস্তারের ন্যায় পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের সূত্রপাত বাংলাদেশেই প্রথম। এই পাশ্চাত্য শিক্ষার মধ্যে বরাবর তিনটি প্রভাব দেখা যায়। পশ্চিমের জ্ঞানের প্রদীপ প্রথমে পাদরীরা এদেশে বহন করিয়া আনেন। দ্বিতীয় প্রভাব তৎকালীন শিক্ষিত বাঙ্গালীদের ;—ইহারা খৃষ্টান পাদরীদের সাহায্যে য়ুরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা জানিতে পারিয়া দেশবাসীকে সেই ধনে ধনী করিবার জন্য উৎসুক হন। একশত বৎসর পূর্ব্বে বাংলাদেশে ইংরাজী শিক্ষার প্রচারে ইঁহারাই প্রথমে নামেন। কোম্পানী বাংলা জয় করিয়া প্রথম অর্দ্ধশতাব্দীর উপর শিক্ষার জন্য কিছুই করেন নাই ; তবে পরবর্ত্তী যুগে শিক্ষার মধ্যে তাঁহাদের প্রভাবই সমধিক। এই তিনটি ধারার ইতিহাসই ভারতের শিক্ষার ইতিহাস।

কোম্পানীর মাদ্রাসা ও সংস্কৃতকলেজস্থাপন

দেওয়ানী কার্য্যের ভার কোম্পানীর হাতে আসিবার পরেও অনেক দিন ফৌজদারী কার্য্যভার মুসলমান কর্মচারীদের উপরেই ছিল। তখন বিচারকার্য্যে ইংরাজ জজ দিগকে সাহায্য করিবার জন্য এক একজন মৌলবী সঙ্গে থাকিতেন। কিন্তু আইনজ্ঞ মৌলবী পাওয়া অনেক সময়ে কঠিন হইত। এই অভাব দূর করিবার জন্য এবং মৈত্র প্রদর্শন দ্বারা রাজ্যভ্রষ্ট মুসলমান সমাজকে প্রীত করিবার আশায় প্রথম গভর্ণর ওয়ারেন হেষ্টিংস ১৭৮১ সালে কলিকাতার এক মাদ্রাসা বা মুসলমানী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ভারতের সাহিত্য দর্শন আইনের উপর ওয়ারেন হেষ্টিংসের যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল এবং তিনি বিশ্বাস করিতেন যে বৃটীশ ক্ষমতা ভারতে চিরস্থায়ী করিতে হইলে ইহা ভারতীয় ভাবাপন্ন হওয়া চাই ; বৃটীশ শাসনাধীনে ভারতের যাহা কিছু ভাল তাহা বড় হইয়া উঠিবে।

কাশীর রাজ্য জয়ের পর সেখানে ১৭৯১ সালে একটি সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত হয়। তখন সংস্কৃত, আরবী, ফার্শী শিক্ষা-প্রচারের জন্য কোম্পানীর খুব উৎসাহ ছিল।

কলিকাতায় মাদ্রাসার খরচ চালাইবার জন্য বার্ষিক ৩০ হাজার টাকার একটি সম্পত্তি নির্দ্দিষ্ট হয়। ছাত্রগণ ৭ বৎসর কাল কলেজে পড়িত; কাহারও বেতন লাগিত না, উপরন্তু প্রথম তিন শ্রেণীর বালকেরা ৫৲ ৮৲ ১০৲ টাকা হিসাবে জলপানী পাইত। আরবী. ফার্শী ভাষায় সাহিত্য, ন্যায়, অলঙ্কার, দর্শন, আইন, গণিত-শাস্ত্র শিক্ষা দেওয়া হইত। এছাড়া য়ুরোপীয় চিকিৎসা শাস্ত্রের গ্রন্থসকল ফার্শী ও আরবী ভাষায় অনুবাদ করিয়া হাকিমি ও উনানী পুস্তকের সহিত পাঠের ব্যবস্থা ছিল। ক্রমে ইংরাজী, ভূগোল প্রভৃতি শিক্ষার ব্যবস্থা হয়।

লর্ড ওয়েলেসলীর কলেজ

লর্ড ওয়েলেসলী এদেশে প্রথমে (১৮০০ খৃঃ) ইংরাজী কলেজ খুলেন; তবে এ কলেজ সাধারণের জন্য ছিল না। সেসময়ে সিবিলিয়ান কর্মচারীগণ ১৫।১৬ বৎসর বয়সে এদেশে আসিত; তাহাদের শিক্ষা, বিদ্যাবুদ্ধি নিতান্ত সামান্য। তাহাদিগকে কর্মক্ষম করিবার জন্য এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা। এই কলেজের অধ্যাপকগণ সাতবৎসর কাজ করিয়া পুরা বেতনে পেনশন্ পাইতেন, এবং কর্মচারীদের বেতনও খুব মোটা হইত। এই সব কারণে অজস্র টাকা এই খাতে ব্যয়িত হইত।

খৃষ্টধর্ম প্রচারে কোম্পানীর আপত্তি।

এই সময়ে খৃষ্টধর্ম প্রচারের জন্য বিলাতে খুব একটি শক্তিশালী দল গঠিত হইয়াছিল। কিন্তু কোম্পানীর পরিচালকগণ ধর্ম প্রচারের ঘোর বিরোধী ছিলেন বলিয়া তাঁহারা খৃষ্টান পাদরীদের এদেশে আসিতে উৎসাহ দিতেন না; বরং যাহাতে তাঁহারা এদেশে না আসেন তাহাই তাঁহারা চাহিতেন। সেই জন্য মহাত্মা কেরী প্রমুখ পাদরীগণ ১৭৯৯ সালে

এদেশে আসিয়া ইংরাজ মুলুকে বাস করিলেন না, দিনেমারদের অধিকৃত শ্রীরামপুরে তাঁহাদের মিশন খুলিলেন। কেরী সাহেবের নিকট বাংলাভাষা যে কত ঋণী তাহা এখানে বর্ণন করা সম্ভব নয়, তবে বাংলাভাষার ইতিহাস-অভিজ্ঞের নিকট ইহা খুবই সুপরিচিত।

১৮১৩ সালের প্রদত্ত শিক্ষার ব্যয়।

ভারতের লোককে য়ুরোপের জ্ঞানে জ্ঞানী করিতে হইবে একথা প্রথমে এখানকার শাসনকর্ত্তা বা বিলাতের পরিচালক-দের কাহারও মনে উদয় হয় নাই। একথা প্রথম মনে হয় বিলাতের পূর্বোল্লিখিত খৃষ্টান সম্প্রদায়ের কয়েকজন ভক্তের মধ্যে। চার্লস গ্রাণ্ট ভারতবর্ষে কিছুকাল কাজ করেন ও পরে কোম্পানীর একজন পরিচালক হন। ১৭৯২ সালে তিনিই প্রথমে ইংরাজী শিক্ষার কথা বলেন। ১৮১৩ সালে নূতন সনদ লইবার সময়ে তিনি ও তাঁহার বন্ধুদের চেষ্টায় কোম্পানী বৎসরে ১ লক্ষ টাকা ভারতে শিক্ষার জন্য ব্যয় করিবেন ঠিক করেন। ইহার উদ্দেশ্য প্রাচীন সাহিত্যের উন্নতি-বিধান, পণ্ডিত ও মৌলবিদের উৎসাহ বর্দ্ধন, বৃটীশ ভারতে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের চর্চ্চা ও তাহার উৎকর্ষ সাধন। কিন্তু সে অর্থের দ্বারা বিজ্ঞানের জন্য কিছুই করা হয় নাই, টাকাগুলি পণ্ডিত ও মৌলবীর বেতনে ও পুরানোপুঁথি ছাপায় ব্যয়িত হইতে লাগিল। উদাহরণ স্বরূপ বলিতে পারি একখানি আরবী গ্রন্থ ছাপিতে ২০ হাজার টাকা ব্যয়িত হয়! আরবী কেহ বুঝিত না বলিয়া ফার্শীতে ইহার অনুবাদ করা হইল; কিন্তু দেখা গেল ছাত্রদের পক্ষে তাহা খুবই দুর্বোধ্য, সুতরাং অবশেষে স্বয়ং অনুবাদককে ৩০০৲ টাকা বেতন দিয়া তাহার ব্যাখ্যা করিবার জন্য রাখা হইল। ১৮২০ সাল পর্য্যন্ত টাকাগুলি এমনিভাবে নষ্ট হইতে লাগিল।

এদিকে বাংলাদেশের একদল লোক পাশ্চাত্য শিক্ষা পাইবার ও দিবার জন্য ব্যস্ত। খৃষ্টান পাদরীগণের খৃষ্টানীশিক্ষায় বাঙ্গালী যুবকদের মন বিকৃত হইয়া যাইতেছিল; এই স্রোত হইতে বাঙ্গালীকে রক্ষা করা

তাঁহাদের শিক্ষার উদ্দেশ্য হইল। অপরদিকে সরকার উদার শিক্ষা প্রচারে বিমুখ; সুতরাং আত্মরক্ষা ও আত্মোন্নতির জন্য আত্মনির্ভর ছাড়া লোকের আর গতি নাই একথা তাঁহারা বুঝিলেন। সেইজন্য রাজা রামমোহন রায় ও মহাত্মা ডেভিড হেয়ার ১৮১৭ সালে হিন্দুকলেজ স্থাপন করিলেন। হেয়ার সাহেব প্রচলিত খৃষ্টানধর্ম্মে আস্থাবান ছিলেন না, তাই তিনি পাদরীদের সহিত কখনো এক হইয়া কাজ করেন নাই। উদারচেতা রামমোহনের সঙ্গে তিনি যোগদান করিয়া এই নূতন ও প্রথম বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। কিন্তু হিন্দুকলেজর সহিত রাজা রামমোহন রায় যুক্ত ছিলেন বলিয়া গোঁড়া হিন্দুগণ ইহার সহিত মন খুলিয়া যোগদান করিতেন না।

হিন্দুকলেজ

১৮১৭ সালে আর একটি জনহিতকর অনুষ্ঠানের সূত্রপাত হয়; সেটি হইতেছে কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটি স্থাপন। এই সমিতির উদ্দেশ্য শিক্ষাপ্রদ পাঠ্য-পুস্তক প্রণয়ন মুদ্রন ও স্বল্প বা বিনা মূল্যে বিক্রয় বা প্রচার। এই সকল গ্রন্থ প্রথমে শ্রীরামপুরের খৃষ্টান্ পাদরীগণই লিখিতেন ও তাঁহাদের ছাপাখানাতেই ছাপা হইত। তখনো বাংলাদেশে বাঙ্গালী গদ্য-লেখকের সংখ্যা খুবই কম। ১৮২৫ সাল পর্য্যন্ত এই সমিতি নানা বিষয়ে বহু গ্রন্থ ছাপাইয়া কাজ বন্ধ করিয়াদেন।

স্কুল বুক সোসাইটি

পূর্বেই বলিয়াছি হিন্দুকলেজ ও রাজা রামমোহন রায়ের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন শ্রীরামপুরের পাদরীগণ। হিন্দুকলেজ স্থাপিত হইবার পর বৎসরেই তাঁহারা শ্রীরামপুরের কলেজ স্থাপন করেন; তাঁহাদের কতকগুলি বিদ্যালয়ের এই কলেজ হইল কেন্দ্র। ইহারা ১৮২৭ সালে ডেনমার্কের রাজার নিকট হইতে উপাধি দিবার সনদ আনয়ন করেন। ১৮২৪ সালে ইহারা সাধারণ শিক্ষাক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

শ্রীরামপুরের কলেজ

১৮২০ সালে কলিকাতার শিবপুরে আংগলিকান খৃষ্টানগণ সর্ব প্রথম কলেজ খুলেন। (Bishop's College) ১৮৩০ সালে আলেক্জেণ্ডার ডাফ নামক স্কটল্যাণ্ডের জনৈক পাদরী এদেশে আসিয়া (General Assembly's Institutions) এক বিদ্যালয় স্থাপন করে। ইহাই পরে স্কটীশ চার্চস কলেজ নামে অভিহিত হইয়াছে। বাংলাদেশের ইতিহাসে ডাফের স্থান খুব উচ্চ। যদিও তিনি গোঁড়া খৃষ্টান ছিলেন তথাচ রাজা রামমোহন রায় শিক্ষা প্রচার কল্পে তাঁহাকে সাহায্য করিতে কোনো দিন বিমুখ হন নাই। ডাফের সময় হইতে বাংলাদেশে ইংরাজী শিক্ষার মধ্যে স্কটীশ অধ্যাপকগণের একটি বিশেষ স্থান হইয়াছে।

১৮৩০-৩২ সালে বিলাতের ইতিহাসে খুব একটা বড় পরিবর্ত্তন হইয়া যায়। শেষোক্ত বৎসর রিফর্ম বিল্ পাশ হয়; ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও মতামত প্রকাশ সম্বন্ধে অধিকার অনেকখানি বাড়িয়া যায়। ১৮৩৩ সালে সনদ লইবার সময়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাছ হইতে বাণিজ্য করিবার অধিকার কাড়িয়া লওয়া হয় এবং বৃটীশ প্রজাদের ভারতে অবাধ প্রবেশের অধিকার দেওয়া হয়। ইতিপূর্ব্বে কোম্পানীর নিকট হইতে পাশ লইয়া তবে কেহ ভারতে আসিতে পারিত। এই বাধা দূর হওয়াতে দলে দলে পাদরী এদেশে আসিতে লাগিলেন। সেই হইতে জার্ম্মান, ফরাসী, ইতালীয়, দিনেমার, সুইস্, মার্কিন, অষ্ট্রেলিয়ান্ সকলেই এখানে ধর্ম প্রচার করিতে আসিয়াছেন এবং শিক্ষাপ্রচারে সহায়তা করিয়াছেন। মাদ্রাজের শিক্ষা এক প্রকার খৃষ্টানদের হাতে। বাংলা-দেশে খৃষ্টান-পাদরী ও দেশীয়দের ঘাত প্রতিঘাতের ফলে চারিদিকে ইংরাজী স্কুল স্থাপিত হইতে লাগিল। সেই সময়ে বাংলাদেশে ও ভারতের অন্যান্য স্থানে অনেক উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এ পর্য্যন্ত শিক্ষার জন্য কোম্পানী কোনই উৎকণ্ঠা প্রদর্শন করেন নাই। ১৮২৩

১৮৩৩ হইতে খৃষ্টান পাদ্রীদের অবাধ আগমন

সালে সাধারণ শিক্ষা-সমিতি (General Committee of Public Instruction) নামে একটি বোর্ড গঠিত হয়। ১৮২৪ সালে সরকার কলিকাতা সহরে ২৫ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া এক সংস্কৃত কলেজ স্থাপন করেন। এই ব্যাপারে তৎকালীন শিক্ষিত সমাজ খুবই ক্ষুদ্ধ হন; ইংরাজী শিক্ষার জন্য লোক লালায়িত অথচ কোম্পানী সেই সময়ে সরকারী তহবিল হইতে ২৫ হাজার টাকা সংস্কৃত কলেজে ব্যয় করিলেন। সংস্কৃত কলেজে সংস্কৃত ব্যতীত, সামান্য ইংরাজী, গণিত, শারীরতত্ত্ব শিক্ষা দেওয়া হইত; বিদ্যালয়ের সংলগ্ন ছোট একটি হাঁসপাতাল ছিল।

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ স্থাপন ১৮২৪

বাংলাদেশে শিক্ষা সম্বন্ধে দুইটি মত ক্রমেই তীব্র ও সুস্পষ্ট আকার ধারণ করিতেছিল। কোলব্রুক, উইলসন প্রভৃতি সংস্কৃতজ্ঞ সাহেবগণ ভারতের প্রাচীন শাস্ত্রাদির অধ্যাপনার পক্ষপাতী; অপরদিকে রাজা রামমোহন রায় ও খৃষ্টীয় পাদরীগণ ইংরাজী শিক্ষার পক্ষে ঘোর আন্দোলন করিতে লাগিলেন। ডাফ্ প্রমুখ্যাৎ পাদরীগণ কলেজে ইংরাজী ভাষায় শিক্ষা দিতেন; তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন খৃষ্টান ধর্ম ইংরাজী ভাষার প্রসার ব্যতীত প্রচার লাভ করিতে পারিবে না। রাজা রামমোহন রায় বুঝিয়াছিলেন দেশের লোকের অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও জড়বুদ্ধি য়ুরোপের জ্ঞান বিজ্ঞানের কথা না জানিলে দূর হইবে না। সেই মর্মে তিনি তৎকালীন বড়লাট লর্ড আমহার্ষ্টকে একখানি পত্র লেখেন; সেই পত্রখানি প্রত্যেক বাঙ্গালীর পাঠ করা উচিত। ১৮১৩ হইতে ১৮৩৫ সাল পর্য্যন্ত এই বাক্‌যুদ্ধ চলিল।

শিক্ষিত সমাজের দুই দল

ইতিমধ্যে লর্ড মেকলে বড়লাটের মন্ত্রী সভায় আইনসদস্য হইয়া আসিলেন। ১৮৩৫ সালে তিনি শিক্ষা-বিষয়ক এক প্রতিবেদন কর্ত্তৃপক্ষের নিকট পেশ করেন। এই দেশের ভাষা সাহিত্য ও ইতিহাস সম্বন্ধে মেকলের জ্ঞান সামান্যই ছিল;

লর্ড মেকলের মন্তব্য

তিনি আমাদের অতীত কীর্ত্তি কলাপ ও তৎকালীন বাঙ্গালী চরিত্রের অত্যন্ত জঘন্য চিত্র অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন। যাহাই হউক ভারতের শিক্ষা ও ভারতবাসীদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তিনি যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা সত্য হইয়াছে। ভারতবাসী ইংরাজী-শিক্ষা লাভ করিয়া ইংরাজের মহত্ত্ব, স্বদেশপ্রীতি, সত্যনিষ্ঠা প্রভৃতি সদ্‌গুণাবলী লাভ করিয়া আপনার পায়ে আপনি যাহাতে দাঁড়াইতে পারে, য়ুরোপীয় রাজনৈতিকপ্রতিষ্ঠান সমূহ দেশমধ্যে স্থাপিত করিতে পারে, ইহাই ছিল মেকলের প্রাণের ইচ্ছা।

ইংরাজী শিক্ষ প্রচলনে কোম্পানীর স্বার্থ।

এছাড়া কোম্পানীর ইংরাজী শিক্ষা প্রচারের অন্য স্বার্থ ছিল। সরকারী আপিষের কাজকর্ম ক্রমেই জটিল হইয়া বাড়িয়া চলিয়াছিল। বিলাত হইতে পরিচালকগণ লিখিলেন 'এইরূপ একশ্রেণীর লোক প্রস্তুত করা প্রয়োজন যাহারা বুদ্ধি ও চরিত্রগুণে দেশের দেওয়ানী সংক্রান্ত কাজ করিতে পারিবে। ইহা করিতে গেলে য়ুরোপীয় সাহিত্য বিজ্ঞানের সহিত ভালরূপে পরিচিত হওয়া উচিত। এদেশের লোকদিগকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য কোম্পানী সংস্কৃত আরবী ও ফারসী পড়াইবার কলেজ খুলিয়াছিলেন। গভর্ণমেণ্ট প্রাচীন শিক্ষার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতেছেন দেখিয়া তাহারা সন্তুষ্ট হইয়াছিল; বিশেষত মৌলবী ও পণ্ডিতগণ খুব খুসী হইয়াছিল। তখন আমাদের রাজ্য নূতন; সে সময়ের পক্ষে এইরূপ রাজনীতি অনুমোদিত ছিল; কিন্তু এখন ইহার তত আবশ্যকতা নাই।' ১৮৩৫ সালে লর্ড বেণ্টিঙ্কের শাসনকালে গভর্ণমেণ্ট বলিলেন অতঃপর ইংরাজী শিক্ষা দেশময় প্রচারিত হইবে।

এই সময়ে মিঃ আডাম নামক জনৈক ইংরাজ বাংলাদেশের নানাস্থান ঘুরিয়া ঘুরিয়া এখানকার দেশীয় শিক্ষার অবস্থা ও প্রণালী লিপিবদ্ধ করেন। তখন অধিকাংশ গ্রামেই শিক্ষার কোনো না কোনো বন্দবস্ত ছিল। তবে শিক্ষার আদর্শ খুব উচ্চ না হইলেও কাজচলা বিদ্যা গ্রামের অধিকাংশ

ছেলেই পাইত; সংস্কৃত শিক্ষা দেশব্যাপী ছিল এবং এক একটি স্থানের পণ্ডিত একত্র করিলে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইতে পারিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় বাংলাদেশের এই ভিতরকার জিনিষগুলির প্রতি কাহারও দৃষ্টি পড়িল না। সরকার উচ্চ শিক্ষা লইয়া এতই ব্যস্ত ছিলেন যে দেশের পাঠশালা চতুষ্পাঠিগুলি ধীরে ধীরে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। এই সব বিদ্যাকেন্দ্রগুলিতে কেবল ভারতের জ্ঞানের ধারা বজায়ের চেষ্টা ছিল; বাহিরের সহিত তাহার যোগ ছিল না এবং যোগস্থাপন করিতেও ইঁহারা ইচ্ছুক ছিলেন না।

বাংলাদেশে বেণ্টিঙ্ক যেমন শিক্ষার জন্য করিয়াছিলেন, মাদ্রাসের তৎকালীন গভর্ণর স্যার টমাস্ মন্‌রো দেশীয় শিক্ষার অবস্থা জানিবার জন্য রীতিমত তদারক করেন। তাঁহার চেষ্টার ফলে প্রকাশ পায় ১৮২৬ সালে প্রায় ১২½ হাজার বিদ্যালয়ে ১ লক্ষ ৮৮ হাজার (অর্থাৎ ৬৭ জন লোকের মধ্যে ১ জন) শিক্ষা পাইতেছিল। বিদ্যালয়ে যাওয়ার বয়সী ছাত্রের প্রায় এক তৃতীয়াংশ বিদ্যালয়ে গমন করিতেছিল। বর্ত্তমানে সমস্ত ভারতে ঐ বয়সী বালকদের ⅓শ অধ্যয়ন করে।

বম্বেতে সেই সময়ে বিখ্যাত ঐতিহাসিক এল্‌ফিন্‌ষ্টোন সাহেব গভর্ণর। তিনি দেশের প্রতিষ্ঠানগুলিকে বাঁচাইয়া রাখিয়া তাহারই মধ্যে য়ুরোপীয় জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রচলনের পক্ষপাতী ছিলেন। দেশের প্রাণ তাহার সাহিত্যে ও দর্শনে; সেই সাহিত্যাদির আলোচনা উঠাইয়া ইংরাজী সাহিত্য দর্শনের প্রবর্ত্তনের তিনি বিরোধী ছিলেন।

১৮৩৫ হইতে ১৮৫৪ সাল পর্য্যন্ত সরকার শিক্ষার জন্য যাবতীয় টাকা স্কুল ও কলেজের জন্য ব্যয় করিয়াছিলেন। এই বিশ বৎসর সরকার শিক্ষা বিষয়ে খুব উৎসাহ দেখান এবং তাঁহাদেরই তত্ত্বাবধানে সব চলিতে থাকে। পাদরী ও দেশীয়দের বিদ্যালয়গুলির খুব উন্নতি হইয়াছিল। সাধারণ লোকের জন্য প্রাথমিক ও মধ্য-বাংলা

বিদ্যালয় খুলিবার দিকে সরকারের দৃষ্টি তখনো যায় নাই। তাঁহারা ভাবিতেন সমাজের উপরের স্তরে শিক্ষাবিস্তার করিলে তাহা নিম্নস্তরকেও স্পর্শ করিবে।

ইংরাজী শিক্ষা যে কেবলমাত্র জ্ঞানের জন্য লোকের প্রিয় হইয়া ছিল তাহা নহে; লোকে শীঘ্রই দেখিল ইংরাজী জানিলে সরকারী চাকুরী সহজে মিলে। এছাড়া ১৮৪৪ সালে লর্ড হার্ডিঞ্জ ঘোষণা করিলেন যে যাহারা সরকারী বিদ্যালয় হইতে পাশ করিবে তাহাদিগের মধ্য হইতে কর্মচারী নিযুক্ত করা হইবে। ইহা একটা কম প্রলোভন নয়। এতকাল হিন্দু মুসলমান উভয়েই পার্শী শিক্ষা করিত, কারণ পার্শী ছিল রাজভাষা। হিন্দুগণের পক্ষে পার্শীও যেমন ইংরাজীও তেমন। সুতরাং একটা ছাড়িয়া আর একটা ধরিতে ও শিখিতে সময় বেশী লাগিল না। মুসলমানগণ এ বিষয়ে পিছাইয়া রহিল। পার্শী তাহাদের জাতীয়-ভাষা, এক প্রকার ধর্মেরও ভাষা— তাহাদের হৃতসর্বস্ব রাজার ভাষা। মুসলমানগণ পাশ্চাত্য জ্ঞান লইতে মুখ ফিরাইয়া থাকিলেন। ফলে মুসলমানগণ বাংলাদেশে হিন্দুদের অপেক্ষা সংখ্যায় অধিক হইয়াও বিদ্যার ক্ষেত্রে, কর্মের ক্ষেত্রে পিছাইয়া গেলেন।

১৮৩৬ সালে বাংলাদেশ হইতে সংযুক্ত প্রদেশ পৃথক করিয়া একজন ছোট-লাটের উপর দেওয়া হয়। সেখানেও শিক্ষার হাওয়া বহিয়াছিল, তবে তাহা নিতান্ত ক্ষীণ। অধিবাসীদের মধ্য হইতে তেমন করিয়া প্রাণের সাড়া পড়ে নাই। সরকার প্রত্যেক তহশীলে একটি করিয়া বিদ্যালয় স্থাপন করেন; এবং চতুর্পার্শ্বস্থ পাঠশালা গুলির উন্নতি করিবার জন্য তদারক অর্থসাহায্য ও উপদেশাদির ব্যবস্থা করেন।

মাদ্রাস গভর্ণমেণ্ট ১৮৪১ সালে মাদ্রাসে একটি ও মফঃসলের

দুই চারিটি জায়গায় কয়েকটি ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। প্রাথমিক শিক্ষার কোনই ব্যবস্থা ছিল না। পাদরীগণ কর্তৃক স্থাপিত পাঠশালাগুলি অর্থসাহায্য পাইত।

বম্বে প্রদেশে সুবিখ্যাত এলফিন্‌ষ্টোন সাহেব ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের জন্য জেলায় জেলায় উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। অনেকগুলি দেশী ভাষার স্কুল সরকারী সাহায্য পাইতে লাগিল এবং পাঠশালাগুলি তদারকের ব্যবস্থা হইল। এই রূপে ধীরে ধীরে ভারতের নানা স্থানে ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত হইতে থাকিল।

১৮৫৩ সালে কোম্পানীর সনদ লইবার সময়ে পার্লামেন্ট তদারক কালে ভারতের শিক্ষার অবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে খোঁজ করিলেন। তাহারই ফলে ১৮৫৪ সালে কোম্পানীর বোর্ড অব কন্ট্রোলের সভাপতি স্যার চার্লস্ উড্ এদেশের শিক্ষোন্নতিকল্পে নূতন এক প্রস্তাব প্রেরণ করিলেন। এই প্রতিবেদন অনুসারে ভারতের শিক্ষার আগাগোড়া নূতন করিয়া গঠিত হইল। এতদিন উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শিক্ষার জন্য সরকার অর্থ ব্যয় করিয়া আসিতে ছিলেন। জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা-প্রচারের কোনো ব্যবস্থা হয় নাই। বিশ বৎসর যাবৎ সরকার নিজ অর্থব্যয়ে স্কুল কলেজ স্থাপন ও পরিচালন করিয়াছিলেন, দেশীয়দের সাহায্য তাঁহারা চান নাই। কিন্তু এমন করিয়া শিক্ষা দেশব্যাপী হইতে পারে না; সেই জন্য বেসরকারী চেষ্টায় ও অর্থে যাহাতে বিদ্যালয় স্থাপিত হয় সেই দিকে তাঁহারা দৃষ্টি দিলেন। মহামতি উডের প্রস্তাবানুসারে নিম্নলিখিত পরিবর্তনগুলি সাধিত হইয়াছিল—(১) শিক্ষা সাধারণের মধ্যে বিস্তৃত করিবার ব্যবস্থা হইল। (২) প্রত্যেক প্রদেশে পৃথক পৃথক্ সাধারণ শিক্ষা সমিতি বা Department of Public Instruction গঠিত হইল। (৩) ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের

প্রস্তাব এই সময়ে হয়, এবং কয়েক বৎসরের মধ্যে কলিকাতা বম্বে ও মাদ্রাসে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। (৪) বেসরকারী বিদ্যালয় যাহাতে অধিক পরিমাণে স্থাপিত হয় সেজন্য সাধারণকে উৎসাহিত করা ও সেগুলিকে যথাযথভাবে তত্ত্বাবধানে রাখিবার জন্য অর্থ সাহায্য করিয়া বাধ্যবাধকতার মধ্যে আনিবার কথা হয়। (৫) সরকারী স্কুল ও কলেজের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করিবার প্রস্তাব হয়। (৬) মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন ও শিক্ষকদের শিক্ষার জন্য স্কুল স্থাপনের কথা তিনি ঐ সঙ্গে উপস্থিত করেন।

১৮৫৭ সালে বঙ্গদেশ, বম্বে, মাদ্রাস, সংযুক্ত-প্রদেশে ২ লক্ষ ৩০ হাজার ছাত্রের মধ্যে প্রায় দুই লক্ষ পাঠশালাতেই পড়িতেছিল; চারি প্রদেশে প্রায় ৫ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে সিপাহী বিদ্রোহ হওয়ায় রাজকোষে অর্থের অত্যন্ত টানাটানি হয়; সুতরাং শিক্ষার জন্য পৃথক কর বা সেস্ গ্রহণ ছাড়া শিক্ষা প্রচার করা অসম্ভব হইল। ১৮৬৫ সালে সিন্ধুপ্রদেশে ও পর বৎসরে মাদ্রাসে ও ১৮৬৯ সালে বম্বেতে ও আরও দুই বৎসর পরে যুক্ত প্রদেশ ও পঞ্জাবে এই কর ধার্য্য করা হয়।

ইহার পর পঁচিশ বৎসর ভারতের শিক্ষানীতির মধ্যে আর কোনো পরিবর্ত্তন হয় নাই। এই কয় বৎসরে শিক্ষা যথেষ্ট অগ্রসর হইয়াছিল; ১৮৫৫ সালে বঙ্গ বিহার উড়িষ্যাতে যেখানে কেবলমাত্র ৪৭টি স্কুল ছিল—গভর্ণমেণ্টের অতিরিক্ত চাপ হ্রাস করিয়া দেওয়াতে দেড় বৎসরের মধ্যে ৭৯টি বিদ্যালয় অর্থ-সাহায্য পাইবার জন্য সরকারের নিকট আবেদন করে। ১৮৭১ সালে উচ্চ ইংরাজী স্কুল ১৩৩টি ও মধ্য ইংরাজী স্কুল ৫৫১ হইয়াছিল। ১৮৮২ সালে স্কুলের সংখ্যা ২০৯টি হয়। ২৫ বৎসরে ৪৭টির স্থানে ২০৯টি বিদ্যালয় হইয়াছিল। ১৮৮২ সালে ভারতে ৯০ হাজার সরকারী বে-সরকারী সকল প্রকার

বিত্থালয়ে ২৫ লক্ষ বিত্থার্থী পাঠ করিত ও ৬৭টি কলেজের বিত্থার্থী সংখ্যা ছিল ৬ হাজার।

১৮৮২ সালে ভারতের শিক্ষার অবস্থা আলোচনা করিবার জন্ম এক কমিশন বসে। ইহার পূর্ববর্ত্তী আর দুটি সরকারী কমিশনের মন্তব্যের ফলে শিক্ষাবিভাগে যেরূপ যুগান্তর হইয়াছিল এই বৈঠকের ফল সেরূপ হয় নাই।

ভারতের বিশেষতঃ বাংলার উচ্চ ইংরাজী শিক্ষার প্রসার এত বাড়িয়াছিল যে তাহা শিক্ষা-বিভাগের আয়ত্বের মধ্যে আর ছিল না। এই কমিশন একথা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই এবং বেসরকারী শিক্ষা প্রচারের জন্ম তাঁহারা আরও উৎসাহ দিলেন; গভর্ণমেণ্ট যাহাতে অতিরিক্ত চাপ দিয়া দেশের চেষ্টাকে নিরস্ত না করেন ইহাই এই কমিশনের উদ্দেশ্য। পঞ্চাশ বৎসরের ইংরাজী শিক্ষার ফলে ভারতের এমন এক শ্রেণীর লোক হইয়াছিল যাহাদের আশা ও আকাঙ্ক্ষা য়ুরোপীয় ধরণের; য়ুরোপের স্বাধীন চিন্তা, য়ুরোপের স্বাধীন রাজনৈতিক অবস্থা সমস্তই তাঁহাদের আদর্শ হইয়াছিল।

১৮৮২ সালের কমিশনের তদারকের ফলে দেশের সর্বত্র নূতন নূতন কলেজ ও স্কুল স্থাপিত হইতে লাগিল। বাংলাদেশের অনেক গুলি স্কুল বাড়িতে বাড়িতে কলেজে পরিণত হইয়াছিল, এই স্কুল ও কলেজের মধ্যে কোনো প্রকার ভেদ ছিল না, একই পরিচালক, একই তহবিল। একই বাড়ীতে সবই হইত। অধিকাংশ স্থলে বাঙালী জমিদারগণ উচ্চ শিক্ষার জন্ম অনেক ব্যয় করিতেছিলেন। কলেজ বিভাগে প্রথম প্রথম লোকসান হইত বটে কিন্তু স্কুল বিভাগের আয় হইতে তাহা পূরণ হইত। ইংরাজীশিক্ষার প্রচারের সঙ্গে কলেজের ছাত্র সংখ্যা বাড়িতে লাগিল এবং অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে কলেজগুলিও প্রথমে আত্মনির্ভরশীল ও পরে লাভজনক হইয়া উঠে।

১৮৮২ হইতে ১৯০২ পর্য্যন্ত ভারতের শিক্ষা বিভাগের বিশেষ কোনো পরিবর্ত্তন হয় নাই। ১৯০১ সালে সকল প্রকার বিত্যালয়ের সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ৫ হাজার—বিশ বৎসরে ২৫ হাজার স্কুল বাড়িয়াছিল। ছাত্র সংখ্যা ১৯০১ সালে ৪০ লক্ষ—অর্থাৎ বিশ বৎসরে ১৫ লক্ষ বাড়িয়াছিল। এ ছাড়া বেসরকারী ৪৩ হাজার পাঠশালায় প্রায় ৬ লক্ষ বিত্থার্থী ছিল। ১৮৮১ সালের তুলনায় বিশ বৎসরের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষালয়ের ছাত্র সংখ্যা ৪৯% এবং উচ্চ ইংরাজী স্কুলে প্রায় চারি গুণ বা ১৮০% হারে বাড়িয়াছিল। এক বাংলাদেশে ২০৯টি স্কুলের স্থানে ৫৩৫টি হাই স্কুল হইয়াছিল এবং মধ্য ইংরাজী স্কুল ত্রিশ বৎসরে ৫৫১টির স্থানে ১,৪৮১টি হইয়াছিল। এবারেও দেখা গেল প্রাথমিক শিক্ষা হইতে উচ্চ ইংরাজী শিক্ষা দ্বিগুণের উপর বাড়িয়াছে। কলেজ বিভাগের উন্নতি প্রাথমিক শিক্ষা অনুপাতে খুবই বেশী হইয়াছিল। ১৮৮১ সালে সমগ্র ভারতে সকল শ্রেণীর ৬৭টি কলেজ ছিল ১৯০১ সালে ১৪৫ হয়; ছাত্র সংখ্যা ৬ হাজারের স্থানে ১৭½ হাজার হইয়াছিল। এ ছাড়া ৪৬টি আইন, চিকিৎসা ও অন্যান্য প্রকারের কলেজে প্রায় ৫½ হাজার বিত্থার্থী অধ্যয়ন করিত। বাংলা দেশে সরকারী কলেজে ছাত্র সংখ্যা ক্রমেই হ্রাস পাইতেছিল এবং বেসরকারী কলেজে বাড়িতেছিল। শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল পরীক্ষা পাশ ও উপাধি গ্রহণ—তা' সে যেমন করিয়াই হউক। ভাল মন্দ কলেজ, ভাল পড়ানো মন্দ পড়ানো প্রভৃতি চিন্তা গরীব ছাত্রদের মনে আসিত না। তাহার মনে আসিত কোথায় সস্তা হইবে। স্কুল ও কলেজে সর্ব্বত্রই পড়ানো হইত পাশ করাইবার জন্য। বিশেষ কতকগুলি পুঁথির বিশেষ স্থানগুলি বিশেষ ভাবে পড়াইয়া নোট দিয়া মুখস্থ করাইয়া য়ুনিভার্সিটির পরীক্ষা পাশ করানো শিক্ষকদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। বিত্যালয়ে শিক্ষকদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। সরকারী স্কুলে বেতন ২৫৲ টাকা হইতে ২০০৲ টাকা পর্য্যন্ত

হইত। বেসরকারী বিদ্যালয়ে ৫৲ টাকা হইতে ৭৮৲ টাকা মাসিক বেতন ও হইত। উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে শিক্ষার খরচ বাংলা দেশেই সব চেয়ে কম পড়িত—মাথা পিছু মাত্র ১৮৲; বম্বেতে ৩৮৲, যুক্ত প্রদেশে ৩৬৲, মাদ্রাজে ২৩৲। ভারতের মধ্যে বাংলাদেশের শিক্ষা সস্তা ছিল বলিয়া উহা খারাপ হইত এবং খারাপ হইত বলিয়াই উহা সস্তা পড়িত।

গত শতাব্দীর শেষভাগে শিক্ষা বিষয়ে চারিদিক হইতে এইরূপ সমালোচনা হইতে লাগিল। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় হইতে যেসকল ছাত্র উপাধি লইয়া বাহির হইতেছে তাহারা যথার্থ উপাধির মর্য্যাদা রক্ষা করিতেছে কিনা, শিক্ষার আদর্শ নীচু হইয়াছে কিনা, পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক কিনা, য়ুনিভার্সিটির সিনেট সভার সদস্য সংখ্যা অত্যন্ত অধিক কিনা ইত্যাদি অনেক প্রশ্ন উঠিতে লাগিল। ১৮৯৮ সাল হইতে এ বিষয়ে অনুসন্ধান, বিচার, দ্বন্দ্ব আরম্ভ হয়। ঐ বৎসরে সমগ্র ভারতের শিক্ষা বিভাগের পরিদর্শনের জন্য একজন কর্ম্মচারী বিলাত হইতে আনীত হন। ১৯০১ সালে তৎকালীন বড় লাট লর্ড কর্জ্জন শিম্‌লা পাহাড়ে য়ুরোপীয়দের লইয়া এক বিশেষ সভা আহ্বান করেন। ১৯০৫ সালে পুনরায় এক কমিশন বসানো হয়। তাঁহাদের প্রতিবেদন প্রকাশিত হইলে ১৯০৪ সালের য়ুনিভার্সিটি অ্যাক্ট পাশ হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পরিচালনার ভার সিনেটের উপর ন্যস্ত ছিল। সিনেটের সভ্য হওয়া সম্বন্ধে কোনো প্রকার নিয়ম ছিল না বলিলেই হয়; সরকার সম্মান দিবার জন্য এমন সকল লোককে সভ্য শ্রেণীভুক্ত করিতেন যাহাদের শিক্ষার সহিত কোন প্রকার যোগ ছিল না। সভ্যেরা আজীবন সিনেটের সদস্যরূপে মনোনীত হইতেন। ইহাদের মধ্যে অনেকেই সরকারী কর্মচারী বা হাইকোর্টের উকিল। অধ্যাপকগণ কচিৎ সভায়

মনোনীত হইতেন, অনেক বড় বড় নামজাদা অধ্যাপক কখনো সিনেটের সভ্য হইতে পারেন নাই। এইরূপে সিনেটে এমন সকল লোক প্রবেশ লাভ করিয়াছিলেন যাহাদের সেখানে কোনো প্রয়োজন নাই, শিক্ষা বা শিক্ষকতার সহিত কোনো প্রকার সম্বন্ধ নাই; তাঁহাদের সংখ্যা নিতান্ত কম ছিল না; তাঁহারা নূতন নূতন বিধি ব্যবস্থার ঘোর বিরোধী ও সকল প্রকার উদারনীতির পরম শত্রু ছিলেন।

১৯০৪ সালের য়ুনিভার্সিটি অ্যাক্ট অনুসারে সরকারী বে-সরকারী সকল কলেজ পরিদর্শনের ব্যবস্থা হইল। সিনেটের সভ্য সংখ্যা একশত করা হইয়াছে; ইহার মধ্যে ৮০ জনই সরকারী মনোনীত; ১০ জন রেজিষ্টার্ড গ্রাজুয়েট্ (বি, এ পাশ করিয়া যে কেহ বার্ষিক দশ টাকা দিলেই রেজিষ্টার্ড গ্রাজুয়েট হইতে পারেন) কর্ত্তৃক নির্বাচিত ও ১০ জন বিভিন্ন শিক্ষার ফ্যাকালটী হইতে নির্বাচিত হন। এত বড় সমিতেতে কোনো কাজ করা কঠিন; সেইজন্য ইহাদের মধ্য হইতে ১৫ জন সভ্যকে নির্বাচন করিয়া একটি কার্য্য-নির্বাহক সভা বা সিণ্ডিকেট গঠিত হইয়াছে। এই সিণ্ডিকেটে কলেজের ৭ জন অধ্যাপক থাকেন। কোনো প্রস্তাব সিনেট হইতে উঠিয়া সিণ্ডিকেটে পাশ হইলে গভর্ণমেণ্টের নিকট অনুমোদনের জন্য যায়। গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক পাশ্ না হইলে কোনো প্রস্তাব কার্য্যকারী হইতে পারে না। পূর্ব হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর অনেক পরিমাণে গভর্ণমেণ্টের প্রভুত্ব করিবার ক্ষমতা বাড়িয়াছে। ১৯০৪ সালে বড়লাটের সভায় মহামতি গোখলে য়ুনিভার্সিটিকেও সরকার বিভাগের অন্তর্গত করিবার চেষ্টার বিরুদ্ধে ঘোর প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। লর্ড কর্জ্জনের সময়ে এই আইন মোটেই লোকপ্রিয় হয় নাই। কিন্তু এখন সকলেই দেখিতেছেন যে ইহার দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্য্যাদা অনেক পরিমাণে বাড়িয়াছে। বর্ত্তমানের পর্য্যবেক্ষণ ও তদারকের ফলে শিক্ষার অবস্থা ও ব্যবস্থা দুইই উন্নতি লাভ করিয়াছে। পূর্বে যে

সরকারী স্কুল ও কলেজে লাইব্রেরী লাব্রোটারী অধ্যাপক শিক্ষক বাড়ীঘর স্বাস্থ্য ক্লাসের ছাত্র সংখ্যা সম্বন্ধে কোনোই বাঁধাবাঁধি ছিল না। যে সব নিয়ম ছিল তাহা পালন হইতেছে কিনা তাহা কেহই দেখিত না বা জানিত না; বর্ত্তমানে এই সমস্ত বিষয়ে কড়াকড়ি হইয়াছে; এক্ষণে লাব্রোটারীতে পরীক্ষা ছাড়া বিজ্ঞান পড়ানো সম্ভব হয় না। এই সব কারণে খরচ বাড়িয়া গিয়াছে ছাত্রদেরও বেতন বৃদ্ধি পাইয়াছে। পূর্বে বেসরকারী স্কুল কলেজগুলি স্বত্বাধিকারীগণের সাধারণতঃ একটি কারবার ছিল। এখনো যে এই শ্রেণীর বিদ্যালয় নাই তাহা নহে; তবে নূতন আইনের ফলে এই শ্রেণীর বিদ্যালয় অনেক কমিয়া গিয়াছে।

১৯১৩ সালে গভর্ণমেণ্ট শিক্ষা বিষয়ে উন্নতি করিবেন বলিয়া মনস্থ করেন। কলেজ ও স্কুলগুলির সংলগ্ন হোষ্টেল বা ছাত্রাবাস রাখিবার ব্যবস্থা, প্রাথমিক পাঠশালার সংখ্যা দ্বিগুণ করিয়া জনশিক্ষার প্রসার করিবার ইচ্ছা করেন। পাঠশালার গৃহাদির উন্নতি ও শিক্ষকগণের বেতনবৃদ্ধি প্রভৃতি সাধু কর্মানুষ্ঠানে তাঁহারা মনোযোগ দিয়াছিলেন। কিন্তু পর বৎসরে যুদ্ধ আরম্ভ হওয়াতে সরকারের অনেক সাধু সংকল্প কার্য্যে পরিণত করা সম্ভব হইল না।

যুদ্ধের পর ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে পুনরায় আর একবার নাড়াচাড়া পড়িয়াছে। পনের বৎসর পূর্বে বাংলা বিহার উড়িষ্যায় ১,৯১,৬৪৮ জন বিদ্যার্থী ছিল—১৯১৭ সালে এক বাংলা দেশেই ২,১৮,০৭০ জন ছাত্রছাত্রী। মাট্রিকুলিশন পরীক্ষায় ১৬ হাজার ছাত্র উপস্থিত হইয়াছিল। এই বিপুল ছাত্রবাহিনীর শিক্ষার ব্যবস্থা একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের করা অসম্ভব। শিল্প, বাণিজ্য, সৈনিক, নৌবিভাগ প্রভৃতি অসংখ্য দিকে অন্য-দেশের ছেলেরা যাইতে পারে; কিন্তু এখানে দুই চারিটি পথ নির্দ্দিষ্ট থাকায় সমস্ত লোক উপাধি গ্রহণ করিবার জন্য সেইদিকে ছুটিতেছে। কলিকাতা

বিশ্ববিত্থালয়ের উপর এত চাপ পড়িয়াছে বলিয়া পাটনা বিশ্ববিত্থালয়কে পৃথক্ করিয়া দেওয়া হইয়াছে; ঢাকায় আর একটি বিশ্ববিত্থালয় খোলা হইল। এবং বর্মাতে নূতন বিশ্ববিত্থালয় খুলিবার প্রস্তাব হইতেছে, এলাহবাদ বিশ্ববিত্থালয় হইতে নাগপুর পৃথক্ করিয়া দিবার কথা চলিতেছে। লক্ষ্ণৌতে একটি বিশ্ববিত্থালয় হইতেছে।

১৯১৭ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে এক বৈঠক বসিয়াছিল। ১৯২০ সালে তাহার প্রতিবেদন প্রকাশিত হইয়াছে। বাংলা দেশের উচ্চ শিক্ষা কিভাবে নূতন করিয়া গঠন করা যায় ইহা এই কমিশনের উদ্দেশ্য। শিক্ষা বিষয়ক বিখ্যাত পণ্ডিত ডাঃ স্যাডলার এই বৈঠকের সভাপতি। ইঁহারা কেবল কলিকাতা বিশ্ববিত্থালয় ও উচ্চ শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহাদের মতামত দিয়া গিয়াছেন। কেবল মাত্র সাহিত্যিক শিক্ষায় দেশের মঙ্গল নয়-বিজ্ঞান, টেক্‌নিক্যাল, বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ে বহু ছাত্র না গেলে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের যথার্থ উন্নতি হইতে পারে না। তাঁহাদের অন্যান্য মন্তব্য গভর্ণমেন্টের বিচারাধীন। এই কমিশনের মন্তব্য গৃহীত হইলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষার মধ্যে খুব বিপ্লব হইবে।

ভারতবর্ষে বর্ত্তমানে ৮টি বিশ্ববিত্থালয় আছে। এবং এখানে আমরা বাংলাদেশের শিক্ষা বিভাগের কথাই একটু বিস্তৃত করিয়া বলিব; অপর দেশের শিক্ষাযন্ত্র প্রায় এইরূপ,—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাপারে সামান্য বিশেষত্ব প্রত্যেক প্রদেশেই আছে।

১৮৫৭ সালে কলিকাতা বিশ্ববিত্থালয় স্থাপিত হয়। গভর্ণর জেনারেল বা বড়লাট ইহার স্থায়ী চান্‌সেলার বা সভাপতি ও গভর্ণর ইহার রেক্টর বা পরিদর্শক। ভাইস-চান্‌সেলার সাধারণত দুই বৎসরের জন্য মনোনীত হইয়া থাকেন। সিনেটের সভ্য সংখ্যা ১০০। এই সভ্যদের মধ্য হইতে ১৫ জনকে লইয়া একটি কার্য্যনির্বাহক সভা

গঠিত আছে ; ইহার নাম সিণ্ডিকেট। ভাইস্-চান্সেলার সিণ্ডিকেট ও সিনেটের অধিবেশনে সভাপতির কাজ করেন ও প্রত্যক্ষভাবে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সকল কাজের জন্য তিনি দায়ী। স্যর নীলরতন সরকার ভাইস্ চান্সেলার ছিলেন। স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় পুনরায় মনোনীত হইয়াছেন। সিনেট কর্ত্তৃক নিযুক্ত সম্পাদককে রেজিষ্ট্রার বলে—শ্রীযুক্ত জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ বর্ত্তমানে এই পদে নিযুক্ত। ইনি পূর্বে স্কটীশচার্চ কলেজের অধ্যাপক ছিলেন ও পরে কলেজ-পরিদর্শক হন।

কলিকাতা য়ুনিভারসিটির খাস তত্ত্বাবধানে একটি আইন-কলেজ ও সায়েন্স বা বিজ্ঞান কলেজ আছে। এছাড়া কলিকাতাস্থিত যাবতীয় এম্ এ পড়াইবার ভার এখন য়ুনিভার্সিটি স্বয়ং লইয়াছে। বর্ত্তমানে নিম্নলিখিত প্রোফেসারশিপগুলি আছে—(১) আইনের প্রসন্নকুমার ঠাকুর অধ্যাপক (২) অর্থনীতির মিণ্টো প্রোফেসার (৩) দর্শনে পঞ্চম জর্জ অধ্যাপক (৪) উচ্চগণিতের হার্ডিংজ প্রোফেসার (৫) ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের কারমাইকেল প্রোফেসার (৬) রসায়ন ও জড় বিজ্ঞানের পালিত প্রোফেসর (৭) গণিত ও জড়বিজ্ঞানের, রসায়ন, ও উদ্ভিদ বিদ্যার রাসবিহারীঘোষ প্রোফেসর (৮) ইংরাজীর দুটি প্রোফেসর। এ ছাড়া অনেক সহকারী অধ্যাপক, লেক্‌চারার, রীডার আছেন।

গত পনের বৎসরের মধ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষায় যেরূপ দ্রুত উন্নতি হইয়াছে, এখানকার কৃত অধ্যাপকগণ দেশে বিদেশে মৌলিক গবেষণায় যেরূপ নাম করিয়াছেন, ভারতের আর কোনো বিশ্ব-বিদ্যালয় এরূপ করিতে পারে নাই। ইতিপূর্বে য়ুনিভার্সিটী বলিলে সিনেটের অপিষ বুঝাইত এবং ইহার কাজ বলিতে বুঝাইত উত্তীর্ণ ছাত্রদের উপাধি দেওয়া।

বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষার প্রসারের জন্য ও য়ুনিভার্সিটির উন্নতির জন্য মাননীয় বিচারপতি স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট

বাঙ্গালী চিরদিন ঋণী থাকিবে। তাঁহার আটবৎসর কাল ভাইসচান্‌সেলারীর সময়ে বিশ্ববিদ্যালয় যথার্থই বিশ্বের বিদ্যার কেন্দ্র হইয়াছে। য়ুনিভার্সিটি কলেজের অধ্যাপকগণের অনেকে সময়, সুযোগ ও উৎসাহ পাইয়া নানা বিষয়ে গবেষণা করিতেছেন। এই বৎসর হইতে এম্, এ, তে বাংলা পড়াইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। ভারতীয় কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে মাতৃভাষার এত আদর ইতিপূর্বে হয় নাই। ইহার প্রত্যেকটি অনুষ্ঠান, প্রতিষ্ঠানের সহিত ইহার প্রত্যেক শিক্ষণীয় বিষয়ের সহিত আশুতোষের নাম যুক্ত।

বাংলাদেশের জনশিক্ষা সরকারী বেসরকারী উভয়ের চেষ্টায় হইতেছে, তবে সরকার সমস্ত শিক্ষার কর্ত্তা; তাঁহারা কোনো বিদ্যালয়কে গ্রাহ্য না করিলে সেখানে পৃথক্ শিক্ষা চলা সম্ভব হয় না। সেইজন্য যাবতীয় পাঠশালা, স্কুল, কলেজ এই বিরাট শিক্ষাযন্ত্রের সহিত কোনো না কোনো সূত্রে গ্রথিত আছে। বেসরকারী বিদ্যালয়গুলি সাধারণত সরকারী সাহায্য পাইয়া থাকে; যাহারা সাহায্য গ্রহণ করে না তাহাদের উপর কর্ত্তৃত্ব করিবার অধিকার তাঁহারা রাখেন। বাংলাদেশে গভর্ণমেণ্ট—কলেজের চেয়ে বেসরকারী কলেজের সংখ্যাই অধিক। কলিকাতা সহরে গভর্ণমেণ্ট তিনটি কলেজ চালাইতেছেন প্রেসিডেন্সি, বেথুন ও সংস্কৃত—। কলিকাতার বাহিরে হুগলী, কৃষ্ণনগর, ঢাকা, রাজসাহী ও চট্টগ্রামে খাশ সরকারী কলেজ আছে। শিক্ষকদের শিক্ষা দিবার জন্য কলিকাতায় ও ঢাকায় শিক্ষাকলেজ আছে। যাহারা উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে অধ্যাপন করেন তাঁহারা এই দুই কলেজে পড়েন। এখান হইতে L. T. ও B. T. উপাধি দেওয়া হয়। উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে বাংলাভাষা পড়াইবার জন্য শিক্ষকের প্রয়োজন হয়; তাহাদের শিক্ষার জন্য ৫টি বিভাগের কেন্দ্রে নর্ম্মাল স্কুল আছে। এছাড়া আরও ১১৫টি গুরুট্রেনিং বিদ্যালয়ে পাঠশালার পণ্ডিতেরা শিক্ষা পাইয়া থাকেন।

সরকার শিবপুরে একটি ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ ও ঢাকাতে একটি ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল, কলিকাতায় মেডিক্যাল কলেজ, বেলগাছিয়াতে পশু-চিকিৎসার কলেজ, আর্ট স্কুল ও বাণিজ্য কলেজ, ও শ্রীরামপুরে তাঁতশিক্ষা কলেজ পোষণ করেন। এছাড়া আরও কয়েকটি মেডিক্যাল স্কুল সরকারী তত্ত্বাবধানে চলে।

সাধারণ শিক্ষার জন্য বর্দ্ধমান ও মেদিনীপুর ব্যতীত প্রত্যেক জেলাতেই সরকারী উচ্চ ইংরাজী—বিদ্যালয় আছে; এগুলি অন্য স্কুলের মডেল বা আদর্শ স্বরূপ। কলিকাতাতে ছেলেদের জন্য চারিটি বিদ্যালয় আছে; ইহার মধ্যে হেয়ার ও হিন্দু প্রেসিডেন্সী কলেজের সহিত যুক্ত; সংস্কৃত কলেজের সংলগ্ন একটি স্কুল আছে। আলিপুরে সম্ভ্রান্ত ধনী সন্তানদের জন্য হেষ্টিংস হাউস নামে যুরোপীয় আদর্শ গঠিত একটি বিদ্যালয় আছে।

মেয়েদের জন্য সরকারী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় কলিকাতায়, ঢাকায়, মৈমনসিংহে ও চট্টগ্রামে আছে। পশ্চিমবঙ্গে এক কলিকাতা ব্যতীত আর কোথায়ও মেয়েদের উচ্চশিক্ষা লাভের উপায় নাই। উত্তরবঙ্গেও কোথায় হাইস্কুল নাই। এই সরকারী মহিলা স্কুল ব্যতীত বেসরকারী যে কয়টি স্কুল আছে তাহা খৃষ্টান ও ব্রাহ্মগণের দ্বারা পরিচালিত।

গ্রামের পাঠশালাগুলি অধিকাংশ স্থানে লোকাল বা জেলা বোর্ড কর্ত্তৃক পরিচালিত। সরকারী পরিদর্শকগণ দেখিয়া শুনিয়া পরীক্ষা করিয়া মাসিক সাহায্যের ব্যবস্থা করেন।

বাংলার অপেক্ষাকৃত পশ্চাদপদ জাতির মধ্যে সরকার শিক্ষাবিস্তারের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এখানকার অন্ত্যজ ও নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে শিক্ষা ছিল না বলিলেই হয়। ১৯১৭ সালে এই শ্রেণীর ছাত্রসংখ্যা ছিল ৭৭ হাজারের উপর; ছাত্রীসংখ্যা ছিল প্রায় ৯ হাজার। ইহাদের মধ্যে এক নমশূদ্রের সংখ্যা ছিল ৪১ হাজারের উপর। এ ছাড়া নেপালী, লেপচা,

গারো, খাশিয়া, চাকৃমা টিপরা, মগদের শিক্ষার জন্য সরকার অনেক টাকা ব্যয় করেন। তবে এসব শিক্ষার ভার খৃষ্টান মিশনারীরা স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছেন। সরকার তাঁহাদিগকে প্রচুর অর্থ সাহায্য করেন। কিন্তু তাঁহারা জীবনদিয়া ইহাদের শিক্ষাদান ও সেবা করিতেছেন।

বাংলাদেশের মুসলমানদের সংখ্যা সমস্ত জনসংখ্যায় অর্দ্ধেকের উপর। শিক্ষায় ইহারা খুবই পিছাইয়া আছে; ইহার কারণ পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। কলিকাতা, হুগলী, ঢাকা ও চট্টগ্রামস্থিত মাদ্রাসা সরকারী সাহায্য পাইয়া থাকে; এখানকার ২,৩৯ লক্ষ মুসলমানের মধ্যে ২,২৯ লক্ষ নিরক্ষর! মাত্র ৬২ হাজার মুসলমান ইংরাজী ভাষা জানে; মুসলমানদের শিক্ষার এই শোচনীয় অবস্থা দূর করিবার জন্য সরকার ও মুসলমান দর নেতাদের দৃষ্টি গিয়াছে।

সরকারী ব্যয় ছাড়া ম্যুন্সিপালটিগুলি তাহাদের আয়ের কিয়দংশ লোকশিক্ষার জন্য খরচ করিতে বাধ্য। এই টাকা সাধারণত পাঠশালা-দিতে ব্যয়িত হয়। মেদিনীপুরের ম্যুন্সিপালটি একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজ ও বর্দ্ধমান বরানগর ও চট্টগ্রামের ম্যুন্সিপালটি প্রত্যেকে একটি করিয়া হাইস্কুল চালান।

১৯১৭ সালে বাংলা প্রদেশের শিক্ষার অবস্থা:—

আর্টকলেজ	৩৩	উচ্চ ইংরাজীস্কুল	২,৭৫৬
আইনকলেজ	৯	প্রাথমিক	৪১,৯৬১
মেডিক্যাল	২	বিশেষ	১,৩৩১
ইঞ্জীনীয়ারিং	১	বেসরকারী	২,২৬৯
শিক্ষাকলেজ	৫		

মোট ছাত্রসংখ্যা ১৯,১৮,৪২০৪ জন

বাংলাদেশের সরকারী শিক্ষার ভার একজন পরিচালকের (ডিরেক্টর) উপর ন্যস্ত। তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য দুই জন সহকারী পরিচালক আছেন; ইহাদের মধ্যে একজন মুসলমান শিক্ষার জন্য বিশেষ ভাবে দায়ী। এছাড়াও টেক্‌নিক্যাল ও শিল্প-শিক্ষা পরিচালনের জন্য একজন বিশেষ কর্ম্মচারী নিযুক্ত আছেন। বাংলাদেশের পাঁচটি বিভাগে পাঁচজন ইন্সপেক্টর বা পরিদর্শক আছেন। বিভাগের আয়তন ও শিক্ষানুযায়ী প্রত্যেক ইন্সপেক্টরের কয়েকজন করিয়া সহকারী ইন্সপেক্টর সাহায্য করেন। ইহঁাদের সকলের উপর স্কুলের শিক্ষা তদারকের ভার।

প্রাথমিক শিক্ষা পরিদর্শনের জন্য প্রত্যেক জেলার একজন ডেপুটি ইন্সপেক্টর আছেন। তাঁহার অধীনে কয়েকজন অতিরিক্ত ডেপুটি ও সব-ইন্সপেক্টর কার্য্য করেন। আবার সবইন্সপেক্টরদের সাহায্য করিবার জন্য কোথাও সহকারী সবইন্সপেক্টর বা পরিদর্শক পণ্ডিত ও মৌলবী আছেন। মোটের উপর শিক্ষা বিভাগে পরিদর্শকের সংখ্যা খুব বেশী। ইহাদের বেতনেই শিক্ষা বিভাগের অনেক টাকা ব্যয় হইয়া যায়।

হাতেকলমে শিল্পশিক্ষা ও টেক্‌নিক্যাল কাজকর্ম্ম শিক্ষা দিবার মত বিদ্যালয়ের সংখ্যা এদেশে বেশী নাই। এত বড় মহাদেশের তুলনায় যে কয়টি সরকারী টেক্‌নিক্যাল স্কুল আছে তাহার সংখ্যা নিতান্ত সামান্য। সরকারী ছাড়া ম্যুন্সিপালিটি ও বেসরকারী তত্ত্বাবধানে কতকগুলি ছোট ছোট স্কুল আছে। খৃষ্টান পাদরীগণের পরিচালিত অনেকগুলি টেক্‌নিক্যাল স্কুল ভারতের নানাস্থানে আছে; ইহার মধ্যে মুক্তি ফৌজদের চেষ্টা বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য। সরকারী বিদ্যালয়ের মধ্যে রুর্কীর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ, বম্বের জুবিলি টেক্‌নিক্যাল কলেজ, পুণার বিজ্ঞান-কলেজ, শিবপুরের ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ, মাদ্রাজের কলেজ অব ইঞ্জিনীয়ারিং সমধিক বিখ্যাত। বেসরকারীর মধ্যে কলিকাতার

জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের টেক্‌নিক্যাল স্কুল ও বড়োদার কলাভবন উল্লেখ যোগ্য। দেরাদুনে আরণ্যবিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য একটি সরকারী কলেজ আছে। মাদ্রাজে ও বর্মাতে উচ্চশ্রেণীর দুটি বিদ্যালয় আছে এবং প্রতি প্রদেশেই আরণ্যবিদ্যা শিখাইবার ব্যবস্থা আছে।

চিকিৎসা-শাস্ত্র শিখাইবার জন্য কলিকাতার মেডিক্যাল কলেজ ও বম্বের গ্র্যাণ্ট মেডিক্যাল কলেজ বিখ্যাত। এছাড়া প্রতি প্রদেশেই দুই একটি করিয়া মেডিক্যাল স্কুল আছে। কলিকাতায় কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজ কয়েক বৎসর হইল স্থাপিত হইয়াছে। ইহা বেসরকারী তত্ত্বধানে হইলেও সরকারী বিত্থালয়ের ছাত্রদের সঙ্গে ইহাদের পরীক্ষা গৃহীত ও উপাধি বিতরিত হয়।

প্রায় প্রত্যেক প্রদেশেই কৃষি-বিত্থালয় আছে ; এই বিত্থালয়গুলি প্রাদেশিক শাসনকেন্দ্রের অধীন ; একমাত্র পুসার কৃষি-কলেজ ভারত গভর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে। পুসার কৃষি কলেজ হইতে শিক্ষালাভ করিয়া বিশেষজ্ঞগণ কৃষি-বিভাগের নানা কাজে নিযুক্ত হন। ১৯১৫ সালে সকল প্রকার টেক্‌নিক্যাল বিত্থালয়ে ১২½ হাজারের কিছু বেশী ছাত্র অধ্যয়ন করিত।

সিপাহী বিদ্রোহের পর হইতে এদেশের কাজে কর্ম্মে ব্যবসায় বাণিজ্যে বহু য়ুরোপীয়কে আসিতে হইয়াছে। সাহেবদের সংখ্যা নিতান্ত কম নহে। ইহাদের শিক্ষার ভার সরকারের উপর। দেশীয়দের সঙ্গে তাহাদের বিদ্যাশিক্ষা একত্র হইতে পারে না বলিয়া তাহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ পৃথক্ করা হইয়াছে। লর্ড লিটনের সময়ে এদেশীয় য়ুরোপীয়দের শিক্ষার অবস্থা অনুসন্ধানের ফলে প্রকাশ পায় যে অধিকাংশ বালক বালিকা ভীষণ অজ্ঞতার মধ্যে বাড়িয়া উঠিতেছে। ১৮৮১ সালে য়ুরোপীয়দের শিক্ষা বিষয়ক এক আইন পাস হয় ও সেই সঙ্গে ইংরাজী ও স্কটীশ শিক্ষালয়ের আদর্শে কতকগুলি বিত্থালয় স্থাপিত হয়। প্রত্যেক প্রদেশেই সাহেবদের

শিক্ষা পরিদর্শনের জন্য সরকারের বিশেষ কর্ম্মচারী নিযুক্ত আছেন। ১৯১৭ সালে বাংলাদেশে সাহেবী স্কুলের ছাত্র সংখ্যা ছিল ৯,৬৩৪। বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৭৯টি। এই বিদ্যালয়ের জন্য সরকারী তহবিল হইতে ৮ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা বৃত্তি দেওয়া হয়; ইহার মোট ব্যয় প্রায় ২৭½ লক্ষ টাকা। সরকারী খরচ মাথাপিছু ৮৮৲ পড়ে; বাংলা দেশের সাধারণের শিক্ষায় মাথা পিছু খরচ ৫৲ টাকারও কম পড়ে।

রাজবংশীয় বালকগণের শিক্ষার জন্য ভারতবর্ষে পৃথক্ শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। এই সকল বিদ্যালয়ে কেবলমাত্র রাজপরিবারের, সর্দ্দার ও সামন্তগণের পুত্রেরাই পাঠ করে। আজমীড়ে, লাহোরে, ইন্দোরে ও রাজকোটে এই শ্রেণীর বিদ্যালয় আছে। বিচক্ষণ সিভিলসার্ভিসের লোকের উপর ইহাদের শিক্ষার ভার।

সরকারী শিক্ষাবিভাগের চাকুরী তিন ভাগে বিভক্তঃ—(ক) ভারতীয় শিক্ষা সার্ভিস (খ) প্রাদেশিক শিক্ষা সার্ভিস (গ) নিম্ন শিক্ষা সার্ভিস। (ক) ভারতীয় শিক্ষা সার্ভিসে কেবলমাত্র বিলাতের বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতি ছাত্রদিগকেই কাজ দেওয়া হইত। প্রত্যেক প্রদেশে যে একজন শিক্ষা পরিচালক থাকেন তিনি এই সার্ভিসের লোক। এই পরিচালক স্থানীয় ছোটলাটের ব্যবস্থাপক সভার সদস্য। তাঁহার অধীনে তিন শ্রেণীর শিক্ষাবিভাগের কর্ম্মচারী আছেন যথা—(১) পরিদর্শক বা ইন্সপেক্টরগণ (২) সরকারী কলেজের অধ্যাপক ও অধ্যক্ষগণ (৩) সরকারী হাইস্কুলের হেড্ মাষ্টারগণ।

বিলাত হইতে আমদানী অধ্যাপকগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ৫০০৲ টাকা মাসিক বেতনে কাজ আরম্ভ করেন এবং বাৎসরিক ৫০৲ টাকা করিয়া বৃদ্ধি হইয়া ১০০০৲ টাকা হয়। কোন কোন প্রদেশের শিক্ষা পরিচালকের বেতন মাসিক ২,৫০০৲ টাকা পর্য্যন্ত হয়। ১৮৯৬ সাল হইতে শিক্ষা বিভাগের কর্মচারীদের জন্য বিশেষ উদ্বৃত্ত অর্থ দিবার ব্যবস্থা

হইয়াছিল। সরকার বলেন একমাত্র ডিরেক্টরের বেতন ব্যতীত আর কোনো বেতন তেমন লোভনীয় নহে বলিয়া ভারতের শিক্ষা বিভাগে উপযুক্ত লোক আসিতেছে না। ১৯১৭ সালে এই সার্ভিসে ২৫৫ জন লোক ছিলেন। দশ বৎসর পূর্ব্বে ১৯০৭ সালে ১৫৭ জন ছিল। ১৯১২ সালে ২১১ জনের মধ্যে ৩ জন মাত্র ভারতবাসী ছিল, কিন্তু বর্ত্তমানে অনেক ভারতবাসী এই কার্য্য পাইতেছেন।

ভারতের যাবতীয় শিক্ষাবিভাগের ভার বড়লাটের অধ্যক্ষ সভায় একজন সদস্যের উপর ন্যস্ত। স্যর শঙ্কর নায়ার এই সভ্য ছিলেন। সরকারের সঙ্গে তাঁহার মতান্তর হওয়ায় তিনি কর্ম্মত্যাগ করেন ও তাঁহার স্থানে মিঃ সাফি নামক জনৈক মুসলমান ব্যারিষ্টার মনোনীত হইয়াছেন।

(খ) প্রাদেশিক শিক্ষাসার্ভিস। সরকারী স্কুলের হেডমাষ্টার, কলেজের প্রোফেসর, ইন্সপেক্টার প্রভৃতি এই সার্ভিসের অন্তর্গত। এই বিভাগে সাধারণতঃ ভারতবাসীরা নিযুক্ত হন। ইহার মাসিক বেতন ২০০৲ হইতে ৭০০৲ টাকা।

(গ) নিম্নশিক্ষা সার্ভিস। ডেপুটি-ইন্সপেক্টর, সব-ইন্সপেক্টর সরকারী স্কুলের শিক্ষকগণ এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহার নিম্নতম বেতন ৪০৲ ও উচ্চতম বেতন ৪০০৲ টাকা।

শিক্ষা বিভাগে উত্তরোত্তর বিদেশী লোকের আমদানী দেশে আদৌ প্রীতিকর হইতেছে না। দাদাভাই নৌরজী প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ব্বেই এই বিষয়ের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। অনেক ইংরাজও এবিষয়ে বলিয়াছেন। কেহ কেহ মনে করেন স্কুলকলেজে সাহেব ও দেশীয় অধ্যাপকগণের বেতন ও সম্মানের মধ্যে পার্থক্য, বিদেশী অধ্যাপকগণের স্থানীয় অবস্থাসম্বন্ধে অজ্ঞতা ও দেশের ইতিহাস ও ধর্ম্মের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রকাশের ফলে যুবকদের মনে নানা প্রকার বিরুদ্ধ ভাবের সৃষ্টি করিয়াছে; বহু অপ্রীতিকর ঘটনারও ইহা অন্যতম কারণ।

বর্ত্তমানে কথা উঠিয়াছে যে ইংরাজীশিক্ষা তেমন সন্তোষজনক হইতেছে না; সুতরাং ছোটবেলা হইতে ইংরাজ শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রীর কাছে তাহারা যাহাতে শিক্ষা পায় সেরূপ ব্যবস্থা হওয়া উচিত।

ষাট বৎসর হইল ভারতবর্ষ খাস ইংরাজ সরকারের হাতে গিয়াছে। এই কয় বৎসরে শিক্ষার উন্নতি কিরূপ হইয়াছে তাহাই এখানে দেখা যাক্।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৮৫৭, বম্বে ও মাদ্রাস ১৮৫৮, পঞ্জাব ১৮৮২, এলাহাবাদ ১৮৮৭ ও পাটনা ১৯১৬ সালে স্থাপিত হইয়াছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলির তত্ত্বাবধানে ১৩৮টি আর্ট কলেজ (১২৮টি পুরুষদের, ১০টি মহিলাদের) আছে। এই কলেজগুলিতে বালকদের ১,২৭৮ টি ও বালিকাদের ১৪৪টি উচ্চ ইংরাজীস্কুল বিদ্যার্থী প্রেরণ করিয়াছে।

১৯১৭ সালে কলেজে ৪৭ হাজার ও সমস্ত স্কুলে ছাত্র ও ছাত্রী ৫ লক্ষ ৬২ হাজারের উপর বিদ্যার্থী পাঠ করিতেছিল; পাঠাশালায় ৫৮ লক্ষের উপর বিদ্যার্থী ছিল।

এই সংখ্যাগুলি দেখিলে হঠাৎ মনে হইতে পারে ভারতের লেখা পড়াজানা লোকের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। কিন্তু ভারতের ৩১ কোটি লোকের তুলনায় যে ৭৫২ লক্ষ লোক স্কুলকলেজ ও পাঠশালায় পড়িতেছে তাহা অধিক নহে। সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা ৩.২% জন লোক বা ছেলেদের মধ্যে ৫.৩% ও মেয়েদের ১% জন বিদ্যাশিক্ষা করিতেছিল। স্কুলে যায় না বা স্কুলকলেজ ত্যাগ করিয়াছে এমন লোকও অনেক আছে। ইহাদের লইয়া ভারতের লেখাপড়া-জানা লোকের সংখ্যা পুরুষদের মধ্যে একশতের মধ্যে ১০.৬% জন ও মেয়েদের মধ্যে ১ জন—অর্থাৎ ৯৯ জন নিরক্ষর। এগার জন পুরুষের জায়গায় একজন মাত্র মেয়ে লেখা পড়া জানে। ১৯১১ সালের আদামসুমারী অনুসারে শতকরা ৬ (৫.৯) জন লোক লেখা পড়া জানিত।

ভারতবর্ষ শিক্ষা বিষয়ে জগতের সকলের নীচে। বিদেশের সহিত তুলনা করিলে আমাদের শোচনীয় অবস্থা সহজেই বুঝা যাইবে। ফিলিপাইনদ্বীপপুঞ্জ বিশবৎসর মার্কিনের অধীন হইয়াছে; ইহার মধ্যে সেখানে যে প্রকার উন্নতি হইয়াছে তাহা খুবই বিস্ময়কর। জাপান অল্প কয়েক বৎসরে যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছে। ১৮৭২ সালে তাহাদের দেশে জনশিক্ষা বাধ্যতামূলক হয়। '৭৩ সালে পাঠোপযোগী ছাত্রদের মধ্যে শত করা ২৮ জন, '৮৩ সালে ৫১ জন, ১৯০৪ সালে ৯৩ জন, ও ১৯১২-১৬ সালে ৯৮·২% জন বিদ্যালয়ে যাইত; কিন্তু ভারতে সে জায়গায় ১৮% জন মাত্র বিদ্যালয় শিক্ষা লাভ করিত। অর্থাৎ পনের বছর বয়সী ছেলে মেয়েদের শতকরা ৮২ জন লেখাপড়া শিখিতেছে না আর জাপানে সে বয়সী ছেলে মেয়েদের মধ্যে নিরক্ষর কেহ নাই বলিলেই চলে। ভারতের বালকদের মধ্যে শতকরা ২৩ জন ও বালিকাদের মধ্যে ৩জন মাত্র বিদ্যালয়ে যায়। সমগ্র জনসংখ্যার সহিত তুলনা করিলে ভারতে লেখা-পড়া-জানা লোকের সংখ্যা ১·৫%; জাপানের ১২%, বিলাতে ১৮%; মার্কিন রাজ্যের ২১%। এমন কি বড়োদা ও মহীশূর বৃটীশ ভারতের শিক্ষা হইতে আগাইয়া গিয়াছে।

ভারতবর্ষের এই মূঢ়তা দূর করিবার জন্য মহামতি গোখলে বড় লাটের সভায় শিক্ষা-বিষয়ক এক বিল উপস্থিত করেন। তিনি পৃথিবীর যাবতীয় সভ্যজাতির সহিত ভারতের তুলনা করিয়া দেখান যে এই অজ্ঞানতা বাধ্যতামূলক শিক্ষা ছাড়া দূর হইতে পারে না। ১৮৭০ সালে বিলাতে ও ১৮৭২ সালে জাপানে বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইবার পর উভয় দেশ কিপ্রকার উন্নতি করিয়াছে তাহা দৃষ্টান্ত স্থল। সাধারণ লোক বা সরকার তাঁহার কোন যুক্তিই সমীচীন বলিয়া বিবেচনা তখন করেন নাই। কিন্তু সুখের বিষয় গত দুই বৎসরের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য জনসাধারণ ও গভর্ণমেণ্ট উভয়েই মন দিয়াছেন এবং কোন কোন ম্যুন্সিপালিটির সীমানার

মধ্যে বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রচলিত করিবার অনুমতি দিয়াছেন। বঙ্গে সর্বপ্রথমে এই সুযোগের সুবিধা গ্রহণ করিয়া লোকশিক্ষার জন্য বদ্ধ পরিকর হইয়াছে। অন্যত্রও সেই চেষ্টা চলিতেছে।

১৯১২ সালে দিল্লীতে সম্রাটের অভিষেককালে তিনি ঘোষণা করেন যে ভারতের শিক্ষার দিকে তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষিত হইয়াছে, ভারতের শিক্ষা বিষয়ের দুর্দ্দশা আর থাকিবে না। এই অভিপ্রায়ে ভারতীয় রাজকোষ হইতে তিনি বার্ষিক ৫০ লক্ষ টাকা জনশিক্ষার জন্য ও উচ্চ শিক্ষার জন্য ১০ লক্ষ টাকার ব্যবস্থা করেন। এ ছাড়া এককালীন ৬৫ লক্ষ টাকা শিক্ষার উন্নতির জন্য দান করেন। ইহার ফলে কয়েক বৎসরের মধ্যে শিক্ষার বেশ উন্নতি হইয়াছিল। কিন্তু এমন সময়ে য়ুরোপে যুদ্ধ আরম্ভ হইলে শিক্ষার ব্যয় সঙ্কুচিত করা হয়—ও সম্রাটের সাধু ইচ্ছা ফলবতী হইতে পারিল না।

ভারতে বিদ্যার জন্য যে অর্থ ব্যয় করা হয় তাহা নানাভাবে সংগৃহীত হয়; তবে এই সবই ভারতীয় প্রজার নিজস্ব টাকা নানা উপায়ে প্রদত্ত। প্রথম আয় ছাত্র বেতন, দ্বিতীয় আয় প্রাদেশিক শাসন হইতে দান। তৃতীয় ভারতীয় রাজকোষের দান। অধিকাংশ হাইস্কুল ও অনেকগুলি কলেজ বেসরকারী সাহায্যে ও ছাত্রবেতনেই চলিতেছে।

শিক্ষার জন্য দান এদেশে অন্যদেশের তুলনায় খুব কম। উচ্চ শিক্ষার জন্য রায়চাঁদ প্রেমচাঁদের দান বিখ্যাত; বিজ্ঞানের জন্য স্যর রাসবেহারী ঘোষ, স্যর তারকচন্দ্র পালিতের দান উল্লেখযোগ্য; ইহাদের অর্থে কলিকাতার বিখ্যাত বিজ্ঞান কলেজ চলিতেছে। এছাড়া অনেক স্কুল কলেজ এইরূপ অর্থ সাহায্যে চলিতেছে তাহা পূর্বেই বলিয়াছি।

যুদ্ধের সময়ে সরকার বুঝিয়াছিলেন যে মূঢ়তা দেশের কি ক্ষতি করিতে পারে। ইংরাজদের পরাজয় কালে এত সব অদ্ভুত হাস্যকর গল্প নিরক্ষর লোকদের মধ্যে প্রচারিত হইয়াছিল যে সেকেবল আমাদের দেশে যেখানে

শতকরা ৯০ জন অক্ষরজ্ঞানশূন্য সেদেশেই সম্ভব। সুশিক্ষা যে যুদ্ধ জয়ের জন্য প্রয়োজন ও জাতির যথার্থ উন্নতির জন্য ও রাজ্যরক্ষার জন্য প্রয়োজন সরকার বুঝিয়াছেন। সুসভ্য জাতিরা বুঝিয়াছেন যে বিদ্যার জন্য ব্যয় করিলে জেল আদালত ও হাসপাতালের ব্যয় হ্রাস করা যায়।

টেক্‌নিক্যাল শিক্ষা।

ভারতবর্ষের শিল্পোন্নতির প্রথম অন্তরায় হইতেছে এখানকার শিক্ষার গলদ; পুঁথি বিদ্যা ও হাতের কাজের সঙ্গে একটা বিরোধ সৃষ্টি করা হইয়াছে। ভদ্রলোকেরা হাতের কাজ করিতে অনিচ্ছুক; পুঁথির বিদ্যা পাইবার জন্য সকলে ধনে প্রাণে মরিতেছেন। অপরদিকে শিল্পীরা প্রাচীন বাঁধা পথে চলিবে—এবং সামান্য লেখাপড়া শিক্ষা করাও তাহারা নিষ্প্রয়োজন মনে করে। ফলে পুঁথির বিদ্যা ও শিল্পীর কৌশল একত্র হইবার অবসর এদেশে কখনো পায় নাই। এখানকার শিক্ষিত লোকেরা অকেজো ও কাজের লোকেরা অশিক্ষিত।

ইংল্যাণ্ড য়ুরোপ আমেরিকা ও জাপান যে আজ এত বড় হইয়াছে ইহার কারণ সেখানকার শিল্প-শিক্ষার দিকে গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি বহুকাল পড়িয়াছে। ভারতবর্ষে যে যে কারণে শিল্পোন্নতি হয় নাই তাহার কারণ এই—(ক) ভাল শিক্ষকের অভাব। অধিকাংশ শিক্ষক কলেজে পাশ করা, যথার্থ শিল্পের সহিত দেখা সাক্ষাত তাঁহাদের খুব কম; কারণ দেশে বড় শিল্পকারখানা খুব কম। (খ) ভাল ছাত্রের অভাব। শিল্পীদের ছেলেরা গ্রাম হইতে নড়ে না; সহরে বা নিজের কারখানায় বা দোকানে তাহারা কাজ করে—আজকালকার শিল্পবিদ্যালয়গুলির প্রতি তাহাদের খুব শ্রদ্ধা নাই। তা ছাড়া এসব বিদ্যালয় গুলিতে প্রবেশ করিতে হইলে যে গুণ বা পড়াশুনা থাকার আবশ্যক তাহা নিরনব্বই জনের থাকে না। ভদ্রলোকের ছেলে

শিল্পবিদ্যালয়ে আসে বটে তবে সেখানেও পুঁথির বিদ্যাটুকু সে ভাল করিয়া শিখে ; কারণ সে জানে হাতে করিয়া কোনো কাজ তাহাকে করিতে হইবে না। ফলে বর্ত্তমানে বিদ্যালয় বলিতে ছুতার ও কামারের কাজ দাঁড়াইয়াছে! এছাড়াও যে আরও শত প্রকারের শিল্প শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে সে কথা খুব কম লোকেই মনে করে। (গ) টেক্‌নিক্যাল স্কুল যে কৃতকার্য্য হইতেছে না ইহার প্রধান কারণ দেশে লোকশিক্ষা নাই ; নিরক্ষর লোকদিগকে অক্ষরজ্ঞান দিয়া তারপর টেক্‌নিক্যাল শিক্ষা দিতে সময় যায় অনেক।

পাশ্চাত্য দেশে বাণিজ্য ও শিল্পোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে টেক্‌নিক্যাল বিদ্যালয় সমূহ খোলা হইয়াছিল—তা বৈ পূর্বে বিদ্যালয় খুলিয়া পরে শিল্পোন্নিতির চেষ্টা হয় নাই। দেশে শিল্প নাই বলিলে হয় ; এ অবস্থায় কাহারও শিল্প ও কারীগরী শিখিবার কোনো তাগিদ থাকে না। যাহারা বিদেশ হইতে শিল্প শিখিয়া আসিয়াছিলেন সুযোগ না পাইয়া কেহ কেহ বিলাতে ফিরিয়া গিয়াছেন কেহবা দেশে আসিয়া চাকুরী করিতেছেন।

বিলাতে ও পাশ্চাত্য দেশসমূহে ১৪।১৬ বৎসর (কোনো স্থানে ১৮ পর্য্যন্ত) পর্য্যন্ত লেখাপড়া শিখিতে লোকে বাধ্য ; তারপরেও যাহাতে তাহারা লেখাপড়ার চর্চ্চা করে—শিল্পকর্ম্ম শিক্ষা করে এজন্য নৈশ বিদ্যালয় আছে। যে লোক দিনের বেলায় সামান্য কাজ করে সন্ধ্যার পর সে নৈশবিদ্যালয়ে ইচ্ছা করিলে যে কোনো বিষয় পড়িতে পারে। ম্যানচেষ্টারের টেক্‌নিক্যালে স্কুলে পাঁচ হাজারের উপর ছাত্র সারাদিনের কঠিন পরিশ্রমের পর স্বেচ্ছায় ও নিজব্যয়ে পাঠ করিতেছে। ভারতবর্ষে এই শ্রেণীর কোনো বিদ্যালয় নাই বলিলেই হয়।

পরিশিষ্ট

প্রদেশানুযায়ী শিক্ষার অবস্থা—১৯১১ সালের আদমসুমারী অনুসারে হাজার জন লোকের মধ্যে শিক্ষিত

প্রদেশ	মোট	পুরুষ	স্ত্রীলোক
আসাম	৪৭	৮৬	৬
বাঙ্গালা	৭৭	১৪০	১১
বিহার উড়িষ্যা	৩৯	৭৬	৪
বম্বে	৬৯	১২০	১৪
বর্ম্মা	২২২	৩৭৬	৬১
মধ্যপ্রদেশ	৩৩	৬২	৩
কুর্গ	১০০	১৫৭	২৮
মান্দ্রাস	৭৫	১৩৮	১৩
উত্তর পশ্চিম সীমান্ত	৩৪	৫৮	৬
পঞ্জাব	৩৭	৬৩	৬
যুক্ত প্রদেশ	৩৪	৬১	৫
ভারত মোট	৫৯	১০৬	১০
করদ রাজ্য			
বড়োদা	১০১	১৭৫	২১
হায়দ্রাবাদ	২৮	৫১	৪
কাশ্মীর	২১	৩৮	১
মহীশূর	৬৩	১১২	১৩
কোচীন	১৫১	২৪৩	৬১
ত্রিবাঙ্কুর	১৫০	২৪৮	৫০
রাজপুতানা	৩২	৫৯	২
মধ্যভারত	২৬	৪৮	৩
সিকিম	৪১	৭৮	৩
মোট	৪৬	৮১	৯

(হাজার করা)

ধর্ম্ম হিসাবে (১৯১১ সালে)

	শিক্ষিত	নিরক্ষর	ইংরাজীজানা
হিন্দু	১১৮	৮৮২	১৮
মুসলমান	৪১	৯৫৯	৩
খৃষ্টান	৪৬৬	৫৩৪	৩৬১
ব্রাহ্ম	৭৮৩	২১৭	৬০২
বৌদ্ধ	৯১	৯০৯	৬
আদিম	৫	৯৯৫	১

অন্যদেশের সহিত তুলনা করিলেই সহজে বুঝা যাইবে আমাদের শিক্ষার কি ভীষণ অবস্থা। কোন্ কোন্ গভর্ণমেণ্ট শিক্ষার জন্য কিরূপ ব্যয় করেন তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে :—

দেশ	মাথাপিছু সরকারী ব্যয়	দেশ	মাথাপিছু সরকারী ব্যয়
মার্কিন যুক্তরাজ্য—	১২৲	নরওয়ে—	৩৶৹
সুইট্জারল্যাণ্ড—	১০৷৹	ফ্রান্স—	৩৸৹
অষ্ট্রেলিয়া—	৮৷৶৹	অষ্ট্রীয়া	২৷৴১০
ইংল্যাণ্ড-ওয়েলস্—	৮৲	স্পেন—	১৷৵৹
কানাডা—	৭৷৹	ইটালী—	১৶১০
স্কটল্যাণ্ড—	৪৶১০	সাইবেরিয়া	৸৵৹
জার্ম্মনী—	৫৵৹	জাপান	৸৵৹
আয়রল্যাণ্ড—	৪৸৹	রুশিয়া	৷৶১০
সুইডেন—	৪৶৹	ভারতবর্ষ	৴৹
বেলজিয়াম—	৪৲		

৭। আইন ও বিচার

দেওয়ানী।

এদেশের বিচার-বিভাগ প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত—দেওয়ানী ও ফৌজদারী। এই দুইটি নাম মুসলমান শাসনকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। টাকাকড়ি, জমিজমা, বিষয় সম্পত্তি, চুক্তি ক্ষতিপূরণ প্রভৃতি বিষয়ের বিচার পূর্বে দেওয়ানের আদালত বা কাছারীতে হইত বলিয়া ইহাকে 'দেওয়ানী' বলে। চুরি ডাকাতি, দাঙ্গা হাঙ্গামা, বঞ্চনা হত্যা প্রভৃতি অপরাধ সম্বন্ধীয় বিচারের ভার ছিল ফৌজদারের উপর, সেইজন্য এখনো সেগুলিকে ফৌজদারী মামলা বলে।

দেওয়ানী ও ফৌজদারীর অর্থ।

১৭৬৫ সালে লর্ড ক্লাইভ বাংলাদেশের দেওয়ানী পাইলেও বিচারের ভার নবাবের উপরই ছিল। তারপর ওয়ারেন হেষ্টিংস বড়লাট হইয়া আসিয়া ইহার আমূল সংস্কার সাধন করেন। তিনি দেওয়ানী ও ফৌজদারী এই উভয় প্রকার বিচারের ভার গ্রহণ করিলেন। রেগুলেটিং অ্যাক্ট অনুসারে ফৌজদারী ও দেওয়ানী আদালত স্থাপিত হইল ও চরম বিচারের ভার সুপ্রিম কোর্টের উপর ন্যস্ত হইল। এই সময়কার বিচারপদ্ধতির মধ্যে কি দোষ ছিল তাহা ইতিহাস পাঠক মাত্রেই জানেন।

প্রথম প্রথম কোম্পানীর শাসনকর্ত্তারা ও বিলাতের কর্তৃপক্ষীয়েরা ভাবিয়াছিলেন যে বিলাতে যে আইন চলে ভারতে তাহারই প্রবর্ত্তন করা সহজ। ১৭৮১ সালে তাঁহারা নিয়ম করিলেন যে মুসলমান ও হিন্দুদের বিচার উভয় ধর্মের নিজ নিজ নিয়মানুসারে হইবে। ইহার পর ১৮৬২ সালে হাইকোর্টের

দেওয়ানী বিচারের ইতিহাস।

প্রতিষ্ঠা হওয়া পর্য্যন্ত বিচার পদ্ধতি ও গঠনের মধ্যে অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। ইহার মধ্যে ১৮৩৩ সালে কলিকাতায় এক আইন বৈঠক বা ল-কমিশন বসে; সভ্যদের মধ্যে লর্ড মেকলে ছিলেন প্রধান; এই কমিশন যে দণ্ডবিধি প্রণয়ন করেন তাহা সামান্য পরিবর্ত্তিত হইয়া ১৮৬০ সালে আইনে পরিণত হয়। উক্ত সময়ের দেওয়ানী আইন অসম্ভবরূপে জটিল হইয়া দাঁড়াইয়াছিল; হিন্দু মুসলমানের আইন, কোম্পানীর আইন, ইংরাজদের জন্য কোম্পানীকৃত বিশেষ আইন, বঙ্গদেশ, মাদ্রাজ, বোম্বাইএর লাট সভার বিবিধ আইন প্রভৃতি এত জমিয়া উঠিয়াছিল যে তাহা হইতে সুবিচার করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ১৮৬০ সালে এই সব আইনের সংস্কার করিয়া দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিষয়ক আইন সংগৃহীত হয়।

১৮৩৩ সালের ল-মেম্বর।

অধুনা এদেশের সর্বোচ্চ বিচারালয় হাইকোর্ট। ১৮৬১ সালে কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাসে হাইকোর্ট স্থাপিত হয়। বঙ্গদেশে হাইকোর্টের পূর্বের নাম ছিল সদর দেওয়ানী ও সদর নিজামত আদালত। প্রথমভাগে দেওয়ানী, দ্বিতীয়ভাগে ফৌজদারী বিচার হইত। এখন হাইকোর্টে দেওয়ানী ফৌজদারী উভয়বিধ মোকর্দ্দমারই বিচার হয়। হাইকোর্টের অধীনে জজ ম্যাজিষ্ট্রেট্, সবজজ, মুন্সেফ প্রভৃতি আছেন। বর্ত্তমানে কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাস, এলাহাবাদ ও পাটনার হাইকোর্ট আছে। ১৮৬০ সালে পঞ্জাবে ও ১৯০০ সালে বর্মাতে হাইকোর্টের অনুরূপ প্রধান বিচারালয় স্থাপিত হইয়াছে; ইহাকে বলে চীফ কোর্ট। অযোধ্যা, মধ্যপ্রদেশ, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ উত্তর, বর্মা, কুর্গ, বেরার ও সিন্ধু প্রদেশে জুডিশিয়াল কমিশনরদের কোর্ট আছে। ক্ষমতা প্রায় সকল কোর্টেরই সমান।

হাইকোর্টের প্রতিষ্ঠা।

১৮৬১ সালের আইনানুসারে প্রত্যেক হাইকোর্টে একজন চীফজাষ্টিস ও পনের জনের অনধিক জজ্ থাকিতেন। কিন্তু কাজের চাপ খুব অধিক

হওয়ায় ১৯১১ সালে জজদের সংখ্যা ২০ জন পর্য্যন্ত হইতে পারিবে ঠিক হয়।

মুন্সেফের আদালত সর্বনিম্ন দেওয়ানী বিচারালয়। তাহার উপর সব-জজ, জেলা জজ্ ও হাইকোর্ট আছে। কোনো কোনো ক্ষুদ্র জেলায় স্বতন্ত্র জজ নাই। নিকটবর্ত্তী জেলার জজ ঐ সকল জেলায় কার্য্য করেন। বাংলা দেশের মধ্যে পাবনার জজ বগুড়ার, রাজসাহীর জজ মালদহের, এবং দিনাজপুরের জজ দার্জিলিংএর কার্য্য করেন। আবার ২৪ পরগণার ন্যায় বড় জেলায় একাধিক জজ আছেন।

মুন্সেফ সবজজ, জজের কর্ত্তব্য ও অধিকার।

যে সকল মোকর্দ্দমার বিচার্য্য বিষয়ের মূল্য ১০০০৲ টাকার অধিক নহে মুন্সেফরা তাহার বিচার করেন। জেলার সদর সহর ও মহকুমা ব্যতীত অন্য যে স্থানে মুন্সেফদিগের বিচারালয় আছে সে স্থানগুলিকে চৌকি বলে।

মুন্সেফদিগের উপরে প্রায় প্রতি জেলাতেই সব-জজ আছেন। কোনো কোনো জেলায় কাজের চাপ বেশী বলিয়া দুই জন তিন জন এমন কি চারি জন পর্য্যন্ত সব-জজ থাকেন। সব-জজেরা যে কোনো দাবীর মোকর্দ্দমার বিচার করিতে পারেন; কিন্তু জেলার জজেদের ১০ হাজার টাকার বেশী দাবী মোকর্দ্দমার শুনানির অধিকার নাই। মুন্সেফদিগের বিচারের বিরুদ্ধে আপিল শুনানীর বা পুনর্বিচার করিবার ক্ষমতাও ইঁহাদের আছে। পাঁচ হাজার টাকা পর্য্যন্ত দাবীর যে সকল বিচার ইঁহারা করেন তাহার বিরুদ্ধে আপিল জেলার জজ সাহেবের নিকট হয়। ইহার অপেক্ষা উচ্চ দাবীর মোকর্দ্দমা হইলে তাহার আপিল হাইকোর্টে হইয়া থাকে। হাই-কোর্টের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের প্রিভিকৌন্সিল হইয়া থাকে। সাধারণতঃ ১০,০০০৲ টাকার কম দাবীর মোকর্দ্দমার আপিল বিলাতে হয় না। হাইকোর্টই ইহার চরম বিচার করিয়া দেন। ইংরাজের বিচারালয়ে আপিল

১৯১৭ সালে দেওয়ানী মোকর্দ্দমার হিসাব নিকাশ।

প্রদেশ	দেওয়ানী রুজু মোকর্দ্দমার সংখ্যা।							টাকার দ্বারা যে সব মোকদ্দমার মুল্য নিরূপণ করা যায় না।	মোট মোকর্দ্দমার সংখ্যা।	মোট টাকার পরিমাণ (পাউণ্ড)
	১০৲ টাকার অনধিক মুল্যের দাবী	১০৲—৫০৲ দাবী	৫০৲—১০০ দাবী	১০০৲—৫০০৲ দাবী	৫০০৲-১০০০৲ দাবী	১০০০৲-৫০০০৲ দাবী	৫০০০৲টাকার উপর দাবী			
বঙ্গদেশ	১,০৭,৮২২	৩,২৮,৫৪৯	১,৫০,৩০৪	১,৫৩,৭৯৫	১৩,২৭০	৭,৩০৪	১,২৪৩	৯৪৬	৭,৬৩,২৩৩	৭১,৩২,২৩৩
বিহার উড়িষ্যা	৩৫,৮৯৫	৭৭,৪১২	৩০,৪৫৭	৩৪,৭৮৬	৪,৩৫৩	৩,৪৯০	৮৪১	১৮০	১,৮৭,৪১৪	৩৪,৮১,৮০১
যুক্তপ্রদেশ	১৩,৯৩১	৮৬,৬৪৮	৫৬,৫৩৩	৫৮,৩০২	৭,০০১	৬,১৮৯	১,৪১৩	২৩	২,৩০,০৪০	৪৭,৯৭,১১৯
পঞ্জাব	১৮,৮৭২	৬৬,৪৭৪	৫০,১৪৩	৫৩,৫৫৯	৮,০৯৭	৪,৫৩৮	৬১৫	৬৩৫	২,০২,৮৯৩	২৬,৫৫.৪২১
দিল্লী	৫৩৪	২,০৮১	১,২৪৯	১,৬১৩	৪৬৩	৩৭৯	১০৫	১	৬,৪২৫	১,২৯,৩৬৫
উঃ পঃ সীমান্ত প্রদেশ	৩,০৯৫	৯,৬১১	৬,৯২৬	৬,২৫০	৭৫৮	৫৯৭	৭৭	৫	২৭,৩২১	৩,০২,৬৩৪
বর্মা	৩,১২২	১৯,৫১৯	১৩,৬০৩	১৯,৪৬৮	২,৩৫৬	১,৭২৮	৩৮৬	১,৩০৯	৬১,৪৯১	১৫,৫২,৪৪৮
মধ্য:প্রদেশ	৭,৪৪১	৪৩,৫৭৩	২৮,৪৪৬	৩৩,৫৩২	৪,২৪৬	২,৮৭১	৩৮৫	১	১,২০,৪৮৫	২৯,৮০,৬৬৫
আসাম	৪,৮৩৭	২১,৭২৭	১০,৩৯২	১০,৩৮৮	৮১৯	৩১৮	৪২	৭১	৪৮,৫৯০	৩,৫৫,৪১৮
আজমীড় মেরবার	১,২১২	৪,১১৫	২,০৮৬	১,৫৯১	৪৪	৩৭	১১	×	৯,০৯৬	৮০,১৪৩
কুর্গ	২০৬	১,৫১৬	৬৩০	৪৯৪	৪৭	৩০	২	×	২,৯২৫	১৮,৬০৩
মান্দ্রাস	৮৭,৫২৪	১,৯৯,৪৫২	৮১,৭৬৫	১,০০,৫৪৩	১৩,০০২	৮,৫১৭	১,৩৫১	৮৮১	৪,৯৩,০৩৫	৬,৫,৬৬,৭৪৮
বোম্বাই	১১,১৮৮	৫৬,৮৫১	৩৩,৪৮৫	৪২,১২৪	৬,৫৬৫	৪,৮৩৩	১,০৫১	২,৩৩৩	১,৫৮,৪৩০	৫১,০৬,৮০৩
বেলুচিস্থান (বৃটীশ)	৫৮৬	১,৭৮৪	৬০১	৬৮৬	১১৯	৪৯	৬	১৬৪	৩,৯৯৫	৩২,১৫৪
										পাউণ্ড
মোট	২,৯৬,২২৫	৯,১৯,৩০৮	৪,৬৬,৬১২	৫,১৭,১৬১	৬১,১৪০	৪০,৮৮০	৭,৫২৮	৬,৫৪৯	২৩১.৫,৩৭৩	৩,৫২,০১,৪৫৫
১৯১১	২,৯৯,৫৪২	৮,৫৮,৩৮৮	৩,৮৭,৬৫৭	৪,০৬,৪৮৬	৪৭,৪০৮	৩১,৫৬৩	৫,৯৫৬	৬,৩৩৬	২০,৪৩,৩৩৬	২,৭৩,৫০,৫৮৫

এক বিশেষত্ব। দেশের লোকের হাইকোর্টের বিচারের উপর খুব আস্থা ও শ্রদ্ধা আছে।

কর্জ দেওয়া টাকার দাবী, বাড়ী ভাড়া প্রভৃতি সাধারণ দেনা পাওনার মোকর্দ্দমা ছোট আদালতে (Small Causes Court) হয়। পূর্বে দেশের বহু স্থানে ছোট আদালতে জজ ছিলেন। এখন ঢাকা, হুগলী, ২৪ পরগণা এবং দুই এক স্থানে ব্যতীত অন্য জেলায় ছোট আদালতে জজ্ নাই। মুন্সেফরাই ইহার বিচার করেন। কলিকাতার ছোট আদালতে পাঁচজন জজ আছেন। ইহারা কেবল সহরের মোকর্দ্দমা করেন। ছোট আদালতের জজদিগের বিচারের বিরুদ্ধে আপিল নাই। তবে আইন সংক্রান্ত ভুল ঘটিলে হাইকোর্টে পুনর্বিচার প্রার্থনা করিয়া মোশন বা বিশেষ আবেদন করা চলে।

ছোট আদালত।

ফৌজদারী।

আমরা এতক্ষণ দেওয়ানী বিচার সম্বন্ধেই বলিলাম। ফৌজদারী মোকর্দ্দমায় অপরাধীকে শাস্তি দিবার প্রধান আইনের নাম ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি। এই আইন পুস্তক হিন্দু, মুসলমান ও ভারতের নানা জাতির দণ্ড ব্যবস্থার সহিত তুলনা করিয়া প্রণীত হইয়াছিল. এবং প্রণয়নকারীরা এতই সুবিবেচনার সহিত ইহা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন যে ১৮৬০ সালে উহা প্রণীত হওয়া সত্ত্বেও এ পর্য্যন্ত বিশেষ কোনো পরিবর্ত্তন সংঘটিত করিবার প্রয়োজন হয় নাই।

ফৌজদারী আদালত।

বিচারক ম্যাজিষ্ট্রেট তিন শ্রেণীর। প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট অপরাধীকে দুই বৎসর কারাদণ্ড ও ১০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা করিতে পারেন; বেত্রদণ্ডও দিতে পারেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট্ ছয় মাস কারাদণ্ড ও ২০০৲ টাকা জরিমানা ও বেত্রদণ্ডের ব্যবস্থা করিতে পারেন। তৃতীয়

তিন শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট্।

শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট্ একমাস কারাদণ্ড ও ৫০ টাকা অর্থ দণ্ড করিতে পারেন।

ইহার উপরেই জেলার সেশন-জজদিগের আদালত। অধিকাংশ স্থলেই জেলার জজ্ ফৌজদারী বিচারও করেন। সেশন-জজেরা অপরাধীর প্রতি ফাঁসি কিংবা যাবজ্জীবন নির্বাসন দণ্ডবিধান করিতে পারেন। অতিরিক্ত (Additional) সেশন-জজদিগেরও এই ক্ষমতা আছে। কেবল সহকারী জজেরা সাত বৎসর কারাদণ্ড বা নির্বাসন দিতে পারেন।

সেশন জজ।

হাইকোর্টই সর্বোচ্চ বিচারালয় বলিয়া এখানকার জজদিগের ক্ষমতা অসাধারণ। ইঁহারা আইননির্দ্দিষ্ট সকল শাস্তি দিতে পারেন; আবার সেশন-জজদিগের বিচারের বিরুদ্ধে আপীল শুনেন ও লঘু পাপে গুরুদণ্ড বা গুরুপাপে লঘুদণ্ড হইলে পুনর্বিচার করেন। আবার যে সকল মোকর্দ্দমায় আপিলের ব্যবস্থা নাই, ইচ্ছা করিলে হাইকোর্ট সেই মোকর্দ্দমার কাগজ পত্র দেখিয়া নিম্ন-বিচারালয়ের আদেশ রহিত করিতে পারেন।

হাইকোর্ট।

হাইকোর্ট কিম্বা সেশন-জজেরা নিজে কোনো ফৌজদারী নালিশ গ্রহণ করেন না। গুরুতর অভিযোগে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটেরা প্রাথমিক অনুসন্ধান করিয়া যদি বুঝেন যে মোকর্দ্দমায় অপরাধীর বিরুদ্ধে যথেষ্ট প্রমাণ আছে, তাহা হইলে ঐ মোকর্দ্দমা সেশন-জজের নিকটে অথবা কলিকাতায় হইলে হাইকোর্টে পাঠাইয়া দেন। ইহাকে দায়রা সোপর্দ্দ করা বলে।

দায়রা সোপর্দ।

ফৌজদারী মোকর্দ্দমায় আপিল এইরূপ হইয়া থাকে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশের বিরুদ্ধে আপিল জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট কিংবা জয়েণ্ট-ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট হয়। ফৌজদারী বিচার সম্বন্ধে সরকার বাহাদুর সন্দেহমাত্র শাস্তি

আপিল ও প্রতিকার।

দেন না ; বিশেষ প্রমাণ না পাইলে কাহাকেও কিঞ্চিন্মাত্র দণ্ড দেওয়া তাঁহাদের মতবিরোধী। প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিকে ক্ষমা করিবার অধিকার একমাত্র রাজার আছে।

সাতবৎসরের অল্প বয়সের বালক বালিকা কোনো অপরাধে অপরাধী হইতে পারে না। তদূর্দ্ধবয়স্ক বালকদিগকে বিশেষ পরীক্ষা করিয়া শাস্তিবিধান করেন। উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির যুবকদিগকে প্রথম অপরাধে প্রতিভূ বা জামিন লইয়া ছাড়িয়া দেওয়ার নিয়ম আছে। অল্পবয়স্ক বালককে চরিত্র-সংশোধক বিদ্যালয়ে (Reformatory) পাঠাইবার ব্যবস্থা করা হয়। আলিপুরে জেলখানার একটি অংশ বালক-অপরাধীদের জন্য বিশেষভাবে নির্দ্দিষ্ট আছে।

Reformatory

সাধারণ সরকারী ম্যাজিষ্ট্রেট্ ব্যতীত অনেক সহরে ও কলিকাতায় অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট্ থাকেন। সহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে হইতে ইহারা নির্ব্বাচিত হন।

মোকর্দ্দমা।

দেওয়ানী মোকর্দ্দমা প্রতি বৎসর প্রায় ২০ লক্ষ করিয়া হয়। নিম্নের তালিকায় প্রতি হাজার জন অধিবাসীর মধ্যে কি পরিমাণ মোকর্দ্দমা হয় তাহা প্রদত্ত হইতেছে। ইহার মধ্যে আমাদের বাংলাদেশের অবস্থা সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয়। ১৯১৩ সালে প্রতি ১০০০ জন অধিবাসীর মধ্যে এইরূপ অভিযোগ হইয়াছিল :—

বঙ্গদেশ—১৪·২	মান্দ্রাজ—১১	মধ্যপ্রদেশ—৭·২	বর্ম্মা—৫·৩
	পাঞ্জাব—৯·৬	আসাম—৬·৪·	যুক্ত প্রদেশ৩·৮
উঃ পঃ সীমান্ত প্রদেশ—১২·৩	বোম্বাই—৭·৮	বিহার উড়িষ্যা-৫·৪	

দেওয়ানী মোকর্দ্দমার অধিকাংশই অর্থসংক্রান্ত; শতকরা ৪০টি মোকর্দ্দমার দাবী ৫০৲ টাকা মাত্র, শতকরা ১৪টির দাবী মাত্র ১০৲। দশহাজার টাকার দাবীর অভিযোগ ১৯১৩ সালে মাত্র ২৬৭০টি ছিল। সমগ্র অভিযোগের শতকরা ৭৬% টি একতরফা ডিগ্রি হয়; অর্থাৎ অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাদীর দাবী ন্যায্য। লোকে টাকা লইয়া যে ঠিক সময়ে টাকা শোধ করিতে পারে না বা করে না তাহার দুইটি কারণ হইতে পারে; এক লোকের চারিত্র-নীতির অভাব, আর লোকের সত্যকারের অর্থাভাব। সমগ্র মোকর্দ্দমার শতকরা ২৫% ভাগ আপিলে যায়।

দেওয়ানী মোকর্দ্দমার সংখ্যা বৃদ্ধি

ফৌজদারী মোকর্দ্দমার সংখ্যা বহুকাল তেমন বাড়ে নাই; কিন্তু বর্ত্তমানে পঞ্জাবে ও বঙ্গদেশে বিশেষভাবে বাড়িতেছে বলিয়া সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ। ১৯০১ সালের তুলনায় ১৯১৩ সালে ফৌজদারী অপরাধের অনুপাত শতকরা ২২% হারে বাড়িয়াছিল অথচ জনসংখ্যা বাড়িয়াছিল শতকরা ৬½ হারে। ঐ বৎসরে ১৩,৮১,৪৪৬টি মোকর্দ্দমা হইয়াছিল। ভারতবর্ষের লোকের মোকর্দ্দমার প্রতি এই অনুরাগ মোটেই শুভলক্ষণ নহে। সামান্য বিবাদ মিটাইবার ক্ষমতা আমাদের নাই; ন্যায্য দাবী দিতে আমরা নারাজ; শোষণ করিয়া পেষণ করিয়া মারিয়া আমরা সুখী হই; লোককে জেরবার করিয়া আনন্দ পাই।

ফৌজদারী অভিযোগের সংখ্যা বৃদ্ধি

৮। পুলিশ ও জেল।

ইংরাজ শাসনে দেশ শান্তিতে আছে। অনেকে বলেন ভারতবর্ষ এমন শান্তি পূর্বে কখনো ভোগ করে নাই; এই শান্তি রক্ষা করিতে সরকার বাহাদুরকে বিপুল আয়োজন ও অর্থব্যয় করিতে হয়। এই শান্তিরক্ষার জন্য পুলিশ ও সৈন্য বিভাগের সৃষ্টি, বিচারালয়ের প্রতিষ্ঠা।

চৌকিদার সর্বনিম্ন শান্তিরক্ষক। প্রত্যেক গ্রামে এক কিংবা ততোধিক চৌকিদার আছে। গ্রাম অতি ক্ষুদ্র হইলে কোনো কোনো স্থানে দুইতিন গ্রামে একজন চৌকিদার থাকে। এক একজন চৌকিদারকে সাধারণতঃ ১০০ হইতে ১২০ ঘর লোকের শান্তিরক্ষা করিবার কথা। বিভাগীয় কমিশনার সাহেবের আদেশ ব্যতীত ৬০ ঘরের কম সংখ্যক ঘরের নিমিত্ত একজন চৌকিদার নিযুক্ত হইতে পারে না। এক একটি গ্রাম-সমাহারের (ইয়ুনিয়ন) সমস্ত চৌকিদারের উপর এক একজন দফাদার থাকে। দফাদার গ্রাম সমহারের প্রধান শান্তিরক্ষক এবং তাহার অধীনস্থ চৌকিদারদিগের কার্য্য-পরিদর্শক। গ্রামের পঞ্চায়েত লোকের নিকট হইতে যে কর আদায় করেন তাহা হইতে দফদার চৌকিদার প্রভৃতির বেতন এবং পোষাকের দাম প্রভৃতি দেওয়া হয়। গ্রামের শান্তিরক্ষা সম্পূর্ণভাবে স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনের অন্তর্গত।

চৌকিদারী বন্দবস্ত

কতকগুলি গ্রাম লইয়া একটি থানা হয়। প্রত্যেক থানায় এক কিংবা একাধিক পুলিস সব-ইন্সপেক্টার বা ছোট-দারোগা আছেন। ইহাদের অধীনে হেড্‌কন্‌ষ্টেবল এবং কন্‌ষ্টেবল থাকে। অনেক সময়ে থানার দূরে আউট্-পোষ্টে (Outpost) হেড্‌কন্‌ষ্টেবলের অধীন কয়েকজন পুলিশ বাস করে। কয়েকটি থানা লইয়া একটি মহকুমা (Sub-division)

থানা, আউট্-পোষ্ট, মহকুমা, জেলা, বিভাগ।

গঠিত। প্রত্যেক মহকুমায় একজন ইন্‌স্পেক্টার বা বড়-দারোগা থাকেন। কয়েকটি মহকুমা লইয়া একটি জেলা; সেই জেলার পুলিশ বিভাগের ভার পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের উপর ন্যস্ত। বড় বড় জেলা হইলে দুই মহকুমার উপর একজন য়ুরোপীয় সহকারী-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত হন। জেলার পুলিশ সাহেব জেলার অপরাধাদির জন্য ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের নিকট দায়ী; পুলিশ-বিভাগের কাজের জন্য তিনি ডেপুটি-ইন্সপেক্টর জেনারেল ও ইন্সপেক্টর-জেনারেলের নিকট জবাবদিহি। আট দশটি জেলা লইয়া একটি বিভাগ করিয়া একজন ডেপুটি-ইন্সপেক্টর জেনারেলের অধীন দেওয়া হয়। সমগ্র প্রদেশের উপর ইন্সপেক্টর-জেনারেল; তিনি দেশের সমগ্র পুলিশ-বাহিনীর ভারপ্রাপ্ত।

গোয়েন্দা-বিভাগ

ইহা ছাড়া গোয়েন্দা বিভাগ আছে। বিচক্ষণ দারোগা, ইন্সপেক্টর প্রভৃতির মধ্য হইতে ইহাদিগকে বাহির করা হয়। রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র প্রভৃতি আবিষ্কারের জন্য ইহারা বিশেষ উপযোগী।

কলিকাতা প্রভৃতির পৃথক ব্যবস্থা।

বড় বড় সহরগুলির (কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাস) শান্তিরক্ষার জন্য যে পুলিশ আছে তাহা প্রাদেশিক পুলিশ-কর্তার অধীন নহে। কলিকাতার পুলিশ একজন পুলিশ-কমিশনরের অধীন। প্রাদেশিক পুলিশ-বিভাগ সম্বন্ধে, দিল্লী ও শিমলার ডিরেক্টর অব্ ক্রিমিনেল ইন্‌টেলিজেন্স ও তাঁহার কর্মচারীরা খোঁজ খবর রাখেন মাত্র এবং আন্তপ্রাদেশিক ব্যবস্থার সময়ে উপদেশাদি দিয়া থাকেন।

ভারতের কারাগার সম্বন্ধীয় শাসন ১৮৯৪ সালের কারাগার অ্যাক্ট অনুসারে চলে। ১৮৮৯ সালের জেল-কমিশনের ফলে কারাগার সম্বন্ধে অনেক নিয়ম বদল হয়। প্রত্যেক জেলায় এবং মহকুমায় কারাগার আছে।

কারাগার।

মহকুমার কারাগারগুলি ছোট; সেখানে বিচারাধীন অপরাধী ও সামান্য অপরাধে দণ্ডিত লোককে রাখা হয়। এ ছাড়া কেন্দ্রকারাগার বা সেন্ট্রাল আছে। যাহারা মহকুমায় একাধিক বৎসরের জন্য দণ্ডিত হয় তাহারা সেন্ট্রাল জেলে প্রেরিত হয়।

কারাবাসী অপরাধীদিগের জন্য সরকার বাহাদুর বহু সুনিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। কারাদণ্ড দুই প্রকার হয় এক সশ্রম আর এক বিনাশ্রম।

কারাগারে শ্রম।

বিনাশ্রমে যাহারা কারাদণ্ড ভোগ করে তাহাদিগকে কারাগারে আবদ্ধ থাকিবার সময়ে কোনই কাজ করিতে হয় না। সশ্রম কারাদণ্ডে নানারূপ পরিশ্রম করিতে হয়। যে শ্রেণীর লোক যেরূপ কার্য্য করিবার উপযুক্ত তাহাদিগকে সেইরূপ কার্য্য করিতে দেওয়া হয়।

কারাগারে লেখাপড়াজানা ভদ্রলোককে লেখাপড়ার কাজ, ছাপাখানার কাজ, ঘর পরিস্কার, আলোবাতি সাজাইবার কাজ প্রভৃতি দেওয়া হয়। অন্যান্যদের বাগানের কাজ, ছুতারের কাজ, তাঁতির কাজ, তেলপেশা প্রভৃতি নানারূপ কাজে নিযুক্ত করা হয়। কারারুদ্ধ লোকদিগের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়। প্রায় সকল স্থানেই সরকারী চিকিৎসক কারাগারের বড় চিকিৎসক। বড় কারাগারে একটি চিকিৎসালয় থাকে, একজন বিশেষ চিকিৎসক থাকেন। প্রতি রবিবারে কাজ বন্ধ থাকে ও কয়েদীদের ওজন করিয়া দেখা হয় তাহাদের ওজন কমিল কি বাড়িল। ওজন কমিলে কয়েদীকে শ্রমজনক কার্য্য কমাইয়া অথবা একেবারে বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় ও পুষ্টিকর খাদ্য ব্যবস্থা করা হয়। স্বাস্থ্যের জন্য কারাধ্যক্ষগণ সবিশেষ যত্ন গ্রহণ করেন। কয়েদীদের স্নানাহার শয়ন ব্যায়াম সম্বন্ধে নিয়ম থাকার ফলে জেল হইতে লোকে যখন বাহিরে আসে অনেক সময়ে তাহাদের স্বাস্থ্যোন্নতি দেখা যায়। কয়েদীরা মুক্তি পাইলে সরকার হইতে বাড়ী ফিরিবার পাশ ও পাথেয় তাহারা পাইয়া থাকে।

সাধারণ কারাগার ভিন্ন উন্মাদ লোকদের জন্য ও অল্পবয়স্ক অপরাধীদের জন্য বিশেষ কারাগার আছে। এখানে আবদ্ধ লোকদিগকে কারাগারের নিয়ম পালন করিতে হয়। সর্বত্র স্ত্রী কয়েদীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা আছে। ভারতবর্ষের জেলগুলি স্বাস্থ্য ব্যবস্থার দিক হইতে ক্রমশই উন্নতি লাভ করিতেছে।

বিবিধ কারাগার।

৯। সৈনিক-বিভাগ

ইংরাজদের ফাক্‌টরী স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে বর্ত্তমান সৈনিক বিভাগের সূত্রপাত। ফাক্‌টরীর পেয়াদা ও পিয়নেরা নিজ নিজ কাজ করা ছাড়া কারখানা রক্ষা করিত। তখনকার দিনে সশস্ত্র সৈন্য না রাখিলে আত্মরক্ষা করা সম্ভব হইত না। ইংরাজ ও ফরাশীর মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হইলে যথার্থভাবে এদেশে সৈনিক সংগ্রহ আরম্ভ হয়। ফরাশীরাই প্রথমে এই দেশীয় লোকদের য়ুরোপীয় ধরণে রণ-শিক্ষা দিতে থাকে। ইংরাজদের দিক হইতে মেজর ষ্টীন্‌জার লরেন্স সবপ্রথমে মান্দ্রাজের তৈলঙ্গীদের লইয়া এক বাহিনী গঠন করেন। বাংলাদেশের কোম্পানীর পাইক, পিয়ন ও পেয়াদারা দাঙ্গা হাঙ্গামার সময়ে যে যেমন ঢাল, তলোয়ার, বন্দুক, তীরধনুক, বর্শা, বল্লম লইয়া উপস্থিত হইত। ক্লাইভ বাংলাদেশে সৈনিক-বিভাগ গঠন করিলেন। এই সময়ে অরাজকতা হেতু রোহিল্লা, রাজপুত প্রভৃতি নানা জাতীয় সাহসিক পুরুষ দেশময় ঘুরিয়া বেড়াইত; ক্লাইভ তাহাদিগকে য়ুরোপীয়ভাবে শিক্ষিত করিতে লাগিলেন, এবং অচিরে তাহারাই অজেয় হইয়া উঠিল।

সৈনিক বিভাগের পূর্ব ইতিহাস।

পলাশী যুদ্ধের পর ভারতের নানা স্থানে ইংরাজদের শক্তি বৃদ্ধি পাইতে থাকে। মান্দ্রাস, বোম্বাই, বঙ্গদেশে ইংরাজ সৈন্য-বিভাগ পৃথক্‌ভাবে গড়িয়া উঠিতেছিল; প্রত্যেক প্রাদেশিক সৈনিক বিভাগের কিয়দ্‌পরিমাণে স্বাধীনতা ছিল। দেশীয় সৈন্যগণ ক্রমে ইংরাজ সরকারের দক্ষিণ হস্ত হইয়া উঠিল। লর্ড কর্ণওয়ালিস ১৭৮৭ সালে এক পত্রে লিখিয়াছিলেন, "আমাদের একদল সিপাহী যে কোনো ব্যক্তিকে হিন্দুস্থানের সম্রাট্‌ করিতে পারে। এদেশীয় সৈনিকদের মুখশ্রী দেখিয়া আমার আনন্দ হয়। কতকগুলি সৈন্যবাহিনী আশ্চর্য্যরূপে সুশিক্ষিত হইয়াছে, অফিসারদের মধ্যে নিজ নিজ উন্নতি করিবার চেষ্টাও যথেষ্ট, সৈন্যদের মধ্যে মনোযোগও আছে। ইহারা যে এককালে সংযমের পরাকাষ্ঠা দেখাইবে সে বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।"

সিপাহীদের শক্তি।

পলাশী যুদ্ধের পর চল্লিশ বৎসরের মধ্যে ভারতীয় সৈনিক বিভাগকে সুনিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য কোনো বিশেষ চেষ্টা হয় নাই। ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে উহা পুনর্গঠিত হয়; তখন য়ুরোপীয় সৈন্য ছিল ১৩,০০০ এবং দেশীয় সৈন্য ছিল ৫৭,০০০। লর্ড ওয়েলেস্‌লি ভারতের শাসনকর্ত্তা হইয়া এদেশে আসিয়া রাজ্যবিস্তারে বিশেষ মনোযোগ দিয়াছিলেন তাহা সাধারণ ইতিহাস পাঠক মাত্রেই জানেন। তাঁহাকে সেইজন্য সৈন্যসংখ্যা বাড়াইতে হইয়াছিল; ইংরাজ সৈন্যের সংখ্যা ১৮০৫ সালে ২৫,০০০ ও দেশীয় সৈন্য ১৩০,০০০ করা হইয়াছিল।

ইহার পর ১৮২৪ সালে একবার ও সিপাহী-বিদ্রোহের পর ১৮৫৯ সালে আর একবার সৈনিক বিভাগের খুব নাড়াচাড়া হয়। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের ফলে ইংরাজ সরকারকে অনেক বিষয়ে সাবধান হইতে হয়। সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে বেঙ্গল সৈন্যবিভাগে ২১,০০০ বৃটীশ ও ১ লক্ষ ৩৭০০০ দেশীয়, মান্দ্রাস সৈন্যবিভাগে ৮,০০০ বৃটীশ ও ৪৯০০০ দেশীয়, বোম্বাই

সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে সৈন্য সংখ্যা।

সৈন্যবিভাগে ৯,০০০ বৃটীশ ও ৪৫,০০০ দেশীয় সৈন্য ছিল; মোট ২,২৯০০০।

সিপাহী বিদ্রোহের ইতিহাস এইখানে বিবৃত করার কোনো প্রয়োজন নাই; তবে এইরূপ বিদ্রোহ আরও দুই একবার সৈনিকবিভাগে হইয়াছিল। ১৮০৬ সালে মান্দ্রাসের ভেলোরে খুব ভীষণ রকমের বিদ্রোহ দেখা দিয়াছিল। সববাহক ডুলিরা যেরূপ রঙের পাগ্‌ড়ী পরে ইহাদিগকেও সেইরূপ পাগ্‌ড়ী পরিতে হয়। এ ছাড়া ইংরাজ উচ্চকর্মচারীগণ সাধারণ সৈন্যদের নিকট হইতে এত দূরে দূরে থাকিতেন যে তাহাদের সহিত কোনো প্রকার সহানুভূতির যোগ ছিল না। এই বিদ্রোহ ব্যতীত ১৮২৪ সালের

বিদ্রোহ শেষে সংস্কার।

সংস্কারের পূর্বে বর্মা সমরের পর আর একবার ছোট খাটো বিদ্রোহ হইয়াছিল। কিন্তু চরম বিদ্রোহ হইল ১৮৫৭ সালে। বিদ্রোহ দমনের পর দেশে শান্তি স্থাপিত হইল; কোম্পানীর হাত হইতে বৃটীশ-রাজ স্বয়ং রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন। এই পুনর্গঠনের ফলে দেশীয় সৈন্যদের সংখ্যা ও সম্মান উভয়ই হ্রাস প্রাপ্ত হইল। দেশীয় সৈন্য শতকরা ৪০% হারে কমানো ও বৃটীশ সৈন্য শতকরা ৬০% হারে বাড়ানো হইল। এ ছাড়া ভারতবাসীকে ভবিষ্যতে গোলন্দাজ বিভাগে কাজ দেওয়া হইবে না ঠিক হইল; কেবলমাত্র পার্বত্য-গোলন্দাজী বিভাগ ও হায়দ্রাবাদের দেশীয় সৈন্যদের গোলন্দাজী সৈন্য মজুত থাকিল। ভারতে মোট সৈন্য সংখ্যা হইল ১ লক্ষ ৪০ হাজার, ইহার মধ্যে বৃটীশ সৈন্য ৬৫ হাজার ও অবশিষ্ট দেশীয়।

ইহার পর বিশ বৎসর পরে ভারত-সরকারের সম্মুখে এক নূতন সমস্যা আসিয়া উপস্থিত হইল। সে সমস্যা ভিতরের বিপ্লবের নহে,

রুষ ভীতি ও সৈন্য-বৃদ্ধি

বাহিরের আক্রমনের। কিছুকাল হইতে রুষীয়েরা মধ্য-এশিয়ায় সাম্রাজ্য বিস্তার করিতে করিতে ভারতের অতি নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল।

১৮৮৫ সালে এই সব লইয়া বৃটিশরাজের সহিত রুষ সরকারের বিবাদ ঘনাইয়া উঠিল এবং অনেকে আশঙ্কা করিতে লাগিলেন যে এই বিবাদ বোধ হয় বিগ্রহে পরিণত হইবে। তখন আবার একবার ভারতের সৈন্য বিভাগের সংস্কার হয়। অনেক যুদ্ধ-বিমুখ জাতিকে এই সময়ে সৈন্য বিভাগ হইতে বাদ দেওয়া হয়। মান্দ্রাজের অনেক জাতি যুদ্ধ বিষয়ে তেমন উৎসাহ দেখাইত না বলিয়া তাহাদিগকে এইবার বিদায় দেওয়া হইল। পূর্বে এক 'কোর' (corps) বা বাহিনীর মধ্যে নানা জাতি ও বর্ণের লোক ভর্ত্তি করা হইত এই সময়ে বর্ণ ও জাতিগত ভাগ অনুসারে সৈন্যগণকে পৃথক্ করিয়া দেওয়া হয়। অপরদিকে বৃটিশ সৈন্যের সংখ্যা সাড়ে দশ হাজারের উপর বাড়ানো হইল। ১৮৭৭ সালে বৃটীশ সৈন্যের সংখ্যা ৭৪ হাজার ও দেশীয় সৈন্যের সংখ্যা ১ লক্ষ ৫৩ হাজার হইল; মোট ২,২৬, ৬৮৪। পর বৎসরে সর্বদা রিজার্ভ সৈন্য রাখিবার জন্য আরও ২৫ হাজার সৈন্য বাহাল করা হইল।

দেশীয় রাজাদের সৈন্য বাহিনী গঠন।

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে দেশীয় রাজগণকে সাম্রাজ্য সেবা করিবার জন্য একটি বাহিনী গঠন করিতে অনুরোধ করা হয়। দেশীয় নরপতিরা বৃটীশরাজের এই আহ্বানে যথোচিত সাড়া দিয়াছেন; সমগ্র ভারতের করদরাজ্যে সমূহে প্রায় ২১ হাজার সৈন্য এই কার্য্যের জন্য গঠিত হইয়াছে। দেশীয় আফিসারগণ তাহাদের শিক্ষাদান করেন। কিন্তু য়ুরোপীয় কর্মচারীগণের উপর সমস্তের তদারকের ভার।

১৮৯১ সালের সংস্কার।

১৮৯১ সাল পর্য্যন্ত সমগ্র ভারতবর্ষের জন্য একজন জঙ্গীলাট বা Commander-in-Chief ছিলেন না; বোম্বাই, মান্দ্রাজ ও বঙ্গদেশে তিনজন পৃথক জঙ্গীলাট ছিলেন। ঐ বৎসরে সমগ্র ভারতের জন্য একজন জঙ্গীলাট নিযুক্ত হইলেন ও তিনটি পৃথক্ ব্যবস্থার পরিবর্ত্তে একটি ব্যবস্থার অন্তর্গত সকলকে করা হইল।

এ ছাড়া আভ্যন্তরিন ব্যবস্থার উন্নতি-সাধনে সরকারের দৃষ্টি পড়িল। ইতিপূর্বে দেশীয় সৈনিকদের বেতন ছিল সাত টাকা মাস। এই বৎসর হইতে ৯৲ টাকা মাস হইল। যুদ্ধের পূর্ব পর্য্যন্ত তাহারা ১১৲ টাকা পাইত। রিজার্ভ সৈন্যদের বেতন ২৲ টাকা মাত্র ছিল; দুই বৎসরের মধ্যে দুই মাস তাহারা রণশিক্ষা লাভ করে। পঁচিশ বৎসর পরে তাহারা ৩৲। ৩॥ হারে পেনশন্ পাইত।

১৯০২ সালে লর্ড কিচেনার ভারতের সৈন্যাধ্যক্ষ হইয়া আসিলেন। তিনি ভারতীয় সৈনিকবিভাগের যুগান্তর সাধন করেন। কিচেনার সৈন্যাধ্যক্ষের ভার লইয়া যখন ভারতে আসিলেন তখন সৈন্যাধ্যক্ষের কর্ত্তব্য ছিল বড়লাট ও তাঁহার সভার নির্দ্দেশ মত কাজ করা। সেনাপতিদের লইয়া কোনোরূপ সঙ্ঘ ছিল না; বড়লাটের মন্ত্রীসভার সমর-সচিবের হাতে সমগ্র সৈনিকবিভাগের ভার একরূপ ছিল। সৈন্যাধ্যক্ষ বড়লাটের সভার বিশেষ সভ্যরূপে সভায় উপস্থিত থাকিতেন; ব্যবস্থার ভার বা অন্য কোনো প্রকারের আধিপত্য তাঁহার ছিল না। তাঁহাকে সমর বিভাগের কোনো প্রকার পরিবর্ত্তন করিতে হইলে মন্ত্রীসভার সমর সচিবের হাত দিয়া তাহা পেশ করিতে হইত। এইভাবে সমরবিভাগ ক্রমেই দুর্বল হইয়া আসিতেছিল। এ ছাড়া সৈন্য বিভাগ নিতান্ত সে-কেলে ধরণে হইয়া উঠিয়াছিল; সৈন্য শিবির দেশময় ছড়ানো অথচ বিপদের জায়গাগুলি তেমন দৃঢ় নয়। অধিবাসীগণকে ভয় দেখাইয়া বশীভূত করিবার যুগ চলিয়া গিয়াছে, তাহারা শান্তিপূর্ণ সুশাসনের অধীনে থাকিয়া সাধারণ নিয়মকানুনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে শিখিয়াছে সুতরাং দেশের মধ্যে মধ্যে সৈন্য রক্ষার প্রয়োজন নাই। জঙ্গীলাট বাহাদুর লর্ড কিচেনার সৈন্য বিভাগের সংস্কার আরম্ভ করিলে তৎকালীন বড়লাট লর্ড কর্জ্জনের সহিত তাঁহার মতান্তর ঘটে। কর্জ্জন মিলিটারী বিভাগের প্রাধান্য স্বীকার

লর্ড কিচেনার ও সৈন্য বিভাগ সংস্কার।

করিতেন না ; কিন্তু অবশেষে বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষ কিচেনারের প্রস্তাবগুলি সমর্থন করেন। এই নূতন ব্যবস্থানুসারে ভারতীয় সৈনিকবিভাগকে নয়টি ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেকটিকে অশ্ব, পদাতিক ও গোলন্দাজ দিয়া সুসজ্জিত করিয়া দেওয়া হইল। প্রত্যেকটি দল যাহাতে সতন্ত্রভাবে যুদ্ধে যাইতে পারে এমনিভাবে এইবার গঠিত হইল। সৈন্যগণকে একস্থান হইতে অন্যস্থানে দ্রুত লইয়া যাইবার ব্যবস্থা ও রসদপত্র যথানিয়ম সরবরাহ করিবার সুবন্দোবস্ত হইল। এ ছাড়া (১৯০৫ সালে) মিলিটারী ডিপার্টমেণ্ট উঠাইয়া দিয়া সেইস্থলে মিলিটারী-সাপ্লাই বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হইল, জঙ্গীলাট বাহাদুর বড়লাট বাহাদুরের মন্ত্রনাসভার সদস্য হইলেন। লর্ড কিচেনার ভারতীয় সৈনিকদিগকে নিম্নলিখিতভাবে বিভক্ত করিলেন।

উত্তর-ভারতের সৈন্য-বিভাগ	হেড-কোয়াটার—মারী
১ম বাহিনী	,, পেশোয়ার
২য় ,,	,, রাবালপিণ্ডী
৩য় ,,	,, লাহোর
৭ম ,,	,, মিরাট
৮ম ,,	,, লক্ষ্ণৌ
বিশেষ ব্রিগেড—দেরা জাৎ ব্রিগেড	,, বান্নু
,, ,, কোহাৎ ,,	,, কোহাট
দক্ষিণ ভারতের সৈন্য-বিভাগ	,, পুণা
৪র্থ বাহিনী	,, কোয়েটা
৫ম ,,	,, ক্ষ্মৌ (বর্ম্মা)
৬ষ্ঠ ,,	,, পুণা
৯ম ,,	,, বাঙ্গালোর
বিশেষ ব্রিগেড	,, বোম্বাই
বর্ম্মা বাহিনী	,, মান্দালে

যুদ্ধে ভারত-সৈন্যের স্থান।

বিগত যুদ্ধের পূর্বে ভারতবর্ষের সকল জাতির লোক সৈনিক-বিভাগে প্রবেশ করিতে পারিত না। বাঙালী ও মহরাঠার উচ্চবর্ণের লোকেরা রণবিভাগে অনুপযুক্ত বলিয়া বহুকাল হইতে বাদ পড়িয়াছিল। গুর্খা, শিখ, পঞ্জাবী, রাজপুত, জাঠ, ডোগরা, বেলুচি, পাঠান ও মরাঠারা যুদ্ধপ্রিয় জাতি বলিয়া সৈন্য বিভাগে প্রবেশলাভ করিতে পারিত। এককালে তৈলিঙ্গী সেনারাও বিখ্যাত ছিল; কিন্তু পঞ্জাব অধিকারের পর তেজস্বী শিখ সৈন্যদের সরকারের কাজে পাওয়া গেলে অপেক্ষাকৃত দুর্বল জাতিদের বাদ দেওয়া হয়। কিন্তু যুদ্ধের সময়ে যখন অধিক সৈন্যের প্রয়োজন হইল তখন রণবিমুখ জাতিদের মধ্য হইতেও সৈন্যসংগ্রহের রীতিমত চেষ্টা হইয়াছিল এবং বাঙালী, মান্দ্রাজী, মহরাট্টী কেহই তখন বাদ যায় নাই। বাঙালী ডবল-কোম্পানীর সৈন্যেরা মেসোপটেমিয়াতেও গিয়াছিল, এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সৈনিকের কার্য্য শিক্ষা দিবার জন্য উৎসাহ কিছুকাল দেখা গিয়াছিল। কিন্তু সেটিকে স্থায়ীভাবে গড়িয়া তুলিবার প্রয়োজন বড় বিশেষ কেহ অনুভব করেন নাই।

সৈন্য হইবার উপযুক্ত জাতি।

ভারতীয় সৈন্যগণ ইংরাজ সরকারের জন্য বরাবরই যুদ্ধ করিয়া প্রাণ দিয়া আসিয়াছে। কেবল যে অতীতে ভারতবর্ষের নানা অংশ জয় করিতে সাহায্য করিয়াছিল তাহা নহে, বর্ত্তমানেও শাসনে রাখিবারও প্রধান সহায় তাহারাই। কাবুল, মিশর, বর্ম্মা, লাসা, পিকিং, আফ্রিকা প্রভৃতি দেশে ভারত সৈনিকেরা যুদ্ধ করিয়াছিল। কিন্তু ইতিপূর্ব্বে শ্বেতাঙ্গে শ্বেতাঙ্গে যুদ্ধে কখনো এদেশীয় সৈনিকদের লাগানো হয় নাই। বিগত যুদ্ধে সে ভেদ রাখা হয় নাই, ভারতবাসীরা ইংরাজ-ফরাসীদের পাশে দাঁড়াইয়া য়ুরোপের

ভারতের বাহিরে ভারতীয় সৈন্যের যুদ্ধ

সমরক্ষেত্রে লড়িয়াছে ; তা ছাড়া মিশর, তুর্কি, মেসোপেটেমিয়া জার্মান পূর্ব-আফ্রিকা, পূর্ব-এশিয়াতে যুদ্ধ করিয়া খুবই খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছে।

গতযুদ্ধে ভারতের দান

গত যুদ্ধের সময়ে ভারতবাসীরা যুদ্ধ জয়ের জন্য যাহা করিয়াছিল তাহার একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নে দিতেছি।

১। যুদ্ধ আরম্ভের সময়ে ভারতের সৈন্য. সংখ্যা এইরূপ ছিল :—

বৃটিশ অফিসার-- ৪,৭৪৪ ভারতীয় সৈন্য—২,৫৯,২০৪

বৃটীশ সৈন্যাদি—৭২,২৫৯ „ রিজার্ভ ৩৪,৭৬৭

সেবক ও কর্ম্মচারী-- ৪৫,৬৬০

২। যুদ্ধের সময়ে ভারত সরকার ৭,৫৪,৪৪৭ জন লোক যুদ্ধ কার্যের জন্যও ৪,০৪,০৪২ জন লোক সেবক ও কর্ম্মচারীরূপে নিযুক্ত করেন, মোট ১১, ৬১, ৪৮৯ জন লোক স্বেচ্ছায় যুদ্ধকার্য্যে লিপ্ত হইয়াছিল। যুদ্ধে ইংল্যাণ্ড শতকরা ৭৫ ভাগ, সমগ্র ইংরাজ-উপনিবেশ (কানাডা অষ্ট্রেলিয়া দক্ষিণ-আফ্রিকার ইত্যাদি) ১২ ভাগ ও ভারভবর্ষ একাই শতকরা ১৩ ভাগ সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিল।*

৩। যুদ্ধ আরম্ভ হইতে ভারত হইতে নিম্নলিখিত সংখ্যক সৈনিক অফিসার ও সেবকাদি প্রেরিত হয় :—

বৃটীশ সেনাপতি	২৩,০৪০
অন্যান্য বৃটীশ সৈন্য	১,৯৬,৪৯৪
ভারতীয় সেনাপতি	১৩,৬১৭
ভারতীয় সৈন্য	৫,৩৮,৭২৪
ভারতীয় সেবকাদি	৩,৯১,০৩৩
অশ্ব গরু প্রভৃতি	১,৭৪,৮৩৬

* Sir M. Visvesvaraya—Reconstructing India.

৪। এই সৈন্যদের কোথায় কত গিয়াছিল তাহার একটি হিসাব নিম্নে দিলাম :—

	বৃটীশ	ভারতীয়
ফ্রান্সে	১৮,৯৩৪	১,৩১,৪৯৬
পূর্ব আফ্রিকায়	৫,৪০৩	৪৬,৯৩৬
মেসোপটেমিয়াতে	১,৬৭,৫৫১	৫,৮৮,৭১৭
মিশরে	১৯,১৬৬	১,১৬,১৫৯
গ্যালিপলী	৬০	৪,৪২৮
এডেন	৭,৩,৮৬	২০,২৪৩
পারস্য উপসাগর	৯৬৮	২৯,৪৫৭
ইংলণ্ডে	৪২,৪৩০	——
	মোট	১২,১৫,৩৩৮

৫। উপর্য্যুক্ত সাহায্য ব্যতীত সাজ সরঞ্জাম ভারতবর্ষ প্রচুর পরিমাণে যুদ্ধের জন্য দান করিয়াছিল।—

রেলওয়ে সরঞ্জাম—

রেল	১,৮৭৪ মাইল
গাড়ী	৫,৯৯৯ খানি
ইঞ্জিন	২৩৭
গার্ডার	১৩,০৭৩ ফুট

নদীপথের সরঞ্জাম—

ষ্টীমার ও গাধাবোট	৮৩৩ খানি
নোঙর নৌকা ও ডিঙ্গি	৫০০ খানি
কাঠ	১ কোটি ঘনফুট

৬। ভারতবর্ষ হইতে ৭ কোটি গুলি, ৬০,০০০ রাইফেল, ৫৫০টি

কামান ইংল্যাণ্ডে যুদ্ধের প্রথম কয়েক সপ্তাহের মধ্যে প্রেরণ করা হইয়াছিল।

৭। ভারতবর্ষের দান—ভারতবর্ষের রাজস্ব হইতে ভারতবাসীরা ৬৭ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা যুদ্ধের জন্য দান করে। এতদ্ব্যতীত ১৯১৮ সালের মার্চ মাস পর্য্যন্তই প্রায় ১½ কোটি টাকা ভারতীয় রিলিফ ফাণ্ডে প্রদত্ত হইয়াছিল; তা ছাড়া অনেক হাঁসপাতাল-জাহাজ, মোটর গাড়ী, আম্বুলেন্স, মেশিন্‌গান্ এরোপ্লেন যুদ্ধের জন্য প্রেরণ করা হইয়াছিল। হায়দ্রাবাদের নিজাম স্বয়ং যুদ্ধের কয়েক বৎসর দুইটি রেজিমেণ্টের লড়াইএর খরচ দিয়াছিলেন; ইহাতে প্রায় ১ কোটি ৫ লক্ষ টাকা তাঁহার ব্যয় হয়। ১৯১৬ সালের পূর্বে ভারতীয় দেশীয় রাজারা প্রায় ১½ কোটি টাকা দান করিয়াছিলেন। সমগ্র দানের মূল্য নির্দ্ধারণ করা অসম্ভব; তবে খুব কম করিয়া খুচরা প্রায় ৭½ কোটি টাকা নানাভাবে ভারতবাসীরা দিয়াছিল।

৮। সমর-ঋণে ভারতবর্ষ প্রায় ৫৯ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা ধার দিয়াছিল। ইহার মধ্যে বঙ্গদেশ হইতে প্রায় কুড়ি কোটি টাকা উঠিয়াছিল।

৯। সমর-বিভাগের ব্যয় যুদ্ধের সময়ে কিরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছিল তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

(ক) ১৯১৪-১৫ হইতে ১৯১৭-১৮ সালের মধ্যে যুদ্ধের ব্যয় যুদ্ধের পূর্বের চেয়ে বাড়িয়াছিল—১৬,৫০০,০০০ পাউণ্ড।

(খ) রাজনৈতিক বিভাগে বিশেষভাবে পারস্যদেশে ব্যয় বৃদ্ধি—১,৩০০,০০০ পাউণ্ড।

(গ) যুদ্ধের জন্য সাধারণ বিভাগের ব্যয় বৃদ্ধি—২৫০,০০০ পাউণ্ড।

(ঘ) ভারতবর্ষ যে টাকা ইংল্যাণ্ডকে যুদ্ধের জন্য দান করিয়াছিল তাহা সুদ ও আসল শোধ বাবদ—৬,০০০,০০০ পর্য্যন্ত।

(ঙ) যুদ্ধের সময়ে সমুদ্রে যেসব মাল নষ্ট হয় তাহার ক্ষতিপূরণ বাবদ ৬৪০,০০০ পাউণ্ড। মোট—২৪,৭০০,০০০ পাউণ্ড

কোম্পানীর আমলে ইংলণ্ডের সৈন্য কাজ করিত বলিয়া ভারতবর্ষকে রীতিমত অর্থ দিতে হইত। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্বের প্রথমভাগে প্রত্যেক হাজার লোকের একটি রেজিমেণ্টের জন্য দুই লক্ষ টাকা দিতে হইত। ১৭৮৮ সালে এই নিয়ম বদলাইয়া ফেলা হয় ও বিলাতে সৈন্য সংগ্রহ ও এদেশে আনিবার ও পোষণ করিবার যাবতীয় খরচ ভারত সরকারকে দিতে হইবে ঠিক হয়। ১৮৩৪ হইতে ১৮৫৭ সাল পর্য্যন্ত বাৎসরিক সৈন্যের খরচ বাবদ কোম্পানী ইংলণ্ডে প্রায় ১৯ লক্ষ ৫০হাজার টাকা গড়ে পাঠাইয়াছিল। সিপাহী বিদ্রোহের পর ১৮৬১ সালে নূতন ব্যবস্থা হইলে প্রত্যেক সৈন্যের জন্য মাথা-পিছু (£10) দশ পাউণ্ড বা এক শত টাকা লওয়া হইত। ১৮৯১ সালে ঠিক হয় যে দশ পাউণ্ডের পরিবর্ত্তে বিলাতে সৈন্য-সংগ্রহ করিতে যাহা যথার্থ ব্যয়িত হয় অর্থাৎ ৭½ পাউণ্ড লওয়া হইবে। এই টাকা বাদে সৈন্যদের বেতন আসা-যাওয়ার খরচ সমস্তই ভারতবর্ষ বহন করে, অফিসারদের পেনশনও দিতে হয়।

বিলাতে সৈন্য-সংগ্রহে ভারতের ব্যয়।

একই দল বৃটীশ-সৈন্য ভারতে বরাবর থাকে না। এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে অধিক কাল থাকিলে সৈন্যদের কার্য্য করিবার শক্তি লোপ পাইবার সম্ভাবনা আছে; ইতিহাসে দেখা গিয়াছে পাঠান মোগলদের ন্যায় দুর্দ্ধর্ষ জাতিও এদেশের জল মাটির গুণে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছিল। ইংরাজ ইতিহাস হইতে সেই শিক্ষা লইয়াছে। এখন গড়ে কোনো সৈন্য ভারতে ৫ বৎসর ৪ মাসের অধিক বাস করে না। নূতন নূতন দল ভারতে আসে ও ভালরূপ শিক্ষালাভ করিয়া দেশে ফিরিয়া যায়। এইজন্য ভারতসরকারের ব্যয় খুবই বাড়িয়া চলিয়াছে ও ভারতের শিক্ষিত সমাজ এই ব্যয়কে অপ-ব্যয়ের সহিত তুলনা করেন। তাঁহারা বলেন দেশের লোকদের ভাল করিয়া রণ-শিক্ষা দিলে তাহারাই ভারতবর্ষ রক্ষা করিতে পারে, বাহিরের সৈন্যের প্রয়োজন সামান্যই হইবে।

দেশী সৈন্যের বেতন পূর্বে ১১৲ ছিল, এবং যুদ্ধের সময় ছাড়া তাহারা আহার সরকার হইতে পাইত না। যুদ্ধের সময়ে তাহাদিগকে ৪৲ টাকা মাসিক বৃদ্ধি দেওয়া হয় এবং 'ভাতা' বলিয়া ৫৲ টাকা দেওয়া হইত। যুদ্ধান্তে তাহাদের 'ভাতা' বন্ধ হইয়াছে, কিন্তু সরকারী আহারের ব্যবস্থা পাকা হইয়াছে।

দেশীয় সৈন্যের বেতন।

ইংরাজ সৈন্যের বেতন ভারতীয় সৈন্য অপেক্ষা প্রায় ৫।৬ গুণ অধিক। এতদ্ব্যতীত ইংরাজদের জীবন যাত্রার আদর্শ আমাদের অপেক্ষা অনেক উচ্চ বলিয়া তাহাদের গৃহাদি নির্মাণে, ছাউনী তৈয়ারী করিতে সরকারী ব্যয় অনেক পড়িয়া যায়। অফিসারদের মাহিনা খুব বেশী বলিয়া অনেকে মনে করেন। লেফনাণ্টদের বেতন মাসিক ৫২৫৲ হইতে ৬৩০৲ টাকা, ক্যাপ্টেনদের মাসিক বেতম ৮৫০৲ হইতে ১০৫০৲, মেজরদের ১১৫০৲ হইতে ১৩০০৲, লেফ্‌নাণ্ট-কর্ণেল· ১০৫০৲ হইতে ১৭৫০৲ টাকা বেতন পাইয়া থাকেন। উচ্চ কর্মচারীদের অধিকাংশই ইংরাজ; যুদ্ধের পর সম্রাটের বিশেষ ইচ্ছায় কয়েকজন দেশীলোক সেনাপতির পদ পাইয়াছে ও ভবিষ্যতে আরও পাইবে বলিয়া আশা দেওয়া হইয়াছে।

ইংরাজ সৈনিক ও কর্মচারীর বেতন।

ভারতবর্ষের এই বিপুল সৈন্যবাহিনীর জন্য বহুপ্রকার সামগ্রার প্রয়োজন। বৃটীশ সৈন্যদের খাদ্য ও বর্ত্তমানে দেশীয় সৈন্যদের আহার্য্য সংগ্রহ, যুদ্ধের ঘোড়া, গাড়ীটানা, কামানটানা ঘোড়া ও বহন কার্য্যের জন্য বৃষভ, অশ্বতর ও এইসব ভারবাহী জন্তুদের আহার্য্য সংগ্রহ, হাঁস-পাতালের রোগীদের ঔষধ ও পথ্য সংগ্রহ ইত্যাদি নানাবিধ বিভাগের কাজ খুবই বিপুল। তারপর ইহাদের পোষাক পরিচ্ছদ, বিছানা, তাঁবু, কিট্‌ব্যাগ্‌ নির্মাণের বন্দোবস্ত করা; জুতা, ঘোড়ার সাজ, বন্দুকের গুলি-বারুদ

সৈনিক বিভাগের বিভিন্ন ভাগ।

রাখার কেস্ প্রভৃতি বিবিধ জিনিষ তৈয়ারী করার অনেকগুলি বিভাগ আছে। এই দুই লক্ষ লোকের বেতন ও আহারাদির ব্যয় ও অন্যান্য ব্যয়ের হিসাব রক্ষা করা একটা বড় রকম কাজ; প্রতিবৎসর প্রায় ২৫।৩০ কোটি টাকা ব্যয় হয়, এই হিসাব রাখিবার জন্য মিলিটারী হিসাব বিভাগ আছে। সৈন্যদের চিকিৎসার ভার সরকারের উপর ন্যস্ত। লাহোর, কলিকাতা, মান্দ্রাস, বোম্বাই ও রেঙ্গুনে সামরিক বিভাগের ঔষধ ভাণ্ডার আছে। যুদ্ধের জন্য অশ্ব, অশ্বতর, গর্দ্দভ, ষাঁড়, গরু প্রভৃতি প্রাণী উৎপন্ন করিবার জন্য সরকারের একটি বিভাগ আছে। বৃটীশ সৈন্যদের জন্য অষ্ট্রেলিয়ান্ ঘোড়া আসে; দেশীয় সৈন্যেরা এদেশীয় ঘোড়াই ব্যবহার করে; কিন্তু গত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে দেশী ঘোড়ার জাত খুব ভাল হইয়াছে এবং এই জাতের ঘোড়া অষ্ট্রেলিয়ান্ ঘোড়ার চেয়ে নানাবিষয়ে ভাল উৎরাইতেছে। দুর্গ, পথ, ব্রিজ, বাড়ীঘর নির্ম্মাণ করিবার জন্য একদল ইঞ্জিনীয়ার আছেন।

রণ বিভাগের ব্যয় বৃদ্ধি

ভারত-রক্ষার ব্যয় ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। ১৮৮৫ সাল হইতে ভারতের সীমান্ত ও সংলগ্ন দেশ-সমূহের ভাবী-আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য বহু রেলপথ, দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছে। ১৮৮৫ হইতে ১৯০৩ সালের মধ্যে নির্ম্মাণ-কার্য্যে ১ কোটি ১০ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয়িত হইয়াছিল। সকল রকমে রণবিভাগের ব্যয় ১৮৮১ সালে ১৬ কোটি ৮৬ লক্ষের স্থলে ১৯০৫ সালে ২৮ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। তারপর মাঝে কিছু কমিয়া আবার ১৯১৮ সালে ৩০ কোটির উপর দাঁড়ায়। এ বৎসরে আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে।

সমর-বিভাগের সংস্কার করিবার জন্য এক কমিটি বসিয়াছিল। এই সভার সভাপতি ছিলেন লর্ড এশার। দুই জন ভারতবাসী (ইঁহাদের

এশার (Esher) কমিটি ও রণবিভাগ সংস্কার

মধ্যে স্যর কে, জি, গুপ্ত ছিলেন) এই কমিটির সভ্য ছিলেন। এই কমিটির প্রধান উদ্দেশ্য ভারতের সৈন্য-বিভাগকে বৃটিশ সাম্রাজ্যের সামরিক বিভাগের অন্তর্গত করা, লণ্ডনের সমর-কর্ত্তাদের সহিত ইহার ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি করা ও ভারতের সৈন্যবাহিণীকে সর্বদা যুদ্ধের উপযুক্ত করিয়া রাখা। ইঁহাদের প্রতিবেদন প্রকাশিত হইয়াছে ; তবে সরকার ইহার মধ্যে কোন্ গুলি গ্রহণ করিবেন ও কোন্গুলি বর্জন করিবেন তাহা প্রকাশ পায় নাই।

দ্বিতীয় ভাগ।

১। জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাস

সিপাহী বিদ্রোহের পর ১৮৫৮ সালে ১লা নভেম্বর তারিখে এলাহাবাদের দরবারে তৎকালীন বড়লাট লর্ড ক্যানিং স্বর্গীয়া মহারাণী ভিক্টোরিয়ার বিখ্যাত ঘোষণাপত্র পাঠ করিলেন। এই শুভদিনে ভারতের সর্বত্রই এই ঘোষণাপত্র পঠিত হইলে দুর্বল ভীত ভারতবাসীর প্রাণে আশার সঞ্চার হইল। এই ঘোষণাপত্রে ভারতের অধিকার ও বৃটিশরাজের অভিপ্রায় সুস্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

বিদ্বেষ, বিদ্রোহ ও বিপ্লবের অগ্নি নিবাইয়া শান্তি স্থাপন করিতে তিন বৎসর লাগিয়া গেল। বিদ্রোহ দমনে সরকারের প্রায় ৪০ কোটি টাকা ব্যয় হইল এবং স্থায়ীভাবে শান্তিরক্ষা করিবার জন্য চারিদিকের ব্যয় বার্ষিক ১০ কোটি টাকা করিয়া পড়িল। ১৮৬১ সালের ভারতীয় কৌন্সিলে আইন পাশ হইলে ভারতের শাসন-পদ্ধতির অনেক পরিবর্ত্তন ঘটে; ইহা যথাস্থানে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া এখানে পুনরুল্লেখ হইতে নিবৃত্ত হইলাম। কোম্পানীর আমলে রাজসরকারে মুসলমানদের ক্ষমতা যথেষ্ট ছিল; কিন্তু বিদ্রোহের পর হইতেই ইহাদের শক্তি ও মর্য্যাদা দুইই কমিয়া যায়; তাঁহারা হৃতরাজ্য, হৃতমান হইয়া পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান, চাকুরীর মায়া ও লোভ ত্যাগ করিলেন; কর্তৃপক্ষও তাহাদিগকে দূরে রাখিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। সেই হইতেই মুসলমানগণ সকল বিষয়ে হিন্দুদের হইতে পিছাইয়া পড়েন।

এই সব রাজনৈতিক ঘটনার পাশে মানুষের অন্তরকে নাড়া দিতে পারে

এমন কতকগুলি ঘটনা কিছুকাল হইতে ঘটিতেছিল। শিক্ষার ইতিহাসে আমরা দেখিতে পাই যে সিপাহী বিদ্রোহের ৪০ বৎসর পূর্ব্ব হইতে ইংরাজী শিক্ষা আমাদের দেশে বিস্তার লাভ করিতে আরম্ভ করে। ১৮৫৬ হইতে ১৮৬১ পর্য্যন্ত এই কাল বঙ্গ-সমাজের পক্ষে মাহেন্দ্রক্ষণ বলিলে হয়। এই কালের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা বিবাহের আন্দোলন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মধর্ম প্রচার, নীলের হাঙ্গামা, হিন্দুপেট্রিয়টে হরিশ মুখার্জির সরকারও নীলকরদের বিরুদ্ধে লেখনী চালনা, বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে ঈশ্বর গুপ্তের তিরোভাব ও মধুসূদনের আবির্ভাব, সোমপ্রকাশের অভ্যুদয়, দেশীয় নাট্যশালা স্থাপন ও হিন্দুসমাজের মধ্যে রক্ষণশীল দলের জাগরণ এবং সমাজ ও ধর্ম সংরক্ষণের প্রয়াস প্রভৃতি ঘটনা ঘটিয়াছিল। ইহার প্রত্যেকটিই বঙ্গসমাজকে এমন প্রবলরূপে আন্দোলিত করিতেছিল যে প্রত্যেটিরই ইতিবৃত্ত গভীরভাবে আলোচনার বিষয়।

বাংলাদেশের বিচিত্র আন্দোলন

শিক্ষিত সমাজের অন্তরের মধ্যদিয়া তখন প্রলয়ের ঝড় ছুটিতেছিল। ১৮৬৫ সালে কেশবচন্দ্র সেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সমাজ ত্যাগ করিয়া স্বয়ং নূতন সমাজ সৃষ্টি করিলেন। ভারতের জাতীয় ইতিহাসে বর্ত্তমানে এই ঘটনাটি অকিঞ্চিতকর বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্বে ইহার প্রভাব সমগ্র সমাজকে ও দেশকে খুবই নাড়া দিয়াছিল। জাতিবর্ণ নির্বিশেষে ধর্ম উপদেশ দান ও নির্বিচারে একই সামাজিক অধিকার সকলকে দানের কথা ভারতবর্ষ বহুকাল হইতে ভুলিয়াছিল;—ব্রাহ্মসমাজ ধর্ম ও সমাজ বিষয়ে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার কথা প্রচার করিয়া দেশের মধ্যে নূতন শক্তি সৃষ্টি করিল।

ব্রাহ্মসমাজের স্বাধীনতার কথা

এই সময় হইতে ভারতের সহিত বিলাতের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ আরম্ভ। বাংলাদেশ হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতি ছাত্রগণ বিলাতের পরীক্ষায় পাশ

দিবার জন্য ইংলণ্ড গমন করিতে আরম্ভ করিলেন ইহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথম I. C. S., মনোমোহন ঘোষ প্রথম ব্যারিষ্টার। ইহাদের আগমনের কিছু-কাল পরেই আরও তিন জন যুবক সিবিল সার্বিসের জন্য বিলাত যাত্রা করেন; তাঁহাদের নাম বাংলার ইতিহাসে সুপরিচিত। ১৮৬৩ সালে বিহারীলাল গুপ্ত, রমেশচন্দ্র দত্ত ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এক সঙ্গে ইংলণ্ড গমন করেন। তাঁহারা যখন পাশ করিয়া ম্যাজি-ষ্ট্রেটের কাজ লইয়া দেশে ফিরিয়া আসিলেন তখন লোকে বুঝিল যে বাঙ্গালীর ছেলে মেধায় ও শক্তিতে ইংরাজের ছেলের অপেক্ষা কম নহে। জাতীয় আত্মশক্তি বোধের ইহা অন্যতম কারণ।

য়ুরোপের সহিত ভারতের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনের গুরু একথা সকলেই স্বীকার করেন। দিল্লীর বাদসাহের কতকগুলি অধিকার দাবী করিবার জন্য তিনি সম্রাট কর্তৃক বিলাত প্রেরিত হন। সেখানকার পার্লামেণ্টের সমক্ষে তিনি ভারত শাসন সম্বন্ধে যে নির্ভীক ও সংবিবেচনাপূর্ণ প্রতিবেদন দাখিল করিয়াছিলেন তাহা পাঠ করিলে তাঁহার দূরদর্শীতার প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। তাঁহার মৃত্যুর পর বিশ বৎসর ভারতে কোনো প্রকার আন্দোলন হয় নাই বলিলে চলে। সিপাহী বিদ্রোহের পূর্বেই বিধিসঙ্গত আন্দোলনের সূত্রপাত হয়।

রাজনৈতিক গুরু রামমোহন

কলিকাতা ও বোম্বাইতে প্রায় একইকালে (১৮৫১) বৃটীশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন স্থাপিত হয়। কলিকাতার এসোসিয়েশনের নেতাদের মধ্যে প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রামগোপাল ঘোষ, রাজা দিগম্বর মিত্র, প্যারী-চাঁদ মিত্র, হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নাম চিরস্মরণীয়। হরিশচন্দ্র হিন্দুপেট-রিয়টে ধারাবাহিক লর্ড ডালহৌসীর আত্মসাৎ পলিসির বিরুদ্ধে লিখিয়া-

১৮৫১ বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন

ছিলেন। অযোধ্যা সাতারা নাগপুর প্রভৃতি দেশীয় রাজ্য বাজেয়াপ্তের ফল যে কি ভীষণ হইতেছিল তাহা বড়লাট না বুঝিলেও হরিশচন্দ্র বুঝিয়াছিলেন। সিপাহী বিদ্রোহের সময়েও বিদ্রোহান্তে তিনি নিরপেক্ষভাবে ও অবিচলিতচিত্তে ভালকে ভাল ও মন্দকে মন্দ বলিয়াছিলেন। এই সময়ে বাংলাদেশে নীলকর সাহেবদের অত্যাচার খুবই চলিতেছিল। হরিশচন্দ্র পেটরিয়টে ইহার বিরুদ্ধে ঘোর আন্দোলন আরম্ভ করেন। নীলকর সাহেবেরা হরিশের উপর এমনি চটিয়াছিল যে অকালে তাঁহার মৃত্যু হইলে এক মোকর্দ্দমায় তাঁহার পরিবারের যথাসর্ব্বস্ব নষ্ট করিয়া দেয়; দুঃখের বিষয় তখন হরিশের বিধবাকে সাহায্য করিবার কোনো চেষ্টা হয় নাই। দীনবন্ধু মিত্রের 'নীল-দর্পণ ও লঙ্ সাহেবের ইংরাজী তর্জমা এই বহ্নিতে ঘৃতাহুতির মত হইল; নীল দর্পণের অনুবাদের অপরাধে লঙের কারাগার হইল। বাঙ্গালী চাষীরা এই সময়ে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যে তাহাদের অভিযোগ দূর না হইলে তাহারা নীল স্পর্শ করিবে না; নিরক্ষর কৃষকগণ তাহাদের জিদ্ বজায় রাখিয়াছিল। এক কমিশন বসিয়া ইহাদের দুঃখের অনেকটা লাঘব করেন। নীলের উৎপাত সাহেব ও দেশীয়দের মধ্যে বিদ্বেষ ও বিরোধের অন্যতম কারণ।

বোম্বাই প্রদেশে জগন্নাথ শঙ্কর শেঠ, ও মহাত্মা দাদাভাই নৌরজীর অদম্য চেষ্টায় ১৮৫৪ সালে বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন স্থাপিত হয়। বাংলা বা বোম্বাইএর আন্দোলনকারীরা কেবল রাজনীতি সংস্কারেই মত্ত ছিল না; রাজনৈতিক আন্দোলনের পাশাপাশি সামাজিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য চেষ্টা চলিতেছিল। পার্শীদের মধ্যে পার্শীধর্ম সংস্কার-সভা ১৮৫১ সালে স্থাপিত হয়; নৌরজী, ওয়াচা, বাঙ্গলী, ফরদনজী প্রভৃতি অনেক কৃতি পার্শীর নাম একাধারে রাজনীতি ও ধর্মনীতির মধ্যে দেখা যায়। হিন্দু সমাজে হরিশচন্দ্র উদার নীতিপরায়ণ ছিলেন; তা ছাড়া আর কাহাকে রাজনীতির সহিত ধর্ম

রাজনৈতিক ও অন্যান্য আন্দোলন।

ও সমাজকে সংস্কৃত করিবার জন্ম ব্যগ্র দেখা যায় না। তবে হিন্দুসমাজের রক্ষণশীল দলের নেতা স্যর রাধাকান্ত দেব বাহাদুর একদিকে যেমন বৃটীশ ইণ্ডিয়ান এসোশিয়েসনের সভাপতি ছিলেন তেমনি উদীয়মান ব্রাহ্মসমাজের শতপ্রকার উন্নতি-চেষ্টার পরম বিরোধী থাকিয়াও হিন্দু সমাজের সংস্কারের জন্ম যথেষ্ট করিয়াছিলেন। এছাড়া সমাজ ধর্ম্ম ও রাজনীতি সংস্কারের চেষ্টা বাংলা দেশে তখন দেখা যায় নাই; এবং যাহা দেখা গিয়াছিল তাহাও রাধাকান্তের ন্যায় রক্ষণশীল ও প্রতিক্রিয়াভিমুখী।

বোম্বাইএর বৃটীশ ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েশন দশ বৎসর কাল নানারূপ লোক হিতকর কাজ করিয়া ১৮৬১ সালে লোপ পাইল এবং ১৮৭১ সালে উহা পুনর্গঠিত হইলেও পূর্বের ন্যায় শক্তিশালী হইতে পারিল না। বোম্বাই ছিল পার্শীদের আন্দোলনের কেন্দ্র; পুণানগরী মহ্রাটা জাতীয়-জীবনের কেন্দ্র।

বম্বে ব্রত আন্দোলন

১৮৭৫।৭৬ সালে এইখানে কৃষ্ণজী লক্ষণ নুলকর, সীতারাম হরি চিপলনকর, প্রভৃতি তেজস্বী মহরাঠাগণ "সার্বজনিক সভা" স্থাপন করেন। মান্দ্রাস প্রদেশে রাজনৈতিক আন্দোলন সুরু হইতে কিছু সময় লাগিয়াছিল। ১৮৮৭ সালে 'হিন্দু''নামে এক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ইহাই সেখানকার জাতীয় জীবনের প্রথম স্পন্দন। ১৮৮৪ সালে মান্দ্রাসে "মহাজন সভা" স্থাপিত হয় এবং অল্পদিনের মধ্যে উক্তপ্রদেশের সকল শ্রেণীর লোকের অনুকূলতা ও উৎসাহ পাইয়া এই সভা মান্দ্রাজে খুবই শক্তিশালী হইয়া উঠিল!

১৮৬৯ হইতে ১৮৮০ সালের মধ্যে ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে বিশেষ কয়েকটি ঘটনা ঘটিল। লর্ড মেয়োর শাসনকালে কতকগুলি সংস্কার সাধিত হয়। এ যাবৎ প্রাদেশিক শাসন কেন্দ্রগুলির বিশেষ কোনো স্বাধীনতা ছিল না—সামান্য ব্যয় করিতে হইলেও ভারত সরকারের অনুমতি লইতে হইত। লর্ড মেয়ো ভারত সরকার হইতে প্রাদেশিক কেন্দ্রগুলিকে কতক-

গুলি বিষয়ে পৃথক করিয়া দিলেন। ইহাঁর সময়ে (১৮৬৯) মহারাণী ভিক্‌টোরিয়ার দ্বিতীয় পুত্র ডিউক্ অব এডিনবরা ভারত ভ্রমণে আসেন; ইংলণ্ডের রাজপরিবারের সহিত ভারতের সাক্ষাৎভাবে পরিচয় এই প্রথম। লর্ড নর্থব্রুকের সময়ে ১৮৭৫ সালে স্বয়ং প্রিন্স অব্ ওয়েলস্ (পরে যিনি সপ্তমএডোয়ার্ড হন, বর্ত্তমান সম্রাটের পিতা) ভারত পরিদর্শন করিতে আসেন। সে সময়ে ভারতের আপামর সাধারণ রাজভক্তির যে নিদর্শন দেখাইয়াছিল তাহা দেখিয়া রাজকুমার খুবই প্রীত হইয়াছিলেন।

রাজ পরিবারের সহিত ভারতের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক

১৮৭৬ সালে লর্ড নর্থব্রুকের পর লর্ড লীটন ভারতের শাসনকর্ত্তা হইয়া আসিলেন। ইংলণ্ডের বিখ্যাত ঔপন্যাসিক লর্ড লীটন ছিলেন ইঁহার পিতা। বড়লাট বাহাদুর পিতার সাহিত্যানুরাগ পাইয়াছিলেন; এদেশের আশা ও আদর্শের সহিত তাঁহার সহানুভূতির যোগ হয় নাই। ভারতের শাসনভার লইবার কয়েক মাস পরেই তিনি ১৮৭৭ সালের ১লা জানুয়ারী তারিখে ভারতের প্রাচীন রাজধানী দিল্লী নগরে মুসলমান বাদসাহের অনুকরণে বিরাট এক দরবারে মহারাণী ভিক্‌টোরিয়াকে ভারতসম্রাজ্ঞী বলিয়া ঘোষণা করিলেন। ইতিপূর্বে বৃটীশ শাসনকালে এমন জাঁকজমক করিয়া রাজদরবার হয় নাই; সুতরাং সাধারণ লোকের মনের উপর ইহার প্রভাব খুবই ভাল হইল; বৃটীশরাজের প্রতি তাহাদের শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম উভয়ই বাড়িয়া গেল। কিন্তু দেশের শিক্ষিত সমাজ ইহাতে সুখী হইলেন না; তাহার কারণ সেই সময়ে ভারতের সর্বত্র ভীষণ দুর্ভিক্ষে লোকে কষ্ট পাইতেছিল। ১৮৭৭ সালে মৈসুম বৃষ্টি দক্ষিণ ভারতে হয় নাই; ৭৭ সালেও বৃষ্টির অবস্থা ভাল হইল না; দুই বৎসর পর পর অনাবৃষ্টির ফলে দেশে শস্য হইল কম। দেখিতে দেখিতে দুর্ভিক্ষ দক্ষিণ হইতে উত্তরে ছড়াইয়া পড়িল। সরকার রেল ও সমুদ্র পথে শস্য প্রেরণ করিলেন, ৮ কোটি টাকা দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য ব্যয়িত হইল,

লর্ড লীটনের শাসন ও দরবার

তথাপি ৫২ লক্ষ লোক অনাহারে ও অনাহারজনিত পীড়ায় মারা পড়িল। মান্দ্রাজের গবর্ণরের অদূরদর্শিতার ফলে এই নিদারুণ কাণ্ড ঘটিল; লীটনের সকল প্রকার সদুপদেশ ও পরামর্শ মান্দ্রাজের গভর্ণর অগ্রাহ্য করিয়া স্বীয় মতলব মত চলিয়াছিলেন বলিয়া এই নিদারুণ কাণ্ড ঘটিল।

দুর্ভিক্ষ ও প্রতিকারের ব্যবস্থা

দুর্ভিক্ষান্তে এক কমিশন বসিয়া দুর্ভিক্ষের কারণ ও তাহার নিবারণের উপায় চিন্তা করিয়া এক প্রতিবেদন পেশ করিলেন। এই কমিশনের ফলে ভারতের দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধীয় সুবিস্তৃত আইন পুস্তক রচিত হইয়াছে। এখন দুর্ভিক্ষ হইলে রাজকর্মচারীগণকে কখন কি করিতে হইবে, কোথা হইতে সাহায্য পাইতে হইবে কেমন করিয়া নিরন্নদের অন্নদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে প্রভৃতি প্রশ্ন ভাবিয়া দিশাহারা হইতে হয় না; সকল প্রকার ও উপদেশ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। রেল পথ বিস্তারের জন্য কমিশন তাগিদ দিলেন।

লীটনের সময় ভারত-সীমান্তে এক যুদ্ধ বাধে। ১৮৭৮ সালে আফগানিস্থানের সহিত দ্বিতীয় সমরে ভারতের বহু লক্ষ টাকা ব্যয়িত হয়। পশ্চিমে বহু কোটী টাকা ব্যয় করিয়া সীমান্ত সুদৃঢ় করা হইল; কিন্তু তাহা সামান্য বিদ্রোহেতেই ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। আর দুইটি কাজের জন্য লীটন ভারতবাসীর কাছে অপ্রিয়। এই দুইটি কাজ তাঁহাকে সময়োপযোগী কর্ত্তব্যবোধে করিতে হইয়াছিল। সিপাহী বিদ্রোহের পরেও ভারতবাসী সম্পূর্ণরূপ নিরস্ত্র হয় নাই; এই সময়ে Arms Act পাশ হইলে দেশীয়দের পক্ষে বন্দুক তরবারি প্রভৃতি আত্মরক্ষার সম্বল রক্ষা করা দোষণীয় বলিয়া গণ্য হইল। কিন্তু য়ুরোপীয় বা য়ুরেশীয়দের ক্ষেত্রে ইহার প্রয়োগ না হওয়াতে এদেশের লোকের গাত্রদাহের যথেষ্ট কারণ হইল। এ পর্য্যন্ত সে বিষয়ে আন্দোলন চলিতেছে ও সরকারকে অপ্রিয় সমালোচনা

সীমান্ত যুদ্ধ

অস্ত্র আইন

সহ্য করিতে হইতেছে। তবে বর্ত্তমানে সরকার এ বিষয়ে নিয়ম কিয়দ্-পরিমাণ শিথিল করিয়া দিতেছেন; কথা হইতেছে সাহেব বা দেশীয় সকলেই পাশ লইয়া বন্দুক রাখিতে পারিবেন।

এই সময়ে দেশীয় কাগজগুলি ক্রমেই সরকার বাহাদুর সম্বন্ধে সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছিল; তাহাদের যে সব নমুনা পাওয়া যায় তাহা মোটেই শ্রুতিসুখকর নহে। সমালোচনা ক্রমেই বিদ্বেষের আকার ধারণ করিতেছিল। কিন্তু যথার্থ সমালোচনা বিদ্বেষ প্রচার নয়। সরকার যদি প্রজার মনোভাব জানিতে না পারেন তবে তাঁহার পক্ষে সুশাসন করা অসম্ভব। ১৮৩৫ সালে স্যরচার্লস মেটকাফ্ ভারতের মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা দান করেন; তারপর এই অধিকার এ যাবৎকাল বরাবর অক্ষুণ্ণভাবেই চলিয়া আসিয়াছিল; সিপাহীবিদ্রোহের পর মাঝে এক বৎসর মুখঠাসা আইন বা Gagging Act বাহাল ছিল; তারপর কুড়ি বৎসর পরে লর্ড লীটন ১৮৭৮ সালে দেশীয় মুদ্রাযন্ত্র সম্বন্ধীয় আইন পাশ করিয়া অযথা বিদ্বেষপূর্ণ সমালোচনা হইতে দেশকে রক্ষা করিলেন। এই আইন পাশ হইলেই শিশিরকুমার ঘোষের "অমৃত বাজার পত্রিকা" অকস্মাৎ বাংলা পত্রিকা হইতে ইংরাজী খোলোস পরিয়া বাহির হইল।

দেশীয় মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা লোপ

ভারতের শিল্প ও বাণিজ্য বহুকাল হইতে ধীরে ধীরে অধঃপাতে যাইতেছিল; তখনও বৃটীশ সরকার বুঝেন নাই যে ভারতের শিল্পোন্নতিতে তাঁহার উন্নতি এবং দেশীয় শিল্পকলাকে পোষণ করায় তাঁহার স্বার্থ। কয়েক বৎসর হইতে বোম্বাইএর দেশী কলওয়ালারা বয়ন শিল্পে মাথা খাড়া করিয়া তুলিতেছিল; কিন্তু ম্যানচেষ্টারের ব্যবসায়ীদের স্বার্থে আঘাত লাগাতে, তাহাদের প্ররোচনা ও তাগিদে বৃটীশ সরকার ও ভারত গভর্ণমেণ্ট শুল্ক সম্বন্ধে যে সকল আইন পাশ করেন তাহার ইতিহাস যথাস্থানে বিবৃত হইয়াছে।

দেশীয় শিল্পোন্নতির অন্তরায়

এই ঘটনাতে দেশের শিক্ষিত সমাজ পুনরায় আঘাত পাইল। বয়ন শিল্পের প্রতি অবিচারের জন্য বিদেশীরা লজ্জিত, ভারতবাসীরা ক্ষুব্ধ। (যুদ্ধের সময়ে বৃটীশরা বুঝিলেন ভারতের ঐশ্বর্য্য তাঁহারই সম্পদ, ভারতের মঙ্গলে তাঁহারই কল্যাণ, সেইজন্য শিল্পোন্নতি করিবার জন্য সর্বত্র উৎসাহ দিয়াছেন এবং শুল্ক সম্বন্ধে সুবিচার করিয়া এদেশের বহুকালের অভিযোগ দূর করেন।)

১৮৭৬ সালে কলিকাতায় ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। পূর্বোল্লিখিত বৃটিশ ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশন জমিদার ও সম্ভ্রান্ত লোকের সভা হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। নব্য বঙ্গের আশা আকাঙ্ক্ষার পক্ষে এই পুরাতন প্রতিষ্ঠান যথেষ্ট ছিল না। যুবক সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার কিছুদিন পূর্বেই সিবিল সার্বিস হইতে বরখাস্ত হইয়া দেশ সেবায় ব্রতী হইয়াছিলেন; তিনি, ব্রাহ্ম-সমাজের নেতা উদীয়মান ব্যারিষ্টার যুবক আনন্দমোহন বসু, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি কয়েকজন তেজস্বী যুবক এই নূতন সভা স্থাপন করিলেন। শ্যামাচরণ সরকার ইহার প্রথম সভাপতি; তাঁহার পরে বিখ্যাত খৃষ্টান পণ্ডিত কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতি হন; আনন্দমোহন ইহার প্রথম সম্পাদক।

ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েশন্
১৮৭৬

ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েশন স্থাপিত হইবার একবৎসরের মধ্যে বিলাতের সিবিল সার্বিস পরীক্ষায় প্রবেশের বয়স কমাইয়া ১৯ বৎসর করা হইল। কিছুকাল হইতে ভারতবাসীরা এই পরীক্ষায় সসম্মানে পাশ করিয়া সিবিল সার্বিস কার্য্য পাইতেছিল। কিন্তু ১৯ বৎসর বয়সের মধ্যে ভারতীয় বালকদের পক্ষে এদেশের শিক্ষা শেষ করিয়া বিলাতে যাওয়া খুবই শক্ত। বিলাতে ও ভারতে এককালীন সিবিল সার্বিস পরীক্ষা গৃহীত হইবার জন্য কিছুকাল হইতে আন্দোলন চলিতেছিল; এক্ষণে এই নিয়ম পাশ হওয়াতে বাংলা-দেশের শিক্ষিত যুবকগণ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলেন। কলিকাতায়

সিবিল সার্বিস
লইয়া আন্দোলন

বিরাট সভা করিয়া ভারত-সচিবের এই ব্যবস্থার প্রতিবাদ করা হইল। ১৮৭৭ সালে ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েশন যুবক সুরেন্দ্রনাথকে রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রচারকরূপে প্রেরণ করিলেন। তিনি উত্তর পশ্চিম প্রদেশের ও পঞ্জাবের প্রত্যেকটি প্রধান নগরে গিয়া সিবিল সার্বিসের বয়স বৃদ্ধি ও একইকাল ভারতে পরীক্ষা গ্রহণের প্রস্তাব করিয়া বক্তৃতা করিয়া বেড়াইলেন। পর বৎসরেও তিনি পশ্চিমে ও দাক্ষিণাত্যে এই উদ্দেশ্যে গমন করেন। তখনকার রাজনৈতিক আন্দোলন কি লইয়া হইত ভাবিলে বর্ত্তমানে অনেকের হাসি পাইতে পারে, কিন্তু ইহাই বর্ত্তমানের সূচনা।

মিঃ ফসেটের বিলাতে আন্দোলন

ভারতবর্ষের অভাব অভিযোগের আলোচনা ও আন্দোলন যে কেবল এখানেই হইতেছিল তাহা নহে; ইংলণ্ডে ভারতের দুই এক জন সুহৃদ চিরদিনই দেখা যায়; তাঁহারা বরাবরই আন্দোলন করিয়া আসিতেছেন। ইংরাজজাতি যুক্তি বুঝে জবরদস্তি বুঝে না; সেইজন্য বিধিসঙ্গত আন্দোলন করিতে ইংরাজেরা বাধা দেয় না। ইংলণ্ডের বিখ্যাত বাগ্মী জন্-ব্রাইট্ চিরদিন ভারতের জন্য সংগ্রাম করিয়াছিলেন। তাঁহার পরে প্রসিদ্ধ অর্থনীতিজ্ঞ পণ্ডিত মিঃ ফসেট্ ভারতের পক্ষ অবলম্বন করিয়া পার্লামেণ্টে লড়াই আরম্ভ করিলেন। ১৮৬৫ সালে তিনি পার্লামেণ্টের সদস্য হন। ভারতের শাসন কার্য্যে ভারতবাসীর সংখ্যা ও সামর্থ্য এত অল্প বলিয়া তিনি প্রতি নিয়ত তাহার তীব্র সমালোচনা করিতেন।

সিবিলসার্বিসের পরীক্ষা সম্বন্ধে তাঁহার মত ভারতীয় আন্দোলনকারীদের সহিত সম্পূর্ণ মিলিয়াছিল; তিনি প্রস্তাব করেন যে বিলাতে এবং কলিকাতা, বোম্বাই ও মান্দ্রাজে একই কালে সিবিল সার্বিসের পরীক্ষা গৃহীত হউক। ১৮৭১ সালে তাঁহারই সভাপতিত্বে ভারতের আর্থিক ব্যবস্থা সুদৃঢ় করিবার জন্য এক কমিশন বসিয়াছিল। ১৮৭৪ সালে তিনি ফসেট পার্লামেণ্টের সভ্য শ্রেণী হইতে বিচ্যুত হইলে কলিকাতার

অধিবাসীরা তাহাদের অন্তরের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া ৭৫০০ টাকা তাঁহাকে দিয়া পুনরায় সভ্য হইবার জন্য উৎসাহিত করিলেন। ১৮৭৫ সালে লর্ড সেলিসবেরী ভারতের রাজ-কোষ হইতে অর্থ লইয়া রাজঅতিথি তুর্কীর সুলতানকে বিলাতে ভোজ দিলেন। ইহাতে মিঃ ফসেট ঘোর প্রতিবাদ করেন। সেলিসবেরীর এই কার্য্যকে তিনি 'মহৎ নীচত্ব' বলিয়া অভিহিত করেন। আবিসীনিয়া-সমরের সমগ্র ব্যয় ভারতের উপর চাপাইবার প্রস্তাব হইলে পার্লামেণ্টে এই মহাত্মাই প্রতিবাদ করেন ও অবশেষে ঠিক হয় ভারত সরকার অর্দ্ধেক ব্যয় বহন করিবেন অপরার্দ্ধ বৃটীশ রাজকোষ হইতে প্রদত্ত হইবে। ১৮৭৯ সালে ডিউক অব্ এডিনবরা এদেশে আসিয়াছিলেন তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি; তিনি এদেশে ভ্রমণকালে ভারতীয় রাজাদের কিছু কিছু উপঢৌকন দিয়াছিলেন; এই উপঢৌকনের মূল্য ভারতবর্ষ হইতেই দেওয়া হয়। প্রিন্স অব্ ওয়েলসের ভারত ভ্রমণের ব্যয় সম্পূর্ণরূপে ভারতের উপর অর্পিত হইবার কথা উঠিলে ফসেট্ ঘোর প্রতিবাদ করেন। ভারতের পক্ষ হইতে কেবল তিন লক্ষ টাকা দিয়া ইহার মীমাংসা হয়। এই সব অদূরদর্শীতার জন্য তৎকালীন শাসনকর্ত্তারা দায়ী; তাঁহারা দেশের লোকের মত বা মনোভাব গ্রাহ্য না করিয়া চলিতেছিলেন বলিয়াই অশান্তি বাড়িয়া চলিতেছিল। এমন সময়ে মহাত্মা লর্ড রীপন আসিয়া ভারতে শান্তি স্থাপন করিলেন।

রীপনের শাসন

১৮৮০ সালে বিলাতে রাজনৈতিক রক্ষণশীল দলের পরাজয় হইলে লীটন কাজ ছাড়িয়া দিলেন ও তাঁহার স্থানে রীপন শাসন কর্ত্তা হইয়া এদেশে আসিলেন। রীপনের প্রথম কাজ হইল আফগানিস্থানের সহিত সন্ধিস্থাপন। আমীরের সহিত তিনি যে সখ্যতা স্থাপন করিয়াছিলেন তাহা বিগত যুদ্ধের দারুণ দুর্দিনের সময়েও অক্ষুণ্ণভাবে বজায় ছিল। কেবল গত বৎসর হইতে পুনরায় বিরোধ আরম্ভ হইয়াছে।

মহীশূরের করদ রাজ্য ১৮৩১ সালে কু-শাসনের জন্য বৃটীশরাজ তাহার তত্ত্বাবধানের ভার স্বয়ং গ্রহণ করেন। ১৮৬১ সালে সরকার বাহাদুর এই রাজ্য প্রাচীন রাজবংশের হস্তে সমর্পণ করিতে মনস্থ করেন; কিন্তু সে সময়ে রাজা নাবালক ছিলেন। ১৮৮১ সালে মহীশূরের রাজসিংহাসনে পুনরায় হিন্দুরাজাকে অভিষিক্ত করিয়া বৃটীশরাজ ন্যায় ও সত্যের যে উদাহরণ দেখাইয়াছিলেন তাহা ইতিহাসে বিরল। দেশীয় মুদ্রাযন্ত্র সম্বন্ধে যে আইন লীটনের সময়ে পাশ হইয়াছিল রীপন তাহা প্রত্যাহার করিয়া দেশের কৃতজ্ঞতাভাজন হইলেন। এই সময়ে ব্যবস্থাপক সভায় রীপন ঘোষণা করিলেন যে জাতীয় স্বরাজ্য পাইবার পূর্বে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন আগে প্রয়োজন। দেশের লোককে স্বায়ত্ব শাসনের জন্য ক্রমশঃ উপযোগী করা দরকার; ভারতবর্ষ বহুদিন পরাধীন; আত্মনির্ভর, আত্মবিশ্বাস ও মিলিত হইয়া কাজ করিবার শক্তি তাহার নষ্ট হইয়াছে। সেই শক্তি-বিকাশের জন্য স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন প্রবর্ত্তিত হইল। তাঁহার সময় হইতে ম্যুন্সিপালটি ও লোকাল বোর্ডের শাসন পদ্ধতি আরম্ভ হয়।

রীপন শাসন বিভাগের অন্যান্য কোটায় হস্তক্ষেপ করেন। য়ুরোপীয় ও দেশীয়দের বিচার একই ভাবে হইত না। শ্রীযুক্ত বিহারীলাল গুপ্ত সিবিল সার্ভিসের লোক ও ম্যাজিষ্ট্রেট্ ছিলেন; তিনি ১৮৮২ সালে বঙ্গীয় ছোট লাটের নিকট বিচারালয়ে বর্ণগত ভেদের বিরুদ্ধে ঘোর প্রতিবাদ করিয়া এক পত্র প্রেরণ করেন। পর বৎসর ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় তৎকালীন (ল-মেম্বর) আইন সদস্য মিঃ ইলবার্ট এই বিল উপস্থিত করেন। সভাতে রীপন ব্যতীত এই প্রস্তাব আর কেহই অনুমোদন করিলেন না। দেশীয়দের নিকট য়ুরোপীয়দের বিচারের প্রস্তাবে সমগ্র ইংরাজ সমাজ ক্ষেপিয়া উঠিল; চারিদিকে ভীষণ আন্দোলন সুরু হইল; য়ুরোপীয়েরা একযোগে একবাক্যে ইহার প্রতিবাদ করিল। কিন্তু ভারতবাসীর চেষ্টা তখনো সুস্পষ্ট আকার

ইলবার্ট বিলের আন্দোলন

ধারণ করে নাই। তাহাদের ক্ষীণ কণ্ঠের আস্ফালনে কর্ণপাত করিবার প্রয়োজন তখন কেহ অনুভব করিতেন না। বিল পাশ হইতে পারিল না। দেশী বিদেশীয় মধ্যে বিরোধ ও বিদ্বেষ জমিয়া উঠিল।

রীপনের সময়ে শিক্ষা সম্বন্ধে এক বৈঠক বা কমিশন বসে। শিক্ষা এতদিন পর্য্যন্ত উপরের শ্রেণীর মধ্যেই আবদ্ধ ছিল; বাংলাদেশে ধনী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সমবেত চেষ্টায় বহুশত উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয় ও অনেকগুলি কলেজ স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু নিম্নশ্রেণীর মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে নাই। এই বৈঠক দেশীয় বিদ্যালয়গুলিকে বাঁচাইয়া তুলিবার জন্য উপদেশ দিলেন এবং মধ্য ও ইংরাজি শিক্ষার জন্য দেশীয় লোকদের চেষ্টা যাহাতে বৃদ্ধি পায় সেইদিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন।

১৮৮২ শিক্ষা কমিশন

বাংলাদেশের মনীষিগণের মনের মধ্যে প্রথমে এই কথাটি জাগে যে মিলিত চেষ্টা ছাড়া ভারতের বাঁচিবার আশা নাই। মহারাজ জ্যোতিরিন্দ্র মোহন ঠাকুর ধনে মানে সেই সময়কার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার নেতৃত্বে কলিকাতায় নেশনাল লীগ (National League) স্থাপিত হয়। ১৮৮৩ সালে ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েশন এক জাতীয় মহাসভা (National Conference) আহ্বান করেন। কলিকাতায় বর্ত্তমান প্রেসিডেন্সি কলেজের সম্মুখস্থিত আলবার্ট কলেজের হলে এই সভা হয়। আনন্দ মোহন বসু ও সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন ইহার উদ্‌যোক্তা। তিন দিন এই সভার অধিবেশন হয়; দুই বৎসর পরে বোম্বাইতে যে কংগ্রেস হয় ইহা তাহারই পূর্বাভাস। ইহার পর বৎসর মাদ্রাজে মহাজন সভা ও বোম্বাইতে প্রেসিডেন্সী এসোসিয়েশন স্থাপিত হয়।

১৮৮৩ নেশানেল কন্‌ফারেন্স

ভারতবাসীদের এইরূপ নানা প্রয়াস যখন অস্ফুট আকারে দেখা দিতেছিল একজন সহৃদয় ইংরাজ রাজপুরুষ নীরবে এই নবজীবনের

প্রতি স্পন্দন লক্ষ্য করিতেছিলেন। এই মহানুভব রাজকর্ম্মচারীর নাম মিঃ এ, ও, হিউম্। হিউম সিবিলসার্ব্বিসের লোক ছিলেন। তাঁহার চারিত্র-মাধুর্য্যে তিনি সিপাহী-বিদ্রোহের দুর্দ্দিনে উত্তর পশ্চিম প্রদেশে প্রজাদের শান্ত করিয়া রাখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ভারতবাসীর আর্থিক, নৈতিক ও রাজনৈতিক দুর্গতি দূর করিবার জন্য বহুদিন হইতে তাঁহার মনে আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছিল। ১৮৮৩ সালে কর্ম হইতে অবসর লইয়া হিউম্ শিক্ষিত ভারতবাসীর এই সাধু চেষ্টা ও সদুদ্দেশ্য ও ন্যায্য দাবীর সহিত আপনাকে অঙ্গীভূত করিলেন। রীপনের পরবর্ত্তী শাসনকর্ত্তা লর্ড ডাফরিন। মিঃ হিউম ডাফরিনের সহিত পরামর্শ করিয়া ভারতবাসীদের আশা আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিবার উপযোগী একটি প্রতিষ্ঠা স্থাপনের জন্য চেষ্টা করিলেন। প্রথম তিন বৎসর ডাফরিন জনসাধারণের এই কংগ্রেসকে সুদৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন; তারপর ১৮৮৮ সালে চতুর্থ বৎসরে যেবার এলাহাবাদে কংগ্রেসের অধিবেশন হয় সেইবার অকস্মাৎ বড়লাট বাহাদুরের মত ও ব্যবহারে পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইল।

মিঃ হিউম্ ও কংগ্রেস

১৮৮৫ সালের বড়দিনের সময়ে পুণা নগরীতে ভারতের জাতীয় মহাসমিতির প্রথম অধিবেশনের কথা হয়; সেখানকার সার্বজনিক সভা ইহার ভার গ্রহণ করেন। কিন্তু উক্ত সময়ে পুণাতে কলেরা মহামারী দেখা দিলে সভার অধিবেশন বোম্বাই সহরে স্থানান্তরিত করা হইল। সেখানকার প্রেসিডেন্সী এসোসিয়েশন অল্প সময়ের মধ্যে সম্বর্দ্ধনার যথোপযুক্ত আয়োজন করিয়া সকলের ধন্যবাদার্হ হইয়াছিলেন। বম্বের নেতাদের মধ্যে তেলাঙ্গ ও ওয়াচার নাম এই সভার সহিত অচ্ছেদ্য ভাবে গ্রথিত। এই সভার নাম হইল 'ইণ্ডিয়ান নেশনাল কংগ্রেস।' সেই হইতে এই পর্য্যন্ত ভারতের শিক্ষিত সমাজের মনোভাব এক প্রকার কংগ্রেসই প্রকাশ করিয়া আসিতেছে। কংগ্রেসের

বম্বেতে প্রথম কংগ্রেসে ১৮৮৫

উদ্দেশ্যঃ (১) ভারতের বিচিত্র জাতিকে এক মহাজাতিতে পরিণত করা ; (২) এই মহাজাতির নৈতিক, মানসিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নতি বিধান ; (৩) ও ভারতের উন্নতির পথের বাধাগুলিকে ন্যায্য ও বিধিসঙ্গত আন্দোলনের দ্বারা দূর করিয়া ভারত ও ইংলণ্ডের সখ্যতা স্থাপন।

১৮৮৫-১৯০৫ কংগ্রেস

১৮৮৫ হইতে ১৯০৫ সালের স্বদেশী আন্দোলনের আরম্ভ পর্য্যন্ত কংগ্রেসের মত ও সব একভাবে চলিয়াছিল। ১৯০৬ সালের কলিকাতার কংগ্রেসে দাদাভাই নৌরজী নূতন কথা প্রচার করিলেন ; সেটি হইতেছে এই ভারতবর্ষ বৃটিশ শাসিত অন্যান্য উপনিবেশাদির ন্যায় স্বায়ত্ব শাসন চায়। ১৯০৫ সালে বঙ্গচ্ছেদ আন্দোলনের সূত্রপাত হয় ; তখন হইতে বৃটীশ মাল বর্জনের জন্য বাংলা দেশে এক নূতন আন্দোলন সুরু হইল ; কংগ্রেসেও তাহার প্রতিধ্বনি শোনা গেল।

লর্ড ডাফরিনের সময়ে কতকগুলি বিশেষ রাজনৈতিক ঘটনা ঘটিয়াছিল। এই সময়ে রুশের সহিত বৃটীশ সরকারের বিবাদের সূচনা হয়। আফগন আমীর রুশকেও নিজের দেশে প্রবেশ করিতে দিলেন না ইংরাজকেও তাঁহার রাজনৈতিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে নিষেধ করিলেন ; কিন্তু ভারত সরকার হইতে অর্থ ও অস্ত্রাদি লইতে স্বীকৃত হইলেন। এই সকল ঘটনার জন্য ভারতের রেলপথ বিস্তার ও যুদ্ধের ব্যয় বৃদ্ধি পাইল। ইঁহারই

রাজনৈতিক ইতিহাস

সময়ে তৃতীয় বর্মা যুদ্ধ হয় এবং তাহার ফলে বর্মা বৃটীশ ভারতের ভুক্ত হয়। ১৮৮৭ সালে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্ব পঞ্চাশ বৎসর হইলে ভারতের সর্বত্র এই 'জুবিলি' উৎসব করা হয়।

লর্ড ল্যান্সডাউনের শাসনের সময়ে মনিপুর সমর ছাড়া আর কোনো বিশেষ ঘটনা হয় নাই বলিলেই হয় ভারতবর্ষ সত্য সত্যই শান্তি অনুভব করিতেছিল। কিন্তু এলগিনের সময় ভারতের সে শান্তি ভঙ্গ হইল। ১৮৯৬

সালে বোম্বাইতে 'প্লেগ' প্রথম দেখা দিল ; দেখিতে দেখিতে এই মহামারী ভারতের অল্পায়ু ও অল্পশক্তি অধিবাসীদের লক্ষ লক্ষের প্রাণবায়ু নিঃশেষ করিয়া লইল। প্রথম কয়েক বৎসর লোকের আতঙ্ক হইত ; কারণ ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট এই অভিনব শত্রুর হাত হইতে কেমন করিয়া রক্ষা পাওয়া যাইবে স্থির করিতে না পারিয়া দিশাহারা হইয়া নানারূপ প্রতিকারের চেষ্টা খুঁজিতে লাগিলেন। কিন্তু লোকের কাছে ব্যাধির চেয়ে ব্যাধির চিকিৎসা অধিক আতঙ্কের হইয়া উঠিল। প্লেগ রোগীদের পৃথক হাসপাতাল করিয়া সেখানে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করা হয়। এই ব্যবস্থা সকল স্থানে যে লাভনীয় হইয়াছিল তাহা নহে। পুণাতে এক দল লোক মনে করিলেন সরকার কেবল উৎপীড়ন করিবার জন্য এই কাটা ঘায়ে নুনের ছিটার ব্যবস্থা করিয়াছেন। মিঃ র‍্যানড্ পুণায় প্লেগ অফিসার ছিলেন; সমস্ত আক্রোশ তাঁহার উপর পড়িল ; দুইজন যুবক তাঁহাকে হত্যা করিল। বোম্বাই প্রদেশের লোকে এই যুবকদিগকে তাঁহাদের পরিত্রাতা বলিয়া মনে করিল এবং জাতি ও ধর্ম্মের জন্য তাহারা প্রাণ দিয়াছে বলিয়া বীররূপে পূজিত হইতে লাগিল। অনেকে মনে করেন নূতন জাতীয়তা বোধের সূত্রপাত এইখানে।

১৮৯৬ প্লেগের আবির্ভাব

লর্ড কর্জন ১৮৯৮ সালে ভারতের শাসনকর্ত্তা হইয়া আসিলেন। তাঁহার মত সুপণ্ডিত, জবরদস্ত ও সকল বিষয়ে উপযোগী লাট ইতিপূর্ব্বে ভারতে কখনো আসেন নাই। অনেকে মনে করেন যে কর্জন খুব রক্ষণশীল ছিলেন। ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সংস্কার করিবার জন্য তিনি যখন নূতন বিধি প্রণয়ন করিতে মনস্থ করিলেন তখন ভারতবাসীরা একবাক্যে তাঁহার এই কার্য্যের মধ্যে কোনো গূঢ় অভিপ্রায় আছে বলিয়া সন্দেহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন একদল লোক বলিলেন ভারতের উচ্চশিক্ষা বন্ধ করিবার জন্য নূতন ব্যবস্থা

কর্জন ও শিক্ষা সংস্কার

একটা ফিকির মাত্র, ইত্যাদি অনেক কথা সেই সময় শোনা গিয়াছিল। কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে ভাঁরতে যে কেবল শিক্ষা বিস্তার লাভ করিয়াছে তাহা নহে, উচ্চশিক্ষা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক অংশে উপযুক্ত সরঞ্জামের সাহায্যে অধ্যাপিত হইতেছে ও ছাত্রদের মনে যথার্থ জ্ঞানানুরাগ সঞ্চারিত হইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশনে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদের উপাধি বিতরণের সময়ে তিনি প্রসঙ্গচ্ছলে পূর্বদেশীয়দের স্বভাব সম্বন্ধে একটি অপ্রীতিকর মন্তব্য প্রকাশ করিয়া ফেলেন। শিক্ষিত বাঙালী তাঁহার এই উক্তিতে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া টাউনহলে বিরাট সভা আহ্বান করিয়া তাহার প্রতিবাদ করেন। উচ্চতম রাজকর্মচারীর দোষ ত্রুটি ধরিয়া তাহার তীব্র সমালোচনা করিবার মত সাহস বাংলাদেশে ক্রমেই বাড়িতেছিল। ইহার চেয়েও গুরুতর আন্দোলন অল্পদিনের মধ্যে আরম্ভ হইল। তাহারই কারণ এই।

লর্ড কর্জনের সময়ে বাংলাদেশ বলিতে আজকালকার বাংলা, এবং বিহার, উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুর বুঝাইত। একজন ছোটলাটের পক্ষে সত্যই এই কাজ অত্যন্ত বেশী হইয়া উঠিয়াছিল। ভারত সরকার ১৯০৩ সালে ৩রা ডিসেম্বর বাংলাদেশ বিভক্ত করিবার প্রস্তাব প্রচার করিলেন। বাঙ্গালীর ইহা পছন্দ হইল না। বাংলার চারিদিকে প্রতিবাদ করিয়া সরকার বাহাদুরকে জানানো হইল যে তাঁহারা যেন এমন কার্য্য করিয়া বাঙালীর হৃদয়কে আহত না করেন। বঙ্গচ্ছেদ রদ করিবার জন্য আবেদন নিবেদনের অন্ত থাকিল না; পূর্ব্ববঙ্গের ৭০ হাজার লোকের সহি দিয়া এক আবেদনপত্র ভারত সচিবের নিকট প্রেরিত হইল। ১৯০৩ হইতে ১৯০৫ সালের মধ্যে বাংলাদেশে প্রায় ২০০০ মিটিংএ সরকার বাহাদুরের এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিবার জন্য অনুরোধ করা হয়। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট মনে করিলেন শাসন-কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে হইলে বঙ্গচ্ছেদকরা তাঁহাদের কর্ত্তব্য;

বঙ্গচ্ছেদের প্রয়োজনীয়তা

সুতরাং বাঙ্গালীর ভাবোন্মত্ততায় কর্ণপাত করিতে গেলে রাজকার্য্য করা সুকঠিন। ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর বা ৩০শে আশ্বিন তারিখে ভারত গভর্ণমেণ্ট ঘোষণা করিলেন যে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজসাহী জিলা আসামের সহিত মিলিত হইয়া পূর্ববঙ্গ আসাম নামে পৃথক একটি প্রদেশ হইল—ঢাকা হইল ইহার রাজধানী। প্রেসিডেন্সী ও বর্দ্ধমান বিভাগ পূর্বের ন্যায় বিহার ওড়িষ্যার সহিত যুক্ত থাকিয়া বঙ্গদেশ বলিয়া পরিচিত থাকিবে। দুই বৎসরের ঘোর প্রতিবাদ ও সানুনয় অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া সরকার যতক্ষণ বাঙালীজাতিকে বিভক্ত করিলেন (দেশীয় নেতারা এইরূপ ভাবে ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন) তখন শান্ত ভীরু বাঙালীর মনেও সরকারকে জব্দ করিবার প্রবল ইচ্ছা জাগিয়া উঠিল; ইহাই স্বদেশী আন্দোলন। বঙ্গচ্ছেদ বাংলার বা ভারতের এই নূতন জাগরণের কারণ নহে ইহা স্বদেশী আন্দোলনের উপলক্ষ মাত্র। এই আন্দোলনের মুল ভারতবাসী মনের গভীরতর প্রদেশকে স্পর্শ করিয়াছিল। আমরা সেই কারণগুলি অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইব।

বঙ্গচ্ছেদ ১৯০৫

বহুকাল ধরিয়া ভারত শুনিতেছিল যে হিন্দুর ধর্ম্ম পৌত্তলিকতা বা জড়পূজার নামান্তরমাত্র, তাহার জাতির ইতিহাস নাই—ভারত চিরদিনই পরাধীন ইত্যাদি। খৃষ্টীয় পাদরীগণ দেশে বিদেশে সময়ে অসময়ে এই সকল কথাগুলি প্রচার করিতেন। এই সব অতিরঞ্জনের কথা এদেশে ও বিদেশে বিশ্বাস করিবার লোকের অভাব ছিল না। কিন্তু যখন দেখা গেল ভারতের ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, ভাষা সাহিত্য লইয়া য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন, যখন দেখা গেল বেদ পুরাণ ধর্ম্মশাস্ত্র লণ্ডন, প্যারীস, রোম, বার্লিন হইতে ছাপা ও অনূদিত হইয়া প্রকাশিত হইতেছে—তখন এ দেশের লোকের মনে হইল যে এসব ত তাহাদের লুপ্তরত্ন। তেমনি ধর্ম্ম

জাতীয় আন্দোলনের কারণ

সম্বন্ধে আত্মবোধ জাগ্রত হইল দুই কারণে; প্রথমতঃ গালি ও নিন্দা শুনিতে শুনিতে মানুষের মনে নিজের ভালমন্দ সমস্তটাকে সমর্থন করিবার ও তাহা লইয়া বুক ফুলাইয়া বড়াই করিবার যে স্বাভাবিক ইচ্ছা জন্মে তাহারই বশবর্ত্তী হইয়া হিন্দুসমাজ তাহার সংস্কারকদের ও খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইল ও প্রাচীনের জাঁক আরম্ভ করিল। বাংলা সাহিত্য বাংলাদেশে এই নূতন আন্দোলনের বিস্তারকল্পে অনেকখানি দায়ী। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলি ও বিশেষতঃ তাঁহার "আনন্দমঠ" দেশের লোকের মনকে আন্দোলিত করিয়াছিল। তাঁহার "বন্দে মাতরম্" সঙ্গীত ভারতের জাতীয়-সঙ্গীত হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রেরও মনে হিন্দু জাতীয়তার কথা জাগিতেছিল; তিনি নিজে চরম প্রতিক্রিয়াপন্থী ছিলেন; মুসলমানদের প্রতি তিনি খুবই অবিচার করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার লেখার মধ্যে জাতীয় ভাবের চেয়ে হিন্দুভাবই প্রকাশ পাইয়াছে অধিক। সেইজন্য তিনি দেশের হিন্দুদের নিকট প্রিয় হইয়াছেন। তাঁহার সাহিত্য জাতীয় জীবনের গঠনের পক্ষে আংশিকভাবে সার্থক হইয়াছে।

এমন সময়ে বিদেশ হইতে লোক আসিয়া ভারতের ধর্মের প্রশংসা সুরু করিল। মাডাম্ ব্লাভাস্কি ও আনিবেসান্ত প্রমুখ থিওজফিষ্টগণ এদেশে আসিয়া বলিতে লাগিলেন যে ভারতের ধর্ম ও আধ্যাত্মিক জীবনের তুলনা হয় না—এখানকার জাতিভেদ সমাজ-বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত, এখানকার আচার ব্যবহারের ভিত্তি বিজ্ঞানের পাথর-গাঁথা ভিতের উপরে। দেশের লোকে বিদেশ হইতে নিজ-ধর্ম সম্বন্ধে এমন কথা শুনিয়া আশ্বস্ত হইল—সে যে নীচ নহে তাহা সে হঠাৎ বুঝিল।

থিওজফি ও হিন্দু সমাজ

ইহার পর যখন স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকার শিকাগোর বিখ্যাত ধর্মসভাতে হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিয়া বক্তৃতা দিয়া দেশে ফিরিলেন তখন লোকে ভাবিল এটা একটা জয় হইল; ইহার উপর যখন

মিস্ নোব্‌ল খৃষ্টধর্ম ও সমাজ ত্যাগ করিয়া "ভগিনী" নিবেদিতা নাম গ্রহণ করিয়া হিন্দু সমাজের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন তখন লোকের হিন্দু ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে কোনোই সন্দেহ থাকিল না। বিবেকানন্দ দেশের কিশোর প্রাণের মধ্যে দেশভক্তি ও ধর্ম্মে মতির বীজ বপন করিবার চেষ্টা করেন। ক্রমে ধর্ম ও দেশভক্তি প্রতিশব্দের ন্যায় হইয়া গেল। ভারতের জাতীয়তা ক্রমে 'হিন্দু' জাতীয়তায় পরিণত হইল। অবশ্য আপনাকে ভাল করিয়া না জানিলে অপরের সহিত মিলনও গভীর হয় না।

বিবেকানন্দ ও বাংলাদেশ

ইহারই পাশাপাশি 'আর্য্য-সমাজের' আন্দোলন চলিতেছিল। দয়ানন্দ সরস্বতী বুঝিয়াছিলেন যে ভারতের মনকে জাগ্রত করিতে হইলে এখানকার প্রাচীন পথ অবলম্বন করিতে হইবে—সেটা হইতেছে একটা কোনো বিশেষ জিনিষকে বিশ্বাস করা। তিনি সেইজন্য বেদকেই আর্য্যদের সকল জ্ঞান ও বিজ্ঞানের আস্পদ বলিয়া প্রচার করিলেন। পঞ্জাবের শিক্ষিত, অধিকাংশ লোকই আর্য্যসমাজের মতাবলম্বী। সেখানেও ভারতের অতীত সম্বন্ধে লোকেরা অত্যন্ত সচেতন। যাহাদের বর্ত্তমান অনিশ্চিত, ভবিষ্যৎ অজ্ঞাত, তাহাদের অতীতের দিকে তাকাইয়া আত্মতৃপ্তি লাভ ছাড়া আর কি গতি আছে? সেই অতীত গৌরবের সুখস্বপ্ন দেখিতে দেখিতে মানুষ বর্ত্তমান সম্বন্ধে অতৃপ্ত হইল ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশান্বিত হইল। এইরূপে পঞ্জাব জাগিল।

দয়ানন্দ ও পঞ্জাব

বোম্বাইতে যে 'নেশনালিষ্ট' জাগরণ দেখা যায় তাহার মূলেও ধর্ম ছিল। গণপতি পূজা মহরটাদের জাতীয় পূজা। ১৮৯৩ সালে পুণাতে এই পূজা উপলক্ষে স্থানীয় হিন্দু মুসলমানে বিরোধ হয়। কিছুকাল পূর্ব হইতে গো-বধ লইয়া হিন্দুরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছিলেন। ১৮৯৪

টিলক ও বোম্বাই

সালে এই গণপতিকে সার্বজনিক পূজায় পরিণত করা হয়। ইহার পর বৎসরে শ্রীযুক্ত টিলক "শিবাজী-উৎসব" প্রবর্ত্তিত করেন। শিবাজীর তেজস্বিতা, তাঁহার স্বদেশ ও স্বধর্মপ্রেম পুনর্জাগ্রত করাই ইহার উদ্দেশ্য। এই উৎসবের সময়ে শিবাজী সম্বন্ধে যে-সকল বক্তৃতাদি হইত তাহার ভিতরে প্রচ্ছন্ন বিদ্বেষ থাকিত বলিয়া কেহ কেহ সন্দেহ করেন। প্লেগের কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। হিন্দু পারিবারিক আদর্শ ভাঙ্গিয়া ও জাতিভ্রষ্ট হইয়া প্লেগ-হাসপাতালে যাওয়ার বিরুদ্ধে টিলক "কেশরী" পত্রিকাতে লিখিতে থাকেন। এই উত্তেজনার মুখে তিনি ১৮৯৭ সালের ১৫ই জুনে তাঁহার পত্রিকাতে শিবাজীর জীবন চরিত ও আদর্শ সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ প্রকাশ করেন তাহা খুবই আপত্তিজনক বলিয়া সরকার বাহাদুর মনে করেন। ২২শে জুন তারিখে সাতদিন পরে মিঃ র‍্যাণ্ড নিহত হন। ১৮৯৮ হইতে ১৯০৬ সালের মধ্যে 'কেশরী' পত্রিকা মহরটাদের খুবই প্রিয় হইয়া উঠিল এবং দেখিতে দেখিতে গ্রাহক সংখ্যা ২০ হাজার হইয়া গেল। এই সব ধর্মান্দোলন ক্রমে রাজনৈতিক আন্দোলনে পরিণত হইল এবং বোম্বাইতেও ধর্ম ও রাজনীতি এক হইয়া দাঁড়াইল।

ভারতবাসী দুর্বল বলিয়া পথেঘাটে আপিষে রেলে তাহাকে অনেক সময়ে সবলকায় শ্বেতাঙ্গদের হস্তে লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইত। সুযোগ এবং সামর্থ্যের অভাব বশত লোকে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিয়া থাকিত। যেবার প্রিন্স রনজিৎ সিংহের ক্রিকেট খেলোয়াড়গণ দিগ্বিজয় করিয়া ফিরিল ভারতবাসীর মনে প্রথমে আত্মপ্রসাদের লক্ষণ দেখা দিল। বুয়র যুদ্ধের সময়ে বুয়র জাতিকে বশ মানাইতে ইংরাজদের দুই বৎসর লাগাতে ইংরাজের শক্তির উপর লোকের সন্দেহ জন্মিল। তারপর রুশ জাপানের যুদ্ধের সময়ে রুশের পরাভবে ভারত-বাসীরা অনুভব করিল যে পূর্ব-দেশের শক্তি অল্প নয়। অন্নভোজী, বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী জাপান রুশের

ন্যায় প্রবল প্রতাপশালী রাজ্যকে পরাভূত করিয়াছে; ইহাতেও সে আশান্বিত হইল। অসন্তোষের আর একটি কারণ শিক্ষিতদের চাকুরী বা উপযুক্ত কর্মের অভাব। ইহার জন্য দায়ী সরকার নয়—সরকার শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন—কিন্তু তাহার পক্ষে প্রত্যেকের চাকুরীর সন্ধান করিয়া দেওয়া সম্ভব নয়।

অন্যান্য কারণ

এই সময়ে ভারতের আর্থিক অবস্থার ইতিহাসবিষয়ে কয়েকখানি পুস্তক প্রকাশিত হয়। ইহার মধ্যে দাদাভাই নৌরজীর পুস্তক প্রথম; সেই গ্রন্থের নাম "ভারতবর্ষের দারিদ্র্য ও বৃটিশ ভারতে বৃটিশ অনোচিত শাসন" (The Poverty and un British rule in British India). দ্বিতীয় গ্রন্থের লেখক উইলিয়ম ডিগ্‌বী; ইনি একজন বিখ্যাত ইংরাজ কর্মচারী ছিলেন। তাঁহার গ্রন্থের নাম 'সমৃদ্ধিশালী বৃটীশ ভারত' বা ১৮৫০তে ২ পেনি ১৮৮০তে ১½ পেনি ১৯০০তে ¾ পেনি (The Prosperous British India)। পুস্তকখানির নাম ব্যঙ্গ করিয়া দেওয়া হয়। বিলাতে পুঁথি ও নথি ঘাঁটিয়া বহুশত পুস্তক পাঠ করিয়া এই গ্রন্থখানি লিখিত। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়—'ভারতের আর্থিক ইতিহাস' (Economic History) দুই খণ্ডে বিলাত হইতে প্রকাশিত করেন। এ দুইখানি গ্রন্থও বহু দিনকার গবেষণার ফল। ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া ভারতের কৃষকদের অবস্থা ভাল করিয়া জানিবার সুযোগ তাঁহার হইয়াছিল। লর্ড কর্জনকে তিনি প্রকাশ্যভাবে কয়েকখানি পত্র লিখিয়া কৃষকদের দুরবস্থার কথা প্রকাশ করেন। যদিও সরকার বাহাদুর দত্ত মহাশয়ের প্রত্যেকটি যুক্তি তন্ন তন্ন করিয়া বিচার ও বিশ্লেষণ করিয়া ছিলেন—তথাচ লোকের সন্দেহ ঘুচে নাই, কারণ সরকারী প্রতিবেদনাদি বিশ্বাস না করিবার অভ্যাস দেশের শিক্ষিত সমাজের মজ্জায় মজ্জায় প্রবেশ করিয়াছে। এছাড়া স্যর হেন্‌রী কটন্ 'নব্য ভারত' (New India) নামে একখানি গ্রন্থে ভারতবাসীর

কয়েকখানি পুস্তক প্রকাশ

আশা নিরাশার কথা সুস্পষ্ট করিয়া লিখেন। স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে সখারাম গণেশ দেউস্কর নামক জনৈক বঙ্গপ্রবাসী মহরাঠা ব্রাহ্মণ প্রধানত উপরোক্ত গ্রন্থসমূহের উপর নির্ভর করিয়া 'দেশের কথা' নামে একখানি বাংলা পুস্তক প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থে রাজদ্রোহাত্মক কিছু না থাকিলেও ইহা এমনি একপেশে ধরণে লিখিত যে অর্দ্ধ শিক্ষিত ও সুকুমারমতি বালকদের মনে বিদ্বেষাগ্নি জ্বালাইবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। এই কারণে সরকার পরে উহার ছাপা বন্ধ করিয়া দেন। এক্ষণে একথা বলিয়া রাখা উচিত যে উপরিউক্ত ইংরাজী গ্রন্থগুলি অত্যন্ত একপেশে অর্থাৎ কোম্পানীর বা বর্ত্তমান শাসনের অভাবের দিকটাকে সুস্পষ্ট করিয়া তুলিবার জন্যই যেন লেখকদের সমগ্র প্রযত্ন হইয়াছে। সুতরাং এই সব গ্রন্থ সাধারণের সাবধানতার সহিত ব্যবহার প্রয়োজন।

পুস্তকগুলির একপেশে বর্ণনা

এসব ছাড়া দেশীয় পত্রিকাগুলি অসন্তোষ প্রচারের জন্য কিয়দ পরিমাণে দায়ী। রীপণের সময় মুদ্রাযন্ত্র সম্বন্ধীয় আইন রদ হওয়াতে দেশীয় পত্রিকা গুলির সাহস খুবই বাড়িয়া উঠিয়াছিল। তাঁহারা বৃটীশ ভারতের প্রজার অধিকারের দোহাই দিয়া অনেক অপ্রিয় কথা, অনেক অপ্রিয় সমালোচনা প্রকাশ করিতেন। ছোট ঘটনাকে বড় করিয়া তুলিয়া অনেক সময়ে বিদ্বেষের কথা প্রচার করিতেন। উপরোক্ত সমস্ত ঘটনাগুলি ভারতের চিত্তকে এমনি অধিকার করিয়াছিল যে বৃটীশ শাসনের হিতের প্রতি তাহার দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় নাই, বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পায় নাই। বঙ্গচ্ছেদের আন্দোলন বিরাট দেশব্যাপী আন্দোলনের উপলক্ষ মাত্র। কারণগুলি পূর্বেই নির্দ্দেশ করিয়াছি। কিন্তু এই স্বদেশী-আন্দোলনে যোগ দিল কাহারা ? ভাল করিয়া দেখিতে গেলে বুঝা যায় ভদ্র ও শিক্ষিত সমাজের মধ্যে ভাসাভাসা ভাবে স্বদেশীস্রোত স্পর্শ করিয়াছিল। নিম্নস্তর ও মুসলমানদের মধ্যে স্বদেশী আন্দোলনের ঢেউ সামান্যই গিয়া লাগিয়াছিল।

১৯০৫ সালের ৭ই আগষ্ট তারিখ বাংলাদেশের স্বদেশী আন্দোলনের জন্মদিন। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয় "সঞ্জীবনী" পত্রিকায় বিলাতী দ্রব্য 'বয়কট' বা বর্জ্জন করিবার কথা প্রস্তাব করেন। প্রথমে যে আন্দোলন সুরু হয় তাহা ছিল কেবল রাজনৈতিক, অর্থাৎ যে প্রতিজ্ঞা-পত্র বাহির হয়—তাহাতে লেখা ছিল যে যতদিন না বঙ্গচ্ছেদ রদ হয়, ততদিন বিলাতী দ্রব্য বর্জন করা হইবে। কিন্তু ক্রমে উহাই স্বদেশী বা শিল্পোন্নতি আন্দোলনে পরিণত হইল এবং আরও পরে উহা জাতীয় বা 'নেশন্যালিষ্ট' আন্দোলনে পরিণত হইল। ৩০শে আশ্বিন বঙ্গচ্ছেদের দিন। সেই দিনকে বাঙালী একাধারে আনন্দ ও বিষাদের দিন করিয়া লইল; বাংলার যে ভাগ হইয়াছে ইহা বাঙালী স্বীকার করিল না; রবীন্দ্রনাথের প্রস্তাবানুসারে বাঙালী এই দিনটিকে পবিত্র "রাখিবন্ধনের" দ্বারা জাতীয় বন্ধনকে দৃঢ় করিল; তিনি সেই সময়ের উপযোগী করিয়া "বাংলার মাটি, বাংলার জল" নামে অক্ষয় সঙ্গীতটি রচনা করিয়া দেশবাসীর কণ্ঠে উপহার দিলেন।

বিলাতী দ্রব্য বর্জন বা বয়কট

রাখিবন্ধন

ক্রমে বিলাতীদ্রব্য ক্রয় ও বিক্রয় লইয়া দেশের নানাস্থানে অশান্তির সৃষ্টি হইতে লাগিল। প্রতি গ্রামে প্রতি সহরে বিরাট জনসভা আহ্বান করিয়া স্থানীয় নেতৃগণ কলিকাতার বিখ্যাত বক্তাদের লইয়া যাইতেন। বিলাতী কাপড়, বিলাতী লবণ, চিনি, মনোহারী সামগ্রী বর্জন করিতে তাঁহারা সকলকেই উৎসাহিত করিতেন। স্কুলের ছেলেরা 'পিকেটিং' সুরু করিল, অর্থাৎ কাহাকে বিলাতী কাপড় চিনি লবণ বা কোন দ্রব্য কিনিয়া লইয়া যাইতে দেখিলে স্বেচ্ছাসেবকগণ তাহাকে অনুনয়, বিনয়, ভয় প্রভৃতি নানা উপায়ে দেশী কাপড় কিনিতে প্রবৃত্ত বা বাধ্য করিত। দেশী কাপড় মাথায় করিয়া স্কুল কলেজের ছাত্রেরা গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া স্বদেশী আন্দোলনের কথা প্রচার করিতে লাগিলেন। কোন কোন স্থানে স্বদেশীর নামে নিরক্ষর

লোকের উপর রীতিমত অত্যাচার হইয়াছিল। এই দেশব্যাপী বিলাতী দ্রব্য-বর্জনের আন্দোলনের ফল ফলিল। ১৯০৮ সালে পূজার সময়ে লক্ষ্মীপূজার দিনে মাড়বারীরা বিলাতী কাপড় রপ্তানীর কণ্ট্রাক্ট কমাইয়া দিল; কয়েকটি হৌস্ দেউলাও হইয়া গেল।

সরকার এই সব আন্দোলন বন্ধ করিবার জন্য ধীরে ধীরে নিয়মাদি পাশ করিতে লাগিলেন। স্কুলের ছাত্রদের এই সব হুজুগে যোগ দেওয়া তাহাদের পাঠ ও মনের পক্ষে ক্ষতিকর বলিয়া গভর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী রিস্লীসাহেব স্কুল সমূহের প্রতি এক সার্কুলার প্রচার করিলেন।

এণ্টিসার্কুলার সোসাইটি

উৎসাহের আতিশয্যে তখনই তাহার পাল্টা Anticircular Society খোলা হইল। কিছুকালের জন্য এই সমিতি দেশের কাজ খুব উৎসাহের সহিত করিয়াছিল। বিলাতী বাণিজ্য বন্ধ করিবার জন্য ও দেশীয় অর্দ্ধমৃত কুটীর-শিল্পকে পুনর্জীবিত করিবার জন্য যতটুকু ভাবোচ্ছ্বাস প্রদর্শনের প্রয়োজন তাহা করিতে বিজ্ঞ নেতা হইতে স্কুলের ছেলে কেহই কিছু কম করেন নাই। চারিদিকে তাঁত, মোজার কল, নিবের কারখানা, বোতামের কারবার জাগিয়া উঠিল। হঠাৎ যেন বাংলার 'মরা গাঙে বান' আসিল।

স্কুলের ও কলেজের ছাত্রদিগকে যখন রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিতে নিষেধ করিয়া সরকার বাহাদুর কড়াকড়ি আরম্ভ করিলেন ও আন্দোলনকারীদিগকে শাস্তি বিধান করিতে লাগিলেন তখনই বাঙ্গালী উৎসাহে অন্ধ হইয়া "বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ্" স্থাপন করিল।

জাতীয় শিক্ষা পরিষদ্

১৯০৬ সালে জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল; এম্ এ ক্লাস হইতে শিশু শিক্ষার ক্লাস পর্য্যন্ত কখন কোথায় কি কি পড়ানো হইবে সমস্ত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচিত, লিপিবদ্ধ মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল।

বাংলাদেশে ধনে-মানে-জ্ঞানে এমন একটি বড় লোক ছিলেন না, যাঁহার-

নাম এই পরিষদের সহিত যুক্ত না ছিল। দেখিতে দেখিতে লক্ষ লক্ষ টাকা উঠিল, বাড়ী ভাড়া করা হইল, প্রকাণ্ড লাইব্রেরী দানে দানে ভরিয়া উঠিল—ছাত্র জুটিল। বহু গ্রামে ও সহরে জাতীয় শিক্ষালয় খোলা হইল—স্বার্থত্যাগী শিক্ষক ও কর্মীর অভাব কোথাও হইল না। কিন্তু আজ সে শিক্ষা-পরিষদ্ কোথায়? কেবল টেক্‌নিক্যাল বিভাগ চলিতেছে—তবে তাহার মধ্যে ন্যাশন্যালত্ব কিছুই নাই।

বরিশালে প্রথম সংঘর্ষ

১৯০৬ সালের গুডফ্রাইডের ছুটিতে সেবার প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্স বরিশালে হয়। পুলিশ আসিয়া এই সভা ভাঙ্গিয়া দিয়া যায় এবং কৃষ্ণ কুমার মিত্র, ভূপেন্দ্রনাথ বসুর ন্যায় লোকও পুলিশের কাছে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হন। বরিশালের অপমাননায় বাংলাদেশ অপমান বোধ করিল; বয়কট ও আন্দোলন ভীমবেগে চলিতে লাগিল। এই সময় হইতেই ভারতবর্ষের সকল প্রদেশেই নেতাদের মধ্যে ভারতের ভাবী আদর্শ ও তাহা লাভ করিবার উপায় লইয়া মত ভেদের সূত্রপাত হয়। কাগজ পত্রে একদল 'নরমপন্থী' ও আর একদল 'চরমপন্থী' বলিয়া অভিহিত হইতে থাকেন। সুরেন্দ্রনাথ ও গোখ্‌লে নরমপন্থীদের নেতা; বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ ও টিলক চরমপন্থীদের চালক ছিলেন। 'বন্দে মাতরম্', 'স্বরাজ', 'সন্ধ্যা', 'নবশক্তি,' 'কর্মযোগীন্', প্রভৃতি কাগজগুলি চরমপন্থীদের মুখপত্র ছিল। এই সবগুলিই নূতন পত্রিকা এবং ইহার একখানিও আজ নাই।

চরমপন্থী ও নরমপন্থী

"যুগান্তর" নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম হইতেই বাহির হইতে থাকে; তাহার ভাব ও ভাষা অন্যসবগুলি হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক। শারীরিক শক্তির দ্বারা বৃটীশ শক্তিকে পরাভূত করিতে হইবে এইমত তাঁহারা প্রচার করেন। বাঙ্গালী শরীরে দুর্বল এ অপবাদ ঘুচাইবার জন্য বাংলাদেশের নানাস্থানে 'অনুশীলন সমিতি' স্থাপিত হয়; গীতাপাঠ,

রাজদ্রোহাত্মক সাহিত্য পাঠ ও আলোচনা, বর্ত্তমান রণনীতি সম্বন্ধে শিক্ষা, লাঠি, তরবারি, ছোরা প্রভৃতি খেলিতে শিক্ষা দেওয়া এই সব সমিতির প্রধান কাজ ছিল বলিয়া প্রকাশ। যুগান্তরের লেখকগণ লোককে বুঝাইতেন যে শারীরিক শক্তি প্রয়োগ পূর্ব্বক বৃটীশ শাসনকে উঠাইতে হইবে; হত্যা করা ধর্ম্মের অঙ্গ এ মত ত' গীতায় স্বয়ং ভগবান প্রচার করিয়াছেন ইত্যাদি।

"যুগান্তরে"র বিপ্লববাদ

গীতার ধর্ম্মকে ইহারা হত্যাদি করিবার ধর্ম্মের আবরণ ও বর্ম্ম করিলেন; রাজনীতি ও ধর্ম্ম এক হইল। ইহার বিষময় ফল অচিরেই দেখা গেল।

১৯০৬ সালে যুগান্তরের সম্পাদকের প্রথম জেল হইল। ভারতের অন্যত্রও এই শ্রেণীর সাহিত্য ও পত্রিকা প্রচারিত হইতে আরম্ভ করিল। হিন্দীতে 'হিন্দস্বরাজ,' মহরাঠী ভাষায় 'কাল' ও 'কেশরী' যে ভাবে তাঁহাদের মত প্রকাশ করিতে থাকিলেন তাহাতে বিদ্বেষ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

এইসব আন্দোলন ও অশান্তিকারীদের মধ্যে শ্যামজী কৃষ্ণবর্ম্মা ও বিনায়ক সরকারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য। কৃষ্ণবর্ম্মা ১৯০৫

কৃষ্ণবর্ম্ম ও ষড়যন্ত্র

সালে বিলাতে চলিয়া যান ও সেখান হইতে রাজদ্রোহ জাগ্রত করিবার জন্য নিয়মিত ভাবে চেষ্টা করিতেছিলেন। বহুদিন পর্য্যন্ত বিলাতের সকল প্রকার বিদ্রোহ ও ষড়যন্ত্রের কেন্দ্র ছিলেন তিনি; অবশেষে লণ্ডন হইতে পলায়ন করিয়া তিনি প্যারী নগরীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং সেখান হইতে বিদ্রোহ, রণনীতি, ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে বহুপ্রকারের পত্রিকা ভারতে গোপনে প্রেরণ করেন। বাংলাদেশের ন্যায় বোম্বাই ও পঞ্জাবের ভিতরে অশান্তি ও বিদ্রোহের তুষে-ঢাকা-আগুন গুমরাইতেছিল।

১৯০৭ সালের মার্চ মাসে বড়লাট লর্ড মিণ্টো ঘোষণা করিলেন যে তিনি পার্লামেণ্টের নিকট ভারত শাসন সংস্কার বিষয়ক প্রস্তাব প্রেরণ

করিয়াছেন। প্রায় ঠিক সেই সময়ে পঞ্জাবে নানা স্থানে অশান্তির চিহ্ন দেখা দিল; আর্য্যসমাজের নেতৃস্থানীয় লালা লাজপত রায় ও সর্দার অজিৎ সিং এই সব অশান্তির জন্য দায়ী বলিয়া গবর্ণমেণ্ট সাব্যস্ত করেন ও ১৮১৮ সালের নির্বাসন আইনানুসারে তাঁহাদিগকে দেশান্তরিত করিলেন। বাংলা দেশেও তলে তলে এই সময়ে ষড়যন্ত্র চলিতেছিল।

পাঞ্জাব নেতাদের নির্বাসন

ঐ বৎসরের ডিসেম্বর মাসে সুরাটে কংগ্রেসের অধিবেশন হইল। 'নরম' ও 'চরম' পন্থীদের মধ্যে ইতিমধ্যেই বিবাদের সূত্রপাত হইয়াছিল। নাগপুরের কংগ্রেস-অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির হাত হইতে কলম কাড়িয়া লইলে সভা ভাঙ্গিয়া যায়। সুরাটের কংগ্রেসে (স্যর) ডাঃ রাসবিহারী ঘোষ সভাপতি হন। তাঁহার বক্তৃতা পাঠের পূর্বেই চরম পন্থীরা সভামধ্যেও এমন কাণ্ড বাঁধাইয়া তুলিলেন যে তাহাতে সভা হইতে পারিল না। গোলমালের সময়ে একখানি মহরাঠা দেশীয় জুতা প্রবীন নেতা সুরেন্দ্রনাথের উপর আসিয়া পড়িল। এদিকে ১৯০৮ সালে ৩রা মে তারিখে মজঃফরপুরে এক ভীষণ কাণ্ড হইল। মিঃ কেনেডী নামক একজন ইংরেজ ব্যারিষ্টার তাঁহার স্ত্রী শুদ্ধ বোমার দ্বারা নিহত হন। এই অপরাধী ধরা পড়ে। ইহার নাম ক্ষুদীরাম—মেদিনীপুরের একটি স্কুলের ছাত্র। কিংসফর্ড নামক কোনো ম্যাজিষ্টেট্ স্বদেশী স্বেচ্ছাসেবকগণের প্রতি কঠোর শাস্তি বিধান করায়—এই বোমা তাঁহারই উদ্দেশ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। এই ঘটনার কিছুদিনের মধ্যেই কলিকাতায় মাণিকতলায় প্রকাণ্ড এক বোমার কারখানা ও ষড়যন্ত্র আবিষ্কৃত হইল। ইহা আলিপুর বোমার মোকর্দমা নামে বিখ্যাত। সরকার অনুসন্ধান করিয়া জানেন যে কয়েকজন শিক্ষিত যুবক দুই বৎসর ধরিয়া এই কর্মে লিপ্ত থাকিয়া নানা প্রকারে দেশের মধ্যে উত্তেজনা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করিতেছিলেন। ইহাদের মধ্যে উপেন্দ্রনাথ

প্রথম হত্যা

মাণিকতলার বোমার কারখানা

বন্দ্যোপাধ্যায়, অরবিন্দের ভ্রাতা বারীন্দ্র ঘোষ, হেম সেন, উল্লাসকর দত্ত, কানাইলাল দত্তের নাম উল্লেখ যোগ্য। নরেন্দ্রনাথ গোস্বামী নামক একজন ষড়যন্ত্রকারী রাজসাক্ষী হওয়াতে, তুইজন অপরাধী আলিপুর জেলের মধ্যে নরেন্দ্রকে রিভলভার দিয়া গুলি করিয়া মারে। এই হত্যাকারীদের একজনের নাম কানাইলাল দত্ত; ইনি বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ; সকলেই ইহাকে খুবই শান্ত সচ্চরিত্র ছাত্র বলিয়া জানিত। বিচারে কানাইলালের ফাঁসি হয়। বোমার মকর্দমায় অরবিন্দ খালাস পাইয়া দেশত্যাগী হইয়া ফরাসী পন্দেচারীতে বাস করিতেছেন। বারীন্দ্র প্রভৃতি অপরাপর অপরাধীদের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হইল এবং অনেকে নানা কালের জন্য কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইল।*

টিলকের কারাগার

মজঃফরপুরের হত্যাকাণ্ডের পর ক্ষুদীরাম দেশের বীর বলিয়া পূজিত হইতে থাকিল। তাহার ফোটো ঘরে ঘরে, দোকানে দোকানে টাঙ্গানো থাকিত। এই সময়ে টিলক তাঁহার পত্রিকাতে এই হত্যা সম্বন্ধে এক প্রবন্ধে অনেক আপত্তিজনক কথা লিখিয়াছিলেন। গভর্ণমেণ্টের বিচারে টিলকের ছয় বৎসর কারাবাসের আদেশ হয়। সরকার এইখানেই শান্ত হইলেন না; বাংলাদেশের স্বদেশী আন্দোলনের যে কয়জন নেতা ও কর্ম্মী ছিলেন—তাঁহাদের মধ্য হইতে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র (সঞ্জীবনীর সম্পাদক ও ব্রাহ্ম সমাজের অন্যতম নেতা) অশ্বিনীকুমার দত্ত (বরিশালের নেতা) সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (ব্রজমোহনের প্রোফেসর; বর্ত্তমান সিটি কলেজের অধ্যাপক)

---

* গত বৎসর রাজঘোষণায় ইঁহারা মুক্তি পাইয়াছেন; এক্ষণে ইঁহাদের যৌবনের উষ্ণতা শীতল হইয়াছে। দেশের মঙ্গল কর্ম কেমন ভাবে করিলে তাঁহাদের জীবন সার্থক হইবে ও বৃটিশরাজের সহিত মিষ্ট সম্পর্ক রক্ষিত হইবে তাহা চিন্তা করিয়া প্রকাশ করিতেছেন; বারীন্দ্র এক্ষণে "নারায়ণ" পত্রিকার ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

পুলিন বেহারী দাস (ঢাকার অনুশীলন সমিতির নেতা পরে ঢাকার মকদ্দমায় সাত বৎসর কয়েদ হয় ও ছাড়া পাইয়া অন্তরীণে আবদ্ধ হন, এখন মুক্ত) মনোরঞ্জন গুহ (নবশক্তির সম্পাদক) ও ভূপেশচন্দ্র নাগ, শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী ও সুবোধচন্দ্র মল্লিককে ১৮১৮ সালে আইনানুসারে অকস্মাৎ দেশান্তরিত করিলেন। তিন প্রদেশের প্রধান প্রধান নেতাদের কাহাকে কারাগারে পাঠাইয়া, কাহাকে দেশান্তরিত করিয়া

বাংলার নেতাদের নির্বাসন

মুষ্টিমেয় যুবকদের রাজদ্রোহ ও বিপ্লব করিবার সকল চেষ্টা মূলেই ধ্বংস করিয়া দিলেন। এই সময়ে অনেকগুলি আইন সরকার পাশ করেন; পাবলিক মিটিং অ্যাক্‌ট্ অনুসারে সভার সময় স্থান ও ভাষা সম্বন্ধে কড়া কড়ি হইল, প্রেস অ্যাকট অনুসারে ছাপাখানার মালিককে টাকা জামিন রাখিতে হইল; এ ছাড়া সিডিশন আইন, রাজদ্রোহ বিষয়ক সভার আইন ও অসংখ্য হুকুম জারি করিয়া আন্দোলনকারীদিগকে দমন করিয়া দিলেন। নানা গ্রামে পুনিটিভ পুলিশ বসিল। শিক্ষা বিভাগ হইতে অসংখ্য পরওয়ানা বাহির করিয়া বালকদিগকে শাসনে রাখিবার চেষ্টা হইল; যাহারা শাসন মানিতে একটু অনিচ্ছা প্রকাশ করিল কর্ত্তৃপক্ষ তাহাদিগকেই বিদ্যালয় হইতে তাড়াইয়া দিলেন; তাহারা নেশনেল স্কুলে ভর্ত্তি হইত; উপরোক্ত আইন সমূহ পাশ হইবার ও নূতন শাসন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইবার পর লর্ড মিণ্টোর শাসনকালের শেষ দুই এক বৎসর বেশ নিরুপদ্রবে কাটিয়াছিল। কিন্তু রাজদ্রোহের বিষ একেবারে নষ্ট হইল না।

বিপ্লব দমন ও নূতন নূতন আইন প্রণয়ন।

মুসলমানদের মধ্যে এক হইয়া কাজ করিবার ইচ্ছা হিন্দুদের অপেক্ষা অনেক পরে দেখা দেয়। মুসলমানদের মধ্যে নূতন আশা ও আকাঙ্ক্ষা

জাগ্রত করেন স্যর সৈয়দ আহমদ; তিনিই প্রথমে পাশ্চাত্য জ্ঞানের সহিত ইসলামের সভ্যতা মিলাইবার জন্য আলিগড়ে কলেজ স্থাপন করেন। লক্ষ্ণৌএর মুসলমানেরা অপেক্ষাকৃত গোঁড়া ও প্রতিক্রিয়াশীল হইলেও উদারচেতা, ইংরাজীশিক্ষিত মুসলমানদের সংখ্যা ভারতের সর্বত্রই বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৮৯২ সালে যখন ব্যবস্থাপক সভার সংস্কার হয় তখন সভাতে মুসলমানদের জন্য বিশেষ কোনো পৃথক ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হয় নাই। তখনো সাম্প্রদায়িক বা ক্ষুদ্র বর্গের স্বার্থ রক্ষার জন্য পৃথক প্রতিনিধি নির্বাচনের কথা রাজনীতির মধ্যে প্রবেশলাভ করে নাই। শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান সম্প্রদায় নিজের পৃথক অস্তিত্ব সম্বন্ধে সজাগ হইয়া উঠিল। ১৯০৬ সালে মোসলেম লিগ (Moslem League) স্থাপিত হয়। প্রতিষ্ঠার সময়ে ইহার উদ্দেশ্য ছিল মুসলমান সমাজের স্বার্থরক্ষা ও বৃটীশরাজের প্রতি ভক্তি অক্ষুণ্ণ রাখা। স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম দিকে মুসলমান সমাজ হিন্দুদের এই আন্দোলনে অন্তরের সহিত যোগদান করিতে পারে নাই; হিন্দুরাও তাঁহাদের রাজনৈতিক আন্দোলনের দলপুষ্টির জন্য মুসলমানদিগকে আহ্বান করিতেছিলেন যথার্থ প্রীতির জন্য বা মিলনের জন্য তাহাদিগকে ডাকেন নাই। সেই সময়ের অনেক কাগজ সন্দেহ করিয়াছিলেন যে সরকার হিন্দু ও মুসলমানের মিলন চান না। পূর্ববঙ্গে অশিক্ষিত মুসলমানেরা হিন্দুদের মন্দির বাজার প্রভৃতি লুণ্ঠন করিতে থাকে। মৈমনসিংহের জামালপুরে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ভীষণ সংঘর্ষ হয়; কুমিল্লাতে দাঙ্গায় লোকও মারা পড়ে! সরকার এইরূপ কার্য্য করিতে উৎসাহিত করিতে পারেন একথা অশিক্ষিত মূর্খের মাথায় স্থান পাইবার কথা; তা বৈ কোনো সদবিবেচক ব্যক্তি এ কথা বলিতে পারেন না। কিন্তু অশিক্ষিতদের মধ্যেও এই বিরোধ ও বিবাদের উপরে উঠিয়া মোসলেমলীগ ১৯১৩

মুসলমানদের আত্মশক্তিবোধ।

১৯০৬ মোসলেমলীগ

হিন্দুমুসলমান বিরোধ

সালে স্পষ্ট করিয়া ঘোষণা করিলেন। যে তাঁহাদের মতে ভারতে স্বায়ত্বশাসনের প্রয়োজন।

১৯০৭ সালে ভারত সরকার শাসন পদ্ধতির সংস্কার করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। তৎকালীন ভারত-সচিব মর্লী ও বড়লাট মিণ্টো উভয়ে মিলিয়া শাসনবিভাগে কতকগুলি সংস্কার করেন; তাহার মধ্যে মুসলমানদের পৃথক নির্বাচনই বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য। অন্যান্য সংস্কারের কথা যথাস্থানে বিবৃত হইয়াছে। ১৯১০ সালে লর্ড মিণ্টো চলিয়া গেলে নভেম্বর মাসে লর্ড হার্ডিংজ রাজপ্রতিনিধি ও বড়লাটরূপে ভারতে আগমন করিলেন।

১৯০৮ সালের শাসন সংস্কার

মর্লী-মিণ্টো সংস্কার ভারতে শান্তি আনিতে পারেন না। রাজনৈতিক আন্দোলনকারীদের কেহ খুসী হইলেন কেহ বা হইলেন না। কিন্তু বিপ্লবকারীদের কেহই কোন প্রকার রাজনৈতিক সংস্কারে খুসী হন না। রাজনৈতিক ডাকাতি হত্যা বাংলাদেশের নানাস্থানে পুনরায় দেখা দিল। এই সময় হইতে রাজনৈতিক বিপ্লবের ঘটনা ক্রমেই বাড়িয়া চলিতে থাকে।

বিপ্লবকারীদের উপদ্রব

১৯১১ সাল ভারতের পক্ষে চিরস্মরণীয় দিন; ভারতের ভাগ্যে কথনো রাজদর্শন ঘটে নাই। ঐ বৎসরের ২রা ডিসেম্বর তারিখে আমাদের সম্রাট পঞ্চম জর্জ ও সম্রাজ্ঞী মেরী তাঁহাদের সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ ভারত দেখিতে আসিলেন ও ১২ই তারিখে দিল্লী মহানগরীতে অভিষিক্ত হইলেন। দিল্লীর দরবারে সম্রাট ঘোষণা করিলেন যে বাংলার অঙ্গচ্ছেদ রদ হইল ও সংযুক্ত বঙ্গ একজন গভর্ণরের হস্তে অর্পিত হইল। বিহার উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুর একটি পৃথক প্রদেশ করিয়া একজন ছোট লাটের হস্তে প্রদত্ত হইল। বঙ্গচ্ছেদের পূর্ব্বের মত আসাম কমিশনের

দিল্লীতে সম্রাটের অভিষেক ও বঙ্গচ্ছেদ রদ।

হস্তে ফিরিয়া গেল। রাজঘোষণার দ্বিতীয় বিধানে রাজধানী কলিকাতা হইতে দিল্লীতে স্থানান্তরিত হইল; ১৫ই ডিসেম্বর সম্রাট সম্রাজ্ঞী উভয়ে নূতন দিল্লীর ভিত্তি-পাষাণ প্রোথিত করিলেন। শিক্ষার জন্য সম্রাট বহু লক্ষ টাকা দান করিয়া যান।

বঙ্গচ্ছেদ বিনা চেষ্টায় উঠে নাই। কংগ্রেস ও নরমপন্থীরা বিধিসঙ্গত আন্দোলন ও ন্যায্যপথে থাকিয়া আপনার দাবী কোনো দিন ছাড়েন নাই। বিলাতে ভারতবন্ধু হেনরী কটন, হারবার্ট পল, কেআর হার্ডি, মিঃ নেভিনসন্ প্রভৃতি কয়েকজন ব্যক্তি পার্লামেণ্টে ও পত্রিকাদিতে ভারতের অভিযোগ সর্ব্বদাই জ্ঞাপন করিতেন। মিঃ মর্লীর পরে লর্ড ক্রু ভারতসচিব হন। কলিকাতা হইতে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্র নাথ বসুমহাশয়কে বিলাতে প্রেরণ করেন। তিনি ভারতসচিবের সহিত দেখা করিয়া বঙ্গচ্ছেদের সকল দিকের কথা স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দেন। লর্ড হার্ডিংঞ্জের সময়ে এই আন্দোলন থামে নাই। সম্রাট আসিয়া বাঙালীর ন্যায্য দাবী মিটাইলেন। কিন্তু একদলের দাবী ও আকাঙ্ক্ষা সকল প্রকার বাঁধ ভাঙ্গিয়া উচ্ছৃঙ্খলতায় পরিণত হইয়াছিল তাহাদের আশাও মিটিল না, তাহাদের দাবীও পূরণ হইতে পারে না।

কিছুকাল হইতে কাগজপত্রে, সভাসমিতিতে, ব্যবস্থাপক সভাতে সরকারী কার্য্যে ভারতবাসীদের স্থান ও মান কম লইয়া আন্দোলন চলিতেছিল। চাকুরী সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া কি কি উন্নতি করা যায় এবং ভারতবাসীকে কি কি কর্ম্মে, কেমনভাবে নিযুক্ত করা যায়—সে বিষয়ে গভর্ণমেণ্টকে পরামর্শ দিবার জন্য ১৯১২ সালে এক কমিশন বসে। ইহাকে পাব্লিক সার্বিস কমিশন বলে। সভ্যদের মধ্যে তিনজন ভারতবাসী ছিলেন—শ্রীযুক্ত গোখলে, বম্বে গভর্ণমেণ্টের অধ্যক্ষ সভার সভ্য মহাদেব ভাস্কর চৌবল ও মাদ্রাস হাইকোর্টের অন্যতম জজ্ মিঃ আবদর রহিম।

পাব্লিক সার্বিস কমিশন ১৯১২

এদিকে ১৯১৪ সালের ৪ঠা জুলাই য়ুরোপের যুদ্ধ আরম্ভ হয়; সেইদিন হইতেই ভারতের ধন প্রাণ সমস্তই সাম্রাজ্যের কল্যাণের জন্য ভারতবাসী উৎসর্গ করিয়াছিল। কিন্তু সাম্রাজ্যের এই দুর্দিনেও বিপ্লবকারীদের উপদ্রব কমিল না; তখন সরকারকে বাধ্য হইয়া ভারতরক্ষা আইন পাশ করিতে হইল; এই আইন যুদ্ধের সময়ে ও যুদ্ধের ছয় মাস পর পর্য্যন্ত বাহাল থাকিবে ঠিক হইল। এই আইনের সাহায্যে প্রায় ৮০০ যুবককে সন্দেহ করিয়া অন্তরীণে আবদ্ধ করা হয়। অন্তরীণের কার্য্য খুবই জবরদস্তভাবে যুদ্ধের কয়েক বৎসর চলিতে থাকে; ইহার ফলে চারিদিকের অশান্তি ও অরাজকতা অনেক পরিমাণে কমিয়া যায়। এই সময়ের খবরের কাগজে কতকগুলি সরকারী চাকরের অদূরদর্শিতার জন্য আবদ্ধ লোকের কষ্টের কথা প্রায়ই প্রকাশিত হইত; কয়েকটি আত্মহত্যার কথাও কাগজে প্রচারিত হয়। সরকার এই সমস্ত অভিযোগের যথোপযুক্ত সদুত্তর দান করিয়া দেখাইয়া ছিলেন যে ঐ সকল অভিযোগের ভিত্তি খুব দৃঢ় নয়। সন্দেহের উপর নির্ভর করিয়া শাস্তিদান করিবার শক্তি বৃটীশ ভারতের আইনে নাই; সেইজন্য সরকার হইতে ভারতরক্ষার বিশেষ আইন প্রণয়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

১৯১৪ যুদ্ধারম্ভ ও ভারতরক্ষা আইন

অন্তরীণ ও দেশে শান্তি

১৯০৭ সালের সুরাটের কংগ্রেস ভাঙ্গিবার পর 'নরম পন্থীরা' কংগ্রেসের সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠিয়াছিলেন। যুদ্ধ আরম্ভ হইতে টিলক তাঁহার দীর্ঘ ছয় বৎসরের কারাবাস হইতে মুক্ত হইয়া বাহিরে আসিলেন। তাঁহার অদম্য উৎসাহ, তেজ কিছুমাত্র কমে নাই। দক্ষিণ আফ্রিকায় ২৫ বৎসর বাসের পর ১৯১৫ সালে মিঃ গান্ধি দেশে ফিরিলেন। ১৯১২ সাল হইতে ভারতের মুসলমানেরাও স্বায়ত্বশাসন পাইবার জন্য মোস্লেম লীগের সর্ত্ত বদলাইয়া

যুদ্ধারম্ভে রাজনৈতিক আন্দোলন

লন। বহুকাল হইতে কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে মিলনের চেষ্টা হইতেছিল। ১৯১৬ সালের লক্ষ্ণৌএর কংগ্রেসে উভয় সম্পাদিত মিলন হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সেই হইল। কংগ্রেস লীগের কতকগুলি দাবী মানিয়া লইতে স্বীকৃত হইলে তাঁহারা এক হইয়া রাজনৈতিক আন্দোলন করিবেন বলিয়া দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইলেন। ভারতের ইতিহাসে এটি একটি বিশেষ ঘটনা। ১৯১৬ সালে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার ১৯জন বেসরকারী ভারতীয় সদস্য ভারতের ভাবী শাসন সংস্কার সম্বন্ধে এক পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়া ভারত সরকারের নিকট পেশ করেন। কংগ্রেস ও লীগ ইহাই একটু পরিবর্তিত করিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন।

'হোমরুল লীগ'

এদিকে মিসেস্ আনিবেসান্ত থিওজফি ছাড়িয়া রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করিলেন। তিনি 'হোমরুল লীগ' নামে একটি পৃথক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়া মান্দ্রাসে প্রকাণ্ড একটি আন্দোলনের ঝড় বাঁধাইলেন। বোম্বাইতে টিলকও একটি পৃথক্ লীগ স্থাপন করিলেন। সমগ্র ভারতবর্ষ যুদ্ধের পর নূতন কিছু পাইবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিল; সকলেই আশা করিল যুদ্ধান্তে রাজ্য শাসনে তাহাদের দায়ীত্ব বাড়িবে। যুদ্ধের জন্য ভারত-বাসী ১৫০ কোটি টাকা নগদ দান করিল; তাহারা যাত্রীদের অসুবিধা করিয়া, মালপত্র চলাচলের উপযুক্ত পরিমাণ গাড়ীর অভাব করিয়া ভারতবর্ষ বহু রেলওয়ে সরঞ্জাম মেসোপটিমিয়ায় প্রেরণ করিল; ভারতের অধিকাংশ দেশী ও বিদেশী সৈন্য মহাসমরের সকলকেন্দ্রে প্রেরণ করিল।

যুদ্ধে ভারতের দান

দেশীয় নৃপতিগণ প্রত্যেকের সাধ্যমত অর্থ ও সৈন্য দান করিয়াছিলেন; ভারতীয় যুবকগণ দলে দলে সৈন্য ভর্তি হইতে লাগিল; এত করিয়া ভারতবাসী ভাবিল তাহার দাবী ন্যায্য, বৃটীশ-সাম্রাজ্যে তাহার অধিকার ও স্থান আছে। কিন্তু এমন সময়ে ভারতবাসীদের বৃটীশ গভর্ণমেণ্টকে ভুল বুঝিবার একটি উপলক্ষ

উপস্থিত হইল। কানাডা ইংরাজদের উপনিবেশ। সেখানে ভারত-বাসীদের প্রবেশ সম্বন্ধে নিয়ম ছিল, যে-জাহাজ সোজা-সুজি কানাডায় না যায় এমন কোনো জাহাজ ব্যতীত ভারতবাসীকে কানাডায় নামিতে দেওয়া হইবে না। অথচ কোনো জাহাজ সোজাসুজি এখান হইতে কানাডায় যাইত না। গুরদিৎ সিং নামক জনৈক শিখ্ "কোমাগাটা মারু" নামে একখানি জাপানী জাহাজ ভাড়া করিয়া তিন শত শিখ সহ কানাডায় উপস্থিত হন। সেখানে তাহাদের নামিতে দেওয়া হয় না। তাহারা ফিরিয়া আসিল; কিন্তু তাহাদিগকে কলিকাতার মধ্যে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিলে পুলিসের সঙ্গে তাহাদের দাঙ্গা হয়। এই ঘটনায় পঞ্জাবের লোকে অত্যন্ত বিরক্ত হয়। সাধারণ লোকে জানে ইংরাজ রাজ্যের সর্বত্র তাহাদের অধিকার আছে এবং তাহাদের প্রতি অবিচারের জন্য ইংরাজই দায়ী। কিন্তু বস্তুত উপনিবেশগুলির ব্যবস্থার মধ্যে হস্তক্ষেপ করিবার কোনো অধিকার বৃটীশ পার্লামেণ্ট আপনার হাতে রাখেন নাই। দক্ষিণ-আফ্রিকার ভারতবাসীদের প্রতি দুর্ব্যবহারের জন্য ভারত গভর্ণমেণ্ট খুবই প্রতিবাদ করিয়া থাকেন; কিন্তু বৈদেশিক রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার যে সরকার বাহাদুরের নাই তাহা লোকে ভাল করিয়া বুঝে না।

"কোমাগাটা মারু"

এদিকে ভারতের নানা স্থানে মিসেস্ বেসান্তের "হোমরুল লীগ" দিন দিন অগ্রসর হইতে লাগিল। স্বদেশী আন্দোলনের প্রথমে বাংলাদেশের স্কুল কলেজের ছাত্রেরা যেমন রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করিয়াছিল মাদ্রাজের হোমরুল লীগেও সেইরূপ ছাত্রেরা যোগদান করিতে সুরু করিল। সরকার এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করায় বেসান্ত জাতীয় শিক্ষালয় স্থাপনের জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। আদেরে পূর্বেই থিওজফি সমাজের স্কুল কলেজ ছিল, তাহাকে কেন্দ্র করিয়া তিনি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। মিসেস বেসান্ত ক্রমেই তাঁহার প্রবন্ধ বক্তৃতাদিতে ইংরাজ সরকারের প্রতি বিদ্বেষ

বেশান্তের অন্তরীনে আন্দোলন

প্রকাশ করিতে লাগিলেন। যুদ্ধের সময়ে চারিদিকে বিপদ, সুতরাং এ প্রকার মত প্রকাশের দায়ীত্ব কতখানি তাহা তিনি বিস্মৃত হইয়াছিলেন; সরকার তাঁহাকে বারবার সাবধান করা সত্বেও তিনি সে সবে কর্ণপাত করেন নাই। তখন মান্দ্রাজ গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ও তাঁহার দুজন সহকারী কর্মীকে অন্তরীনে আবদ্ধ করিলেন। ইহারই কিছু কাল পূর্বে মুসলমান সমাজের নেতৃস্থানীয় মহম্মদ আলী তদীয়-ভ্রাতা সয়কৎ আলীর সহিত ভারতরক্ষা আইনানুসারে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। এই সব ঘটনার জন্য হিন্দু ও মুসলমানসমাজে একযোগে আন্দোলন সুরু হইল।

১৯১৭ সালের ২০ শে আগষ্ট তারিখে মিঃ মণ্টেগু পার্লামেণ্টে ভারতের শাসন সংস্কার সম্বন্ধে বিখ্যাত ঘোষণাপত্র পাঠ করিলেন। ভারতকে ক্রমে ক্রমে দায়ীত্বপুর্ণ স্বায়ত্বশাসনের পথে লইয়া যাইতে হইবে ইহাই ঘোষণাপত্রের মর্ম।

মিঃ মণ্টেগুর ঘোষণা
২০ শে আগষ্ট

ঐ বৎসরের সেপ্টেম্বর মাসে বেসান্তকে গভর্ণমেণ্ট ছাড়িয়া দিলেন; কিন্তু মহম্মদ আলি কোন প্রকার সর্ত্তের মধ্যে যাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করায় সরকারও তাঁহাদের ছাড়িতে পারিলেন না। সেবার কলিকাতায় কংগ্রেস হইবার কথা; বাংলার অভ্যর্থনা সমিতিতে সভাপতি কে হইবেন লইয়া অত্যন্ত অশান্তি হয়। চরমপন্থীদের জিদ্ বজায় থাকিল—বেসান্ত সভানেতৃ হইলেন।

১৯১৬ সালে লক্ষ্ণৌতে কংগ্রেস ও লীগের রাজনীতি সম্বন্ধে যে বোঝা পাড়া হয় তাহা অনেকটা পরিমাণে পুঁথির ব্যাপার হইয়াছিল; গভীরভাবে মিলন হইবার পক্ষে উভয় দলের বাধা বিস্তর ছিল। উদার ধর্মনীতির বিরুদ্ধে হিন্দুদের মধ্যে যেমন প্রতিক্রিয়া দেখা যায়, আলিগড়ের মুসলমানদের ও হিন্দুমুসলমান মিলনের বিরুদ্ধে লক্ষ্ণৌর মৌলবীদের জিদ্ তেমনি প্রবল ভাবে দেখা দিল। মুসলমানী কাগজ ও সমাজ হোমরুলকে তীব্রভাবে

মুসলমানদের ভাগ্য-বিপর্য্যয়

আক্রমণ করিতে লাগিলেন। কংগ্রেসের সহিত লীগ্‌কে জড়িত করায় মুসলমানদের স্বার্থ হিন্দুদের হাতে সমর্পণ করা হইয়াছে ;—এই অভিযোগ কোনো কোনো দিক হইতে শোনা গেল। কংগ্রেস যে হিন্দু প্রতিষ্ঠান নয় ইহা যে ভারতের জাতীয় মহাসমিতি একথা অধিকাংশ হিন্দু ও মুসলমানের কাছেই অস্পষ্ট। লক্ষ্ণৌতে মুসলমানদের দাবী মিটাইলে হিন্দুদের অনেকেও খুসী হন নাই। ইতিমধ্যে যুরোপের যুদ্ধে তুর্কীর পরাজয় আরম্ভ হইল ; এশিয়াতে মেসোপটেমিয়া সম্পূর্ণ রূপে ইংরাজদের হাতে আসিল ; আরবের শেরিফ তুর্কীর সুলতানের শাসন হইতে পৃথক হইয়া ইংরাজদের সাহায্যে নূতন স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিলেন ; প্রাচীন খলিফৎ দেখিতে দেখিতে ভাঙ্গিয়া পড়িল। মুসলমানদের কাছে ধর্ম ও রাজনীতি এক। পৃথিবীর যাবতীয় মুসলমান-ধর্মসমাজের গুরু তুর্কীর সুলতান। তুর্কীর ধ্বংসকার্য্য দেখিয়া ভারতীয় মুসলমানগণ সহজে অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। কিন্তু হিন্দুদের কাছ হইতে এ বিষয়ে আশানুরূপ সহানুভূতি পাওয়া গেল না ; কাহারো মত ভারতের রাজনীতির সহিত ভারতের বাহিরের রাজনীতি যুক্ত করিলে এদেশের মঙ্গল হইবে না, এরূপে ভারতের নেশন গড়িবে না। আবার কেহ কেহ রাজনীতির দিক হইতে খলিফতে যোগদান করা যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন। এই সময় হইতে 'খলিফৎ' আন্দোলনের সূত্রপাত। কয়েকবৎসরের মধ্যে ইহা আরও স্পষ্ট আকার ধারণ করিয়াছে।

বিহারে বকর-ইদের অশান্তি

নেতাদের মধ্যে মনের মিলন যেখানে গভীর নয়—যেখানে মিলনটা কেবল রাজনৈতিক অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য—সেখানে নিরক্ষর মূর্খদের মধ্যে মিলন আশা করা যায় না। কিছুকাল হইতে গোবধ লইয়া হিন্দুমুসলমানে বিরোধ উত্তর-ভারতের কয়েকটি স্থানে দেখা দিয়াছিল। ১৯১৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বকর-ইদের গোবধ লইয়া বিহার প্রদেশের নানাস্থানে অশান্তি সুরু হইল।

এই প্রদেশে কিছুকাল হইতেই গোবধ লইয়া দাঙ্গা মারামারি হইতেছিল। এ বৎসরে হিন্দুরাই প্রথমে মুসলমানদের উপর কোরবাণী লইয়া জুলুম আরম্ভ করে। ছয়দিন ধরিয়া একরূপ অরাজকতা চলিল। অবশেষে সৈন্য আসিয়া শান্তি স্থাপন করে। ভারতরক্ষা আইনানুসারে প্রায় এক হাজার অপরাধীকে নানারূপ শাস্তি দেওয়া হয়। কিন্তু বাহিরের অশান্তি থামিলে ত' অন্তরের মিল হয় না। হিন্দু খবরের কাগজে লুণ্ঠন ও উৎপীড়নকারীদের যথেষ্ট নিন্দা করিলেন বটে কিন্তু গোবধ সম্বন্ধে পরিষ্কার করিয়া কিছু বলিতে পারিলেন না; ধর্মের স্বাধীনতা দিবার বেলায় তাঁহাদের সুর বদলাইয়া গেল। মুসলমানেরা হিন্দুদের এই প্রকার দোটানা ভাবের অর্থ সহজেই বুঝিলেন।

এদিকে ভারত সচিব মিঃ মণ্টেগু শীঘ্রই ভারতে আসিবেন জানিয়া চারিদিকের নানা প্রতিষ্ঠান ও সভাসমিতি আবেদনপত্র লিখিতে আরম্ভ করিলেন;

ভারত সচিবের আগমন

১৯১৯ সালের শেষাশেষি মণ্টেগু ভারতে আসিলেন ও শাসন সংস্কার সম্বন্ধে বিশিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান সমূহের মতামত শ্রবণ করিতে লাগিলেন। ১৯১৬ সালে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার ১৯ জন দেশীয় সভ্য সংস্কার সম্বন্ধে যে এক খসড়া প্রস্তুত করিয়া ছিলেন, তাহাই কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া কংগ্রেস ও লীগ গ্রহণ করিয়াছিলেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে আবেদনকারীরা কংগ্রেস-লীগের সংস্কার দাবী করিলেন। মিঃ মণ্টেগু ও বড়লাট বাহাদুর লর্ড চেমস্‌ফোর্ড অকৃত্রিম ভদ্রতা ও অকথিত ধৈর্য্যের সহিত সকলের কথা শ্রবণ করিলেন, কিন্তু কোথায়ও কোনো মতামত প্রকাশ করিলেন না।

১৯১৭ সালের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় কংগ্রেসে মিসেস্ বেসান্ত সভানেতৃ হইলেন; এই সভায় আলিভ্রাতাদের জননীকে আনয়ন করা হয়; এরূপ অপূর্ব সভা পূর্বে কখনো হয় নাই।

এদিকে যুদ্ধের জন্য পৃথিবীর সর্বত্র সাধারণ লোকের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া উঠিতেছিল, ভারতবর্ষের কাঁচামাল বিদেশে বিক্রয় হয় ও তৈয়ারী সামগ্রী বিদেশ হইতে আমাদিগকে কিনিতে হয়। সুতরাং রপ্তানীতে তাহার পয়সা আসিল না আমদানীতে অসম্ভব দাম দিতে হইল। যুদ্ধের আরম্ভ হইতে জিনিষ পত্রের দাম অসম্ভব রূপে বাড়িয়া চলিয়াছে; সরকার বাহাদুর কয়েকবার দাম সম্বন্ধে নিয়ম বাঁধিয়াও কিছু করিতে পারেন নাই। এমন সময়ে মিত্র-রাজ্য সমূহের খুব একটি বড় রকমের সহায় রুস সাম্রাজ্য অন্তরবিপ্লবের জন্য ভাঙ্গিয়া পড়িল। জার্মানী তখন পূর্ব সীমান্তে প্রবল,—অনেকের ভয় হইল রুশের ভিতর দিয়া জার্মানরা এদেশে আসিবে। ১৯১৮ সালের এপ্রিল মাসে বড় লাট দিল্লীতে সরকারী বেসরকারী বড় বড় লোকদের ও দেশের নেতাদের আহ্বান করিয়া সাম্রাজ্য রক্ষা বিষয়ে পরামর্শ করিলেন। দেশের যুদ্ধোপযোগী সমস্ত সামগ্রী সরকারের হস্তে অর্পণ করিবার জন্য, সৈন্যসংগ্রহ ও সমরঋণে অর্থদান করিবার জন্য প্রত্যেক প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টকে চেষ্টা করিতে অনুরোধ করা হইল। দেশের নেতারাও প্রত্যেকটি বিষয়ে সরকারকে সাহায্য করিয়াছিলেন।

যুদ্ধের জন্য আয়োজন

এই সময়ে ভারতের সকল কর্মের মধ্যে মিঃ গান্ধির নাম উল্লেখ যোগ্য। মিঃ গান্ধী চিরকাল ন্যায় ও সত্যের জন্য সংগ্রাম করিয়া আসিতেছেন। ১৯১৭ সালের মাঝামাঝি সময়ে চম্পারণের চাষাদের পক্ষ লইয়া তিনি নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন; এবং তাহার ফলে কমিশন বসাইয়া তিনি তাহাদের দুঃখের অনেক পরিমাণে লাঘব করেন। ১৯১৮ প্রথম ভাগে গুজরাটের অন্তর্গত কায়রা জেলায় অজন্মা বশতঃ অন্নকষ্ট দেখা দেয়। ফলে অনেক প্রজা সরকারী খাজনা দিতে একান্ত অসমর্থ হইয়া পড়ে। গুজরাট সভা কমিশনরের নিকট 'ডেপুটেশন' প্রেরণ করিলে তাঁহারা প্রজার কথায়

মিঃ গান্ধির কার্য্যাবলী

কর্ণপাত করার প্রয়োজন বোধ করিলেন না। ২২শে মার্চ মিঃ গান্ধী গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া প্রজাদের অবস্থা দেখিয়া 'সত্যাগ্রহ' লইতে বলিলেন; অর্থাৎ সরকার কর্মচারী যতই উৎপীড়ন করুক তাহারা খাজনা দিবে না; জুনমাস পর্য্যন্ত আন্দোলন চলিল। দলে দলে প্রজা উৎসন্ন যাইতেছে দেখিয়া সরকার খাজনা মুলতুবী দিয়া সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন।

১৯১৮ সালের ৮ই জুলাই শাসন-সংস্কার সম্বন্ধে মণ্টেগু-চেমস-ফোর্ড প্রতিবেদন প্রকাশিত হইল। তাঁহারা কি কি পরিবর্ত্তন করিতে চাহিয়াছিলেন তাহা অন্যত্র আলোচিত হইয়াছে। নরমপন্থীরা রিপোর্ট পাঠ করিবামাত্র ইহাকে খুব বড় দান বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন; চরমপন্থীরা ইহার মধ্যে কিছুই নাই বলিয়া উড়াইয়া দিলেন।

শাসন সংস্কার প্রকাশ

উভয় পক্ষের মশীযুদ্ধের ফলে উভয়ই নিজ নিজ ভ্রম বুঝিলেন। ভারত সচিব বলিয়াছিলেন ভারতকে স্বায়ত্ত-শাসনের পথে লইয়া যাওয়া হইবে, অধিক আশার কথা তিনি বলেন নাই। চরমপন্থীরা কংগ্রেসে প্রবল বলিয়া নরমপন্থীরা ইহা ত্যাগ করিলেন ও 'মডারেট্‌ কন্‌ফারেন্স' আহ্বান করিয়া সংস্কারের প্রস্তাব সমর্থন করিলেন।

১৯১৮ সালের নভেম্বর মাসে যুদ্ধ শেষ হইয়া গেল। জার্মানের পরাজয় হইল। যুদ্ধের পর সন্ধি আলোচনার সময়ে ভারতবর্ষ হইতে স্যর সত্যেন্দ্র-প্রসাদ সিংহ, Sir John Meston ও বিকানীরের রাজা প্রতিনিধিরূপে প্রেরিত হন। ভারতের পরম সৌভাগ্যবশতঃ শ্রীসত্যেন্দ্রপ্রসাদ সিংহ বিলাতের House of Lords এর প্রথম সভ্য হইলেন। সত্যেন্দ্রপ্রসাদ বর্ত্তমানে সহকারী ভারত সচিবের কর্ম করিতেছেন; পূর্বে এ সম্মান আর কেহ পান নাই। ভারতে বড়লাটের অধ্যক্ষ সভায় তিনিই প্রথম সভ্য; সাম্রাজ্যের সমর-বিষয়ক মন্ত্রণা বৈঠকে তিনি প্রথম ভারতীয় সভ্য; সন্ধি বৈঠকেও তিনি প্রথম। বাঙ্গালী এই গৌরবে গৌরবান্বিত।

* ইনি এক্ষণে বিহার ছোটনাগপুর প্রদেশের গবর্ণর হইয়াছেন।

উপর্যুক্ত ঘটনা ঘটিবার কয়েকদিনের মধ্যেই রাজদ্রোহ বিষয়ক কমিটীর প্রতিবেদন প্রকাশিত হইল। এই প্রতিবেদনে ভারতের নানাস্থানে বিপ্লব-কারীদের ষড়যন্ত্রের যে চিত্র দেওয়া হইয়াছে তাহা অত্যন্ত ভীষণ। দেশময় রাজদ্রোহ প্রচার করিবার জন্য, রীতিমত ভাবে লুণ্ঠন ও অর্থ সংগ্রহাদির জন্য, এক প্রদেশের সহিত আর এক প্রদেশের নেতাদের যোগস্থাপন ও দেশীয় সৈন্যগণকে বিদ্রোহী করিবার জন্য প্রবাসী ভারতবাসীদের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া অর্থ ও অস্ত্র আনয়নের জন্য সকল প্রকার আয়োজন দেশ মধ্যে হইতেছিল। ভারত রক্ষা আইন যুদ্ধের পর ছয় মাস মাত্র কার্য্যকারী হইবে; অথচ সাধারণ দণ্ডবিধির দ্বারা বিপ্লবকারীদের অতিসতর্ক ব্যবহার ও কার্য্যাবলীকে শাসনের মধ্যে ফেলা যায় না। এই জন্য ভারতের দণ্ড-বিধির পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন হইয়াছিল। এই সময়ে মহাযুদ্ধ শেষ হইল; কাজেই সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইবার ছয়মাস পরে ভারতরক্ষা আইন পরিত্যক্ত হইলে রাজদ্রোহিগণকে আটক করা সম্ভব হইবে না। এই আশঙ্কায় গবর্ণমেণ্ট রাউলাট কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী দুইটি বিল ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় পেশ করেন। প্রথম বিলটির স্থূল মর্ম এই যে সকৌন্সিল বড়লাট প্রয়োজন বোধ করিলে বৃটীশ ভারতের যে কোনো স্থানে ভারতরক্ষা আইনের অনুরূপ ক্ষমতা প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাদের হস্তে ন্যস্ত করিতে পারি-বেন। দ্বিতীয় বিলের উদ্দেশ্য ভারতীয় ফৌজদারী আইনের বাঁধন আরও দৃঢ় করিয়া পুলিশের উপর অধিক ক্ষমতা অর্পন করা। ১৯১৯ সালের প্রারম্ভে প্রস্তাবিত বিলের বিরুদ্ধে সারা ভারতে তুমুল আন্দোলন আরম্ভ হইল। প্রত্যেক স্থানেই এই বিলের বিরুদ্ধে সভা হইল। জননায়কগণ একবাক্যে বলিলেন যে প্রস্তাবিত বিল দুইটি ন্যায় ও স্বাধীনতার মূলমন্ত্র বিরোধী এবং মানুষের সহজাত অধিকারের পরিপন্থী। কিন্তু বস্তুত নির্দোষ ব্যক্তির ভয়ের কোনো হেতু ছিল না; এগুলি বিপ্লবকারীদের দমন করিয়া

রৌলট কমিশনর ও বিল

রাখিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। ১৯১৯ সালের মার্চ মাসে উল্লিখিত বিল দুইটি ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় উঠিলে বেসরকারী দেশীয় সদস্যগণ এক-যোগে শেষ পর্য্যন্ত প্রাণপণে উহার বিরুদ্ধে লড়িলেন; কিন্তু সরকার কিছুতেই মূল বিল প্রত্যাহার বা পরিবর্ত্তন করা সম্ভব মনে করিলেন না। শেষে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় সরকারী সভ্যগণের সংখ্যাধিক্য হেতু বিল দুইটি বেসরকারী সদস্যগণের সম্মিলিত প্রতিবাদ সত্ত্বেও পাশ হইয়া গেল। তবে গভর্ণমেণ্ট এইটুকু প্রতিশ্রুতি দিলেন যে প্রথম আইনটি কখনও রাজনৈতিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হইবে না এবং উহা তিন বৎসর পরে পরিত্যক্ত হইবে।

বিলের বিরুদ্ধে আন্দোলন

ভারতের জনসাধারণের মধ্যে এই ব্যাপারে আন্দোলন আরম্ভ হইল। মিঃ গান্ধি এই বিল দুটিকে অন্যায় বিবেচনা করিয়া প্রচার করিলেন যে তাঁহারা এই আইনের বিরুদ্ধে নিরুপদ্রবে অমান্য করিবেন। বোম্বাইতে পথে প্রকাশ্যভাবে নিষিদ্ধ পুস্তিকা বিক্রয় করিয়া তাঁহারা গভর্ণমেণ্টের আদেশ অমান্য করিতে লাগিলেন। ৩০ শে মার্চ্চ দিল্লীতে সত্যগ্রহ পালনের দিন ভীষণ দাঙ্গা বাঁধিল; ৬ই এপ্রিল কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, লাহোর, করাচী প্রভৃতি বড় ছোট অনেক সহরে সত্যগ্রহ দিবস মহোৎসাহে সাধিত হয়। সর্বত্রই দোকান পাট বন্ধ থাকে। এমন সময়ে ৯ই এপ্রিল মিঃ গান্ধিকে দিল্লী যাইবার পথে গ্রেপ্তার করা হয়। এই ঘটনায় চারিদিকে অশান্তির আগুন জ্বলিয়া উঠিল, বড় বড় সহরে 'হরতাল,' ঘোষিত হইল। ১১ই হইতে ১৩ই এপ্রিল সারা হিন্দুস্থানের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত অশান্তি দেখা দিল। পঞ্জাবের হাঙ্গামা প্রকাশ্য রাজদ্রোহে পরিণত হইল। এই সময়ে সাধারণ হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে খুবই প্রীতি প্রকাশ পাইয়াছিল। লাহোর, আমদাবাদে ঘোর অনর্থপাত ঘটিল। অবশেষে সরকার বাহাদুর পঞ্জাবে সামরিক আইন Martial law

জারি করিয়া কঠোর হস্তে বিদ্রোহ দমনে ব্রতী হইলেন। এই কঠোরতা লইয়া সমগ্র বৃটীশ সাম্রাজ্যে আলোচনা আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। ছোট লাট বাহাদুর মাইকেল ওডায়র ও সেনাপতি ডায়ারকে সকলে নিন্দা করিতেছে। এ সব বিষয়ের মীমাংসা হয় নাই, পঞ্জাবের অশান্তি তদারক করিবার জন্য এক কমিশন বসিয়াছিল।

পঞ্জাবে অশান্তি

ভারতীয় তিনজন সভ্যই সরকারী কর্মচারীদিগকে লঘুপাপে গুরুশাস্তি বিধানের অপরাধে অপরাধী করিয়াছেন। বিলাতে ও এখানে এ বিষয়ে প্রতিদিন আলোচনা চলিতেছে।

হণ্টার কমিটি

মুসলমান সমাজ 'খলিফৎ' আন্দোলন দেশে বিদেশে চালাইতেছেন। তুর্কীর রাজ্যকে অক্ষুণ্ণরাখাই তাঁহাদের অভিপ্রায়। নূতন শাসন সংস্কার বিধি পার্লামেণ্টে পাশ হইয়া গিয়াছে। চারিদিকে নূতন মন্ত্রীসভার জন্য নির্বাচনের ধুম পড়িয়া গিয়াছে। দেশের জনসাধারণের মধ্যে রাজনীতি ক্রমে ক্রমে প্রবেশ লাভ করিতেছে এবং ভারতবর্ষ ধীরে ধীরে স্বায়ত্বশাসনের পথে অগ্রসর হইবে মিঃ মণ্টেগুর এই উক্তি কার্য্যে পরিণত হইতেছে।

খলিফৎ ও মুসলমান সমাজ

Valentine Chirol's Indian Unrest, 1910. Lovat Frazer's History of the Nationalist Movement in India, 1920. Sedition Committee Reports, 1918. Rushbrock Williams, India, 1917-18. A. C. Mozumdar's Indian National Evolution; Annie Besant's Uplift of India. Buckland's Bengal under Leiutenant Governors' 2 Vols.

২। ধর্মসংস্কার ও সংরক্ষণ

ভারতবর্ষের ধর্মের কথা বলিতে গেলে স্বতই সাধারণ লোকের মনে হিন্দুধর্মের কথা মনে হয়, অন্যান্য ধর্মের অস্তিত্ব ভুলিয়া যায়। কিন্তু হিন্দুদের সংখ্যা বেশী বলিয়া অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের মত ও বিশ্বাস, সংস্কার ও চেষ্টা যে নগণ্য একথা ভাবিয়া চলিলে হিন্দুদের কল্যাণ নাই,—সমগ্র ভারতেরও মঙ্গল নাই। ভারতের ধর্মগুলিকে আমরা তিনভাগে ভাগ করিতেছি। যথা :—(১) ভারতীয় ধর্ম, অর্থাৎ যে সকল ধর্মের উৎপত্তি ভারতের মধ্যে—যেমন (ক) হিন্দু (খ) বৌদ্ধ (গ) জৈন। (২) আদিম ধর্ম (৩) ভারতের বাহিরের ধর্ম।

ভারতের ধর্ম

হিন্দুধর্মের উৎপত্তি কবে কোথায় ইত্যাদি কূট তর্কের মধ্যে না গিয়া মোটামুটি ভাবে বলিতে পারি বৈদিক ধর্ম নানা যুগের মানুষের ইতিহাস, অভিজ্ঞতা, আধ্যাত্মিকতার মধ্য দিয়া আসিতে আসিতে নদী প্রবাহের ন্যায় ভাল মন্দ সবই বহন করিয়া চলিতেছে। হিন্দু কে একথার মীমাংসা হয় নাই—যতপ্রকারে সম্ভব তাহার ব্যাখ্যা হইয়াছে কিন্তু প্রত্যেকটির একটি না একটি ত্রুটি ধরা পড়িয়াছে। শেষ পর্য্যন্ত ঠিক হইয়াছে যে, যে বেদ ব্রাহ্মণ ও বর্ণাশ্রমকে মানে সেই হিন্দু। এই সূত্রানুসারে শিখরা, আর্য্য সমাজী বা ব্রাহ্মেরা কেহই হিন্দু নয়; অথচ হিন্দুসমাজ ইহাদিগকে ছাড়িতেও নারাজ এবং ইঁহারাও আপনাদিগকে সাধারণত যাহাকে হিন্দু বলে সে শ্রেণীর হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতেও অনিচ্ছুক। ১৯১১ সালের আদমসুমারী অনুসারে হিন্দুদের সংখ্যা ছিল ২১ কোটি ৭৫ লক্ষ অর্থাৎ সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা ৭০ ভাগ।

(ক) হিন্দুধর্ম

বৌদ্ধ ধর্ম ভারতে অতি সামান্য দেখা যায়—নেপাল, ভুটান, চট্টগ্রাম ও সিংহলে এখনো ইহা বিদ্যমান। নেপাল ও বিশেষত ভুটান সিকিম অঞ্চলে প্রেতপূজা প্রভৃতির সহিত মিশিয়া বৌদ্ধধর্ম কিম্ভূতকিমাকার ধারণ করিয়াছে। খৃষ্ট জন্মের ৬ষ্ঠ শতাব্দী পূর্বে বুদ্ধদেব এই ধর্ম প্রচার করেন—সহস্র বৎসরের কিঞ্চিৎ অধিক কাল এই ধর্ম ভারতের নানাস্থানে প্রবল ছিল; কিন্তু ৯ম খৃষ্ট শতাব্দীতে ব্রহ্মণ্য ধর্মের পুনরুত্থানের সহিত বৌদ্ধধর্ম ভারত হইতে লোপ পাইতে থাকে—ইহার মতামতের কিয়দংশ হিন্দুধর্ম গ্রহণ করে অবশিষ্ট অগ্রাহ্য বলিয়া ফেলিয়া দেয়।

(খ) বৌদ্ধধর্ম

জৈন ধর্ম্ম প্রাচীন ভারতে বহুকাল হইতে ছিল—মহাবীর তাহাকে আকার দান করিয়া ধর্মমতরূপে উহা প্রচার করেন। জৈনেরা ধর্ম প্রচার করিবার জন্য বৌদ্ধদের মত দেশ বিদেশে বাহির হন নাই।

(গ) জৈনধর্ম

(২) ভারতের হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের পাশাপাশি চিরকালই আর একটি শক্তি কাজ করিয়া আসিয়াছে। সেটি হইতেছে এখানকার অনার্য্য শক্তি। এই অনার্য্য শক্তি যে কেবল জাতি ও বর্ণ সমস্যা সৃষ্ট করিয়াছিল তাহা নহে—ধর্মের উপর ইহার প্রভাব কিছু কম হয় নাই। পুরাণগুলির অনেক আখ্যায়িকা ও মত এই সব লৌকিক ধর্মের সংস্কৃত সংস্করণ। অসংখ্য অনার্য্য শাখা উপশাখা হিন্দু সমাজের মধ্যে আসিয়াছে; কিন্তু আসে নাই এমন সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। ইহারা হিন্দু নয়। আদমসুমারীতে ইহারা 'আনিমিষ্ট' Animist বলিয়া উল্লিখিত। এই আদিম অনার্য্য জাতি এখনো যেমন ভাবে বর্তমান পূর্বেও হিন্দুযুগে তাহারা তেমনি ছিল; বরং তখন তাহাদেরই সংখ্যা আর্য্যদের তুলনায় অধিক ছিল। ক্রমে তাহাদের অধিকাংশই হিন্দুদের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল—মধ্যযুগে মুসলমান এবং বর্তমানে খৃষ্টান সমাজের মধ্যে ইহারাই আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। হিন্দু মুসলমান ও খৃষ্টান সমাজের

(১) আদিম ধর্ম

মধ্যে প্রবেশ করিয়াও আদিম অনার্য্যদের সংখ্যা প্রায় ১ কোটি ৩ লক্ষ।

(৩) তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যে ভারতের বাহিরের ধর্মগুলি পড়িতেছে। (ক) ইহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ধর্ম হইতেছে ইহুদী। দাক্ষিণাত্যে কোচীন ষ্টেটের ইহুদীগণের মধ্যে প্রবাদ আছে যে তাহারা খৃষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে প্যালেষ্টাইন হইতে পলাইয়া আসিয়া ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল।

ভারতের বাহিরের ধর্ম্ম

(খ) মালাবারে সিরীক খৃষ্টানদের মধ্যে প্রবাদ যে খৃষ্টের শিষ্য সাধু তমাস্ ভারতে আসিয়া প্রাণত্যাগ করেন; এবং সেখানকার প্রথম খৃষ্টীয় চার্চ ৫২ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত হইয়াছিল। (গ) আট শত বৎসর পূর্বে মুসলমানগণ ভারত জয় করে; তাহাদের জয় কেবল রাজ্যজয় ছিল না—ধর্মে ও তাহারা জয়লাভ করিয়াছিল। তাই বর্ত্তমানে ৭ কোটীর উপর লোক মুসলমান এবং এক বাংলাদেশের শতকরা অর্দ্ধেকের উপর লোক ইস্‌লাম ধর্মাবলম্বী।

ভারতবর্ষের মধ্যে যে সব বাহিরের জাতি প্রবেশ করিয়াছিল এবং যে সব অনার্য্য আদিম জাতি এখানে বাস করিত তাহাদের অধিকাংশ বিরাট হিন্দুসমাজের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। শক্ হুন, যিউচী, গ্রীক, প্রভৃতি বাহিরের জাতি হিন্দুদের মধ্যে মিশাইয়া গিয়াছে। "জাতিতত্ত্ব" পরিচ্ছেদে এ বিষয়টি বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। কিন্তু ইহুদী, পারশী, খৃষ্টান, মুসলমান প্রভৃতিকে সে সম্পূর্ণ গ্রাস করিতে পারে নাই কেন? ইহার কারণ এই শেষোক্ত ধর্মগুলি পূর্ব হইতেই উচ্চভাবে পরিপূর্ণ ছিল, বহুদেব পূজক গ্রীক বা অর্দ্ধসভ্য শক্ হুনদের ন্যায় এই সব জাতিদের ধর্মতত্ত্ব অল্প ভিত্তির উপর নির্মিত ছিল না। এই সব জাতি যে কেবল নিজ ধর্ম লইয়া শান্তভাবে ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল তাহা নহে, তাহারা হিন্দুদের কাছে আসিয়াই তাহাদিগকে ধর্ম ত্যাগ করিতে বলিল;

ইহা হিন্দুদের ইতিহাসে কখনো ঘটে নাই। ইহার ফলে এই সব ধর্ম হিন্দুদের ধর্মের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে নাই। যাহারা প্রবেশ করিয়াছে তাহারা নিম্নস্তর দিয়া প্রবেশ করিয়াছে—হিন্দুদের সমস্ত মানিয়া তবে মিশিয়া গিয়াছে। নূতন লোকেরা সমকক্ষভাবে, আচার্য্য ও প্রচারক রূপে প্রবেশ করিয়াছিল,—সেইখানেই হিন্দুদের আত্মাভিমানে আঘাত লাগিয়াছিল এবং তাহারা আত্মরক্ষার জন্য সকল প্রকার কঠোর নিয়ম সংযম প্রবর্ত্তন করিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে ভারতে দুইটি ধর্ম্ম প্রবল ছিল—হিন্দু ও মুসলমান। হিন্দুসমাজ সহস্রভাগে বিভক্ত—পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্ন—যুদ্ধব্যাপৃত, গোঁড়া, অসহিষ্ণু। উদার শিক্ষা দেশে ছিল না;—সাম্প্রদায়িক শিক্ষা ও গ্রাম্যতা দেশের অন্তরে অন্তরে প্রবিষ্ট ছিল। ভারতের এই অজ্ঞতা দূর করিবার জন্য খৃষ্টান পাদরীগণ কিরূপ চেষ্টা করিয়া ছিলেন তাহা 'শিক্ষার ইতিহাস' অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে।

ব্রাহ্ম-সমাজ।

বঙ্গীয় সমাজ ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে যখন নানাপ্রকার অজ্ঞতা ও হীনতায় ডুবিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল—কোনদিক দিয়াই তাহার চেতনার লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যাইতেছিল না,—সেই সময় বর্ত্তমান যুগপ্রবর্ত্তক রাজা রামমোহন রায় অন্ধকারে আলোক-স্তম্ভের মত দেখা দিলেন। পুঞ্জীভূত অন্ধকার ভেদ করিয়া তাঁহার আলোক-রশ্মি চারিদিকে প্রাণের আবেগ জাগাইয়া তুলিল।

দেশ পৌত্তলিকতার ধূমে সমাচ্ছন্ন—ক্ষুদ্র বৃহৎ দেবতার মূর্ত্তি পূজায় দেশবাসী তন্ময় বা ভারতের উদার অধ্যাত্ম ধর্ম্মের পরিবর্ত্তে সঙ্কীর্ণ পৌরহিত্য জাতিভেদ ও পৌত্তলিকতা ক্রমাগতই দেশকে চরম দুর্গতির দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছিল।

কতকগুলি অতিশয় কুফলপ্রদ সামাজিক রীতি সমাজকে দুর্ব্বল করিয়া দিতেছিল। কুলীণ ব্রাহ্মণের সহিত কন্যার বিবাহ দেওয়া সম্মানজনক এইরূপ একটি ধারণা থাকায় একটি কুলীনের সহিত বহুবালিকার বিবাহ দেওয়া সমাজে প্রচলিত হইল। কন্যার কৌমার্য্য ঘুচিলেই সমাজপতিগণ সন্তুষ্ট—তাহা মৃতপ্রায় বৃদ্ধের সঙ্গে বিবাহ দিয়াই হউক অথবা অনুপযুক্ত মূর্খের সহিতই হউক। হতভাগিণী বালিকাদের অধিকাংশই বিবাহের পর স্বামী সহবাসের সৌভাগ্যলাভ দূরে থাক্ স্বামীর সাক্ষাৎ লাভই করিত না।

স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীর সহমরণ প্রথা সমাজে কি প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল তাহা আমরা জানি। অধিকাংশ স্থলেই জোর করিয়া হত-ভাগিণী নারীকে আত্মীয় স্বজন মৃত স্বামীর জলন্ত চিতায় ফেলিয়া দিত। এই প্রথা যে কতখানি নিষ্ঠুরতার পথে চলিয়াছিল তাহা ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়।

অজ্ঞানতার সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গসমাজের রুচিরও বিকৃতি ঘটিয়াছিল। অপেক্ষাকৃত ধনীব্যক্তিগণ কুৎসিত আমোদ প্রমোদে আপনাদের ধন ও শক্তির অপব্যয় করিতেছিলেন; অপরদিকে নিম্নশ্রেণীভুক্ত অন্য সকলে কুরুচি পূর্ণ কবি ও পাঁচালী গান প্রভৃতিতে অতিশয় আমোদ পাইত; উচ্চদরের বঙ্গসাহিত্য বলিতে তখন কিছুই ছিল না।

সমাজের এইরূপ অবস্থায় রাজা রামমোহন রায় ধর্ম সম্বন্ধে উদার আলোচনার জন্য ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে আত্মীয় সভা নামে এক সভা স্থাপন করিলেন। পূর্ব হইতেই প্রচলিত ধর্ম ও সমাজের সংস্কারক বলিয়া তাঁহার খ্যাতি কিছু পরিমাণে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। কলিকাতার উদার শিক্ষাপ্রাপ্ত কয়েকজন খ্যাতনামা ব্যক্তি এই সভার সভ্য হইয়া রাজার সহিত আন্তরিক সহানুভূতি করিতে লাগিলেন। এই সভ্যদের মধ্যে কয়েকজনের নাম উল্লেখ যোগ্য—প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, কালীশঙ্কর ঘোষাল ও নন্দ কিশোর বসু।

আত্মীয় সভা স্থাপন

এই সভায় হিন্দুশাস্ত্র পাঠ ও ব্যাখ্যা হইত এবং কলিকাতার বিখ্যাত ওস্তাদ গোবিন্দলাল রাজার রচিত গান গাহিয়া শুনাইতেন। ইহা ব্যতীত রাজা নানাপ্রকার জ্ঞানগর্ভ আলোচনা দ্বারা এই সভাকে লোকের চিত্তাকর্ষণ করিতেন। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে এই সভায় রাজার সহিত সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী নামে এক পণ্ডিতের পৌত্তলিকতা সম্বন্ধে ঘোরতর তর্ক উপস্থিত হয়। এই তর্ক শ্রবণ করিবার জন্য সহরের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি আসিয়াছিলেন।

১৮১৯ খৃষ্টাব্দেই আত্মীয় সভা কোনো কারণে বন্ধ হইয়া যায়। রাজা The Precepts of Jesus নামক গ্রন্থে তাঁহার মত পরিষ্কার করিয়া প্রকাশ করিলেন। (Trinity) ত্রিত্ব বাদকে অস্বীকার করায় শ্রীরামপুর মিশনারীদিগের সহিত তাহার কিছুকাল ধরিয়া তর্কযুদ্ধ হয়।

Mr. Adam বলিয়া এক ব্যক্তি রাজার প্রভাবে ত্রিত্ববাদ পরিত্যাগ করিয়া একেশ্বরবাদী ভুক্ত (unitarian) হইলেন। ইহার ফলে তাঁহাকে সমাজচ্যুত হইতে হইল। অপরদিকে রাজা তাঁহাকে লইয়া ১৮২১ খৃষ্টাব্দে একটি Unitarian Mission নাম দিয়া সভা স্থাপন করিলেন। Mr. Adam এই সভায় ব্রহ্মোপাসনা করিতেন ও উপদেশ দিতেন। কিছুকাল ইহার কার্য্য বেশ চলিয়াছিল। ক্রমশঃ ইহার শ্রোতা ও উৎসাহীদল কমিয়া আসিতে লাগিল। রাজাও বুঝিতে পারিতেছিলেন ইহা তেমন ফলপ্রদ হইবে না। Mr. Adam এর সহিতও তাঁহার মতদ্বৈধ ঘটিতে লাগিল।

একেশ্বর বাদীগণের সভা Unitarion mission

এইরূপ শুনা যায় যে একদিন রাজা Unitarian সভা হইতে ফিরিতেছেন তাঁহার সঙ্গে দুই শিষ্য ছিলেন তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী ও চন্দ্রশেখর দেব। তাঁহারা প্রসঙ্গ ক্রমে বলিলেন যে সম্পূর্ণরূপে তাঁহাদের মতের অনুরূপ একটি সভা না থাকার জন্যই বাধ্য হইয়া তাঁহাদিগকে Unitarian সভায় যাইতে

হয়। রাজার মনে তাঁহাদের কথাগুলি লাগিল এবং তখন হইতে নূতন করিয়া একটি সভা স্থাপনের সঙ্কল্প তাঁহার মনে লাগিল।

একটি বৃহৎ সভায় রাজা বন্ধুবান্ধবকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদের পরামর্শে ও উৎসাহে অসাম্প্রদায়িকভাবে এক-ঈশ্বরের পূজার জন্য একটি সভা স্থাপন করিবেন স্থির করিলেন ও১৮২৬ খৃষ্টাব্দের ২০ এ আগষ্ট (৬ই ভাদ্র) একটি ভাড়াটিয়া বাড়িতে ব্রহ্ম সভার কার্য্য আরম্ভ হইল।

ব্রহ্ম সভা

প্রতি শনিবার সন্ধ্যায় এই সভা বসিত। প্রথমে বেদ পাঠ হইত, ইহাতে ব্রাহ্মণ ব্যতীত কেহই যোগ দিতে পারিত না। তাহার পর রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ নামে রাজার এক বন্ধু উপনিষদ পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেন। সর্বশেষে রাজার উপদেশ পাঠ করা হইত।

ক্রমশঃ বহুলোক ইহার কার্য্যে সহানুভূতি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে বন্ধুবর্গের সাহায্যে চিৎপুর রোডে রাজা এই সভার জন্য একটি বৃহৎ বাটী ক্রয় করিলেন এবং ২৩ এ জানুয়ারী (১১ই মাঘ) প্রকাশ্যভাবে ব্রাহ্ম-সমাজ প্রতিষ্ঠা করিলেন। ইহার কিছুকাল পরেই কয়েকজন ট্রাষ্টির হস্তে সমাজ চালনার ভার দিয়া তিনি ইয়োরোপ যাত্রা করিলেন।

ব্রাহ্ম-সমাজ

তিনি চলিয়া যাওয়ার পর কিছুকাল ধরিয়া তাঁহার পুত্র রাধাপ্রসাদ রায় অপর ট্রাষ্টিগণের সাহায্যে সমাজের কার্য্য একরূপ চালাইয়াছিলেন। ক্রমশঃই তাঁহাদের উৎসাহ কমিয়া আসিতে লাগিল। রাধাপ্রসাদ বৈষয়িক কারণে কলিকাতা ত্যাগ করিয়া দিল্লীতে চলিয়া গেলেন। তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি বহু উৎসাহী সভ্যগণ একে একে সরিয়া পড়িতে লাগিলেন। শিশু অবস্থায়ই রাজার প্রতিষ্ঠিত সমাজ লুপ্তপ্রায় হইল। একমাত্র বৃদ্ধ রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ তাঁহার শীর্ণ হস্তে ইহার পতাকা ধরিয়া রহিলেন। তাঁহারই অধ্যবসায়ে সমাজের কার্য্য কখনও বন্ধ হইয়া যায় নাই। ১৮৪৩

খৃষ্টাব্দে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন প্রকৃতভাবে ইহার কার্য্যের ভার মস্তকে গ্রহণ করিলেন তখনই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ রাজার কার্য্য উপযুক্ত পাত্রে পড়িয়াছে দেখিয়া নিশ্চিন্ত ভাবে অবসর গ্রহণ করিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ পূর্ব্ব হইতেই ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে "তত্ত্ব-বোধিনী সভা" স্থাপন করিয়া উদার শাস্ত্রালোচনা ও ধর্মালোচনার আয়োজন করিয়াছিলেন। তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকায় অক্ষয়কুমার দত্ত প্রমুখ এই সভার সভ্যগণ নিজ নিজ মতামত প্রকাশ করিতেন। ক্রমশঃ স্বভাবতই এই সভা ব্রাহ্ম সমাজের আদর্শের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিতে লাগিল। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে মহর্ষি ব্রাহ্ম সমাজের আর্থিক সাহায্যের ভার লইলেন এবং তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যের জন্য ব্রাহ্ম সমাজস্থ ব্যক্তিদিগকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। দেবেন্দ্রনাথ সমাজের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিতে গিয়া ইহার দুরবস্থা লক্ষ করিলেন। যে অল্প সংখ্যক ব্যক্তি ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য চালাইতেছিলেন তাঁহাদের মধ্যেও প্রকৃত ধর্মবিশ্বাস ও উৎসাহ তেমন ছিল না। তাঁহাদের অধিকাংশই প্রকৃতপক্ষে পৌত্তলিক ছিলেন। সভায় যোগদান করিবার নিমিত্ত কোনরূপ বিশেষ প্রতিজ্ঞাপত্র না থাকায় কেবল কৌতুহলপরবশ হইয়া অনেকে ইহার কার্য্যে যোগ দিতেন।

তত্ত্ব-বোধিনী সভা

সমাজের কার্য্য-প্রণালীও দেবেন্দ্রনাথের মনকে তেমন স্পর্শ করিল না। অব্রাহ্মণ ভিন্ন অপর কেহ বেদ পাঠ করিতে পারিবে না এই সকল নিয়ম তাঁহার ভাল লাগিল না।

প্রথমেই তিনি সভ্যদিগের জন্য একটী প্রতিজ্ঞাপত্র রচনা করিলেন এবং সমাজের কার্য্যের জন্য একটী উপাসনা প্রণালী গঠন করিলেন। পূর্ব্বের বেদ ও উপনিষদ্ পাঠের পরিবর্ত্তে এই উপাসনা প্রণালীর প্রচলন হইল। ১৮৪৩ সালে ডিসেম্বর মাসে (৭ই পৌষ), আরও ২০ জন যুবকের সহিত দেবেন্দ্র নাথ, রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। ইহার

দেবেন্দ্রনাথের ব্রহ্ম-সমাজে যোগদান।

পর হইতেই সমাজের অবস্থা উন্নত করিবার জন্য তাঁহার সকল চেষ্টা নিযুক্ত হইল।

সমাজের মধ্যে আবার নবজীবনের সাড়া পড়িয়া গেল। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের জন্য দূরদেশসমূহে উৎসাহী ব্যক্তিগণ প্রেরিত হইলেন। দেবেন্দ্র নাথ রাজার রচিত পুস্তকাদি পুনর্বার মুদ্রিত করিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ব্রাহ্ম-সমাজের মতামত ওজস্বিনী ভাষায় ব্রাহ্মগণ লিখিতে লাগিলেন। তাঁহার উৎসাহে কলিকাতার বাহিরে নানাস্থানে বিভিন্ন ব্রাহ্ম-সমাজ স্থাপিত হইল। ইতিমধ্যে দেবেন্দ্রনাথ বেদ ও উপনিষদাদির আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। অক্ষয় কুমার দত্তের সহিত বহু তর্কবিতর্কের পর তিনি বুঝিলেন বেদের অভ্রান্ততা স্বীকার করা অসম্ভব। কিন্তু সম্পূর্ণরূপে বেদ উপনিষদ্ বর্জন করা দূরে থাকুক, ইহাদের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা অক্ষুণ্ণ রহিল। এখন উপনিষদ্ হইতে একেশ্বরবাদ প্রতিপাদক সুন্দর সুন্দর কয়েকটী শ্লোক সঙ্কলন করিয়া তিনি 'ব্রাহ্মধর্ম' নামক গ্রন্থে তাহা মুদ্রিত করিলেন ও ব্রাহ্ম ধর্মের মূল মত 'ব্রাহ্মধর্ম বীজে'র মধ্যে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিলেন। এই সময় হইতে পূর্বের 'বেদান্ত প্রতিপাদ্য ব্রাহ্মধর্ম' নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া কেবল 'ব্রাহ্মধর্ম' নাম চলিত হইল।

বেদের অভ্রান্ততা অস্বীকার।

'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থ।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে বিংশতি বৎসরের যুবক কেশবচন্দ্র সেন সকল প্রকার সামাজিক ও পারিবারিক বাধাবিঘ্ন তুচ্ছ করিয়া আপনার অসাধারণ প্রতিভা ও কার্য্যতৎপরতা লইয়া ব্রাহ্ম সমাজে আসিয়া যোগদান করিলেন। দেবেন্দ্রনাথও প্রেমবাহু প্রসারিত করিয়া তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। উপযুক্ত সহযোগী পাইয়া মহর্ষির উৎসাহ দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল। দেবেন্দ্রনাথের ভক্তি ও কেশবের কর্ম মিলিত হইয়া সমাজকে নূতন বলে বলীয়ান্ করিয়া

কেশবের ব্রাহ্ম সমাজে যোগদান।

তুলিল। দিন দিনই সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল ও অধিকতর লোক ইহার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

কেশবচন্দ্রের ন্যায় প্রতিভাবান্ বক্তা অতি অল্পই দেখা যায়। তাঁহার ওজস্বিনী বক্তৃতায় ও প্রবন্ধে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় সকলে আকৃষ্ট হইতেন। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে কেশব কর্মত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণরূপে সমাজের কার্য্যে আপনার শক্তি নিযুক্ত করিলেন। এই সময় হইতে বিশেষ করিয়া যুবক-দলের উপর তাঁহার বক্তৃতা ও লেখার ভিতর দিয়া ব্রাহ্ম-সমাজের প্রভাব বহুল-পরিমাণে বিস্তৃত হইতে লাগিল।

কেশব তাঁহার কতিপয় অন্তরঙ্গ ধর্মবন্ধু লইয়া একটী মণ্ডলী রচনা করিলেন। এই মণ্ডলীতে নানারূপ পাঠ ও আলোচনার মধ্যে তাঁহারা খৃষ্টীয় ধর্মগ্রন্থসকল পাঠ করিতে লাগিলেন। ধীরে ধীরে খৃষ্টধর্মের প্রভাব এইরূপে ব্রাহ্ম-সমাজে প্রবেশ লাভ করিতে লাগিল। খৃষ্ট ধর্মের দুইটী বিশেষ লক্ষণ অনুতাপ ও প্রার্থনা কেশবের মনকে বিশেষভাবে বিচলিত করিল। প্রার্থনা কেশবের জীবনের মূলমন্ত্র ছিল।

সমাজে খৃষ্টীয় প্রভাব।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার দ্বিতীয় কন্যার বিবাহের সময় প্রচলিত হিন্দু অনুষ্ঠান পদ্ধতির পরিবর্তে, পৌত্তলিক অংশটুকু বাদ দিয়া ব্রাহ্ম মতানুযায়ী একটী অনুষ্ঠান পদ্ধতি সঙ্কলন করিলেন ও সেই অনুসারে কন্যার বিবাহ দিলেন।

অনুষ্ঠান পদ্ধতি।

পূর্বে ব্রাহ্ম সমাজকে একটী ধর্ম্মমণ্ডলী বলিয়াই লোক জানিত, এখন হইতে সমাজ সংস্কার কার্য্যও ইহার একটী প্রধান অঙ্গ হইল।

এই বৎসরেই বহু আলোচনার পর কেশব 'ব্রাহ্ম ধর্মের অনুষ্ঠান' নামে এক পুস্তিকা বাহির করিলেন; সেই সময় হইতে ব্রাহ্মদিগের সকল প্রকার অনুষ্ঠান ইহার অনুযায়ী হইত।

১৮৬২ খৃষ্টাব্দে মহর্ষি কেশবকে 'প্রধান আচার্য্য' পদে বরণ করিয়া

তাঁহাকে 'ব্রহ্মানন্দ' উপাধিতে ভূষিত করিলেন। ইহার পূর্বে ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপর কোন জাতি আচার্য্য পদ লাভ করিতে পারিত না। মহর্ষির এই কার্য্য কিন্তু সমাজের সকল প্রবীণ ব্যক্তি অনুমোদন করিলেন না। অপর দিকে নব্যদল ইহাতে খুবই উৎসাহিত হইলেন। এই অব্রাহ্মণ আচার্য্য হওয়া লইয়া ক্রমশঃ দুইটী দলের সৃষ্টি হইতে লাগিল। এতদ্ব্যতীত সমাজ সংস্কার লইয়াও প্রাচীন ও নবীন দলের মধ্যে বিবাদের লক্ষণ দেখা দিল।

অব্রহ্মণ আচার্য্য।

নব্যদল ভিন্ন জাতির মধ্যে বিবাহ, বিধবা বিবাহের পক্ষ সমর্থন করিয়া আন্দোলন তুলিলেন এবং উদ্যোগ উৎসাহ করিয়া প্রকৃতই এইরূপ কতিপয় বিবাহ দিলেন। এতদূর অগ্রসর হওয়া মহর্ষিরও মনোনত ছিল না; তিনি ইহাতে মর্মাহত হইলেন। এদিকে ব্রাহ্মণেতর ব্যক্তিকে আচার্য্যের পদদান করা সম্বন্ধে মহর্ষির মত একেবারে স্থির হইয়া যায় নাই। নব্যদল যখন উৎসাহের সহিত অব্রাহ্মণ দিগকে উপাচার্য্যের পদ দান করিলেন, তখন মহর্ষি তাহা অনুমোদন করিতে পারিলেন না। এই লইয়া বিচ্ছেদের সূত্রপাত হইল।

সামাজিক বিষয়ে মতভেদের সূত্রপাত।

মহর্ষি যখন নব্যদলের আপত্তি সত্ত্বেও ব্রাহ্মণদিগকেই আচার্যের স্থান দিলেন ও তাঁহাদিগের সকল যুক্তি উপরোধ অগ্রাহ্য করিলেন তখনই (১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে) প্রাচীন সমাজ হইতে নব্যদল কেশবের নেতৃত্বে বিচ্ছিন্ন হইয়া আসিলেন।

অব্রাহ্মণ আচার্য্য হওয়া লইয়া মহর্ষির সহিত বিবাদ।

ইহার পরও কিছুদিন মহর্ষি ও কেশবের আগ্রহে এই বিচ্ছেদ যাহাতে সম্পূর্ণ না হইতে পারে তাহার চেষ্টা চলিল। কিন্তু যে সকল মত লইয়া এই বিচ্ছেদ তাহার কোনও মীমাংসা হইল না।

বিচ্ছেদ।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজ।

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজ' নাম দিয়া নব্যদল এক নূতন সমাজ স্থাপন করিলেন। প্রাচীন ব্রাহ্ম-সমাজের নাম তখন হইতে আদি ব্রাহ্ম সমাজ হইল।

সর্ব্ব ধর্ম্ম সমন্বয় শ্লোক সংগ্রহ।

ব্রাহ্মধর্ম সকল ধর্মের সমন্বয়ক্ষেত্র—ইহাই স্পষ্ট করিয়া উপলব্ধি করিবার জন্য ও সকলের সমক্ষে ইহা প্রচার করিবার জন্য ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ সকল ধর্ম হইতে উৎকৃষ্ট বাণী সকল সংগ্রহ করিয়া 'শ্লোকসংগ্রহ' নামে এক পুস্তিকা প্রচার করিলেন।

আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি নব্যদলের উপর খৃষ্টীয় প্রভাব বহুল পরিমাণে আসিয়া পড়িয়াছিল। অনুতাপ প্রার্থনা ও প্রার্থনাসূচক সঙ্গীত তাহাদের মধ্যে ধর্মের উন্মাদনা আনিয়া দিয়াছিল।

বৈষ্ণব প্রভাব ও সংকীর্ত্তণ।

ইহাদের মধ্যে একজন প্রধান সাধক বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী-শ্রীচৈতন্যের শিষ্য অদ্বৈত গোস্বামীর বংশধর। বৈষ্ণব পরিবারের ভক্তির ভাব তাঁহার মধ্যে পূর্ণমাত্রায় ছিল। তাঁহার প্রভাবে ব্রাহ্মসমাজে ধীরে ধীরে খোল করতাল লইয়া ভাবে উন্মত্ত হইয়া ভক্তি সঙ্গীত সঙ্কীর্ত্তন করিবার প্রথা প্রচলিত হইল।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা প্রণালী।

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র সেন ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের ভিত্তি-স্থাপন করিলেন। এই সময় মহর্ষি প্রণীত উপাসনা-প্রণালীর কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া সংস্কৃত শ্লোকগুলির অধিকাংশ বর্জন করিয়া কেশব একটী পৃথক রকমের উপাসনা প্রণালী প্রণয়ন করিলেন। এই সময় আর একটী নূতন ভাব দেখা দিল। এই বৎসরের উৎসবের দিনে নগরের রাজপথে পথে ব্রাহ্মগণ সঙ্কীর্ত্তন করিয়া লোকের মন স্পর্শ করিয়াছিলেন। তদবধি উৎসব উপলক্ষ্যে এখনও ঐরূপ প্রথা চলিয়া আসিতেছে।

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ২২শে নবেম্বর এক সভায় ব্রাহ্মগণ 'ব্রাহ্মদিগের বিবাহ পদ্ধতি আইন সঙ্গত কিনা' এই বিষয়ে বহু আলোচনা করিলেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন বিবাহ প্রণালীর মধ্যে ব্রাহ্মবিবাহ বলিয়া কিছুই ছিল না। এস্থলে আইন অগ্রাহ্য করিয়া ব্রাহ্মবিবাহ নিরাপদ নহে ইহা অনেকেই বুঝিয়াছিলেন। কেশব ইহা আইন সঙ্গত করিবার জন্য বিধিমতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

সিমলায় যাইয়া কেশব বড়লাটের আইন সভ্য Sir Henry Maineএর (Legal member) সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তাঁহার সহিত কথোপকথনের ফলে কৌন্সিলে তিনি 'Native marriage Bill' উপস্থিত নকরিলে। ব্রাহ্মদিগের জন্য বিশেষভাবে কোনও আইন হওয়া কঠিন, কারণ ব্রাহ্ম বলিতে পরিস্কার করিয়া কোন্ শ্রেণীকে বুঝায় আর কাহাকে বুঝায় না তাহা ঠিক করা যায় না। সুতরাং সাধারণ ভাবে ঐরূপ একটি আইন হওয়া তখনকার মত শ্রেয়ঃ মনে করা হইল। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ৩ আইন পাশ হইয়া গেল। এই আইন অনুসারে ১৪ বৎসরের নিম্নে কোনও বালিকার বিবাহ হইতে পারেনা। বর ও কন্যার সম্মতিক্রমে বিবাহ হওয়া প্রয়োজন। অসবর্ণ বিবাহ এই আইন অনুসারে সঙ্গত, বহু-বিবাহ নিষিদ্ধ ও বিধবা বিবাহ অনুমোদিত হইল। আইনতঃ এইরূপে নিরাপদ হইয়া ব্রাহ্মগণ তাঁহাদিগের বিবাহ ব্রাহ্ম বিশ্বাসগত অনুষ্ঠানবদ্ধ করিলেন।

১৮৭২ সালের ৩ আইন।

এই সকল কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে কেশব বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রমুখ কতিপয় ধর্ম্মবন্ধুর সহিত নানাস্থানে গমন করিয়া অগ্নিময়ী বক্তৃতায় ও সঙ্গীতে সকলকে মুগ্ধ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। এইরূপে ব্রাহ্মধর্ম ক্রমে বিস্তৃত হইতে লাগিল। এখন হইতে বিশেষভাবে কয়েকজনকে প্রচারকরূপে নির্দ্দিষ্ট করা হইল। তাঁহারা

ভ্রমণকারী প্রচারক।

ব্রাহ্মধর্মের পতাকা হস্তে বিভিন্ন স্থানে গমন করিয়া ধর্মপ্রচার করিতেন। অদ্যাবধি এই উদ্দেশ্যে কয়েকজন প্রচারক থাকেন।

ব্রাহ্মগণ যাহাতে সপরিবারে একত্রে থাকিয়া জ্ঞান ও ধর্মের চর্চ্চায় জীবন যাপন করিতে পারেন তাহার জন্য কেশব ভারত-আশ্রম স্থাপন করিলেন। এতদ্ভিন্ন ধর্মার্থীদিগের জন্য 'ব্রাহ্মনিকেতন' নামে একটি আশ্রম করিলেন। ব্রাহ্মদিগের সকল বিষয়ে মতামত প্রকাশের জন্য ইংরাজীতে 'ইণ্ডিয়ন মিরার', বাংলায় 'ধর্মতত্ত্ব' নামে একটী পত্রিকা চালাইবার ভার কেশব লইলেন। নারীদিগের জন্য বিশেষভাবে একটী বিদ্যালয়ও খুলিলেন।

কর্মে যখন তিনি এইরূপে ব্যাপৃত তখন কিন্তু সমাজের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তি তাঁহার সকল মত ও কার্য্য সম্পূর্ণরূপে অনুমোদন করিতে পারিতে-ছিলেন না। আবার দুইটী দলের সৃষ্টি হইল। কেশব ও তাঁহার অনুগত

বিরোধের সূত্রপাত।

ব্যক্তিগণ স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী হইলেও কতক পরিমাণে রক্ষণশীল ছিলেন। অপরদিকে নব্যদল স্ত্রীস্বাধীনতার সকলপ্রকাব বাধা অপসারিত করিয়া নারীদিগকে পুরুষের সমান অধিকার দিতে চাহিলেন। আবরণের অন্তরাল হইতে নারীদিগকে বাহিরে আনিয়া তাঁহাদিগকে উচ্চতম শিক্ষা দেওয়াই তাঁহাদের লক্ষ্য। কেশবের স্ত্রীশিক্ষার আদর্শ তাঁহাদের যথেষ্ট মনে হইল না। এই লইয়াই প্রথম বিরোধের ঝটিকা উঠিল। সংস্কারকদল নারীদিগের জন্য হিন্দু মহিলা বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন; পরে উহার নাম বঙ্গমহিলা বিদ্যালয় হইল। শেষে ইহা বেথুন কলেজের সহিত যুক্ত হইয়া যায়।

এই সকল সামাজিক মতভেদ ভিন্ন নব্যদল আরও দুইটী বিষয়ে আপত্তি করিলেন। তাঁহারা দেখিলেন ক্রমশঃ সমাজে গুরু ও অবতারবাদ প্রবেশ করিতেছে। দ্বিতীয়তঃ সমাজে নিয়মতন্ত্র বলিয়া কিছু নাই। একমাত্র কেশবই প্রকৃতপক্ষে সমাজ চালাইতেছিলেন। স্বাধীন চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ ইহা দেখিয়া ভীত হইলেন।

নব্যদল কেশব ও তাঁহার অন্তর্গত ব্যক্তিদিগের সহিত আলোচনা করিয়া এই সকলের মীমাংসা করিতে বহু প্রয়াস পাইলেন; কিন্তু কোনই ফল হইল না। ইতিমধ্যে ব্রাহ্মগণ জানিতে পারিলেন যে কেশবের কন্যার সহিত কুচবিহারের পঞ্চ দশবর্ষী নাবালক রাজার সহিত বিবাহ স্থির হইয়াছে। কন্যার বয়স তখনও চোদ্দ হয় নাই এবং রাজা ব্রাহ্ম নয় তাহা সকলেই জানিতেন; বিবাহ ব্রাহ্মমতে হইবে না তাহাও শোনা গেল। ইহা শুনিয়া অধিকাংশ ব্রাহ্ম প্রকৃত ঘটনা কেশবের নিকট হইতে শুনিতে চাহিলেন; কিন্তু কোনও প্রশ্নের উত্তর তাঁহার নিকট পাওয়া গেল না।

কুচবিহার বিবাহের আন্দোলন।

১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে বিবাহ স্থির হইয়া গেল। ব্রাহ্মগণ শুনিলেন পৌত্তলিক অংশ বাদ দিয়া কুচবিহারের পদ্ধতি অনুসারে বিবাহ হইবে। জাতিচ্যুত বলিয়া কেশব কন্যাসম্প্রদান করিতে পারিবেন না; তাঁহার ভ্রাতা সম্প্রদান করিবেন। এই সকল শুনিয়া ব্রাহ্মগণ স্বভাবতঃই রুষ্ট হইলেন।

কেশব এই সকল সর্ত্তে আপত্তি জানাইলেও তাঁহার কোনও অনুরোধ রহিল না। নামমাত্র ব্রাহ্মমতে অনুষ্ঠান হইয়া কুচবিহারের প্রচলিত পদ্ধতি অনুসারে বিবাহ সম্পন্ন হইল।

এই বিবাহই বিরোধের চরম কারণ। তেয়িশ জন ব্রাহ্ম একটী পত্রে স্বাক্ষর করিয়া কেশবের এই কার্য্যের প্রতিবাদ করিয়া পাঠাইলেন। তিনি তাহা অগ্রাহ্য করিলেন।

এতদ্ব্যতীত মন্দিরে আচার্য্য হওয়া লইয়াও দুইদলে বিবাদ বাধিল; নব্যদল একটী সভা আহ্বান করিয়া এক কমিটি গঠন করিলেন। সমাজের মঙ্গল যাহাতে হয় ইহাই তাহার উদ্দেশ্য। মিলন হওয়া যখন অসম্ভব বোঝা গেল তখন নব্যদল পৃথক একটী সমাজ স্থাপন ভিন্ন আর উপায় দেখিলেন না।

বিচ্ছেদ।

১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে টাউন হলে একটী সভা আহ্বান করিয়া নব্যদল 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' নাম দিয়া ভিন্ন একটী সমাজের প্রতিষ্ঠা করিলেন। তাঁহাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল যে সমাজের সকল কার্য্য সমাজস্থ সর্বসাধারণের মত লইয়া চলিবে। এক নেতৃত্ব কোনও ক্রমেই যাহাতে সমাজে স্থান না পায় তাহার জন্য সকলেই বিশেষ সচেষ্ট রহিলেন। আনন্দমোহন বসু সমাজের প্রথম সভাপতি, শিবচন্দ্র দেব প্রথম সম্পাদক ও উমেশচন্দ্র দত্ত সহকারী-সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন। ৪৯ জন ব্যক্তি লইয়া একটী কমিটি গঠিত হইল, ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই মফঃস্বল সমাজ গুলির প্রতিনিধি।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ।

বিধিমতে সে কমিটিতে নিয়মতন্ত্র প্রণালী গঠিত হইল। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের ইহাই বিশেষত্ব যে ইহা সাধারণ তন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত, ইহার কোনও কার্য্য কেবল একজন ব্যক্তির ইচ্ছানুসারে হইবার উপায় নাই।

নিয়মতন্ত্র।

১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে (২রা জ্যৈষ্ঠ) সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মন্দির স্থাপিত হইল।

মন্দির স্থাপন।

এদিকে কুচবিহার বিবাহের পর হইতে এবং নব্যদল বিভিন্ন হইয়া আসার সময় হইতে কেশবচন্দ্র আদেশবাদের উপর বিশেষভাবে জোর দিয়া সেই অনুসারে সমাজের কার্য্য চালাইতে লাগিলেন। তাঁহার সম্প্রদায়ের নাম পরিবর্ত্তিত করিয়া নববিধান রাখিলেন।

নব বিধান।

অপরদিকে সাধারণ ব্রাহ্মগণ নব উৎসাহে কার্য্য আরম্ভ করিলেন। প্রতিভাশালী যুবক শিবনাথ শাস্ত্রী পার্থিব উন্নতির সকল প্রলোভন ধর্মের আকর্ষণে বিনা দ্বিধায় পরিত্যাগ করিয়া আপনার শরীর মন সমাজের কার্য্যে লাগাইয়া দিলেন। সমাজের নিয়মাবলী প্রস্তুত হইতে আরম্ভ করিয়া

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যাবলী।

মন্দির নির্ম্মাণ, সমাজের পত্রিকা চালান, যুবকদিগের উন্নতি কল্পে প্রাণপণ চেষ্টা, স্ত্রীজাতির শিক্ষা, স্বাধীনতার জন্য প্রয়াস সকলের মধ্যেই তাঁহার হস্ত দেখিতে পাওয়া যাইত। শিবনাথ শাস্ত্রী, আনন্দমোহন বসু প্রমুখ ব্যক্তিগণ যুবকদিগের জন্য 'ছাত্রসমাজ' নাম দিয়া একটী সমিতি স্থাপন করিলেন। আধ্যাত্মিক, সামাজিক ও নৈতিক বিষয়সকল যুবকগণ যাহাতে আলোচনা করিয়া আপনাদের উন্নতিসাধন করিতে পারেন ইহাই ইহার উদ্দেশ্য।

ছাত্রসমাজ

নানা বিষয়ে আলোচনার জন্য Brahmo Public Opinion বলিয়া প্রথমতঃ একটি পত্রিকা বাহির হইত, পরে উহার নাম পরিবর্ত্তিত করিয়া Indian Messenger রাখা হইল। এখনও ঐ নাম দিয়া প্রতিসপ্তাহে নিয়মিতভাবে পত্রিকাটী চলিয়া আসিতেছে। ইহা ব্যতীত 'তত্ত্বকৌমুদী' নাম দিয়া অপর একটী বাঙ্গালা পাক্ষিক পত্রিকা বাহির হয়।

পত্রিকাদ্বয়।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতার উন্নতি-সাধনের জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত। নরনারীর সমান অধিকার এই মন্ত্র সাধারণ সমাজ প্রথম হইতে ধরিয়া রাখিয়াছে। ইহার অনুকূল হাওয়ায় বর্দ্ধিত ও শিক্ষিত হইয়া কত নারী সমাজের ও দেশের কাজে লাগিয়া ধন্য হইতছেন। নারীগণ ধীরে ধীরে এমন কি আচার্য্যের পদ গ্রহণ করিতেছেন।

স্ত্রীজাতির উন্নতি।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ হইতে নানাস্থানে বালক ও বালিকাদিগের জন্য অনেকগুলি বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে।

বিদ্যালয় স্থাপন।

এই সকল বাহ্যিক কর্ম্মের দিক কেবল দেখিলে মনে হইবে এই সমাজ শুধু কর্ম্ম লইয়াই ব্যস্ত ধর্ম্মের দিক ইহার তেমন সরস নয়। আমরা

ধর্ম্ম প্রচার।

দেখিয়াছি যুবক শিবনাথ পার্থিব উন্নতির দিকে না তাকাইয়া সমাজের জন্য আপনার মন প্রাণ ঢালিয়া দিলেন। কেবল বাহিরের কর্মের প্রেরণায় ইহা সম্ভব নয়। ধর্মের আকর্ষণ কতটা প্রবল হইলে সাংসারিক প্রলোভন ত্যাগ করা সম্ভব তাহা অনুমান করিতে পারা যায়। শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ কতিপয় ধর্মবীরগণের তেজোময়ী বাণীতে দলে দলে লোক আসিয়া ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে উপাসক মণ্ডলীর সংখ্যা বাড়িয়া চলিল। কলিকাতার বাহিরেও এই ধর্মবীরগণের কার্য্য নিস্ফল হয় নাই—নানাস্থানে অল্পকালের মধ্যে অনেকগুলি ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইল।

সাধনাশ্রম।

সাধকমণ্ডলী যাহাতে অনুকুল একটী স্থানে থাকিয়া পাঠ সাধন ভজনে সময় কাটাইতে পারেন তাহার জন্য সমাজ হইতে একটী সাধনাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইল। শিবনাথ শাস্ত্রী ইহার প্রধান উদ্যোগী ছিলেন।

সাধনাশ্রমের মুলমন্ত্র "প্রাণ ব্রহ্মপদে হস্ত কার্য্যে তাঁর"। সমগ্র ব্রাহ্ম সমাজেরও ইহাই মূলমন্ত্র।

বোম্বাইএর "প্রার্থনা সমাজ" সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সহিত আদর্শ ও মতে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত।

আর্য্য সমাজ

ভারতবর্ষের অপৌত্তলিক একেশ্বরবাদী ধর্ম সম্প্রদায়গুলির মধ্যে আর্য্য সমাজের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ভারতের সনাতন ধর্ম যথাসম্ভব রক্ষা করাতে ও ভারতের আচার, নীতি অনেকাংশে অক্ষুণ্ণ রাখাতে অন্যান্য নুতন ধর্ম-সম্প্রদায় অপেক্ষা ইহার প্রতি ভারতবাসীর বিশেষতঃ হিন্দু জাতির আস্থা অধিক বলিয়া মনে হয়; সুতরাং ইহার কার্য্য ও কিঞ্চিৎ পরিমাণে সহজসাধ্য হইতে পারিয়াছে। উত্তর-পশ্চিম ভারতে ইহার প্রভাব সর্বাপেক্ষা অধিক।

আর্য্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা দয়ানন্দ সরস্বতী গুজরাটের অন্তর্গত সরভী নামক একটী ক্ষুদ্র গ্রামে, ১৮২৪ সালে, এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। জীবিত কালে ইঁহার প্রকৃত নাম কেহ জানিতে পারে নাই।

প্রতিষ্ঠাতার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

পরে জানা গিয়াছে ইঁহার পৈত্রিক নাম মূলশঙ্কর; ইঁহার পিতা অম্বাশঙ্কর একজন অতিশয় নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। বাল্যকাল হইতেই পুত্রের মধ্যে ধর্মে একাগ্রতা সংক্রামিত করিবার জন্য পিতার যত্নের অবধি ছিল না। মূলশঙ্কর যখন চোদ্দ বৎসরের বালক সেই সময়ে শিবরাত্রির ব্রতপালন করিবার জন্য সারাদিন উপবাস করিয়া রাত্রি জাগরণের উদ্দেশ্যে পিতাপুত্র অর্ঘ লইয়া শিবমন্দির যাত্রা করিলেন। দিবসের অনশনে শরীর ক্লান্ত, নিদ্রায় বালক অভিভুত; তথাপি ক্ষুদ্র তেজস্বী বালক জাগিয়া থাকিয়া মন্ত্রোচ্চারণ করিতে লাগিল। এইরূপে কিছুক্ষণ কাটিবার পর হঠাৎ বালক দেখিল একটী ইঁদুর চুপি চুপি আসিয়া শিবলিঙ্গটিকে বিশেষ ভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে; যখন দেখিল ইহা প্রাণহীন, ইহার ক্রোধ

অপরাধির শাস্তিবিধান করিতে একান্তই অসমর্থ তখন নির্ভয়ে ইঁদুর দেবতার নৈবেদ্য ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। বালক স্বভাবতঃই সকল বিষয়ে বুদ্ধিদ্বারা বিচার করিয়া গ্রহণ করিত ও এই ঘটনা তাহায় প্রচলিত ধর্মসংস্কারে আঘাত করিল। এই সামান্য ঘটনা হইতেই তাহার পৌত্তলিক পূজার প্রতি আস্থা বিনষ্ট হইয়া গেল। পিতার অশেষ অনুরোধ ও আদেশে বালকের মন পরিবর্ত্তিত হইল না।

অশেষ নির্য্যাতন ভোগ করিয়া আরও কয়েক বৎসর তাঁহাকে গৃহেই থাকিতে হইয়াছিল। এই সময়ের মধ্যে তাঁহার একটী বোন্ মারা যান; এই বোন্‌কে তিনি অন্তরের সহিত ভাল বাসিতেন। ইঁহার মৃত্যুতে অত্যন্ত আঘাত পাওয়াতে তাঁহার মনে মুক্তির সন্ধিৎসা জাগিল। একাকী থাকিয়া জ্ঞান ও ধর্মের রস আস্বাদন করিবেন ও জনমানবকে তাহার ফল বিতরণ করিবেন ইহাই তাঁহার আকাঙ্ক্ষা। পিতামাতা আত্মীয়স্বজন তাঁহাকে বিবাহ দিয়া গৃহী করিবার সঙ্কল্প করাতে গৃহে বাস করা নিরাপদ নয় বুঝিয়া তিনি গৃহের সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া চিরদিনের মত তাহা ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

গৃহত্যাগের পর কয়েক বৎসর তিনি নির্জ্জনে সন্ন্যাসব্রত পালন করেন; তৎপরে নানা দেশ ভ্রমণ করেন। এইরূপ ভ্রমণ করিতে করিতে বোম্বাই সহরে আসিয়া ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে আর্য্য সমাজ প্রতিষ্ঠা করিলেন। সন্ন্যাস পালনের সময়েই মূলশঙ্কর তাঁহার গুরুর নিকট হইতে 'দয়ানন্দ সরস্বতী' নাম পাইয়াছিলেন। দয়ানন্দের নাম পূর্ব্বেই চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। নূতন সমাজ প্রতিষ্ঠার সময় বহুসংখ্যক লোক তাঁহার প্রভাবে এই সমাজভুক্ত হইলেন। সমাজের দশটি মূলমন্ত্র স্থির করা হইল—এই মন্ত্রগুলিতে দীক্ষা লইয়া সমাজে প্রবেশ করিতে পারা যায়।

বোম্বাই সহরে সমাজ স্থাপন।

১৮৭৭ সালে দয়ানন্দ লাহোরে যান। এইখানে তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা

অধিক উৎসাহ ও সহানুভূতি লাভ করেন। লাহোরে যে সমাজ স্থাপন করা হইল তাহাই প্রকৃতপক্ষে আর্য্য সমাজের কেন্দ্র-স্থল হইল। এই স্থানে পূনর্বার দশটী মন্ত্র সুস্পষ্ট ভাবে লিপিবদ্ধ করা হয় এবং এখন হইতে রীতিমত সমাজের কার্য্য আরম্ভ হয়।

লাহোরে সমাজ স্থাপন।

মন্ত্রগুলির মধ্যে ধর্ম, সমাজ ও নীতির উচ্চ আদর্শ নিহিত। অজ্ঞান ও অকল্যাণ দূর করিয়া সমগ্র মানবকে জাতিনির্বিশেষে ধর্মের আলোক দান করাই আর্য্য সমাজের মূলমন্ত্র। সকল প্রকার জনহিতকর কার্য্যের মূলে ও এই মন্ত্র।

মন্ত্র দশটীর প্রথম দুটীতে আর্য্য সমাজের ঈশ্বর সম্বন্ধে মতের আভাস পাওয়া যায়। জগৎকারণ ভগবান্ সর্বশক্তিমান্, অসীম, অনন্ত, সর্বব্যাপী সকল জ্ঞানের আধার, ন্যায়-বিধাতা, আবার পূর্ণ প্রেমময়, দয়াময় জীবের আরাধ্য একমাত্র তিনিই।

ধর্ম্মমত।

এইমতে একেশ্বরবাদী সকল ধর্মসম্প্রদায়ই সায় দিবেন। কিন্তু ইহার সহিত আরও দুইটী মত আর্য্য সমাজস্থ ব্যক্তিগণ পোষণ করেন। দয়ানন্দ মহাপণ্ডিত ছিলেন, তিনি বেদ তন্ন তন্ন করিয়া পাঠ করিয়াছিলেন। বেদকে তিনি সকল জ্ঞানের খনি বলিয়া মনে করিতেন এবং ইহা অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। সকল আর্য্যই মনে করেন বেদ অভ্রান্ত সকল জ্ঞানের আকর। তৃতীয় মন্ত্রে আর্য্যগণ ইহাই স্বীকার করিয়া লন এবং শ্রদ্ধার সহিত নিয়মিতভাবে বেদ পাঠ করিবেন এই প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ হন। দ্বিতীয়তঃ আর্য্যগণ কর্মবাদে আস্থাবান্। কর্মহেতু জীব পুনঃ পুনঃ জন্মলাভ করে এবং এইরূপে উন্নত হইতে উন্নততর জন্ম প্রাপ্ত হয় ইহাই তাঁহাদের ধারণা।

ভারতবর্ষীয় অন্যান্য একেশ্বরবাদী ধর্মসম্প্রদায়ের সহিত আর্য্য সমাজের একযোগে যুক্ত হইবার প্রয়াস কয়েকবার করা হইয়াছিল কিন্তু বেদের

অভ্রান্ততা ও কর্মবাদে বিশ্বাস এই দুইটি বিশেষ মতের জন্যই তাহা সম্ভব নহে।

আর্য্য সমাজের আরাধনা প্রণালীর মধ্যে সর্বপ্রথমে বেদ মন্ত্রোচ্চারণের সহিত হোম একটী প্রধান অঙ্গ। হোম সমাপ্ত হইলে যথাবিধি আচার্য্য উপদেশ ও প্রার্থনা করেন। জাতিনির্বিশেষে যোগ্য ব্যক্তিমাত্রেই আচার্য্যের কার্য্য করিতে পারেন।

মতভেদ ও বিভাগ।

কালক্রমে আর্য্যদিগের মধ্যে কয়েকটী মতভেদ উপস্থিত হয়। একদল বলিলেন নিরামিষ আহার সর্বতোভাবে শুদ্ধ থাকিবার প্রকৃষ্ট উপায়; এই মতানুসারে তাঁহারা মৎস্য মাংস সম্পূর্ণভাবে বর্জন করিয়া চলিতে লাগিলেন। অপর পক্ষ নিরামিষ ভোজনের প্রয়োজনয়তা বোধ করিলেন না। এইরূপে দুইটী দলের সৃষ্টি হইল। ক্রমশঃ আরও একটী বিষয়ে মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। একদল দয়ানন্দের সকল উক্তি নির্বিচারে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত, অপরদিকে অধিকতর স্বাধীনচিত্ত আর্য্যগণ তাহাতে অসম্মত। আপনার স্বাধীন বুদ্ধিদ্বারা সকল বিষয় বিচার করিয়া গ্রহণ করা কর্তব্য ইহাই তাঁহাদের মত। এই বাদ প্রতিবাদের ফলে দুইটী বিভাগ হয় উন্নতিশীল যাঁহারা স্বাধীন চিন্তা ও স্বাধীন কর্ম্মের পক্ষপাতী—রক্ষণশীল দল যাঁহারা সর্বতোভাবে দয়ানন্দের উক্তি অনুসরণই শ্রেয়ঃ মনে করেন। নিরামিষ-ভোজীগণ স্বভাবতই রক্ষণশীল দলভুক্ত হইলেন ও মাংসাশীগণ উন্নতিশীল দল বৃদ্ধি করিলেন। যাহা হউক প্রধানতঃ দুইটী বিভাগ হওয়াতে দুইপক্ষ বিভিন্নভাবে শিক্ষা বিস্তারের আয়োজন করিতে লাগিলেন। উন্নতিশীল আর্য্যগণ ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে লাহোরে 'দয়ানন্দ অ্যাংলোবেদিক কলেজ' নাম দিয়া এক কলেজ স্থাপন করেন। এইখানে আধুনিক শিক্ষার

শিক্ষা বিস্তার।

আদর্শানুযায়ী শিক্ষার ব্যবস্থা করা করা হইয়াছে। অপরদিকে রক্ষণশীল আর্য্যগণের উদ্যোগে ১৯০২

সালে হরিদ্বারের কাংড়া উপত্যকায় গুরুকুল বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ক্রমশঃ বারাণসী বৃন্দাবন ও অন্যান্য স্থানে গুরুকুল বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। ইহার উদ্দেশ্য প্রাচীন হিন্দু আদর্শ অনুসারে বালকদিগকে শিক্ষাদান। 'গুরুকুলে' বাস করিয়া ছাত্রেরা সকল প্রকার কর্ত্তব্য সাধনের সহিত বিদ্যালাভ করে। আর্য্য সমাজের যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়াকলাপ পালন করা এখানকার ছাত্রদের একটী বিশেষ কর্ত্তব্য।

আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি পুরোহিতগণ জাতিদ্বারা নির্বাচিত হন না—যোগ্যতাই একমাত্র নির্দ্দেশ। জাতিভেদের শৃঙ্খল আর্য্যগণ সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়াছেন। আর্য্যসমাজের মত শুধু মুখে বলিয়াই তাঁহারা ক্ষান্ত হন নাই—সামাজিক অনুষ্ঠান দ্বারা তাহা প্রচলিত করিবার জন্য প্রয়াস পান। দ্বিজ পদ পাইবার পূর্বে অপেক্ষাকৃত নিম্নজাতীয় ব্যক্তির তিন দিন কেবলমাত্র দুগ্ধ পান করিয়া থাকিতে হয়; নির্দ্দিষ্ট দিবসে যথাবিধি, বেদমন্ত্র পাঠ করিয়া সর্ব-সমক্ষে তাহাকে উপবীত দান করা হয়। এই প্রকার অনুষ্ঠানকে 'শুদ্ধিক্রিয়া' বলে। কেবল অপেক্ষাকৃত নিম্নজাতীয় ব্যক্তিগণকে উচ্চ পদবীতে উঠাইয়াই আর্য্যসমাজ সন্তুষ্ট নহেন; অস্পৃশ্য নিকৃষ্ট জাতিগুলিকে সমাজে স্থান দান করিতে তাঁহারা সর্বদাই তৎপর। এইরূপ নিকৃষ্ট হেয় জাতির মধ্যে আর্য্যসমাজ কার্য্য করিবার ক্ষেত্র খুবই প্রশস্ত। তাঁহারা মেথ্ বলিয়া এক অস্পৃশ্য জাতিকে শুদ্ধিক্রিয়া দ্বারা 'আর্য্য' করিয়া লইয়াছেন।

সমাজ সংস্কার।

সনাতন উৎকৃষ্ট সামাজিক আদর্শগুলিকে পুনরায় সঞ্জীবিত করিবার জন্য তাঁহারা প্রাণপণ চেষ্টা করেন। সহসা মনে হয় নারীগণের প্রতি সম্মান যেন ভারতবাসী আজকাল নূতন দিতে শিখিতেছে। কিন্তু অবরোধ প্রথা বহু প্রাচীনকালে এ দেশে ছিলনা তাহার প্রমাণ আমরা প্রাচীন সাহিত্যের বহুস্থানে দেখিতে পাই। আর্য্যসমাজ নারীগণের সেই লুপ্ত

মর্য্যাদা পুনর্জীবিত করিতে চেষ্টা করিতেছেন। অন্যান্য উন্নতিশীল ধর্ম সম্প্রদায়ের ন্যায় আর্য্যসমাজ স্ত্রী-স্বাধীনতা ও স্ত্রীশিক্ষার পতাকা হস্তে ধারণ করিয়া সকলপ্রকার প্রতিকূলতার সহিত সংগ্রামে জয়লাভ করিতেছে। আর্য্য সমাজস্থ বহুসংখ্যক নারী অধুনা জ্ঞানে বীর্য্যে মণ্ডিত হইয়া সমাজের শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছেন।

স্ত্রী স্বাধীনতা-প্রিয় আর্য্যগণ স্বভাবতই বাল্যবিবাহ ঘৃণা করেন। যথেষ্ট শিক্ষালাভের অবসর দিবার জন্য যোল বৎসরের পূর্বে কন্যার বিবাহ সমাজে নিষিদ্ধ। অপরদিকে ২৫ বৎসরের নিম্নে কোনও ব্যক্তির বিবাহ আর্য্যসমাজে মনোনীত নহে। বিভিন্ন প্রকার ব্যক্তির রুচিকে সম্মান প্রদর্শন করিয়া দয়ানন্দ বিভিন্ন প্রকার বিবাহের রীতিই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। আর্য্যসমাজের মধ্যে বিবাহের পূর্বে উভয়পক্ষের পরস্পরের সহিত দেখা করিবার রীতি প্রচলিত আছে। স্বামী বা স্ত্রীর মৃত্যুর পর কাহারও দ্বিতীয়বার বিবাহ সাধারণতঃ আর্য্যসমাজ পছন্দ করেন না।

প্রয়োজন হইলে অবস্থা বিশেষে স্বামী বা স্ত্রী বর্তমান থাকিতেও কিছুকালের জন্য অপর একজনের সহিত বাস করিতে পারা যায় এইরূপ একটী সামাজিক নিয়ম আর্য্যসমাজে আছে। 'নিয়োগ' বিধি অনুসারে এইপ্রকার কার্য্য সমাজে নিন্দিত নহে। বিধি থাকা সত্বেও কিন্তু আর্য্যদের মধ্যে এইরূপ দৃষ্টান্ত অতি বিরল।

জনহিতকর কার্য্য।

জনহিতকর কার্য্যে আর্য্যসমাজের যেরূপ উদ্যম ও উৎসাহ তাহা অতীব প্রশংসনীয়।

দুর্ভিক্ষ ভারতবর্ষের চিরন্তন ব্যাধি। দরিদ্র ভারতের অন্নাভাব সম্পূর্ণ-ভাবে মোচন করার কল্পনা বৃথা। বে-সরকারী যে সব দেশীয় অনুষ্ঠান দুর্ভিক্ষ মোচনের জন্য বিধিমতে চেষ্টা করেন আর্য্যসমাজ তাহাদিগের অগ্রণী। ১৮৯৯ সালে দুর্ভিক্ষ যখন দেশকে শূন্য করিয়া ফেলিতেছিল

তখন দেশীয়দিগের মধ্যে আর্য্যসমাজই দুর্ভিক্ষপীড়িতদিগের সাহায্যের জন্য প্রথম কর্মক্ষেত্রে অবতরণ করেন। এইরূপে ক্রমশঃ বিস্তৃতভাবে অভাব-ক্লিষ্ট ব্যক্তিদের সাহায্যের জন্য আর্য্যসমাজ বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়াছেন। বিনামূল্যে দরিদ্র ব্যক্তিদিগের চিকিৎসা ও ঔষধপ্রদান, পীড়িত অক্ষম ব্যক্তিদিগের সেবা শুশ্রূষা ও মৃতব্যক্তির সৎকারের জন্য আর্য্যসমাজে বিশেষ বিশেষ প্রতিষ্ঠান আছে। এই সকল জনহিতকর প্রতিষ্ঠানগুলির কত কত প্রয়োজন তাহা বলাই বাহুল্য। এই দিক দিয়া দেশের অভাব মোচনের জন্য আর্য্যসমাজ যাহা করিতেছেন তাহা অনুকরণীয়।

পূর্বেই বলিয়াছি অপৌত্তলিক ধর্মসম্প্রদায়গুলির মধ্যে আর্য্যসমাজ ভারতবাসীর বিশেষতঃ হিন্দু ভারতবাসীর শ্রদ্ধা অপেক্ষাকৃত অধিক লাভ করিয়াছে; তাহার কারণ আর্য্যসমাজ দেশের লোকের সহিত অধিক যোগ রক্ষা করিতে পারিয়াছে। অন্যান্য কারণের মধ্যে তাহার একটী কারণ বোধ হয় ইহা প্রাচীন নামটী ত্যাগ করে নাই। আর্য্যনামের সহিত ভারতবাসীর যেরূপ শ্রদ্ধা সম্ভ্রম জড়িত আছে তাহাতে এই নামটী রক্ষা করার জন্য হয়ত কিঞ্চিৎ পরিমাণে আর্য্যসমাজ স্বদেশবাসীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছে।

মুসলমান ধর্মসমাজ সংস্কার

উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে সমাজের অবস্থা।

মুসলমানদের রাজ্য হারাইবার কারণ কেবল রাজনৈতিক নহে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে অজ্ঞতা মূঢ়তা হিন্দু মুসলমান উভয়ের সমান ছিল। বাহিরের পৃথিবীর জ্ঞান ছিলনা বলিলেই হয়; জ্ঞানবিজ্ঞান অত্যন্ত স্থূল ও মূঢ় ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। মধ্যযুগের মুসলমানী জ্ঞানের ধারার চিহ্ন গত শতাব্দীতে আদৌ পাওয়া যায় না।

নূতন জ্ঞানের আলোতে মুসলমান সমাজ চক্ষু ফিরাইয়া তাকায় নাই। অবশেষে বাহিরের আঘাত এই সমাজকেও স্পর্শ করিল।

সৈয়দ আহমদ্ খাঁ রাজা রামমোহন রায়ের ন্যায় মুসলমান সমাজের কল্যাণের জন্য তাঁহার জীবন উৎসর্গ করেন। সিপাহী বিদ্রোহের পর তিনি বুঝিলেন যে কি মূঢ়-অন্ধতা ও সংস্কার দেশকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। ইহা বুঝিবামাত্র তিনি পাশ্চাত্য জ্ঞান ও বিজ্ঞানের কথা তাঁহার স্বধর্মাবলম্বী লোকদিগকে বলিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন এবং নানা উপায়ে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন যে পশ্চিমের জ্ঞানালোক ছাড়া এ দেশের মুক্তি নাই। ১৮৬৯ সালে তিনি ইংলণ্ডে তাঁহার পুত্রকে লইয়া গমন করেন ও প্রায় দেড় বৎসর কাল সেখানে বাস করিয়া সেখানকার বিদ্যাপীঠগুলি বিশেষভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আসেন। দেশে আসিয়া তিনি সমাজ সংস্কারের জন্য ত হ জ ই ব্ উল্ অ খ লা ক্ নামে এক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকায় মুসলমান ও য়ুরোপীয়দের একত্র ভোজন বিষয়ে (অখাদ্য কিছু না থাকিলে) ও মুসলমানদের সামাজিক রক্ষণশীলতা বিষয়ে লিখিতে লাগিলেন। মুসলমানেরা তাঁহাকে একঘরে করিয়া সমাজচ্যুত করিল এবং তাঁহাকে হত্যা করিবে বলিয়াও ভয় দেখাইল।

সৈয়দ আহমদ খাঁর সমাজ সংস্কার কার্য্য।

তাঁহার শ্রেষ্ঠ কাজ হইল আলিগড়ের কলেজ স্থাপন। এখানে ছাত্রগণকে বিলাতের অক্সফোর্ড, কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায় মানুষ করিতে হইবে ইহা হইল তাঁহার উদ্দেশ্য। মুসলমান ধর্মের সমস্তই এখানে শিখাইবার ব্যবস্থা হইল। একজন জ্ঞানী বিচক্ষণ মৌলবী বিদ্যার্থীগণের ধর্মনীতি শিক্ষার জন্য নিযুক্ত আছেন। শিয়া সুন্নী মুসলমানদের ধর্মশিক্ষার পৃথক ব্যবস্থা আছে। প্রতিদিন বিদ্যালয়ের আরম্ভের

আলিগড় কলেজ-স্থাপন।

পূর্বে ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া হয়। কলেজের মসজিদে ছাত্রেরা উপস্থিত থাকিতে বাধ্য এবং রমজানের সময়ে উপবাস করিবার জন্য বলা হয়। এখানকার শিক্ষার ফলে ছাত্রেরা বৈদেশিক ভাব যথেষ্ট পরিমাণে পাইতেছে।

মুসলমান শিক্ষা সমিতি।

১৮৮৬ সালে সৈয়দ আহমদ মুসলমান শিক্ষার কনফারেন্স স্থাপন করেন। ইহার অধিবেশন প্রতি বৎসর এক এক সহরে হয়। গত কয়েক বৎসর হইতে মুসলমান মহিলাদেরও একটি অনুরূপ এই সভা হইতেছে।

ধর্ম সংস্কার।

মুসলমান ধর্ম সংস্কারে সৈয়দ পশ্চাৎপদ হন নাই। মহম্মদের ধর্ম মতকে দেশ ও কালোপযোগী করা ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য। দেশোপযোগী অনেক মত ও বিধান কোরাণের সহিত আছে; সেগুলির সহিত বর্তমানের জ্ঞান বিজ্ঞানকে খাপ খাওয়াইয়া না লইতে পারিলে মুসলমান ধর্ম দুর্বল হইয়া পড়িবে। তিনি খৃষ্টিয় ধর্ম গ্রন্থের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা দেখাইতেন এবং কোরাণ ও বাইবেল উভয় গ্রন্থে মানবীয় ও দৈবভাব উভয়ের সমাবেশ হইয়াছে মনে করিতেন। তিনি যুক্তিবাদী ছিলেন এবং যুক্তির সূক্ষ্ম পথ দিয়া ধর্মকে বিচার করিয়া লইতেন। সৈয়দ গভর্ণমেণ্টের দ্বারা স্যর উপাধিতে ভূষিত হন ও বড়লাটের সভায় সদস্য মনোনীত হন।

তাঁহার যুক্তিবাদ বর্তমানে মৌলবী চিরাগ আলি ও আমীর আলি সাহেব দেশময় প্রচার করিতেছেন। ষষ্ঠ শতাব্দীর ইসলাম ধর্ম উনবিংশ বা বিংশ শতাব্দীতে ভারতের পরিবর্তিত রাজনৈতিক ও সমাজিক অবস্থার সহিত কোনো প্রকারে মিলিত হইতে পারে না। সেইজন্য আমীর আলি সাহেব 'ইসলামের ভাব' বলিয়া পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন।

আলিগড় ও তদ্দেশীয় মুসলমানসমাজ ও বহু শিক্ষিত মুসলমান

তাঁহাদের ধর্মকে নূতন করিয়া পাইতেছেন ও নূতনভাবে বর্তমানের উপযোগী করিয়া প্রচার করিতেছেন। কিন্তু এই উদার নীতি সাধারণ অশিক্ষিত মুসলমানে গ্রহণ করে নাই এবং ইহার বিরুদ্ধে ঘোর প্রতিক্রিয়া চলিতেছে।

পার্সীধর্ম

রাজা রামমোহন রায় প্রমুখ ব্রাহ্মসমাজের নেতৃগণ যেরূপ ভাবে হিন্দুধর্ম ও সমাজকে শোধন করিয়া বিশ্বমানবের ধর্মরূপে প্রচার করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহার কথা আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি। এইরূপ ভাবের সংস্কার পার্সী ও মুসলমানদের মধ্যেও গত শতাব্দীর মধ্যভাগে দেখা যায়।

বৈদিক আর্য্যদের সহিত ইরাণী-দের মতভেদ ও বিচ্ছেদ।

পার্সীদের সহিত বৈদিক আর্য্যদের খুব যোগছিল; বৈদিক ভাষা ও পার্সীদের আবেস্তার ভাষার সহিত যথেষ্ট মিল আছে। উভয়ের দেবতাদের মধ্যে নামের ও স্বভাবের সাদৃশ্য দেখা যায়। এককালে এই উভয় শাখা একত্র বাস করিতেন, তারপর ধর্ম সম্বন্ধীয় মতদ্বৈত হওয়ায় ইঁহারা পৃথক্ হন। পারসীকদের প্রধান দেবতা অহুরমজ্‌দ। বিরোধী হিন্দু-আর্য্যেরা এই অসুরকে ঘৃণা করিতেন। সোমরস বৈদিক লোকেরা মাদক রসে পরিণত করিয়া পান করিতেন; পারসীকেরা ইহার ঘোর বিরোধী ছিলেন। এইরূপ মতভেদের ফলে তাঁহারা পৃথক্ হইলেন। পারসীকেরা আর একটি জিনিষকে স্বীকার করিতেন; সেটী হইতেছে অহুর মজদ ব্যতীত আর একটী দুষ্ট শক্তির অস্তিত্ব; তাহাকে তাঁহারা 'অহ্রিমণ' বলিতেন। এই সয়তানকে হিন্দুরা কখনো স্বীকার করেন না—বুদ্ধদেবের 'মার' কেহ কেহ মনে করেন

এই পারসীক সয়তানের রূপান্তর। ৭ম খৃষ্ট পূর্ব শতাব্দীতে জরথুস্থ্র নামে জনৈক ঋষি পার্সী ধর্ম সংস্কার করিয়া নূতনভাবে প্রচার করেন; সেইজন্য পার্সীদের ধর্মকে জোরায়াষ্টারের ধর্ম বলে। আদিম পারসীরা পারস্থে বাস করিত বলিয়া তাহারা ইতিহাসে পারসিক নামে খ্যাত। মুসলমানদের দ্বারা পরাভূত হইলে অধিকাংশ পারসী ইস্লাম ধর্ম অবলম্বন করে। যাহারা স্বধর্ম ত্যাগ করে নাই, তাহারা ৭১৭ খৃষ্টাব্দে ভারতের গুজরাট অঞ্চলে আশ্রয়ের জন্য উপস্থিত হয়। সেই অবধি পার্সীরা ভারতের লোক—ভারতের সুখ দুঃখের সহিত তাহাদের সম্বন্ধ জড়িত।

পারসীকদের ভারতে আগমন।

উনবিংশশতাব্দীর প্রথমভাগে পার্সীদের অবস্থা হিন্দুদের অপেক্ষা কোনো অংশে ভাল ছিল না। হিন্দুদের মধ্যে বহুশতাব্দী বাস করিয়া পার্সীদের ভিতর ক্রমে ক্রমে নারী অবরোধ, শিশুবিবাহ, বহুবিবাহ, প্রভৃতি প্রথা প্রচলিত হইতে আরম্ভ করে। হিন্দু পূজা পার্বন মানিয়া ও বংশানুগতিক পৌরহিত্য স্বীকার করিয়া পার্সীরা প্রাচীন ধর্ম ধ্বংস করিতে বসিয়াছিল। অনেকে আবেস্তার (ইহাদের প্রাচীন ধর্ম গ্রন্থ) শ্লোক মুখস্ত করিত কিন্তু তাহার অর্থ অধিকাংশেই জানিত না।

ইতিমধ্যে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও খৃষ্টান আক্রমণ সমভাবে ভারতের সুপ্ত মনকে জাগাইয়া তুলিল; ১৮৪৯ অব্দে পার্সীদের ছেলেমেয়েদের জন্য প্রথম বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ইহার দুইবৎসর পরে রহনুমৈ কজ্‌দয়স্নন্‌ সভা বা ধর্ম সংস্কার সভা প্রতিষ্ঠিত হয়;—দাদাভাই নোরজী তখন যুবক, তিনি, ওয়াচা, প্রভৃতি শিক্ষিত পারসীকেরা ইহার উদ্‌যোক্তা। রস্ত্‌ গোফাটার্‌ নামে একখানি সাপ্তাহিক কাগজ প্রকাশ করিয়া তাহাতে সংস্কারের কথা, উদারনীতির কথা আলোচনা

সংস্কার ও সংরক্ষণ।

আরম্ভ করিলেন। বক্তৃতা করিয়া, সভা আহ্বান করিয়া, সাহিত্য প্রচার করিয়া তাঁহারা পার্সী সমাজকে ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিলেন। গোঁড়া পার্সীরা খুবই প্রতিবাদ করিল—কিন্তু এ সত্ত্বেও উহাদের কাজ ভালই চলিয়াছে।

অবেস্তা আলোচনা।

পার্সীদের ধর্ম-পুস্তক আবেস্তা য়ুরোপে বহুকাল হইতে অধীত হইতেছে। কিন্তু এই সমাজের লোকেরা তেমন করিয়া অধ্যয়ন কখনো করে নাই। কামা নামক জনৈক পার্সী সর্বপ্রথম য়ুরোপে গিয়া আবেস্তা অধ্যয়ন করেন। দেশে আসিয়া তিনি বৈজ্ঞানিক ভাবে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের সাহায্যে আবেস্তা অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। তাঁহার ছাত্রদের মধ্যে ভরুচা, অঙ্কেলে সরিয়া, কংগা বিখ্যাত।

ইতিমধ্যে ইংরাজী শিক্ষা প্রচারের সহিত ইংরাজী ভাষাও পারসীকদের মধ্যে প্রবেশ লাভ করে। তাহার ফলে এই সমাজের মধ্যে বৈদেশিক হাবভাব ও আদর্শ এমনিভাবে প্রবেশ করিয়াছে যে পার্সীরা প্রাচীনের ভালটুকু হইতেও অনেক দূরে পড়িয়াছে। ব্যবসায় ও বাণিজ্যে তাহাদের মনকে এমনভাবে গ্রাস করিয়াছে যে ধর্ম ও আধ্যাত্মিক জীবন ব্যবহারিক জীবন ইহতে অনেক পিছাইয়া গিয়াছে।

বর্তমান আন্দোলন।

পারসীকদের মধ্যে বি, এম, মালাবারীর নাম ভারতের সর্বত্র পরিচিত। তিনি ভারতের নারীজাতির উন্নতির জন্য তাঁহার সকল শক্তি নিয়োজিত করিয়াছিলেন। কয়েক বৎসর পূর্বে দহলা নামে একজন পুরোহিত য়ুরোপ ও আমেরিকায় পার্সীধর্ম ও ভাষা অধ্যয়ন করিয়া আসিয়া কার্যে লিপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার পার্সী-দার্শনিক পুস্তক বিদেশেও আদৃত হইয়াছে। তিনি জরথুস্ত্রের বিশ্বাসীগণের এক কন্‌ফারেন্স স্থাপন করিয়াছেন। ১৯১০ সনে ইহার প্রথম অধিবেশনে রক্ষণশীল ও উদার দলের

মধ্যে ভীষণ অশান্তি হয়। ইহার পরের সভাগুলিতে উভয় দলের উষ্ণতা কমিয়া আসিয়াছে দেখাযায়। এই সব সভায় কতকগুলি প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং ইহার অনেকগুলি কৃতকার্য্যতার সহিত কার্য্যে পরিণত হইতেছে। প্রস্তাব—১ পার্সীধর্ম্ম প্রচার, ২ পঞ্জিকা সংস্কার, ৩ পার্সী পুরোহিতদের শিক্ষা, ৪ শিল্প ও টেক্‌নিক্যাল শিক্ষা, ৫ ৩৫ জন ডাক্তারকে দিয়া বিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েদের শরীর পরীক্ষা, ৬ দরিদ্র সেবা, ৭ দুগ্ধশালা স্থাপন, ৮ কৃষির ব্যবস্থা।

এই উদার পন্থীদের মধ্যে ডাঃ দহলা, স্যর মেহ্‌টা, স্যর দিন্‌শ পেটিট্‌, বিখ্যাত তাতা পরিবার, ডাঃ কাট্রকের নাম উল্লেখ যোগ্য।

শিবনারায়ণ পরমহংস

শিবনারায়ণ পরমহংস ১৮৪০ সালে কাশীধামে জন্মগ্রহণ করেন। শিক্ষা বলিতে আমরা যাহা বুঝি তাহা তিনি কখনো পান নাই; তবে নিজের আধ্যাত্মিক শক্তির বলে তিনি যে শিক্ষা দিয়াছেন তাহা অনেকে অনুসরণ করিতেছে। বারবছর বয়সে তিনি গৃহত্যাগী হন ও দেশ ভ্রমণ কালে প্রথম কয়েকবৎসর কেবল জিজ্ঞাসু ভাবে কাটান; পরে কেহ তাঁহার কাছে আসিলে তাঁহার ধর্মমত ব্যক্ত করিতেন। কলিকাতার বিখ্যাত এটর্ণী বাবু মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় শিবনারায়ণ পরমহংসের প্রধান শিষ্য। ১৮৮৮ সালে তাঁহার সহিত মোহিনী বাবুর প্রথম পরিচয়। তিনি তাঁহার উপদেশাদি লিপিবদ্ধ করিয়া বাংলায় 'অমৃত সাগর' নামে এক গ্রন্থাকারে মুদ্রিত করেন। ১৯০৭ সালে ইংরাজীতেও একখানি বই লিখিয়া বিলাতে ছাপাইয়াছিলেন।

পরমহংসের শিষ্যের মধ্যে সাধারণ লোকই অধিক। তিনি কোনো ধর্ম সম্প্রদায় স্থাপন করিতে নিষেধ করেন, তবে বাংলাদেশের ও বিশেষত কলিকাতায়

শিবনারায়ণের ধর্মমত।

নানাস্থানে তাঁহার ভক্ত শিষ্য অনেক আছে। তিনি বলেন ঈশ্বর জ্যোতিতে প্রকাশিত এবং তাঁহার ইচ্ছা সর্ব বিষয়ে প্রবল। দয়ানন্দের ন্যায় তিনি হোম ও যাগে বিশ্বাস করিতেন এবং তাঁহার শিষ্যেরা এগুলি যথারীতি পালন করেন। তিনি দয়ানন্দের ন্যায় প্রতিমা পূজার ঘোর বিরোধী; তাঁহার মতে দেবদেবী পূজার ফলে কেবল যে ব্যক্তি বিশেষের পতন হয় তাহা নয় প্রতিমা পূজক জাতিরও সর্বনাশ হয়। মনুষ্য পূজা বা অবতারাদি তিনি মানিতেন না। সামাজিক দিকে তাঁহার মত খুব উদার। তিনি জাতি ভেদ, বাল্যবিবাহাদির ঘোর বিরোধী ছিলেন এবং নারীশিক্ষার সমর্থন করিয়া বলিতেন যে পুরুষ ও স্ত্রীর প্রতি সমান ব্যবহার প্রয়োজন। জন্মান্তরাদির সহিত মুক্তি বা আধ্যাত্মিক জীবনের কোন সম্বন্ধ আছে বলিয়া তিনি স্বীকার করিতেন না। তিনি বলিতেন যে পৃথিবীতে একটি ভাষা হউক ও সর্ব্বশাস্ত্র হইতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট মত সংগ্রহ করিয়া নূতন ধর্মগ্রন্থ প্রণীত করা হউক।

সামাজিক মত।

শিবনারায়ণ পরমহংস দেশ পর্য্যটন করিয়া বেড়াইতেন বলিয়া তাঁহার প্রভাব বহুদূর পর্য্যন্ত অনুভূত হইয়াছিল। বিহারের দক্ষিণে 'ঈশামশি পন্থি' নামে একটি সম্প্রদায় আছে। তাহাদের অধিকাংশই মুচি। ইহারা ছাড়া কতকগুলি শিক্ষিত সাধু এই মতাবলম্বী। তাহারা খৃষ্ট ও কৃষ্ণের জীবনী মিলাইয়া বিশ্বাস করে এবং বাইবেল পাঠ করে। প্রতি শুক্রবার তাহারা একত্র হইয়া উপাসনা করে। শোনা যায় শিবনারায়ণ পরমহংসের এক শিষ্যই এই মত প্রবর্ত্তিত করেন।

ধর্মবিস্তার।

আসামের কাছাড়ীদের মধ্যে 'মেথ্' নামে একটি জাতি আছে। শিবনারায়ণের মৃত্যুর কিছুদিন পরে কালীচরণ নামে তাঁহার এক শিষ্য কলিকাতা হইতে

কাছাড় বরমো সম্প্রদায়।

পরমহংসদেবের উপদেশাদি সংগ্রহ করিয়া সার নিত্যক্রিয়া নাম দিয়া মুদ্রিত করেন ও কাছাড়ে লইয়া গিয়া প্রচার করেন; তিনি সেখানে গিয়া বলেন এই পথে চলিলে তাহারা 'ব্রাহ্ম' হইবে (মেঘ উচ্চারণে বরমো বলে)। এই 'বরমো'গণ আপনাদিগকে পৃথক জাতি বলিয়া অভিহিত করিতেছে। ইহাদের কোনো মন্দির নাই এবং প্রকৃতির পূজা করিয়া তাহার উদ্দেশ্যে ফলমূল নিবেদন করে ও গন্ধদ্রব্যাদি পোড়ায়।

কালীচরণ ইহাদের নেতা এবং তিনি পরমহংসের শিষ্যগণ কর্ত্তৃক প্রকাশিত পুস্তকাদি প্রচার কল্পে ব্যবহার করিয়া থাকেন। বর্ত্তমানে 'মেথ্'দের আর্থিক উন্নতির জন্য তিনি চেষ্টা করিতেছেন।

আহমদীয় ধর্মমত

পঞ্জাবে খৃষ্টান ধর্ম ও আর্য্য সমাজের প্রভাবের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া-রূপে এই ধর্মমত দেখা দেয়। খৃষ্টান, মুসলমান ও হিন্দু এই তিন ধর্মকে সমন্বয়ের আদর্শ লইয়া এই নূতন মত প্রচারিত হইয়াছে।

পঞ্জাবের গুরুদাসপুর জেলায় কাদিআন গ্রামে এক প্রাচীন সুফী পরিবারে মির্জ্জা গুলাম আহমদের জন্ম। তাঁহার শিক্ষাদীক্ষা সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না। তিনি তাঁহার প্রচার কার্য্য ১৮৬৯ সালে আরম্ভ করেন; তাঁহার মৃত্যু হয় ১৯০৮ সালে।

আহমদ বলেন, "আমি খৃষ্টীয় সমাজের প্রতিশ্রুত পরিত্রাতা (মেসায়া) মুসলমান সমাজের মাহদি ও হিন্দুদের শেষ অবতার কলি। আমার আবির্ভাব কেবল মুসলমান ধর্ম সংস্কারের জন্য নহে, কিন্তু সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের ইচ্ছায় হিন্দু মুসলমান ও খৃষ্টান—এই তিন মহাধর্মের উদ্ধার আমারই দ্বারা সাধিত হইবে। আমি খৃষ্টান ও মুসলমানদের প্রতিশ্রুত মেসায়া ও হিন্দুদের অবতার।" আহমদের মতানুসারে যীশু ক্রুশে দেহত্যাগ

করেন নাই ; কয়েকঘণ্টা মাত্র ক্রুসে থাকিবার পর তাঁহাকে নামাইয়া ঔষধাদি প্রয়োগ করিলে তিনি চল্লিশ দিনের পরে আরোগ্য লাভ করেন ও সেখান হইতে ভারতে আসিয়া বাস করেন। কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগরের নিকটে যুস্ আসফ্ নামে কোনো মুসলমানী কবর আছে। আহমদীয় মতে 'যুস্' যীশু শব্দের অপ্রভ্রংশ ও অসাফ্ অর্থে সংগ্রহীতা। এই কবর যীশুরই কবর। তিনি কোরাণ, বাইবেল প্রভৃতি হইতে ইহাই প্রমাণ করিতে চান যে তাঁহার আবির্ভাবের সময়, তাঁহার জীবনের ঘটনাবলী সবই শাস্ত্রমত। যীশুর জীবনের সহিত তাঁহার জীবনীর সৌসাদৃশ্য আছে ; ভারতের সহিত ইহুদীদের আবস্থার মিল আছে—ইহুদীরা রোমানদের অধীন, ভারতও ইংরাজদের অধিকারভুক্ত ; ইহাদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনও তৎকালীন রোমানদের তুল্য। এই সব দেখাইয়া তিনি বলেন যে খৃষ্টের মিসন তিনি পূর্ণ করিতে আসিয়াছেন।

তাঁহার বিশ্বাস ছিল তিনি খৃষ্টের ন্যায় অলৌকিক ঘটনার দ্বারা ভবিষ্যৎ বলিতে পারেন। শোনা যায় তিনি আর্য্যসমাজের পণ্ডিত লেখ্ রামের মৃত্যুর কথা ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন। লেখরাম খুন হন এবং অনেকের সন্দেহ হয় যে একজন মুসলমান জিজ্ঞাসুভাবে পণ্ডিতের সহিত সখ্যতা স্থাপন করেন—ইহা তাহার কর্ম। কিছুদিন ধরিয়া আহমদের এইরূপ ভবিষ্যদ্বাণী বলিতে লাগিল, কিন্তু তাঁহার বাণী বিশেষ ভাবে কার্য্যকারী হয় নাই। অবশেষে ১৮৯৯ সালে পঞ্জাব সরকার আহমদকে এই শ্রেণীর ভবিষ্যদবাণী, ও অপরের সম্বন্ধীয় কোনো প্রকার মন্তব্য প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া দেন। ১৮৯৮ সালে তিনি প্লেগের এক প্রকার দৈব ঔষধ প্রচার করিলেন। সরকার বুদ্ধি করিয়া সেবারও তাঁহাকে বাধা দিলেন। আহমদ স্বয়ং ১৯০৮ সালে কলেরা রোগে মারা পড়েন।

আহ্মদ তাঁহার জীবনের শেষভাগে প্রচার করিতে আরম্ভ করেন

তিনি খৃষ্টের চেয়ে বড়। খৃষ্টের চরিত্র সম্বন্ধে তিনি নানাপ্রকার কটু উক্তি করেন। আহমদের সম্প্রদায়ের প্রধান কেন্দ্র কাদিআনে। তাঁহার কৃতকার্য্যতার কারণ তিনি খুব জবরদস্ত লোক ছিলেন—চারিদিক গুছাইয়া ব্যবস্থা করিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল। আহ্মদ্কে ঠিক বুজরুক বলা যায় না, তিনি আত্মসম্মোহিত হইয়া এই প্রকার বালকোচিত কর্ম করিয়াছিলেন। তিনি 'আল্হকম্' নামে একখানি পত্রিকা দেশীয় ভাষায় ও ইংরাজীতে "রিভিউ অব্ রিলিজন্" নামে পত্রিকা, ও বহু পুস্তিকা, পত্র, আবেদনাদি প্রকাশ করেন। গোঁড়া মুসলমানেরা এই ধর্মকে খুবই নিন্দা করে এবং তাহাদের সহিত কোনো সম্বন্ধ নাই বলিয়া ঘোষণা করেন।

আহমদের শিষ্য হাকিম নূর-উদ্দীন্ আহমদের ন্যায় মোটেই যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন না। তাঁহার মৃত্যুতে এই সমাজ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। দাক্ষিণাত্যের শোরাপুর নামে এক স্থানে এই সমাজের একটি শাখা ছিল; সেখানকার নেতা অব্দল্লা আপনাকে গুরু বলিয়া প্রচার করিতেছেন।

বিলাতে এই সম্প্রদায়ের একটি মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পূর্বে যেখানে মুসলমানের মস্জিদ্ ছিল তাহারই নিকটে খোদা কমল্ উদ্দীন তাঁহার প্রচার আলয় খুলিয়াছেন। লর্ড হেড্লে নামক জনৈক ইংরাজ আহমদীয় সম্প্রদায়ে প্রবেশ করাতে ইহাদের উৎসাহ খুব বাড়িয়াছে এবং দিল্লী হইতে দুইজন মৌলবী সেখানে প্রেরিত হইয়াছেন।

রাধাসোয়ামী সৎসঙ্গ

যুক্ত প্রদেশে কিছুকাল হইতে লোক চক্ষুর অন্তরালে একটি ধর্মমত ধীরে ধীরে প্রচার ও প্রসারলাভ করিতেছে। রাধাসোয়ামি সৎসঙ্গ

বাহিরের প্রচারে বিশ্বাস করেন না বলিয়া কখনো তাঁহারা সাধারণের নিকট আপনাদের মত মুদ্রিত পুস্তক ছাড়া প্রকাশ করেন না। এইখানে সৎসঙ্গ প্রাচীন ভারতের হিন্দুভাব পূর্ণমাত্রায় বজায় রাখিয়াছেন। কেন না কোনো সামজিক বা নৈতিক আন্দোলনে কখনো তাঁহাদের সহানুভূতি পাওয়া যায় নাই, রাজনীতির সহিতও ইহাদের কোনা যোগ নাই। ইহারা একেশ্বরপূজক, প্রতিমার বিরোধী; কিন্তু গুরুকে দেবতা বলিয়া সম্পূর্ণ-রূপে মানে।

আগ্রার জনৈক সরকারী কর্মচারী এই মতের প্রবর্ত্তক; তাঁহার নাম শিবদয়াল সিংহ। ইনি বহুকাল আপন মনে ঈশ্বর ও আধ্যাত্মিক জীবন সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া ১৮৬১ সালে আবিষ্কার করিলেন যে তিনি ভগবানের অবতার। আদি পরমেশ্বরের নাম কি তাহা তিনি জানিতে পারিলেন এবং কিছুকালের মধ্যে কয়েকজন শিষ্য সংগ্রহ করিয়া বুঝাইলেন তিনি মানবদেহে ভগবান্। তাঁহাকে শিষ্যেরা রাধাসোয়ামি দয়াল ও সোয়ামিজি মহারাজ বলিয়া থাকেন। ১৮৭৮ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়। হিন্দিতে দুইখানি বই (একখানি গদ্যে) তিনি লিখিয়া গিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় গুরুর নাম শালিগ্রাম সাহেব। ১৮২৮ সালে এক কায়স্থ পরিবারে ইহার জন্ম এবং শিক্ষা ও চেষ্টাগুণে ক্রমে সংযুক্ত প্রদেশের পোষ্ট-মাষ্টার জেনারেল পদে নিযুক্ত হন। সিপাহী বিদ্রোহের সময়কালের হত্যাকাণ্ড ও নৃশংসতা দেখিয়া তাঁহার মন পার্থিব ব্যাপারে বিরত হইয়া যায়। তিনি বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন ও অনেক সাধু সন্ন্যাসীর সঙ্গলাভ করিয়াও উপকৃত হইলেন না। এমন সময়ে তিনি শিবদয়ালের সন্ধান পাইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ১৮৭৮ সাল হইতে ১৮৯৮ সাল পর্য্যন্ত তিনি গুরু ছিলেন। হিন্দিতে 'প্রেম বাণী', 'প্রেম পত্র' ও ইংরাজিতে 'রাধা সোয়ামি মত প্রকাশ' ও এ ছাড়া হিন্দি ও উর্দ্দুতে অনেক

নিবন্ধ প্রকাশিত করেন। শালীগ্রাম সাহেব ধর্মের মধ্যে তত্ত্ব আনিয়া তাহাকে দার্শনিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেন। শালীগ্রাম সাহেবের মৃত্যুর পর সৎসঙ্গের গুরু হন ব্রহ্মশঙ্কর মিশ্র। ইনি বাঙালী ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম এ। ১৮৮৫ সালে ব্রহ্মশঙ্কর সৎসঙ্গে যোগদান করেন এবং ১৮৯৮ সালে ইহার গুরু হন। ইনি রাধা সোয়ামি মতকে বৈজ্ঞানিক ধর্ম বলিয়া প্রচার করিবার জন্য প্রয়াসী হন এবং পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের পরিভাষা দিয়া তিনি সৎসঙ্গের মতকে ব্যাখ্যা আরম্ভ করেন। সম্প্রদায়ের লোকেরা বিশ্বাস করেন যে গুরুরা যাহা লিখিয়াছেন তাহা পরমেশ্বরের বাণী। ১৯০৭ সালে ব্রহ্মশঙ্করের মৃত্যুর পর মাধবপ্রসাদ সৎসঙ্গের নেতা। তবে ইহাকে তাঁহারা পূর্ণ অবতার বলেন না। মাধবপ্রসাদের কর্মকেন্দ্র এলাহা-বাদে ছিল। সেখানে তিনি অ্যাকাউণ্টেণ্ট জেনারেল অফিসের প্রধান সুপারিণ্টেডেণ্ট ছিলেন। রাধাসোয়ামি মতের প্রধান কেন্দ্র আগ্রা। যুক্ত-প্রদেশে প্রায় লক্ষ লোক এই মতের পোষক। তাঁহাদের মতে পরমাত্মা সর্বশক্তির মূল ; জীবাত্মা তাহার অংশ। ঈশ্বর শক্তি স্বরূপ, শক্তির শব্দ শোনা যায়। এই নূতন ধর্মের গুরুগণ সেই শব্দ শুনিতে পান। রাধা এই শব্দের মধ্যে সেই অনাহত বাণী শোনা যায়। সেইজন্য রাধাসোয়ামিই পরমেশ্বরের নাম। সৎসঙ্গের লোকেরা এই শব্দ অভ্যাসের দ্বারায় শুনিতে পান। তাঁহাদের মতে বিশ্বে তিনটি লোক আছে। প্রথম লোক বা আত্মালোক সেখানে রাধা সোয়ামি বাস করেন ; দ্বিতীয় লোক 'ব্রহ্মাণ্ড' ইহা আত্মা ও বস্তু উভয়ের সমাবেশে সৃষ্ট, তৃতীয় লোক বস্তু ও আত্মার লোক—মানুষ এই লোকের অধিবাসী। এই তিনটি লোকের প্রত্যেকটি ছয়টি করিয়া ভাগে বিভক্ত। যোগশাস্ত্র অনুসারে ইঁহারা মানুষের আধ্যাত্মিক জীবনকে ভাগ করিয়াছেন। আধ্যাত্মিক জীবন লাভের প্রধান উপায় নৈতিক জীবনলাভ ও সকল

প্রকার উষ্ণ খাদ্য সেইজন্য নিষিদ্ধ। উত্তেজক ক্রিয়া কর্মের মধ্যে প্রবেশ প্রশংসনীয় নহে। গুরুর প্রতি অচলা ভক্তি ও বিশ্বাস ব্যতীত উদ্ধার নাই কারণ এই গুরুই পরমেশ্বর বা রাধাসোয়ামির মূর্ত্তি। তিনটি উপায়ে আত্মা মুক্তিলাভ করিতে পারে যথা (১) নাম উচ্চারণ (২) ধ্যান—এ ক্ষেত্রে গুরুদের ফটো পূজা করাই প্রচলিত, (৩) রা-ধা এই শব্দ মনোযোগ পূর্ব্বক শুনিবার চেষ্টা।

রাধাসোয়ামি মতের কেন্দ্র আগ্রা এলাহাবাদ ও কাশী। ইহাদের মন্দিরে কোনো দেবদেবীর মূর্ত্তি থাকে না, কেবল প্রথম তিন জন গুরুর চিত্র মন্দিরে আছে। গ্যালারীর একদিকে বেদী; এই বেদীর তলদেশে গুরুদের চিতাভস্ম প্রোথিত। প্রতিদিন দুইবার সকালে ও সন্ধ্যায় শিষ্যগণ মন্দিরে মিলিত হইয়া উপাসনা করেন। ইঁহারা গুরুদের লেখা পাঠ করেন। তাহাদেরই কোলের সঙ্গীত গান করেন। গুরুর প্রতি ইহাদের ভক্তি অগাধ। সেইজন্য গুরুর উচ্ছিষ্ট ও প্রসাদ আহার করিতে, চরণোদক পান করিতে তাহাদের কোনও আপত্তি নাই। এই সব অধিকার সকলের নাই—যাহারা অন্তরঙ্গ তাহারাই পারে। সৎসঙ্গ সমাজ সংস্কারের জন্য আদৌ ব্যস্ত নহেন; তাঁহাদের মত আপনি ভাল না হইলে জাতিকে উদ্ধার করা যায় না। সেইজন্য কোনো সামাজিক প্রশ্ন লইয়া তাঁহারা ব্যস্ত নহেন। শান্তভাবে জীবন যাপন করা ইহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য।

গতবৎসর আগ্রায় রাধাসোয়ামি সম্প্রদায় শিক্ষা প্রচার কল্পে এক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন।

দেব সমাজ

শিবনারায়ণ অগ্নিহোত্রী উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লোক। রুরকির

ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের ওভারসীয়ারের কাজে পাশ করিয়া তিনি ধর্ম ও সমাজ সংস্কারে প্রবৃত্ত হন। ১৮৭৩ সালে ২৩ বৎসর বয়সে তিনি যখন লাহোরের সরকারী স্কুলের ড্রয়িং শিক্ষকের কাজ করেন ব্রাহ্মসমাজের উদার মত তাঁহার মনকে স্পর্শ করে। দুই বৎসর পরে তিনি স্থানীয় সমাজের সম্পাদক নিযুক্ত হন ও অল্প দিনের মধ্যে তাঁহার চরিত্র ও বাগ্মীতার জন্য বিখ্যাত হন। অগ্নিহোত্রী আর্য্যসমাজের ভীষণ শত্রু ছিলেন—বেদের প্রতি আর্য্য সমাজের অন্ধ বিশ্বাস ও ভক্তিকে তিনি শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন না। ১৮৮০ সালে কলিকাতায় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের স্থাপনসময়ে তিনি উপস্থিত হন; এবং সেই সময়ে তিনি ও আর তিনজন লোক এই নূতন সমাজের প্রচারক-রূপে দীক্ষিত হন। পঞ্জাবে ফিরিয়া গিয়া অগ্নিহোত্রী ভীষণ উৎসাহের সহিত কাজ আরম্ভ করিলেন। তিনি সমাজের কোনো বিধি নিষেধ মানিবার পাত্র ছিলেন না; তাঁহার অদম্য ইচ্ছাকে দমন করিবার শক্তি কাহার ছিল না। সেইজন্য ব্রাহ্মসমাজের শান্তিপ্রিয় লোকদের ইহা সহ্য হইল না,

প্রতিষ্ঠাতার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

অগ্নিহোত্রীও দেখিলেন পাঁচজনের নিয়ম নিষেধে তাঁহার কাজ করা অসম্ভব। সুতরাং তিনি পৃথক হইয়া নূতন সমাজ স্থাপন করিলেন। ১৮৮৭ সালে এই দেব-সমাজ স্থাপিত হয়। তিনি ইহাকে প্রেরিত দৈব ধর্ম বলিয়া ও নিজেকে ইহার গুরু বলিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন; তবে ব্রাহ্ম ধর্মের মূল সত্যের সহিত ইহার যোগ ছিল। ১৮৯০ সালে অগ্নিহোত্রী একটা জটিল মোকর্দমায় জড়িত হইয়া পড়েন পাঁচবৎসর ইহার জের চলিতে থাকে। এই ঘটনার পর ১৮৯৮ সালে তিনি দেব-সমাজকে নিরীশ্বরবাদ সমাজ বলিয়া ঘোষণা করেন; ইহার উদ্দেশ্য শিক্ষা ও নীতির উন্নতি। তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহাকে মনুষ্য-অভিব্যক্তির চরম বলিয়া

ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ ও নূতন সমাজ স্থাপন।

সমাজে অবতার বাদ।

বিবেচনা করেন ও দেবতার ন্যায় পূজা করেন। শিষ্যেরা তাঁহাকে সত্যদেব বলে। নূতন মত প্রচারিত হইলে পূর্বের দেবসমাজীয় শাস্ত্র ও পুস্তিকা বিক্রয় বন্ধ করিয়া নূতন মতকে সমাজের ধর্ম বলিয়া তাঁহারা প্রকাশ করেন। ইঁহারা জড় ও শক্তিকে মানেন এবং বলেন সমগ্র বিশ্ব চারি লোকে বিভক্ত

ধর্মমত।

অজীব, উদ্ভিদ, প্রাণী ও মনুষ্য। ঠিকমত অভিব্যক্তির পথে চলিতে পারিলে মানব আত্মার উন্নতি ও কল্যাণ, নচেৎ তাহার পতন, অবশ্যম্ভাবী। সৎকর্ম উন্নতির ও অসৎ কর্ম, অধোগতির কারণ। কিছু দূর উঠিতে পারিলে আত্মার পতনের ভয় থাকে না। দেবগুরু সেইস্থানে উঠিয়াছেন—তিনি অভিব্যক্তির চরম পুরুষ। দেব-সমাজের সভ্য হইতে যাহারা ইচ্ছুক তাহাদিগকে কতকগুলি নৈতিক নিয়ম মানিয়া চলিতে হয় মাত্র—ঈশ্বর, জন্মান্তরবাদ প্রভৃতি কিছুই মানিতে হয় না।

অগ্নিহোত্রী দেবগুরু কচিৎ সমাজ-মন্দিরে উপস্থিত হন। তাঁহার চিত্র গৃহে আছে। এখানে লোকে সমবেত হইলে, সকলে দাঁড়াইয়া উঠে ও সমস্বরে গুরুর বন্দনা গান সংস্কৃতে পাঠ করেন, পরে হিন্দিতে ইহার ব্যাখ্যা করা হয়। তারপর সকলে গুরুর চিত্রের সম্মুখে সষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে। পুনরায় একটি গান হইলে উপদেশ হয়। ইঁহার জন্মদিন সমাজের উৎসব দিন। দেব-সমাজের প্রচারক আছে। দুইটি হাই স্কুল, অনেকগুলি প্রাথমিক

শিক্ষাবিস্তার।

পাঠশালা, অন্ত্যজ জাতির জন্য বিদ্যালয়, প্রচারকদের জন্য শিক্ষালয় দেব-সমাজের দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। নারীশিক্ষার প্রতি দেব-সমাজে বিশেষ দৃষ্টি আছে ; ফিরোজপুরের একটি বিদ্যালয় চলিতেছে। মোটের উপর সমাজ-সংস্কার ও শিক্ষা প্রচার ইঁহাদের প্রধান উদ্দেশ্য।

দেবসমাজের শাস্ত্রের নাম দেবশাস্ত্র ; অগ্নিহোত্রীর লিখিত এই পুস্তক

ধর্ম্মশাস্ত্র।

পৃথিবীর আর সকল ধর্ম্মপুস্তককে দূর করিয়া দিবে ইহাই তাঁহাদের বিশ্বাস। হিন্দি, উর্দু, সিন্ধি, ও ইংরাজীতে অনেক পুস্তিকা, চারিখানি পত্রিকা, ইহারা প্রচার করিয়াছেন।

১৯১৩ সালে অগ্নিহোত্রী তাঁহার পুত্রকে তাঁহার গদীতে বসাইলে তাঁহার প্রধান শিষ্য দেবরাম অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া দেব-সমাজ হইতে পৃথক্ হইয়া "বিজ্ঞান মূলক তত্ত্ব-শিক্ষা" নামক গ্রন্থ লিখিয়া আপনাকে আদর্শ পুরুষ, পরম পূজনীয়, উপাস্য, পরিপূর্ণ জীবন দাতা, সমগ্র মানবের উদ্ধার-কর্ত্তা বলিয়া প্রচার করেন। দেবরামের সহিত অনেকগুলি লোক দেব-সমাজ ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন।

রামকৃষ্ণ মিশন

মহাত্মা রামকৃষ্ণ পরমহংসের নাম গদাধর চট্টোপাধ্যায়। হুগলী জিলার অন্তর্গত কামারপুকুর গ্রামে ১৮৩৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জীবন সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক ঘটনা ইতিমধ্যে শিষ্যদের দ্বারা লিপিবদ্ধ হইয়াছে; এমন কি পণ্ডিত মোক্ষমূলর সম্পাদিত রামকৃষ্ণের জীবনীতে অতিপ্রাকৃত ঘটনা সমন্বিত হইয়াছে। আমরা যাহাকে শিক্ষা বলি গদাধর সে শিক্ষা লাভ করেন নাই। সতের বৎসর বয়সে পিতার মৃত্যু হইলে তিনি কলিকাতায় আসিয়া সামান্য পূজারীর কাজ করিয়া জীবিকা উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন। ১৮৫৫ সালে দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ী নির্ম্মিত হইলে গদাধরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সেখানকার পূজারী নিযুক্ত হন ও গদাধরও সেখানে সহকারীর একটি কাজ পান। তিনি কালীকে নিজ মাতা ও বিশ্বমাতারূপে দেখিতেন এবং সর্ব্বদাই যোগযুক্ত অবস্থায় বাস করিতেন—মাঝে মাঝে তাঁহার সমাধি হইত। তাঁহার মাতা ও ভ্রাতারা ভাবিলেন

রামকৃষ্ণের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

যে বিবাহ দিলে গদাধরের মতি-গতি ফিরিবে। ১৮৫৯ সালে ২৫ বৎসর বয়সে গদাধর ছয় বৎসরের এক বালিকাকে বিবাহ করেন। কিন্তু ভক্তের জীবন এ সব বন্ধনে মুগ্ধ হয় না। তিনি দক্ষিণেশ্বরের নিকটে একটি বনে গিয়া কঠোর তপস্যা ও কৃচ্ছ্রসাধন করিতে লাগিলেন। বার বৎসর এইরূপ ভাবে কাটিল। এই সময়ে এক ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসিনী তাঁহাকে যোগ ও তন্ত্র সম্বন্ধে উপদেশ দেন। এই সন্ন্যাসিনীর সমবেদনা ও আধ্যাত্মিক উপলব্ধি গদাধরের জীবনে খুবই উপকারে আসিয়াছিল। তাঁহার সমস্ত বিদ্যা ইঁহাকে শিখাইয়া কয়েক বৎসর পরে সন্ন্যাসিনী নিরুদ্দেশ হন।

কিন্তু ইহাতেও গদাধরের মন তৃপ্ত হইল না ; তিনি উচ্চতর জ্ঞানের জন্য পিপাসিত। এই সময়ে ভোজপুরী নামক জনৈক বৈদান্তিক সন্ন্যাসী গদাধরের মন্দিরে উপস্থিত হন। তিনি শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈত মত ইঁহাকে শিক্ষা দেন ও দীক্ষিত করিয়া সন্ন্যাসী করেন ; সন্ন্যাসী হইয়া 'রামকৃষ্ণ' নাম গ্রহণ করেন। ভোজপুরী চলিয়া যাইবার পর কিছুকাল পর্য্যন্ত তিনি আত্মার গভীর আনন্দলাভ করিয়া কাটান ; কিন্তু ইহার পর সাংঘাতিক ব্যারামে তাঁহাকে কিছুকাল ভুগিতে হয়। রোগ শান্তির পর তিনি বৈষ্ণব ধর্ম সাধন করেন ও আপনাকে রাধা কল্পনা করিয়া ও ঈশ্বরকে কৃষ্ণরূপে ভাবিয়া কিছুকাল অতিবাহিত করেন। এইরূপ গভীর সংগ্রামে বার বৎসর কাটিয়া গেল। ১৮৭১ সালে তাঁহার স্ত্রী তাঁহার সহিত বাস করিতে আসিলেন ; কিন্তু তিনি সংসার বন্ধনে যাইতে অস্বীকৃত হওয়ায় তাঁহার স্ত্রী চিরদিন শিষ্যারূপে বাস করিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করেন। এইবার তাঁহার জাতি অভিমান দূর করিবার জন্য সংগ্রাম সুরু হইল—সেই জন্য চণ্ডালের ও মেথরের কাজও করিয়া তিনি আত্মশোধন করেন। মুসলমান ধর্ম জানিবার জন্য তিনি এক ফকিরের সহিত কিছুদিন বাস করেন ও মুসলমান ধর্মানুসারে প্রত্যেকটি প্রথা পালন করিয়া ইস্‌লাম সাধন করেন।

ধর্ম সাধন।

খৃষ্টকেও তিনি ধ্যানে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এই সময় হইতে বাহিরের লোকে তাঁহার সম্বন্ধে জানিতে আরম্ভ করে। ১৮৭৩ সালে আর্য্য-সমাজের প্রতিষ্ঠাতা দয়ানন্দের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় ও ১৮৭৫ সালে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের সহিত মিলন হয়। কেশবচন্দ্র তখন দেশে বিদেশে বিখ্যাত; তিনি তাঁহার বন্ধু বান্ধবদের নিকট এই মহাপুরুষের কথা বলিতে থাকেন। তখন রামকৃষ্ণ সাধু সন্ন্যাসী বলিয়া পরিচিত ছিলেন—কোনো সম্প্রদায়ের গুরু বলিয়া লোকসমক্ষে প্রচারিত হন নাই। ১৮৭৯ সাল হইত ১৮৮৬ সাল পর্য্যন্ত তিনি নিরন্তর উপদেশ দিয়াছিলেন। ঐ বৎসরে তাঁহার মৃত্যু হয় ও তাঁহার শিষ্যবৃন্দ রামকৃষ্ণের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করিয়া হিন্দুধর্মকে জীবনে ফুটাইবেন বলিয়া ঠিক করিলেন। ইহাদের মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য স্বামী বিবেকানন্দ। বিবেকানন্দের নাম নরেন্দ্রনাথ দত্ত। ইনি কলিকাতার বি, এ। সুগায়ক ও তেজস্বী বলিয়া ছাত্রসমাজে পরিচিত ছিলেন। ১৮৮২ সালে তিনি রামকৃষ্ণের শিষ্য হন; গুরুর মৃত্যুর পর তিনি সন্ন্যাসী হইয়া বিবেকানন্দ নাম লইয়া ছয় বৎসর হিমালয়ে বাস করেন ও সমগ্র ভারত ভ্রমণ করিয়া দেশকে ভালরূপে জানেন। ১৮৯৩ সালে আমেরিকায় শিকাগো সহরে সর্বধর্মের মহাসভায় হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যা করিবার জন্য বিবেকানন্দ প্রেরিত হন। সেখানে তিনি তাঁহার বাগ্মিতা ও যৌক্তিকতা দ্বারা সকলকে মুগ্ধ করেন। তাঁহার হিন্দুধর্ম ব্যাখ্যা শুনিয়া অনেকে বলেন যে ভারতে খৃষ্টধর্ম প্রচারের চেষ্টা বৃথা। সেখানে কিছুদিন থাকিয়া বেদান্ত প্রচারের জন্য সভাস্থাপন করেন। হিন্দুধর্ম যে প্রতিমা পূজা প্রচার করে না ইহা তিনি জোর করিয়া তাহাদের মনের মধ্যে মুদ্রিত করিয়া দিয়া আসেন। দেশে ফিরিয়া আসিয়া বেলুড়ের মঠ স্থাপন করেন।

বিবেকানন্দ।

শিকাগোর ধর্মসভা।

বেলুড়ে মঠস্থাপন।

তিনি বুঝিলেন ভারতের একদল লোক সংসার ত্যাগী না হইলে এদেশের আধ্যাত্মিক সম্পদের কথা এদেশবাসী ও বিদেশবাসী সকলের নিকট প্রচারিত হইবে না। ১৮৯৮ সালে স্বামী বিবেকানন্দের স্বাস্থ্যভগ্ন হওয়ায় তিনি পুনরায় য়ুরোপ ও আমেরিকায় যাত্রা করেন। ১৯০০ সালে ফিরিবার সময়ে প্যারি নগরীর ধর্মসভায় উপস্থিত হইলেন। ভারতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি মাত্র দুইবৎসর জীবিত ছিলেন, কিন্তু তাহার মধ্যেই অনেকগুলি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়া রামকৃষ্ণ মিশনকে দৃঢ় ভূমির উপর স্থাপিত করেন। ১৯০২ সালে ৪০ বৎসর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন।

প্যারীনগরীর ধর্ম্ম-সভায় যোগদান।

বিবেকানন্দ হিন্দুধর্মকে দেশে ও বিদেশে উচু করিয়া ধরিয়াছেন। বিদেশের নিকট ভারতকে তিনি বড় করিয়া ধরিয়া দেশ ভক্তির পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু দেশের মধ্যে অনেক মতামতকে তাঁহার সমর্থন করিতে হইয়াছিল, যাহা তিনি সত্যই বিশ্বাস করিতেন কিনা সন্দেহ। তিনি নিজে প্রতিমাপূজক ছিলেন না; তিনি ছিলেন বৈদান্তিক। অথচ দেশের লোকের কাছে কার্য্যতঃ তাহার সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহার সামাজিক মত খুবই উদার; ছুঁৎমার্গ বলিয়া তিনি শব্দ সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন; নিজে ব্রাহ্মণ ছিলেন না এবং ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্বও স্বীকার করিতেন না। কিন্তু তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে (সন্ন্যাসী বাদ দিয়া) হিন্দুসমাজের প্রাচীন বন্ধন ভাঙ্গিবার কোনো চেষ্টা দেখা যায় না। স্বামীজির উপদেশানুসারে জীবন যাপন করা কেহই যুক্তিযুক্ত মনে করেন না। এই দুর্বলতার কারণ বিবেকানন্দ হিন্দুধর্ম ও সমাজের সমস্ত দোষ ত্রুটিগুলিকে ভাল বাসার চোখে দেখিয়াছিলেন। ভগ্নী নিবেদিতাও তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া ভারতের প্রাচীন সকল প্রথা আচার ব্যবহারকে সমর্থন

সমাজ সংস্কারের শিথিলতা।

ভগ্নী নিবেদিতা।

করিয়াছেন। কিন্তু স্বামীজির নিকট ভারতবর্ষ এক বিষয়ে ঋণী ; তিনি ভারতবর্ষকে ভাল বাসিতে শিখাইয়া গেছেন—এ কয়জন শিক্ষিত যুবক সংসারত্যাগ করিয়া দেশের ও দশের সেবা করিতেছেন। রামকৃষ্ণ মিশনের পাঁচটি মঠ আছে—বেলুড়, কাশী, প্রয়াগ, মায়াবতী ও বঙ্গালোর। বেলুড় সমস্ত মিশনের কেন্দ্র। কাশী, হরিদ্বার, প্রয়াগ ও বৃন্দাবনে সেবাশ্রম আছে। তীর্থস্থানে সর্বদাই অসহায় ভাবে লোক উপস্থিত হয়, তাহাদের সেবা ইহার উদ্দেশ্য। এই সব স্থানে হাসপাতালের খুব ভাল বন্দোবস্ত আছে। দেশের যেখানে দুর্ভিক্ষ বন্যা প্লেগ মহামারি উপস্থিত হয় এই মিশনের যুবকগণ সেখানে প্রাণ দিয়া খাটিয়া থাকেন। এই সেবার দ্বারা খৃষ্টীয় সমাজ ভারতে বহু সংখ্যক লোকের মন ও প্রাণ পাইয়াছেন ; ইহারাও সেই সেবার পথে চলিয়াছেন।

মিশনের সেবাধর্ম্ম।

আমেরিকায় রামকৃষ্ণ মিশনের শাখা আছে ; তবে সেখানে উহা বেদান্ত সোসাইটি নামে খ্যাত—বেদান্তের অদ্বৈত বাদ প্রচারই প্রধান উদ্দেশ্য, রামকৃষ্ণ ভগবানের অবতার কিনা বা স্বয়ং ভগবান কিনা এ সমস্ত প্রশ্নের মধ্যে তাঁহারা প্রবেশ না করিয়া ভারতের শ্রেষ্ঠ দর্শনের মত প্রচার করেন। দুইখানি ইংরাজী পত্রিকা 'ব্রহ্মবাদিন্' মান্দ্রাজ হইতে, 'প্রবুদ্ধ ভারত' মায়াবতী হইতে প্রকাশিত হয় ; কলিকাতা হইতে 'উদ্বোধন' নামে একখানি বাঙ্গালা মাসিক পত্রিকা মিশনের মত ও কার্য্য কলাপ প্রকাশ করে। ইহাদের সাহিত্য প্রচারের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা থাকায় দেশ মধ্যে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্য বহুল পরিমাণে প্রচারিত হইতেছে।

থিওজফি

থিওজফি লোকের ধর্ম্মমত না হইলেও ইহার মত ও বিশ্বাস হিন্দুসমাজের শিক্ষিত লোকের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। ১৮৮৫ সালে

যে বৎসর আর্য্যসমাজ স্থাপিত হয় সেই বৎসর আমেরিকার নিউইয়র্ক সহরে ব্লাভাস্কি নামক একজন রুশরমণী ও কর্ণেল অল্‌কট্‌ থিওজফি সমাজ স্থাপন করেন। ইহার উদ্দেশ্য কোন প্রকার ধর্ম, জাতি, বর্ণ ভেদ না করিয়া (১) বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের বীজ বপন করা (২) তুলনামূলক ধর্ম, দর্শন ও বিজ্ঞানের আলোচনা (৩) মানবের মধ্যে নিহিত অজ্ঞাত শক্তি সমূহের সন্ধান। পৃথিবীর যে কোনো ধর্মে থাকিয়া থিওজফি সমাজের সভ্য হওয়া সম্ভব হয়। সর্ব ধর্মের মূল সত্য থিওজফি। কতকগুলি মূল মত, চিহ্ন, পূজা ও উপদেশাদি প্রত্যেক ধর্মের মধ্যে সাধারণভাবে দেখা যায়—বিপদ হয় ছোট ছোট মত ও বিশ্বাস লইয়া। সেগুলিকে বাদ দিলে সর্বদেশের ও সর্বকালের উপযুক্ত একটিমাত্র ধর্মমত অবশিষ্ট থাকে, এবং সে মত সকলের কাছে দেওয়াও যায়। থিওজফি যদি এখানে থামিত তবে বোধ হয় লোকের এ সম্বন্ধে কোন ভুল ধারণা হইত না। তাঁহারা আরও বলেন ঈশ্বর এক—ঈশ্বরের ত্রিমূর্ত্তি কর্ম্মের মধ্যে প্রকাশ পাইতেছে, এছাড়া জড়ের মধ্যে আত্মার আবির্ভাব—মানুষের মধ্যে বিভিন্ন স্তরের লোকের অস্তিত্ব আছে;—জন্মান্তর বাদ, কর্মবাদ ও মহাত্মাদের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। ইহাদের বিশ্বাস যে তিব্বতে কতকগুলি মহাত্মা আছেন। তাঁহাদের মধ্যে 'কুটহুমি' নামে একজন অলৌকিক মহাত্মা সর্বদা ম্যাডাম্‌ ব্লাভাস্কীকে সাহায্য করিয়াছেন এবং সময়ে সময়ে পত্র বা টেলিগ্রাম দিয়া তাঁহার মনোভাব প্রকাশ করিয়াছেন। কুটহুমি তাঁহাকে থিওজফি মত শিক্ষা দেন। ম্যাডাম্‌ ব্লাভাস্কী বহুকাল এইরূপ অসম্ভব কথা বলিয়া লোককে বিমোহিত করিতেছিলেন। তারপর ১৮৮৫ সালে বিলাত হইতে সাইকিকেল রিসার্চ সোসাইটির প্রেরিত কয়েকজন মেম্বর কর্ত্তৃক অনুসন্ধানের ফলে তাঁহার নানাপ্রকার ছলনা ধরা পড়ে। ব্লাভাস্কীর পরে মিসেস্‌ আনি বেসাণ্ট এই সমাজে সভানেতৃত্ব

থিওজফির মত ও বিশ্বাস।

ম্যাডাম্‌ ব্লাভাস্কি।

করিতেছেন। তিনি যদিও ঐ প্রকার স্বেচ্ছাকৃত কোনোরূপ ছলনার অবতারণা করেন না তথাচ অসম্ভব কথা বলিবার ও বিশ্বাস করিবার ক্ষমতা তাঁহার অসাধারণ।

মিসেস বেসাণ্ট।

তিনি হিন্দুদের নিকট বলেন যে তাঁহাদের ধর্মের সবই ভাল। বেদ নিত্য ও অনাদি; মন্ত্র উচ্চারণ করিলে কম্পন উৎপন্ন হয়; সেই কম্পন হইতে অতিপ্রাকৃত দেহ সমূহ উৎপন্ন হয়। এই সব মন্ত্র সংস্কৃতে হওয়ার বিশেষ প্রয়োজন—বিশেষকালে বিশেষভাবে বলিবারও প্রয়োজন আছে; এই সব মন্ত্রাদির প্রতি অশ্রদ্ধা হইয়াছে বলিয়া হিন্দুধর্মের অধঃপতন এবং জাতির অধোগতি; গর্ভাবস্থায় জননীগণ মন্ত্রাদি শ্রবণ করে না বলিয়া সন্তান দুর্বল হইতেছে। শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডাদি প্রদান করিলে মৃত আত্মাদের পাওয়া যায়। নানারূপ আধ্যাত্মিক, বৈজ্ঞানিক, বৈদ্যুতিক ব্যাপার দ্বারা মিসেস্ বেসাণ্ট হিন্দুধর্মের ভাল মন্দ সবগুলিকে সমভাবে দেখাইতে চান। মিসেস্ বেসাণ্ট প্রতিমা পূজার সমর্থক। মানুষের উৎপত্তি সম্বন্ধে একখানি বই মিসেস্ বেসাণ্ট ও লেড্‌বিটার নামক আর একজন থিওজফিষ্ট লিখিয়াছেন; এই বই আধ্যাত্মিক যোগবলে লিখিত—এবং এমন সব অসম্ভব উক্তি আছে যে তাহা পাঠ করিয়া সামান্য লোকও হাসি সম্বরণ করিতে পারে না।

থিওজফি-সোসাইটির মধ্যে কিছুদিন হইতে ভেদ আরম্ভ হইয়াছে। ১৮৯৫ সালে আমেরিকার অধিকাংশ থিওজফিষ্ট এই সমাজ ত্যাগ করিয়া নূতন সমাজ স্থাপন করেন। এই ভেদের কারণ এই—ব্লাভাস্কীর মৃত্যুর পর সমাজের সহকারী-সভাপতি মিঃ জজ্ (Mr. Judge) 'কুটহুমি' ও অন্যান্য মহাত্মাদের অনেক সব চিঠি দেখাইয়া বলেন যে অলকটের পরিবর্ত্তে তিনি সভাপতি হবেন। অলকট্ তিব্বতীয় সাধুদের লেখা চিনিতেন—তিনি প্রমাণ করিলেন জজের চিঠিগুলি জাল। তখন জজ্ 'কুটহুমি'র পত্রাদি লইয়া পৃথক হইয়া গেলেন।

মতভেদ ও বিরোধ

ইহার কয়েক বৎসর পরে লেড্‌বীটার নামক মিসেস্‌ বেসান্টের একজন প্রিয়পাত্রের নামে চরিত্র-নীতি সম্বন্ধে কতকগুলি কথা উঠে ও তাহা প্রচারিত হইলে তিনি সোসাইটি হইতে বহিষ্কৃত হন। কিন্তু ১৯০৯ সালে মিসেস্‌ বেসাণ্ট পুনরায় তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিলে ৭০০ ইংরাজ থিওজফিষ্ট সমাজ ত্যাগ করিয়া যান। ইহার কিছুদিন পরে জারমেন থিওজফিষ্টগণ ইহাদের বাড়াবাড়ি দেখিয়া ডাঃ ষ্টাইনারের নেতৃত্বে দলবাঁধিয়া থিওজফি সমাজ ত্যাগ করিয়া নূতন সমাজ গঠন করেন। এমন কি ভারতবর্ষেও তাঁহার বিরুদ্ধে প্রকাণ্ড এক দল উঠিয়াছে। কিছুদিন পূর্বে কৃষ্ণমূর্ত্তি নামক জনৈক মাদ্রাজী ছাত্রকে বেসাণ্ট মৈত্রেয়ীর অবতার বলিয়া ঘোষণা করেন। ইহাতে কাশীর সেণ্ট্রাল হিন্দু কলেজের মধ্যে ভীষণ দলাদলি হয় ও অবশেষে মিসেস্‌ বেসাণ্টকে কাশী ত্যাগ করিয়া মাদ্রাজের আদৈরে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে। থিওজফির দিক হইতে উত্তর ভারতে তাঁহার স্থান খুব কমিয়া গিয়াছে। কৃষ্ণমূর্ত্তি আলসিয়ন যে ভাবী অবতার ইহা সপ্রমাণিত করিবার জন্য Star of the East নামে মাসিক একখানি পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

কিন্তু থিওজফি একদিকে খুব বড় কাজ করিয়াছেন; শিক্ষার জন্য এই সমাজের লোকেরা প্রচুর অর্থব্যয় করিতেছেন। গত কয়েক বৎসর মিসেস্‌ বেসাণ্ট জাতীয় মহাবিদ্যালয় স্থাপনের জন্য বহুঅর্থ জোগাড় করেন এবং মাদ্রাজ, সিংহল ও ভারতের নানাস্থানে অনেকগুলি উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয়, পাঠশালা খুলিয়াছেন।

অন্যান্য ধর্ম্মসম্প্রদায়।

মাদ্রাজে মাধ্ব সম্প্রদায়।

হিন্দুধর্ম ও সমাজনীতির সংরক্ষণের ইতিহাস আমরা পূর্বেই লিপিবদ্ধ করিয়াছি। সমগ্র হিন্দুধর্মকে রক্ষা করিবার জন্য যেমন নূতন নূতন মত ও প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইতে লাগিল তেমনি সাম্প্রদায়িক মত গুলিকে রক্ষার জন্য পুরাতন সমাজের মধ্যে নূতন শক্তি দেখা দিল। দক্ষিণভারতবর্ষে বৈষ্ণব মাধ্ব সম্প্রদায়ের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে প্রথমেই এই জাগরণ দেখা যায়। ১৮৭৭ সালে কাঞ্চি সব্বা রাওজী নামক জনৈক ইংরাজী শিক্ষিত সরকারী কর্মচারী মাধ্ব-সম্প্রদায়ের এক সভা স্থাপন করেন। প্রতি বৎসর এই সভা আহূত হয়। তিনলক্ষ টাকার মূলধনের একটি ব্যাঙ্ক আছে এবং ইহার আয় হইতে সমিতির কাজ কর্ম চলে। বর্ত্তমান প্রাচীন পণ্ডিত পরিবারের বালকেরা ইংরাজী শিক্ষার দিকে ঝুঁকিয়াছে। ইংরাজীতে ইহারা পুস্তকাদি প্রকাশিত করিয়া আপনাদের মতকে বাহিরের পাঁচজনের মতের সঙ্গে সমানক্ষেত্রে রাখিতে চাহিতেছেন।

বাংলায় চৈতন্য সম্প্রদায়।

বাংলাদেশের মহাপ্রভু চৈতন্যের বৈষ্ণব-সম্প্রদায় অন্যান্য বৈষ্ণবদের হইতে পৃথক। শ্রীকৃষ্ণ ও রাধা ইঁহাদের ধর্মতত্ত্বের প্রধান অঙ্গ। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ করিয়া হিন্দু সমাজে ফিরিয়া গেলে বৈষ্ণবসমাজে প্রাণের সাড়া পড়ে। তাঁহার গভীর প্রেম ও ভক্তি সম্প্রদায়ের মধ্যে সত্যই নূতন জীবন আনিয়াছে। সাহিত্যের দিক দিয়া বৈষ্ণব সমাজ প্রচারের কাজ বিশেষ ভাবে করিতেছে। এই নূতন আন্দোলনের মূলে শিক্ষিত সমাজ। খৃষ্টীয় পাদরীদের দ্বারা নিরন্তর আঘাত পাইতে পাইতে হিন্দু সমাজ আপনাকে রক্ষা করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিল। খৃষ্টীয় পাদরী ও পণ্ডিতগণ বলিতেছিলেন যে কৃষ্ণ, রাম প্রভৃতি পৌরাণিক ব্যক্তিরা

মিথ্যা, গীতা শ্রীকৃষ্ণের উক্তি নয় ইত্যাদি। শ্রীকৃষ্ণ ঐতিহাসিক বীর, রামায়ণ মহাভারত ইতিহাস, শ্রীকৃষ্ণের জীবন আদর্শ ও অনুকরণীয়, গীতা শ্রেষ্ঠ ধর্ম-গ্রন্থ ইত্যাদি প্রতিপাদন করা নবযুগের প্রধান চেষ্টা হইল। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্র' কৃষ্ণের ঐতিহাসিকতা প্রমাণের চেষ্টা। শিশিরকুমার ঘোষ ইংরাজীতে লর্ড গৌরঙ্গ ও বাংলায় অমিয়-নিমাইচরিত নামে প্রকাণ্ড গ্রন্থ প্রকাশ করেন। খৃষ্টীয় একখানি বিখ্যাত গ্রন্থের ন্যায় ইংরাজীতে শ্রীকৃষ্ণের অনুকরণ নামে একখানি বই প্রকাশিত হয়। গীতার অসংখ্য সংস্করণ, ব্যাখ্যা ইদানীং প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণের বাণী বিলাতেও প্রচারিত হইয়াছে। ১৭৮৫ সালে সব প্রথমে গীতা ইংরাজী ভাষায় অনূদিত হয়; তাহার পরও অনেকে এই বই তর্জ্জমা করিয়াছেন। সুরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় নামক একজন বাঙ্গালী 'প্রেমানন্দ ভারতী' নাম গ্রহণ করিয়া চৈতন্যের শিষ্য হন। আমেরিকায় গিয়া তিনি কৃষ্ণের জীবন ও ধর্ম প্রচার, একটি মন্দির স্থাপন ও ইংরাজীতে কৃষ্ণের সম্বন্ধে পুস্তক প্রকাশ করেন। উড়িষ্যার উত্তর তেলেগু প্রদেশের বৈষ্ণবেরা ১৯১০ সালে এক সভা করিয়া তাঁহদের মধ্যে একত্রে কাজ করিবার ব্যবস্থা করেন।

আজকাল বাংলাদেশের একদল উচ্চ শিক্ষিত লোকের মধ্যে বৈষ্ণব ধর্মের খুব আন্দোলন হইতেছে। গান সঙ্কীর্ত্তন, কথকতা প্রভৃতি পুনরায় দেখা দিতেছে এবং প্রাচীন অনেক জিনিষের সমর্থন পূর্ণ মাত্রায় প্রকাশ পাইতেছে। এছাড়া প্রাচীন বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচারের জন্য শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা বহুদিন চেষ্টা করিয়া আসিতেছে।

দাক্ষিণাত্যে রামানুজ সম্প্রদায়।

দাক্ষিণাত্যে মহীশূরাঞ্চলে রামানুজ সম্প্রদায়ের কেন্দ্র। সেখানকার ব্রাহ্মণদের মধ্যে ইংরাজী শিক্ষা প্রবেশ করিয়াছে। ইহারা খৃষ্টীয় আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য বহুকাল হইতে সজাগ হইয়াছেন। গোবিন্দাচার্য্য স্বামী নামক

একজন ইংরাজী অভিজ্ঞ পণ্ডিত রামানুজের ধর্মমত অনেকগুলি পুস্তক লিখিয়া প্রচার করিয়াছেন, বিদেশে ও এই সকল পুস্তক প্রচারিত হইয়াছে। ১৯০২ সালে 'উভয় বেদান্ত প্রবর্ত্তন সভা' নামক সমিতি স্থাপিত হইয়াছে; ইহার উদ্দেশ্য বিশিষ্টাদ্বৈত মত সংস্কৃত ও তামিল ভাষার মধ্য দিয়া প্রচার, বিদ্যার্থীদের পরীক্ষা গ্রহণ ও পারিতোষিক বিতরণ ও বক্তৃতা দিয়া ধর্ম-শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া বিশিষ্টাদ্বৈত মত প্রচার।

১৯১১ সালে এলাহাবাদে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের চারিটি শাখা (শ্রীবৈষ্ণব, মাধ্ব, বল্লভাচারী ও নিম্বার্ক সম্প্রদায়) প্রথম মিলিত হইয়া পরস্পরকে বুঝিতে ও জানিতে চেষ্টা করেন। ইহার পরে আরও কয়েকবার এইরূপ বার্ষিক সভা হইয়াছে।

বৈষ্ণব ছাড়া অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে আত্মরক্ষা ও আত্মপ্রচারের ভাব দেখা দিয়াছে। তামিল প্রদেশ শৈবমতের খুব বড় কেন্দ্র। ইংরাজী-শিক্ষা প্রচারের সঙ্গে সেখানেও ইংরাজীতে নিজ সম্প্রদায়ের কথা প্রচার করিবার ইচ্ছা জাগিয়াছে। বহুস্থানে শৈব-সভা স্থাপিত হইয়াছে। পালামকোট্টায় শৈব-সভা ১৮৮৬ সালে স্থাপিত হয়। ১৮৯৫ সাল পর্য্যন্ত ইহাদের সম্বন্ধে অন্য সম্প্রদায়ের লোকের জ্ঞান নিতান্ত অল্প ছিল। ডাঃ জি, য়ু, পোপ, মিঃ বারনেট্ প্রভৃতি পাশ্চত্য পণ্ডিতগণ সর্বপ্রথমে শৈব মতের কথা পশ্চিমে প্রচার করেন। নল্লস্বামী পিল্লে নামক জনৈক পণ্ডিত বহু ইংরাজী গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া শৈব মতের কথা প্রচার করিয়াছেন। ১৯০৬ সালে শৈবসিদ্ধান্ত মহাসমাজ স্থাপিত হয় এবং প্রতিবৎসর এক এক নগরে এই সভার অধি-বেশন হয়। উত্তর তামিল দেশে ১৯০৯ সালে আর একটি অনুরূপ শৈব সভা হয়। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যের কথা বলিয়াছি এবং ইহারা বহুলপরিমাণে উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে খৃষ্টীয় প্রভাব বাধা দিতে সমর্থ হইয়াছে।

শৈব সম্প্রদায়।

দ্বাদশ শতাব্দীতে বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্গত কল্যাণে বীর শৈব সম্প্রদায়

লিঙ্গায়েৎ।

গঠিত হয়; ইহাদের অপর নাম লিঙ্গায়েৎ। ইহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব ও জাতিভেদ ছিল না; কিন্তু চারিদিকের আব্‌হাওয়ার গুণে ও শিক্ষার অভাবে হিন্দুসমাজের সমস্ত বিধি নিষেধ ইহাদের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। প্রায় ৩৫ বৎসর পূর্বে লিঙ্গায়েৎ শিক্ষা সমিতি স্থাপিত হয়। বহু ধনী ও মধ্যবিত্ত লোকে মিলিয়া একটি ফাণ্ড তুলিয়া (২ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা) লিঙ্গায়েৎ বালকদের শিক্ষার জন্য খরচ করিতেছেন। ইহার কেন্দ্র ধরবার। বৎসর পনের পূর্বে সর্বভারতীয় লিঙ্গায়েৎ সমাজের এক সভা হয়; এই সভা সেই হইতে বরাবর চলিতেছে। ধর্ম সম্বন্ধে কথা উঠিলে খুবই অশান্তি হইত বলিয়া নেতারা শিক্ষা ও সমাজ বিষয়ে তাঁহাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ করিয়াছেন।

শক্তি বা তান্ত্রিক পূজা সাধারণ লোকের মধ্যে বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। ধর্মসংস্কারক ও খৃষ্টীয় পাদরীগণ বহুকাল হইতে ইহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছেন। অধুনা শক্তিপূজার নূতন ব্যাখ্যা হইতেছে। তন্ত্রের ব্যাখ্যাতা জনৈক উচ্চপদস্থ সাহেব। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে অনেক-

তান্ত্রিক পূজা।

গুলি বই ইংরাজী ও সংস্কৃতে প্রকাশিত হইয়াছে ও শিক্ষিত সমাজের মধ্যে নূতন আলোক ও আন্দোলন আনয়ন করিতেছে। প্রাচীন হিন্দুধর্মের যা কিছু ভাল প্রমাণ করিবার জন্য এই সাহেব খুব ব্যস্ত এবং সেই জন্যই তিনি দেশের মধ্যে খুব জনাদর লাভ করিয়াছেন।

ভারত ধর্ম মহামণ্ডল

এই সব সাম্প্রদায়িক চেষ্টা ব্যতীত সমগ্র হিন্দুধর্মকে রক্ষা ও প্রচার করিবার জন্য ভারতধর্মমহামণ্ডল স্থাপিত। আর্য্য-সমাজ জাতিভেদ ও দেবদেবী মানে না বলিয়া তাহারা সনাতন হিন্দুসমাজের শত্রু,—রাম-

কৃষ্ণ মিশনে কায়স্থ নরেন্দ্রনাথ দত্ত স্বামী বিবেকানন্দ হইয়া ধর্মব্যাখ্যা করিয়াছেন, শূদ্রকে সন্ন্যাসী করেন ইত্যাদি অনেক অশাস্ত্রীয় কার্য্য তাঁহারা করেন, থিওজফিও নানা অবান্তর জিনিষে বিশ্বাসী; এই সকল বিষয়ের প্রতিবাদও করার জন্য প্রাচীন হিন্দুধর্ম রক্ষার উদ্দেশ্যে এই মহামণ্ডল সৃষ্ট হয়। ১৮৯০ সালের পর হইতে নানা স্থানে পৃথক্ পৃথক্ প্রতিষ্ঠানের অধীন এই সনাতনধর্ম রক্ষার আয়োজন হইয়াছে। আর্য্যসমাজের প্রতিদ্বন্দ্বী-বিদ্যালয় হরিদ্বারের ঋষিকুল। মথুরাতে নিগমাগম মণ্ডলী, বাংলায় ধর্ম,মহামণ্ডলী, দক্ষিণ-ভারতে ভারত-ধর্ম মহামণ্ডল স্থাপিত হয়। কিন্তু ইহাদের কাহারও সহিত কাহারও যোগ ছিল না। ১৯০০ সালে দ্বারভাঙ্গা মহারাজার সভানেতৃত্বে দিল্লীতে এক বিরাট্ কনফারেন্স হয়। ইহার দুই বৎসর পরে (১৯০২) সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলিকে ভারতধর্ম মহা-মণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত করিয়া মথুরাতে কেন্দ্র করা হয়। ১৯০৫ সালে কাশীতে ইহার কেন্দ্র উঠাইয়া আনা হয় এবং এখনও এই আন্দোলনের কেন্দ্র কাশীতে। ধর্ম-মহামণ্ডলের উদ্দেশ্য সনাতন ধর্মসম্মত হিন্দুধর্ম-শিক্ষা-বিস্তার, বেদ স্মৃতি পুরাণ ও অন্যান্য ধর্মশাস্ত্র সম্বন্ধে জ্ঞান প্রচার, সংস্কৃত ও হিন্দি সাহিত্যের সকল শাখার বিস্তার;—হিন্দু প্রতিষ্ঠান ও তীর্থসমূহের শাস্ত্রসম্মত সংস্কার, ভারতবর্ষের নানাস্থানের শাখা সমিতিগুলির সহিত একত্র কাজকরা; নূতন নূতন হিন্দু-কলেজ, স্কুল, গ্রন্থাগার, গ্রন্থ-প্রকাশ বিভাগ খোলা ও পুরাতন গুলিকে এই সমিতির সহিত একত্র কাজ করিবার ব্যবস্থা করা। বর্ত্তমানের উপযোগী করিয়া কিছুই করিবার কোনো কথা নাই। মহামণ্ডল হইতে ইংরাজী-হিন্দী একখানি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এই সমিতির অধীন প্রাদেশিক সমিতিসমূহ এবং তাহাদের তত্ত্বাবধানে নানা সহরে ও গ্রামে প্রায় ৬০০ সংখ্যা সভা আছে; প্রচারকের সংখ্যা প্রায় ২০০। মহামণ্ডলের টাকার অভাব নাই,

মহামণ্ডলের উদ্দেশ্য।

কার্য্যপ্রণালী।

অভাব হইয়াছে উপযুক্ত লোকের। বর্ত্তমানে ইহার প্রধান কর্মী বিখ্যাত মদনমোহন মালব্য। দ্বারভাঙ্গার মহারাজা ইহার সভাপতি বলিয়া লোকবল ও অর্থবলের অনটন হয় না। মালব্যজীর উৎসাহে কাশীতে হিন্দু বিশ্ব বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। প্রাচীন হিন্দুধর্মের পুনরুত্থান দেখিয়া দেশের লোক খুব উৎফুল্ল হইয়াছে। কিন্তু ইহার আদর্শের মত জীবন যাপন করা বর্ত্তমানের এতই বিরোধী যে সকলেই পরস্পরকে উৎসাহিত করিয়া নিরস্ত হইতেছেন। অতি অল্প সংখ্যক প্রাচীন পণ্ডিত ব্যতীত সকল প্রকার বিধি নিষেধ মানিয়া কেহই চলিতেছেন না।

কাশীতে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রাচীন হিন্দুধর্ম রক্ষার জন্য মিসেস্ বেসাণ্ট প্রমুখ থিওজফিষ্টগণ কাশীতে সেণ্ট্রাল হিন্দুকলেজ স্থাপন করেন। ক্রমে এই কলেজকে একটি পৃথক বিদ্যালয়ে পরিণত করিবার চেষ্টা সকলের মনে দেখা দিল। মিসেস্ বেসাণ্টের সহিত নানা-কারণে স্থানীয় হিন্দুদের ও একদল থিওজফিষ্টদের বিবাদ হইলে তিনি কাশী ত্যাগ করিয়া মান্দ্রাজের আদৈরে যান। শ্রীযুক্ত মদনমোহন মালব্য হিন্দু বিদ্যালয় স্থাপনের প্রধান উদ্‌যোক্তা। কাশীতে অনেক জমি কিনিয়া বিপুল আকারে বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। ইহাতে প্রাচীন ভারতের সাত্ত্বিকতার কোনো চিহ্ন দেখা যায় না ও বিলাতী বিদ্যালয়ের কুশ্রী অনুকরণ বলিয়া অনেকে নিন্দা করিতেছেন। হিন্দুদের দেখাদেখি মুসলমানেরা আলিগড়ে মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য উদ্‌যোগ করেন। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট হিন্দুদের উপর যে সকল সর্ত্ত দিয়াছেন তাহা মুসলমানেরা স্বীকার করিতে রাজি নহেন বলিয়া সে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় নাই।

ঠাকুর দয়ানন্দ।

বাংলাদেশে কিছুকালের মধ্যে অনেকগুলি নূতন নূতন ধর্ম সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছে। প্রাচীন হিন্দুধর্ম ব্যাখ্যা ও তাহার প্রচার ইহাদের উদ্দেশ্য। এই সাধকশ্রেণীর মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ পরম-হংসই প্রথম। তাঁহার পর বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী

ব্রাহ্মসমাজ হইতে চলিয়া গিয়া নূতন সম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহাকে অবতার বলিয়া পূজা করেন। কিছুদিন হইতে শিলচরে ঠাকুর দয়ানন্দের প্রভাব খুবই হইয়াছে। ইনিও শ্রীচৈতন্যের ভক্তি-স্রোত পুনরায় আনিবার জন্য দ্বাদশবর্ষ ব্যাপী কীর্ত্তনের আয়োজন করিয়াছিলেন। পুলিশের সঙ্গে ইহাদের একবার সংঘর্ষ হয় এবং একটি বড় রকমের মোকর্দ্দমায় পরাজিত হইয়া দয়ানন্দ শাস্তি পান। বর্ত্তমানে তিনি ও তাঁহার ভক্তেরা পৃথিবীতে শান্তি আনিবার চেষ্টা করিতেছেন।

কাঙ্গাল হরিনাথ আর একজন ভক্ত-সাধু। শিক্ষিত সমাজের মধ্যে তাঁহার অনেক শিষ্য আছে।

অল্পদিন হইল ফরিদপুরে আর একজন সাধুর আবির্ভাব হইয়াছে। তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহাকে ভগবানের অবতার রূপে দেখেন। তিনি আঠার বৎসর একঘরে বসিয়া যোগ করিয়া জ্ঞান লাভ করিয়াছেন। তিনিও ভক্তিধর্ম শিক্ষা দিতেছেন এবং ফরিদপুরের বুনো ও জেলেদের মধ্যে ধর্ম প্রচার করিয়া তাহাদিগকে কীর্ত্তনাদি শিখাইয়াছেন। তাঁহার মত বা শক্তির পরিচয় তিনি ধীরে ধীরে দিবেন। তিনি বলেন যে গোবধ ও মদ্যপান এক এক মহাদেশ হইতে এক একবার উঠাইবেন; তাঁহার শিষ্যেরা বলেন পৃথিবীর উদ্ধার ইহার দ্বারা হইবে। ফরিদপুরের গোয়ালকাঠির গ্রামে তাঁহার আশ্রম, প্রতিবৎসরে সীতানবমীর সময়ে ঐ খানে উৎসব হয়। পশ্চিমবঙ্গের বহুস্থানে তাঁহার অনেক শিষ্য আছে।

জগদ্বন্ধু।

জৈন

বুদ্ধের ধর্ম প্রচারিত হইবার কিছু পূর্বেই উত্তর ভারতে জৈন ধর্মের আবির্ভাব হইয়াছিল। কিন্তু পাঁচ ছয় শত বৎসরের মধ্যে জৈনগণ

তীর্থঙ্করদিগকে দেবতার আসনে বসাইয়া পূজা আরম্ভ করিলেন—ধর্মের প্রাচীন বিশুদ্ধতা নষ্ট হইল। এক সময়ে ইহাদের শক্তি সমগ্র ভারতকে যে অভিভূত করিয়াছিল তাহার নিদর্শন নানাস্থানের অসংখ্য মন্দির ও ধর্মশালা। আবু পর্বতের জৈন মন্দির ভারতীয় স্থপতির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলিয়া সকলে স্বীকার করেন। অতি প্রাচীনকালে জৈনদের মধ্যে দুইটি ভাগ হইয়া যায়—শ্বেতাম্বর ও দিগাম্বর। শ্বেতাম্বর মন্দিরে হিন্দু পুরোহিত কাজ করেন এবং প্রায় সমস্ত জৈন পরিবারে কোনো ক্রিয়াই ব্রাহ্মণ ব্যতীত সাধিত হইতে পারে না। হিন্দুসমাজের মধ্যে জৈনগণ যে ক্রমেই বিলীন হইয়া আসিতেছে তাহার প্রমাণ গত ত্রিশ বৎসরের আদমসুমারী;—১৮৯১ সালে জৈনদের সংখ্যা ছিল ১৫ লক্ষ, ১৯০১ সালে ১৩ লক্ষ ৩৪ হাজার, ১৯১১ সালে ১২ লক্ষ ৪৮ হাজার।

জৈনদের অবনতি

১৪৭৩ খৃষ্টাব্দে গুজরাটের আহমদাবাদে জৈনদের ভিতরে সংস্কারের এক আন্দোলন আরম্ভ হয়। এই নূতন দল প্রতিমা পূজার ঘোর-বিরোধী; ইহাদিগকে স্থানিকবাসী বলে।

জৈন সম্প্রদায়ের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষা অনেক দিন হইতে প্রবেশ করা সত্ত্বেও শিক্ষা তেমন ভাবে ব্যাপকতা লাভ করিতে পারে নাই; ইহার কারণ জৈনগণ ব্যবসায়েই তাহাদের মন প্রাণ দিয়াছে অন্য কোনো উচ্চ আদর্শের সহিত যোগস্থাপন করে নাই। আধুনিক সময়ে জৈনদের মধ্যে রাজচন্দ্র রবজীভাই নামক একজন কাথিবাড়বাসী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মূর্ত্তি ও মূমতি (মুখের কাপড়) ব্যতীত মোক্ষলাভ হয়—স্থানীকবাসী হইয়াও শ্বেতাম্বরের মন্দিরে পূজা করা যায় ইত্যাদি উদার মত তিনি প্রচার করেন। ১৯০৯ সালে মাত্র ৩২ বৎসর বয়সে তিনি মারা যান।

যে সাম্প্রদায়িক জাগরণ হিন্দু সমাজের মধ্যে দেখা গিয়াছে, জৈনদের

মধ্যে তাহার প্রথম আভাস পাওয়া যায় ১৮৯৩ সালে। ঐ বৎসরে দিগম্বর গণের প্রথম বাৎসরিক কনফারেন্স হয়। বৎসর দেড়েক পরে খৃষ্টীয় যুবক সমিতির অনুকরণে জৈন-যুবক-সমিতি নামে এক সমিতি গঠিত হয়। ১৯০৩ সালে শ্বেতাম্বরগণের প্রথম কন্‌ফারেন্স ও ১৯০৬ সালে স্থানকবাসীদের প্রথম মিলন-সভা হয়। ইহাদের মধ্যে অনেকের ইচ্ছা এই তিন সম্প্রদায়কে এক করিয়া এক বিপুল শক্তির সৃষ্টি করেন।

কন্‌ফারেন্স

ইহাদের সকলের উদ্দেশ্য জৈন সাধু ও পুরোহিতদের জন্য উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করা; জৈন ছাত্রদের জন্য পৃথক্‌ হোষ্টেলাদি খোলা ও যেখানে জৈন ধর্মপুস্তক নিয়মিতভাবে অধ্যাপনা করানো, ইংরাজি ও দেশী ভাষায় জৈন-পত্রিকা প্রকাশ, প্রাচীন গ্রন্থসমূহের উদ্ধার ও প্রকাশ এবং নূতন করিয়া তাহাদের ব্যাখ্যা ও প্রচার, সমাজ ও ধর্মের সংস্কার সাধন।

দিগম্বর, শ্বেতাম্বর, স্থানকবাসী সকলেই এই সংস্কারের জন্য বদ্ধপরিকর। দিগম্বরগণ কাশীতে "স্যাদ্‌বাদ মহাবিদ্যালয়" স্থাপন করিয়া অর্হতগণের শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন, দিল্লীতে একটি অনাথাশ্রম, দেশের নানা স্থানে হোষ্টেল ও বম্বেতে একটি বিধবাশ্রম স্থাপন করিয়াছেন; এ ছাড়া অনেকগুলি সংবাদপত্র বহুভাষায় প্রকাশিত হইতেছে—নারীদের জন্য বিশেষভাবে একখানি কাগজ ইঁহাদের আছে। শ্বেতাম্বরগণও দিগম্বরদের পথ অনুসরণ করিয়াছেন; তাছাড়া ইহাদের আর একটি কার্য্য বিশেষ প্রসংশনীয়। তাঁহারা জৈন সাহিত্যের একটি তালিকা প্রস্তুত করিতেছেন, ইহার প্রকাশের প্রথম বাধা প্রাচীনপন্থী জৈন সাধুগণ; তাঁহারা এই সকল জ্ঞানগর্ভ পুঁথি সমূহ কিছুতেই বাহিরে প্রকাশ করিতে চান না।

অনেকগুলি কাণ্ড হইতে বহু জৈন গ্রন্থ গত কয়েক বৎসরের মধ্যে

প্রকাশিত হইয়াছে। সংস্কৃত, প্রাকৃত ও হিন্দিতে যে কত বই আছে তাহা আমরা জানিতাম না। জৈন-যুবক-সমিতি বর্ত্তমানে ভারত-জৈন মহামণ্ডল নাম গ্রহণ করিয়াছে। এই সভার কেন্দ্র লক্ষ্ণৌতে। ইহার প্রধান কর্মচারী একজন সম্পাদক; তিন সম্প্রদায়ের তিনজন সহকারী-সম্পাদক তাঁহাকে সাহায্য করেন। ইহার প্রধান উদ্দেশ্য তিন শাখার মধ্যে সখ্যতা ও ঐক্য স্থাপন। ইংরাজীতে জৈন-গেজেট নামে একখানি মাসিক পত্রিকা ইঁহাদের মুখপাত্র। আগ্রাতে একটি বড় লাইব্রেরী স্থাপন করিয়া জৈন পুস্তক পুঁথি রক্ষা করার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বিলাতেও জৈনধর্ম প্রচারের ব্যবস্থা হইয়াছে। য়ুরোপীয় জৈন শাস্ত্রবিদ ও ভারতীয় জৈনদের লইয়া একটি সভা গঠিত হইয়াছে।

আত্মোন্নতির চেষ্টা

বৌদ্ধদের মধ্যেও এই নূতন আন্দোলনের সাড়া পড়িয়াছে। য়ুরোপীয় ও আমেরিকান সুধীগণ বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি মনোযোগ দিবার পর হইতে এদেশে ও সিংহলে বৌদ্ধধর্ম প্রচার ও রক্ষার জন্য বৌদ্ধগণ সচেষ্ট হইয়াছেন। সিংহলের মহাবোধি সোসাইটি—ইহার প্রথম প্রয়াস। বাংলাদেশের চট্টগ্রাম প্রদেশেই কেবল বৌদ্ধ আছে। তাঁহাদের মধ্যে আত্মোন্নতির চেষ্টা দেখা দিয়াছে; তাঁহারা সিংহলের বৌদ্ধদের সহিত মিলিত হইয়া কলিকাতায় বৌদ্ধ বিহার স্থাপন করিয়াছেন; ইঁহাদের মুখ্য পত্রিকা জগজ্জ্যোতি।

বৌদ্ধ সমাজ

শিখ ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা খুব কম হইলেও ভারতের রাজনৈতিক ও ধর্মনৈতিক ইতিহাসের উপর তাহাদের প্রভাব কম নয়। হিন্দুধর্মের সকল প্রকার আচার, ব্যবহার, সংস্কারের প্রতিবাদ-স্বরূপ এই ধর্ম স্থাপিত হয়। অপরদিকে মুসলমানদিগের গ্রহণ করিবার পথও প্রথমে ইহারা পরিষ্কার করে। অনেকের ভুল ধারণা যে শিখেরা মুসলমান বিদ্বেষী। একথা সম্পূর্ণ ভুল। তাহারা

শিখ সমাজ

মুসলমান শাসন কর্ত্তাদের শত্রু ছিল—ধর্মের সঙ্গে তাহাদের সম্পূর্ণ যোগ আছে। এখন পর্য্যন্ত পঞ্জাবে স্কুল কলেজে কোনো সামাজিক বা ধর্ম-সম্বন্ধীয় ব্যাপারে শিখ ও মুসলমান ছাত্রদের মধ্যে যোগ সহজে হয়—হিন্দুছাত্রদের সহিত নহে।

পঞ্জাব বিজয়ের পর হইতে ঐদেশে নানা ধর্মের আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। ১৮৪৯ সালে সর্বপ্রথমে খৃষ্টীয় পাদরীগণ ধর্ম প্রচারের জন্য তথায় উপস্থিত হন; তৎপরে ১৮৬৩ সালে ব্রাহ্ম সমাজ, ১৮৭৭ সালে আর্য্যসমাজ ও ১৮৯৮ সালে দেব-সমাজের আন্দোলন সুরু হয়। এই সমস্তের ঘাত প্রতিঘাতে শিখ-সমাজ জাগিয়াছে। আধ্যাত্মিক দিক হইতে বিচার করিলে দেখা যায় যে হিন্দু বা মুসলমানদের অপেক্ষা শিখ-দের অবস্থা ভাল নয়। হিন্দু প্রতিমা ও পুত্তলিকা শিখদের গৃহে গৃহে এমন কি মন্দিরেও প্রবেশ করিয়াছে। 'গ্রন্থ-সাহেব' প্রতিমার ন্যায়পূজিত হয়। খৃষ্টানদের ও বিশেষভাবে আর্য্য-সমাজের গায়ে-পড়া আক্রমণের ফলে শিখ সমাজ জাগিয়া উঠিয়াছে। ১৮৯০ সালে একদল শিক্ষিত শিখ শিখধর্ম ও সমাজের উন্নতির জন্য দলবদ্ধ হন ও অমৃতসরে 'খাল্‌শা কলেজ' স্থাপন করেন। ছোট ছোট অনেকগুলি সমিতি শিক্ষা ও সংস্কারে মন দিয়াছে। ১৯০৩ সালে ইংরাজীতে 'খালশা অ্যাড্‌ভোকেট্‌' নামে একখানি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। 'শিখ্‌ রিভিউ' নামে আর একখানি পত্রিকা ইঁহাদের দ্বারা চলিত। ১৯০৫ হইতে শিখেরা যথার্থ-ভাবে শিখ হইবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছে। মন্দির হইতে সমস্ত হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি তাহারা দূর করিয়াছে এবং হিন্দু প্রভাব ও আর্য্য প্রভাব ও তাহারা প্রাণপণে বাধা দিতেছে। শিখেরা বেদ বা হিন্দুদের কোনো ধর্ম গ্রন্থকে অভ্রান্ত বা অপৌরেষ বলিয়া মানে না; তাহাদের কাছে বাইবেল, কোরাণ, বেদ বেদান্ত সবই সমান। গরু তাহারা খায় না ইহার কারণ গরু দেবী বলিয়া নয়—গরু কৃষি প্রধান দেশের উপকারী

সহায় ও ধন বলিয়া থায় না। শিখেদের সামাজিক ও শিক্ষা সম্বন্ধীয় উন্নতি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। বিধবাশ্রম, অনাথাশ্রম স্থাপন, অন্ত্যজ জাতির উদ্ধারের জন্য চেষ্টা, শিখ ছাত্রদের জন্য হোষ্টেল খোলা, প্রতিবৎসরে শিক্ষার কনফারেন্সের অধিবেশন প্রভৃতি নানা সদ্‌কর্মে শিখেদের বহুমুখী শক্তির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

খ্রীষ্টীয় ধর্ম ও সমাজ

প্রবাদ আছে যে সাধু থমাস্ প্রথম শতাব্দীতে ভারতে আসিয়া খৃষ্টধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু এই প্রবাদ কতদূর প্রামাণ্য তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যের মালাবার উপকূলে একদল খৃষ্টানের বাসের কথা সর্বপ্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহারাই ইতিহাসে সিরীয় খৃষ্টান নামে খ্যাত। ষোড়শ শতাব্দীতে পর্টুগীজদের আসিবার পূর্বে খৃষ্ট ধর্ম প্রচার তেমনভাবে হয় নাই। ইহারা গোয়াতে কেন্দ্র করিয়া তাহাদের সাম্রাজ্যের সর্বত্র প্রচার কার্য্যে নিযুক্ত হয়। সেণ্ট জাভিয়ার (যাঁহার নামে একটি বিখ্যাত কলেজ কলিকাতায় ভবানীপুরে আছে) নামে জনৈক স্পেনীয় সাধু পর্টুগীজদিগের রাজনৈতিক শক্তির সুবিধা দেখিয়া ভারতে আসেন; তাঁহার নিষ্ঠা ও উৎসাহে খৃষ্টধর্ম বহুল পরিমাণে প্রচারিত হয়। কিন্তু রাজনৈতিক ইতিহাস পরিবর্ত্তনের সহিত পর্টুগীজদের ক্ষমতা ধর্মক্ষেত্রে ও কর্মক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ হইয়া আসিল। এখনো রোমান কাথলিক খৃষ্টানদের সংখ্যা ১৯ লক্ষ ৪ হাজার—প্রোটেস্‌টাণ্টদের চেয়ে প্রায় তিন লক্ষ বেশী।

প্রাচীন ইতিহাস

প্রোটেষ্টাণ্ট চার্চ ১৯শ শতাব্দীর পূর্বে খৃষ্টধর্ম প্রচারে বিশেষ মনো-

যোগ দেয় নাই। পলাশী যুদ্ধের কিছু পরেই খৃষ্টীয় পাদরীগণ এদেশে প্রচার করিতে আসেন; কিন্তু ইংরেজ কর্তৃপক্ষ এইরূপ প্রচারের ঘোর বিরোধী ছিলেন। তাঁহারা বিজিত হিন্দু মুসলমানের ধর্ম বিষয়ে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে হস্তক্ষেপ করিতে অনিচ্ছুক ছিলেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বহু হিন্দু মন্দির রক্ষা ও পোষণের ভার লইয়াছিলেন; তীর্থ স্থানগুলি সংস্কার বা পুনর্গঠণের জন্য তাঁহারা হিন্দু মহন্তদের টাকা ধার দিতেন। মন্দিরের পুরোহিত এমন কি দাক্ষিণাত্যের নর্ত্তকীদের পর্য্যন্ত মাস-মাহিনা দিতেন। যাগ, যজ্ঞ, ব্রাহ্মণ ভোজনাদি ব্যাপারেও টাকা দিতে কোম্পানী কার্প্যণ্য করিতেন না। এমন কি বহুকাল পর্য্যন্ত চড়কের সময়ে পেট ও পিট ফোঁড়া ও সতীদাহ সরকারী লোকের ব্যবস্থাধীনে হইত। কোম্পানী খৃষ্টীয় পাদরীগণকে তাঁহাদের রাজ্যের মধ্যে বাস বা প্রচার করিতে দিতেন না বলিয়া মহাত্মা কেরী প্রমুখ পাদরীগণ দিনেমারদের রাজ্য শ্রীরামপুরে উপনিবেশ স্থাপন করেন। বিলাতের লোকেদের বহুকালকার আন্দোলনের ফলে ১৮১৩ সালে কোম্পানীর সনদ পুণর্গ্রহণের সময়ে এই নিয়ম রদ করা হয়। এছাড়া কোম্পানী কোনো খৃষ্টানকে সরকারী কাজ দিতেন না এবং সৈন্য বিভাগে কোনো লোক খৃষ্টান হইতে ইচ্ছা করিলে তাহাকে রীতিমতভাবে বাধা দেওয়া হইত ও দীক্ষিত হইলে তাহাকে কাজ হইতে বরখাস্ত করা হইত।

কোম্পানীর প্রচারে বাধা

১৮১৩ সালে খৃষ্টান পাদরীদের ভারতে প্রচার সম্বন্ধে বাধা দূর হইলে দলে দলে প্রোটেষ্টাণ্ট চার্চের লোক এদেশে আসিয়া ধর্ম প্রচারে মন দিলেন। ১৮২৯ সালে ডাফ সাহেব কলিকাতায় আসিয়া ইংরাজী কলেজ খুলিয়া মহা উৎসাহে ধর্ম প্রচারে নিযুক্ত হন; তাঁহার চেষ্টা বহুপরিমাণে কৃতকার্য্য হইয়াছিল। ১৯১২ সালে প্রোটেষ্টাণ্ট খৃষ্টানদের সংখ্যা ১৬ লক্ষের উপর ছিল। ঐ বৎসরে

১৮১৩ সালে বাধা রদ

তাহাদের পরিচালিত ১৩,২০৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রায় ৪½ লক্ষ বিদ্যার্থী পড়িতেছিল; তবে ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই খৃষ্টান নহে। সমগ্র বৃটীশ ভারতের যাবতীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নয় ভাগের এক ভাগ খৃষ্টানদের দ্বারা পরিচালিত। ইহাদের তত্ত্বাবধানে ২৮৩টি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে ৬২ হাজার বালক ও প্রায় সাড়ে আট হাজার বালিকা অধ্যয়ন করিতেছিল। কলেজের উচ্চ শিক্ষার জন্য খৃষ্টান সমাজ যথেষ্ট অর্থ ও সামর্থ ব্যয় করিতেছেন। ৩৮টি কলেজে সাড়ে পাঁচ হাজারের উপর ছাত্র ছাত্রী বিদ্যালাভ করিতেছে। ইহাদের মধ্যে প্রায় সওয়া পাঁচ হাজার অখৃষ্টান।

খ্রীষ্টানদের শিক্ষাদান কার্য্য

রোমান কাথলিকদের তত্ত্বাবধানেও ক্ষুদ্র গ্রাম্য বিদ্যালয় হইতে আরম্ভ করিয়া উচ্চ শ্রেণীর কলেজ পর্য্যন্ত আছে। ইহাদের কলেজ ও স্কুলে খৃষ্টান বিদ্যার্থীদের সংখ্যা অধিক। দেশীয় প্রোটেষ্টাণ্ট খৃষ্টানদের চেয়ে রোমান কাথলিকদের শিক্ষা কম; কিন্তু হিন্দু ও মুসলমানদের অপেক্ষা অনেক বেশী। ধর্ম হিসাবে খৃষ্টানদের মধ্যে শিক্ষা সব চেয়ে বেশী। রোমান-কাথলিকদের অধীনে প্রায় তিন হাজার রোমান কাথলিকদের শিক্ষা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৯৮ হাজার বালক ও ৪১ হাজার বালিকা অধ্যয়ন করিতেছে। মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ে ১ লক্ষ ৪৩ হাজার বালক ও ৭৩ হাজার বালিকা ও কলেজে ৫০০০ বিদ্যার্থী পাঠ করিতেছে। এই সব বিদ্যার্থীদের মধ্যে য়ুরোপীয় ও য়ুরেশীয় বিদ্যার্থীর সংখ্যা আপেক্ষিক ভাবে অধিক।

জনসেবা খৃষ্টীয় সমাজের একটি প্রধান কাজ। ১৮৭৮ সালের পূর্ব পর্য্যন্ত খৃষ্টান চার্চ শিক্ষা ও প্রচার কার্য্যে লিপ্ত ছিল। ঐ বৎসরের ভীষণ দুর্ভিক্ষের ফলে বহু লক্ষ অনাথ ও নিরাশ্রয় লোক অন্নাভাবে খৃষ্টীয় সমাজের শরণাপন্ন হয়। বহু স্থানে হাসপাতাল ও ডিস্পেন্সারী পাদরীরা

চালাইতেছেন এবং অসংখ্য লোকের উপকার করিতেছেন। কুষ্ঠদের জন্য হিন্দু বা মুসলমানদের যে সব আশ্রয় আছে তাহা উল্লেখযোগ্য নহে।

জনসেবা ও চিকিৎসা

খৃষ্টান চার্চ কুষ্ঠদের এক প্রকার সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করিয়াছে। ১৯১১ সালে প্রোটেস্টাণ্ট চার্চের অন্তর্গত ১১৮ জন পুরুষ ও ২১৭ জন নারী চিকিৎসা কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। ইঁহাদের দ্বারা পরিচালিত শিল্প-বিস্তালয়ের সংখ্যা ১৮০টি এই সব বিদ্যালয়ে প্রায় ৬০ রকমের বিভিন্ন শিল্প শিক্ষা দেওয়া হয়। যাঁহারা এসব বিদ্যালয় দেখিয়াছেন তাঁহারাই একবাক্যে বলিয়াছেন যে খৃষ্টীয় চার্চ শিল্পের জন্য সত্যই কাজ করিতেছেন। এক্ষেত্রে খৃষ্টীয় মুক্তি-ফৌজদের (Salvation Army) ত্যাগ ও উৎসাহ বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। এমন কি সরকার পর্য্যন্ত ইহাদের উপর কতকগুলি দুর্বৃত্ত জাতিকে সভ্য করিবার ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত আছেন। ইঁহারা প্রেমে সকলকে বশ করিতেছেন।

ভারতে ধর্ম প্রচার করিবার জন্য যে কত মিশন আছে তাহার তালিকা দিতে গেলেই একখানি বই হয়। পাদরীদের এই কাজ নানা লোকে নানা ভাবে দেখিয়া থাকেন। বন্ধুহীন, সুদূর পার্বত্য প্রদেশে প্রিয়জন-শূন্য স্থানে, অশিক্ষিত অসভ্যদের মধ্যে যাঁহারা দীর্ঘ জীবন যাপন করিতেছেন তাঁহাদের উদ্দেশ্য ও কর্মকে দুরভিসন্ধির চক্ষে দেখা সত্য দৃষ্টি

খৃষ্টধর্ম প্রচারের কারণ

নহে। ভারতের নানা প্রদেশের নিম্নস্তরের লোকদের সামাজিক অবস্থা যে কিরূপ শোচনীয় তাহা আমরা যথাস্থানে দেখিয়াছি। চণ্ডাল, ডোম, পারিহা, মেথ্‌ প্রভৃতি অন্ত্যজ জাতি যতদিন হিন্দু আছে ততদিন তাহাদের সমাজে মাথা তুলিবার অনেক অন্তরায়, অথচ খৃষ্টান হইলে বিস্তালয়ে পড়িবার বাধা, পথে চলিবার বাধা সমস্তই দূর হইয়া যায়। এই সব ছোট খাটো ব্যাপারেই নিম্ন শ্রেণীর লোকদের মন গলে। ধর্মতত্ত্ব তাহারা বুঝে না। ধর্ম-

তত্ত্বের দিক দিয়া যাহারা খৃষ্টান ধর্মকে বিচার করেন তাহারা হিন্দু সমাজে বড় এবং বিদ্যাতে শ্রেষ্ঠ। উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে খৃষ্টীয় ধর্ম বিশেষভাবে প্রচারিত হয় নাই এবং হইবার আশাও কম। সাধারণ খৃষ্টীয় পাদরী-গণের ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে ধারণা যেরূপ সরল তাহাতে হিন্দু-মনকে পরাহত করা সহজ নহে। তবে নিম্নশ্রেণীর মধ্যে প্রতিবৎসর প্রায় এক লক্ষ করিয়া লোক খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করিতেছে এবং হিন্দুসমাজ যতদিন না তাহাদিগকে সমানভাবে আপনাদের মধ্যে গ্রহণ করিতে সমর্থ না হইবে ততদিন এ সমস্যার পূরণ হইবে না।

ভারতের খৃষ্টীয় মিশনগুলির অধিকাংশই বিদেশের টাকায় চলিতেছে। বিদেশের অনেক ধনী ও বিধবা তাঁহাদের সর্বস্ব প্রচার-কার্য্যে দান করিয়া যান। এইরূপ সেবা, শিক্ষা ও প্রচারের জন্য অর্থদানকে তাঁহারা শ্রেষ্ঠ দান বলিয়া মনে করেন। কিন্তু এদেশের ইরোপীয় খৃষ্টান কর্মচারী ও সৈনিকদের জন্য সরকারী ধর্মযাজক নিযুক্ত আছেন। চারি সম্প্রদায়ের খৃষ্টান মিশন খৃষ্টীয় সঙ্ঘের অন্তর্গত। ইহাদের মধ্যে ইংলণ্ডীয় বা আঙ্গলিকান চার্চ ও স্কটলণ্ডীয় বা প্রেস্‌বিটার চার্চের বিশপ বা চ্যাপলেন (বড় পুরোহিত) ভারতীয় সেক্রিটারী অব্‌ ষ্টেট্‌স কর্তৃক নিযুক্ত হন। সমগ্র ভারত সাম্রাজ্যে ১৫২ জন খৃষ্টীয় বিশপ বা চ্যাপলেন আছেন। রোমান ও মেথডিষ্ট মিশন সরকারী হইতে সাহায্য পাইয়া থাকে। চারি সম্প্রদায়ের গির্জ্জাঘর সরকারী ব্যয়ে নির্মিত ও সজ্জিত হয়। বহু স্কুল এই সব মিশন কর্তৃক পরিচালিত; অনেকগুলি স্কুল কেবলমাত্র ইরোপীয় বালক বালিকাদেরে জন্য নির্দ্দিষ্ট। সরকার এই সকল বিদ্যালয়ে প্রচুর অর্থ দান করেন। সরকারের এই সব বিদ্যালয়ে দান ও খৃষ্টীয় মিশনের সাহায্য দান লইয়া গভর্ণমেণ্টকে এদেশীয় লোকদের নিকট অনেক গঞ্জনা ভোগ করিতে হয়। ছাত্রদের তুলনায় বিদ্যালয়ে অর্থ সাহায্য অতিরিক্ত পরিমাণে হয়।

৩। বর্ণভেদ

ভারতবর্ষের জন সমাজ বহু জাতিতে বিভক্ত ; হিন্দু, মুসলমান আদিম, খৃষ্টান ধর্মাবলম্বী লোকদের মধ্যেই অনেক ভেদ আছে। অন্যান্য দেশের সহিত ভারতের জাতি ভেদের পার্থক্য এইখানে যে অন্যত্র 'জাত' ব্যক্তিগত, সুতরাং গুণগত, এখানে জাতি বংশগত ; কাহারো সদ্ বা অসদ্ বংশে জন্মগ্রহণের উপর তাহার সামাজিক মর্য্যাদা নির্ভর করে।

বর্ণ।

সমগ্র হিন্দুজাতিকে শাস্ত্রমতে চারি বর্ণে পৃথক করা হয়—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। ব্রাহ্মণ সমাজের শীর্ষ স্থানীয়—শিক্ষা দীক্ষার গুরু ; যুদ্ধাদি কর্মে লিপ্ত বীরগণ রাজন্য বা ক্ষত্রিয় পদবাচ্য। বৈশ্য বা বিশ্ অর্থে জনসমূহ বুঝায়, ইহারা বিচিত্র কর্মে লিপ্ত ; শূদ্র দ্বিজ জাতির বাহিরের বর্ণ অর্থাৎ আর্য্যদের অন্তর্গত নয়—ইহারা অনার্য্য—আর্য্যদের নিকট বশ্যতা স্বীকার করিয়া আচার ব্যবহার দাসত্ব মানিয়া লইয়াছিল। এই চতুর্বর্ণের বাহিরে ছিল পঞ্চম বা অস্পৃশ্যেরা ; তাহারা নিষাদ, চণ্ডাল প্রভৃতি উপজাতি বা Tribe। ইহাই গেল আর্য্য সমাজের প্রথম ভেদ।

(২) উপবর্ণ।

ব্রাহ্মণ বলিলে ভারতের সমগ্র ব্রাহ্মণ জাতিকে বুঝাইলেও ইহাদের মধ্যেও জাতি-ভেদ যথেষ্ট আছে। এইখানে জাতি শব্দের অর্থটি আমরা পরিষ্কার করিয়া দিব। কোনো জাতি বলিলে কয়েকটি পরিবার বুঝায়, ইহাদের আচার ব্যবহার ও পেষা এক ; একজন মহাপুরুষ বা ঋষি হইতে তাহাদের সকলের উদ্ভব। জাতির মধ্যে বিবাহের আদান

প্রদান বিশেষ কোন শাস্ত্র সম্মত বা বিশেষ কোনো স্থানের লোকাচার সম্মত হওয়ার একান্ত প্রয়োজন ; পরস্পরের সহিত আহারাদি ও পাকস্পর্শ সম্বন্ধে সামাজিক প্রথা মানিয়া চলিতে হয় ; উচ্চ বর্ণ তাহার নিম্ন বর্ণের হস্তে পক্ক অন্ন গ্রহণ করে না ; এই সকল নিয়ম পালন করিয়া চলার নাম জাতি রক্ষা। এক্ষণে এই সকল নিয়ম প্রত্যেক দেশে পৃথক। উত্তর ভারতে বা আর্য্যাবর্ত্তে ব্রাহ্মণেরা ব্রাহ্মণেতর অনেকগুলি জাতির হাতে জল গ্রহণ করেন ; কিন্তু দাক্ষিণাত্যে ব্রাহ্মণ যে অপর জাতির হাতে জলপান করিবে তাহা তাহাদের স্বপ্নের অগোচর। সেখানে (মালবারে) নায়ার জাতির সংস্পর্শে ব্রাহ্মণের জাতি যায় ; কম্মান্দন বর্গের মিস্ত্রী, কামার, ছুতার, মুচি ব্রাহ্মণের ১৮ হাতের মধ্যে আসিলে অশুচির কারণ হয়। ইলুবনেরা ২৪ হাত, পুলায়ন ৩২ হাত ও পারিয়া ৪৮ হাত তফাতে ব্রাহ্মণকে অশুচি করিতে পারে। সেইজন্য দাক্ষিণাত্যের বহু স্থলে ব্রাহ্মণ-প্রধান গ্রামে ইহারা প্রবেশ করিতে পারে না এবং রাজপথে ব্রাহ্মণ দেখিলে বহুদূর হইতে পথ ছাড়িয়া চীৎকার করিতে থাকে। উত্তরের ব্রাহ্মণদের মধ্যে এইরূপ কোনো মানামানি নাই। সেইজন্য প্রাচীন লেখকগণের মতে ভারতের সমগ্র ব্রাহ্মণ দুই ভাগে বিভক্ত—পঞ্চ গৌড় ও পঞ্চ দ্রবিড়। মোটামুটি ভাবে বলিতে পারা যায় সংস্কৃতজ ভাষাভাষী আর্য্য বা মিশ্রিত আর্য্যগণ পঞ্চগৌড়ের অন্তর্গত—যথা সারস্বত, কান্যকুব্জ, মিথিলা, গৌড় (বাংলা) ও উৎকল। কর্ণাট, তামিল, তেলেগু প্রভৃতি পঞ্চ দ্রবিড়ের অন্তর্গত। ইহা গেল দ্বিতীয় ভাগ।

উপর্য্যুক্ত শ্রেণী ভাগই চরম নহে। ইহাদের মধ্যে স্থানীয় ভাগ আছে ;

(৩) শ্রেণী।

এই ভাগ অনেক সময়ে ভৌগলিক কারণ জনিত। বাংলা দেশের মধ্যেই নিম্নলিখিত উপবিভাগ দৃষ্ট হয় যেমন—(ক) রাঢ়ি (খ) বারেন্দ্র (গ) সপ্তশতী (ঘ) মধ্য-শ্রেণী (ঙ) বৈদিক (চ) গ্রহবিপ্র।

উপর্য্যুক্ত শ্রেণীর মধ্যে পুনরায় যে ভাগ দেখা যায় তাহাকে গোত্র বলে। লৌকিক বিশ্বাস অনুসারে প্রতি গোত্র কোনো এক ঋষির বংশোদ্ভব। প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রে সাধারণত যে দশ ঋষিকে মানব জাতির আদি বলিয়া ধরা হয়—সেই সব ঋষিকে ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যেরা তাঁহাদের আদি পুরুষ বলিয়া মানে। এক একটি গোত্র কয়েকটি পরিবারের সমষ্টি; এক গোত্রের মধ্যে বিবাহ হয় না তাহার কারণ তাহারা এক আদি পুরুষের বংশধর।

(৪) গোত্র।

(৫) পরিবার সমাজের ও ব্যক্তির মিলিবার স্থান। সমাজ-তত্ত্বের মূল হইতেছে পরিবার। লৌকিক ভাষায় 'জাত' শব্দ বর্ণের স্থানে ব্যবহৃত হয় এবং সেই জাতের অর্থ কি, কি উপায়ে তাহা রক্ষিত হয় সে বিষয়ে পূর্বেই বলিয়াছি। এই জাতি-রক্ষার প্রধান জিনিষ বিবাহ। বিবাহ সম্বন্ধে হিন্দুসমাজে যেরূপ ব্যাপক নিয়মাবলী আছে আর কোনো সমাজে সেরূপ আছে বলিয়া জানি না। বিবাহ সগোত্রে হইতে পারে না; আদিম জাতিদের মধ্যে এক গোত্রে বিবাহ নাই। ইহার পর এক উপবর্ণের বাহিরে বিবাহের নিষেধ সকল বর্ণের মধ্যেই প্রচলিত। কিন্তু পঞ্জাব ও আসাম অঞ্চলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিয়মের ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব বঙ্গের কোথায় কোথায় বৈদ্য ও কায়স্থের মধ্যে বিবাহ প্রথা এখনো প্রচলিত আছে বলিয়া পশ্চিম বঙ্গের বৈদ্যগণ পূর্ব বঙ্গের বৈদ্যদের সহিত ক্রিয়া কর্ম করিতে অনিচ্ছুক।

পরিবার।

বর্ণভেদ বা জাতিভেদের উৎপত্তি লইয়া বহুকাল হইতে গবেষণা চলিতেছে। য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ যেমন বহুবিধ মতবাদ বা থিওরী খাড়া করিয়াছেন, এ দেশের প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা এ বিষয়ে ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ করিতে ভুলেন নাই। শাস্ত্রমতে চারিবর্ণ যথাক্রমে ব্রহ্মার

বর্ণভেদের উৎপত্তি।

মুখ, বক্ষ, উরু ও পদ হইতে উদ্ভূত। একথাটিকে অক্ষরে অক্ষরে মানিয়া বিশ্বাস করিতে গেলে প্রাচীনদের বুদ্ধির প্রতি আমাদের যথেষ্ট শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হইবে না। তবে ইহাকে রূপকভাবে গ্রহণ করিলে একথাটির সত্যতা ও গভীরতা সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ থাকে না; প্রত্যেক সমাজের পুষ্টির জন্য জ্ঞান, কর্ম, অর্থ ও সেবার প্রয়োজন। এই ভেদ কর্মগত। মনুতে ৩৬টি বর্ণের উল্লেখ পাওয়া যায়; তাঁহার মতে এই সব বর্ণ সঙ্কর। অনুলোম বিবাহের কথা সচরাচর দেখা যায়; প্রতিলোম বিবাহ বা নীচবর্ণের পুরুষের উচ্চবর্ণের স্ত্রীকে বিবাহে সঙ্কর-বর্ণ হয়। এই মত কিয়দ পরিমাণে সত্য হইলেও সম্পূর্ণরূপে নহে তাহা আমরা দেখিব। বর্ত্তমানে ভারতে বর্ণের সংখ্যা ২৩৭৮টি। জাতি সম্বন্ধে লৌকিক ধারণা যে (১) বর্ণভেদ হিন্দুধর্মের বিশেষ অঙ্গ, ও ধর্মের সহিত ইহার সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য, (২) সমগ্র হিন্দুসমাজ ব্রহ্মণাদি চতুর্বর্ণে বিভক্ত; (৩) ধর্ম সনাতন —তাহার কোনো পরিবর্ত্তন নাই। বিজ্ঞানের চেষ্টায় এ সব ধারণা জ্ঞানীদের মন হইতে দূর হইয়াছে। বর্ণের উৎপত্তি সম্বন্ধে দেশীয়দের ধারণা যেরূপ ভ্রান্ত য়ুরোপীয় অনেক পণ্ডিতের ধারণাও তদ্রূপ। কাহারও মতে জাতির উৎপত্তি কর্ম বা পেশা। মিঃ নেস্‌ফিল্ড্ দেখাইয়াছেন যে যুক্ত প্রদেশের একশতটি বর্ণের মধ্যে ৭৭টি কর্মগত, ১৭টি বর্ণগত, ৩টি স্থানীয় নামানুগত ইত্যাদি। বর্ণগত নামের অধিকাংশের পেশা শীকার, মাছ ধরা প্রভৃতি। কয়েক জন পণ্ডিত বহু শত লোকের মাথা মাপিয়া খর্পর-বিজ্ঞানের সাহায্যে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে ব্রাহ্মণ ও ঝাড়ু-দারদের মধ্যে পার্থক্য নাই বলিলেই চলে। আবার কেহ বলেন আহার, বিবাহাদি সম্বন্ধে যে সব প্রাচীন বাচ-বিচার দেখা যায় তাহা আর্য্যদের আদিম অভ্যাস, গ্রীস্ ও রোমেও এইরূপ দুই একটি পদ্ধতি দেখা যাইত। এই সকল মতবাদের প্রত্যেকটির মধ্যেই কিছু সত্য থাকিতে পারে; তাই বলিয়া কোনো একটি কারণকেই এই জটিল জাতিভেদের কারণ

বলিতে গেলে সত্য বলা হইবে না। যে সব উপায়ে বর্ণ গঠিত হইয়াছে তাহা নিম্নে উদাহরণ সমেত প্রদত্ত হইতেছে।

উপজাতির বর্ণভেদ।

(১) অনেক আদিম জাতি বা উপজাতি হিন্দুসমাজের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে একথা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। এই প্রথা ভারতের ইতিহাসের গোড়া হইতে চলিয়া আসিতেছে। অনেক উপজাতি রাজা হইয়া রাজন্য হইয়াছেন; এ উদাহরণের জন্য আমাদিগকে বাংলার বাহিরে যাইতে হইবে না। কোচ বিহারের রাজবংশীরা ও ত্রিপুরাবাসীরা এক্ষণে আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া অভিহিত করে। ছোটনাগপুরের ভূমিজেরা এখন একটি পৃথক বর্ণ। অনার্য্য আচার ব্যবহারের সঙ্গে হিন্দু রীতিনীতি তাহারা অবলম্বন করিয়াছে। যুক্ত প্রদেশের আহীর, ডোম, দোষাদ, বোম্বাইএর কোলী, মহর ও মরাঠা, বাংলার বাগ্দি, চণ্ডাল, কৈবর্ত্ত, পোদ, রাজবংশীকোচ, মান্দ্রাজের মাল, নায়ার, বেল্লাল ও পারিয়াগণ হিন্দুসমাজের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে; প্রাচীনকালে ইহাদের অস্তিত্বের কোনো চিহ্ন পাওয়া যায় না।

ব্রাহ্মণদের মধ্যে যে সকলে এক জাতীয় তাহা নহে। ভারতের আদিম জাতির মধ্য হইতে অপেক্ষাকৃত গুণবান্‌দিগকে অথবা স্থানীয় পুরোহিতগণকে আর্য্যেরা ব্রাহ্মণ করিয়া লইতেন। পৌরবাদি বংশ হইতে এক একটি শাখাকে ব্রাহ্মণ করিয়া লইবার উদাহরণ পুরাণে পাওয়া যায়। উত্তর ভারতের সুন্দর আকৃতি ব্রাহ্মণগণ ও দাক্ষিণাত্যের কৃষ্ণকায় খর্বাকৃতি ব্রাহ্মণ এক জাতির নহে। শাকদ্বীপি ব্রাহ্মণগণকে অনেকে পারসিক বংশজাত বলিয়া অনুমান করেন। মণিপুরের ব্রাহ্মণগণ বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের ঔরসে মণিপুর রমণীর গর্ভজাত। এইরূপ নানা উপজাতির মধ্য হইতে ব্রাহ্মণ সংগৃহীত হইয়াছিল এবং এখনো হইতেছে। বর্ত্তমানে নমশূদ্রেরা আপনাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া

অভিহিত করিতেছে। গতবৎসর একজন বৈষ্ণব পাঁচশ লোককে ব্রাহ্মণ করিয়াছিলেন বলিয়া কাগজে পড়া গেল। নানা উপজাতি ও বর্ণ হইতে ব্রাহ্মণ সৃষ্ট হইয়াছে।

উপজীবিকা গত বর্ণভেদ।

নানা প্রকার পেশা বা জীবিকা অনুসরণ বিভিন্ন বর্ণের উৎপত্তির একটি কারণ। পূর্বে যে চারি বর্ণ ছিল তাহা এক্ষণে রূপান্তরিত হইয়াছে; কর্মগত বিভাগ হইতে জন্মগত বর্ণের সৃষ্টি হইয়াছে। প্রত্যেক বর্ণেরই কোনো না কোনো বিশেষ কর্ম আছে। অনেক সময়ে এই পৈতৃক কর্ম ত্যাগের ফলে নূতন উপবর্ণের সৃষ্টি হইয়াছে। ব্রাহ্মণ পুরোহিত, আহীর গোরক্ষক, চামার ও মুচি চর্মের কাজ করে, চুহাড়, দোষাদ, ডোম পরিচ্ছন্নতার কাজ করে; গোয়ালা দুধ বেচে, কৈবর্ত্ত ও কেওয়াৎ মাছ ধরে ও চাষ করে, কায়স্থ কেরাণীর কাজ করে; এইরূপ, ধোপা নাপিত, কামার, কুমার, সোণার স্বর্ণকার, পোদ, তেলি, তিলি সকলেরই বিশেষ কোনো কাজ তাহাদের জাত ব্যবসায়। কিন্তু জাত-ব্যবসায় যে সকলেই করে তাহা নহে; প্রাচীনকালে দ্রোণ যুদ্ধ কার্য্য ও বিদুর সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন; জনক উপনিষদ্ ব্যাখ্যা করিতেন ও পরশুরাম পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছিলেন। সুতরাং তখনো যে সকলেই নিজ নিজ জাত-ব্যবসায় করিতেন এমন নহে। বিহারের আহীরদের শতকরা ৮০ জন কৃষিকার্য্য করে; বাংলাদেশের ব্রাহ্মণদের শতকরা ১৭ ও বিহারের ৮ জনের পৌরহিত্য জাত-ব্যবসায়; চামারদের শতকরা ৮ জন চামড়া করে; অবশিষ্টেরা কেহ ইট তৈয়ারী করে, কেহ মজুরী করে। তাঁতি, কামারদের মধ্যেও এইরূপ।

এই সব বর্ণের মধ্যে অনেক সময়ে কর্মান্তর গ্রহণের জন্য নূতনবর্ণ সৃষ্ট হয়। বাংলার সদ্‌গোপের গোয়ালাদের হইতে পৃথক্ হইয়া সদ্‌গোপ

নাম লইয়াছে। শিক্ষিত কৈবর্ত্ত ও পোদগণ অশিক্ষিতদের হইতে পৃথক্ হইয়া নূতন বর্ণ সৃষ্টি করিতেছে; মাহিষ্যবর্ণ নূতন দেখা দিয়াছে। মধু-নাপিতেরা জাত-ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া অন্য কর্মে লিপ্ত বলিয়া তাহারা এক্ষণে পৃথক বর্ণে পরিগণিত। চাষা-ধোপারা ধোপা হইতে পৃথক। বাংলাদেশ হইতেই এই কয়টী উদাহরণ; ভারতবর্ষে কর্মান্তর গ্রহণের জন্য এইরূপ জাতি বরাবর গঠিত হইয়া আসিতেছে। এইখানে একটি কথা মনে রাখা দরকার যে ভারতের এক অংশের বর্ণ বা উপবর্ণের সম্মান বা মর্য্যাদার সহিত অন্য প্রদেশের মিল দেখা যায় না।

কর্মান্তর গ্রহণে নূতন বর্ণ

(৩) ভারতের কতকগুলি ধর্মসম্প্রদায় পৃথক পৃথক্ বর্ণ হইয়া উঠিয়াছে; তাহাদের মধ্যেও সাধারণ হিন্দুসমাজের ন্যায় উপবর্ণ, শ্রেণী প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমষ্টি দেখা যায়। বাংলাদেশের বৈষ্ণব, বোম্বাই অঞ্চলের লিঙ্গায়েৎ ও উড়িষ্যার সারক সম্প্রদায় এই শ্রেণীর বর্ণ-ভেদের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। দক্ষিণাত্যে পূর্বে যাহারা জৈন ধর্মাবলম্বী ছিল এক্ষণে তাহারা আপনাদের মধ্যেই বিবাহাদি সম্পন্ন করে। বোম্বাইয়ের লিঙ্গায়েৎ সম্প্রদায় দ্বাদশ শতাব্দীতে জাতিভেদ ও ব্রহ্মণ্যের প্রতিবাদ করিতেই ইহা আবির্ভূত হইয়াছিল। কিন্তু গত কয়েক শতাব্দীর মধ্যে তাহাদের ভিতর ব্রাহ্মণাদি ভাগ হইয়াছে এবং তাহারা বীরশৈব-ব্রাহ্মণ, বীরশৈব-ক্ষত্রিয় ইত্যাদি বলিয়া আপনাদিগের পরিচয় দিতেছে।

সম্প্রদায়গত ভেদ

দেশীয় খৃষ্টানদের মধ্যেও এই শ্রেণীর জাতিভেদ দৃষ্ট হয়। কোঙ্কনের রোমান ক্যাথলিক খৃষ্টান সমাজ বাম্বণ (ব্রাহ্মণ), ছরোদ (ছত্রিয়) শুদির (শূদ্র), রেণ্ডার, গবিদ, মোম্বল (ধোপা), কুম্বার, কাফির (মজুর) ইত্যাদি ভাগে বিভক্ত। সীরিয়ান খৃষ্টানদের মধ্যে, জাতিভেদ খুবই বদ্ধমূল, তাহাদের উপজাতির মধ্যে বিবাহাদি হয় না বলিলেই চলে।

(৪) হিন্দুশাস্ত্র মতে ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণ ব্যতীত সকল জাতিই বর্ণ-শঙ্কর ; এইখানে আমরা সেই বর্ণ-সঙ্কর জাতির কথা বলিব না। গত দেড় শত বৎসরের মধ্যে ভারতের আর্থিক ও রাজনৈতিক বিপ্লবের সঙ্গে এখানকার সমাজিক জীবনও অনেকখানি পরিবর্তিত হইয়া পড়িয়াছে। উড়িষ্যার সাগরদিপেশা নামক এক সঙ্কর বর্ণ আছে। ইহারা উচ্চবর্ণের ওড়িয়া ও বাঙ্গালী-কায়স্থের ঔরসে ওড়িয়া-দাসীদের গর্ভজাত সন্তান। ইহারা নিজ নিজ পিতার জাতি অনুসারে বিভক্ত, এবং পরস্পরের মধ্যে বিবাহাদি করে না। ইহাদের সংখ্যা ন্যূনাধিক ৫০ হাজার হইবে। এছাড়া মধ্য-প্রদেশের বিদুর, মালাবারের ছক্কিয়ার, বোম্বাইয়ের ভিলাল, বড়োদার গোলা, আসামের বোরিয়া জাত বর্ণ-সঙ্কর। বোরিয়ারা বিধবা ব্রাহ্মণ কন্যার গর্ভে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের গর্ভজাত। ভারত-বর্ষের ফিরিঙ্গিরা বর্ণ-সঙ্কর ; তাহাদের সহিত খাঁটি য়ুরোপীয়দের সম্বন্ধ নাই বলিলেই হয়। ব্রহ্মদেশে বহু ভারতপ্রবাসী হিন্দু ও মুসলমান গিয়া বিবাহাদি করিতেছে ; সেখানেও বর্ণ-সঙ্কর জাতি সৃষ্ট হইতেছে। আসামের চা বাগিচার কুলীদের মধ্যে, আন্দামানের কয়েদীদের মধ্যেও এইরূপ অসবর্ণ বিবাহের ফলে সঙ্কর বর্ণ সৃষ্ট হইতেছে।

সঙ্কর জাতি

(৫) ভারতের ইতিহাসে যে সব জাতি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিল তাহাদের কাহারও কাহারও মধ্যে জাতীয়তা-বোধ এখনো সুস্পষ্ট। এই শ্রেণীর 'নেশনে'র সংখ্যা ভারতে কম। নেপালে নেবারগণ এককালে রাজা ছিল। ইহাদের মধ্যে দেবভজগণ ব্রাহ্মণ ; সূর্য্যবংশী মালেরা রাজবংশীয় ; শ্রেষ্ঠগণ মন্ত্রী ও সম্ভ্রান্তব্যক্তি ; জপুরা কৃষক। ইহাদের নীচে অন্যান্য অনেক বর্ণ আছে। নেবারদের মধ্যে একটি সম্পূর্ণ সামাজিক জীবনের চিত্র পাওয়া যায়। বোম্বাইয়ের মারাঠাদের মধ্যে একটি জাতীয় ভাব দেখা যায় ; সেই বোধ সমগ্র জাতিকে একটি পৃথক সমষ্টি করিয়া তুলিয়াছে।

নেশনগত বর্ণ

(৬) স্থান পরিবর্ত্তনে নূতন বর্ণ সৃষ্ট হইতে দেখা যায়। যদি কোনো বর্ণের লোক নিজ দেশ ত্যাগ করিয়া অন্য কোনো প্রদেশে গিয়া বাস করিতে থাকে তবে দুই এক পুরুষের মধ্যেই তাহাদের পৃথক হইয়া পড়িবার সম্ভবনা খুব বেশী। সমাজের চোখের সাম্‌নে না থাকিলে তাহারা আহার ও পাকস্পর্শাদি সম্বন্ধে যে যথেষ্ট সাবধানতা রক্ষা করিয়াছে তাহার কোনো প্রমাণ নাই ; এই জন্য পুত্র কন্যার বিবাহের সময়ে প্রচুর অর্থ লাগে। কিন্তু বর্ত্তমানে রেল হওয়াতে বিবাহাদি ক্রিয়া কর্মের সময়ে দেশে গিয়া সমাজের সহিত যোগরক্ষা করা সম্ভব ও সুলভ হইয়াছে। প্রাচীনকালে স্থান পরিবর্ত্তনের ফলে রাঢ়ী, বারেন্দ্র, তিরহুতিয়া, জৌনপুরী, কনৌজিয়া প্রভৃতি ব্রাহ্মণ-বর্ণের মধ্যে ভেদ সৃষ্ট হইয়াছিল। মালাবারের নামবুদ্রি ব্রাহ্মণগণকে দেখিলে আর্য্য বলিয়াই মনে হয়, কিন্তু তাহাদের অন্যান্য আচার অপরাপর স্থানের ব্রাহ্মণের ন্যায় আদৌ নহে। নামবুদ্রি ব্রাহ্মণেরা তাহাদের কন্যার বিবাহ অল্প বয়সে দেয় না। বহু বিবাহ তাহাদের মধ্যেই খুবই প্রচলিত ; জ্যেষ্ঠপুত্র ব্যতীত অপর কাহারও বিবাহ জাতির মধ্যে হয় না। অন্যান্য ছেলেরা নায়ার রমণীদের উপপতিরূপে থাকে। নায়ারদের মধ্যে বহু-স্বামী বিবাহপ্রথা বিদ্যমান ছিল এবং এখনো পূর্বোক্ত প্রথা ইহাদের মধ্যে রহিয়াছে।

স্থান-পরিবর্ত্তনে বর্ণভেদ

(৭) স্থান পরিবর্ত্তনে যেমন নূতন বর্ণ সৃষ্ট হয় তেমনি কোনো লৌকিক আচার ত্যাগ করিলে নূতন বর্ণ উদ্ভূত হয়। শাস্ত্রানুসারে যাহারা ক্রিয়া কর্ম করে না তাহারা ব্রাত্য। ইতিহাসে বরাবরই ব্রাত্যদের উল্লেখ পাওয়া যায় ; ব্রাত্যদের সহিত সামাজিক সম্বন্ধ রক্ষা নিন্দনীয়। উত্তর-পশ্চিমের 'বাভন' জাতি এককালে ব্রাহ্মণ ছিল, কৃষিকার্য্য গ্রহণ করায় তাহাদের পতন হয়। মোঙ্গলীয় রাজবংশী কোচেরা বলে যে পরশুরামের ভয়ে

আচার পরিবর্ত্তনে জাতিভেদ

তাহারা পলাইয়া আসিয়াছিল বলিয়া তাহাদের পতন হয়। উগ্রক্ষত্রিয়েরা আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া অভিহিত করিয়া ঐরূপ ব্যাখ্যা দিয়া থাকেন। বাংলার কায়স্থগণ ক্ষত্রিয় ছিলেন, তারপর তাঁহাদের পতন হয় ও অন্যান্য ক্ষত্রিয়দের সহিত ক্রিয়াদি বন্ধ হইয়া যায়। এইরূপ বেরারের বনজারী, মাদ্রাসের বল্লুবন, জাতাপু, মধ্যপ্রদেশের চিতারী, বোম্বাইয়ের নাদোর, প্রভৃতি বর্ণ এই শ্রেণীর মধ্যে পড়ে। বিধবা-বিবাহ দিয়া একদল লোক সমাজে পৃথক হইয়া পড়িয়াছিল। বাংলার পীরআলি ব্রাহ্মণ ও কায়স্থেরা বোধ হয় এইরূপ কোনো আচার ত্যাগ করায় এক্ষণে পৃথক বর্ণ রূপে পরিগণিত হয়।

বর্ণের মধ্যে যেমন সাত প্রকারের ভেদ দেখা গেল, উপবর্ণের মধ্যেও তেমনি পৃথক পৃথক শ্রেণী আছে। ভারতের নানা স্থানে একই কর্মের জন্য নানা বর্ণের সৃষ্টি হইয়াছিল। ধোপার প্রয়োজন সব দেশেই ছিল এবং প্রত্যেক স্থানেই একদল লোক এই কাজ আরম্ভ করে ও তাহাদের কাজ ক্রমে বংশগত হইয়া দাঁড়ায়; কিন্তু একস্থানের ধোপার সহিত অন্য স্থানের ধোপার কোনো সম্বন্ধ ছিলনা। ধোপা বলিলেই যে ভারতের যাবতীয় ধোপা বুঝায় এবং তাহাদের উৎপত্তি এক স্থান বা এক ঋষি হইতে হইয়াছে তাহা নহে। মগধিয়া তিরহুতিয়া, আউধিয়া, বাঙ্গালী ধোপা সবই পৃথক। প্রত্যেক স্থানে প্রত্যেকটি বর্ণ সম্বন্ধেই এই কথা কিঞ্চিদধিক খাটে।

বর্ণ বা জাতি ছিল জাতীয় জীবনের মর্মস্থল। ধর্ম, নীতি, শিক্ষা, দীক্ষা সমস্তই জাতের মধ্যে আবদ্ধ ছিল। শিক্ষার ভার যেমন সমাজের হাতে ছিল—শাসনের ভার সমাজ নিজ হাতে রাখিয়া ছিল, রাজপুরুষের হস্তে তাহা তুলিয়া দেয় নাই। প্রত্যেক বর্ণের বা উপবর্ণের নিজ নিজ পঞ্চায়েৎ আছে। ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য উচ্চ-বর্ণের মধ্যে পঞ্চায়েৎ প্রথা নাই; সমাজপতি ও বয়োজ্যেষ্ঠেরা যাহা করেন

সমাজ-শাসন

তাহাই সকলে মানিয়া চলে। অন্যান্য বর্ণের মধ্যে পঞ্চায়েতের ক্ষমতা প্রভূত, পঞ্চায়েৎ অপরাধীর শাস্তি বিধান করে, দুর্নীতি হইতে সমাজকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করে ও আচার রীতিনীতি মানিয়া চলিতে বাধ্য করে।

বর্ত্তমানে ব্রাহ্মণেতর সকল বর্ণই আপনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠ বর্ণ ও অন্য সকলেই শূদ্র ইহা হইতেছে লৌকিক মত। ইহা মানিতে লোক এখন রাজি নহে। বাংলাদেশের কায়স্থগণ আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া প্রচারিত করিয়া উপবীত গ্রহণ করিতেছেন, ক্ষত্রিয়দের ন্যায় একাদশ দিন কালাশৌচ মানিতেছেন। নমশূদ্রেরা ব্রাহ্মণ বলিয়া লিখাইতেছে, চাষী-কৈবর্ত্ত মাহিষ্য বলিয়া আত্মপরিচয় দিতেছে, আসামের হাড়িরা বৃত্তিয়াল বেণিয়া বলিয়া ঘোষণা করিতেছে। বহু জাতি আপনাদিগকে বৈশ্য বলিয়া প্রকাশ করিতেছে। এই সকল 'জাতে ওঠা'র জন্য বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় না। কয়েকজন ব্রাহ্মণকে কিঞ্চিৎ মুদ্রা দিলেই ব্যবস্থা সহজে মিলিত। ক্রমে এই প্রথার

সকল বর্ণের মধ্যে জাতে উঠার চেষ্টা

এমনি ব্যভিচার ঘটিতে লাগিল যে কাশীর পণ্ডিতগণ অবশেষে বাংলার পণ্ডিতদের এইরূপ ব্যবহারে প্রতিবাদ করিতে বাধ্য হইলেন এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে অর্থ প্রত্যর্পণ ও ব্যবস্থা উঠাইয়া লইতে বাধ্য করিলেন। এই 'জাতে ওঠার' চেষ্টা ভারতের সর্বত্র চলিতেছে। পূর্ব পূর্ব আদমসুমারীর প্রতিবেদনে স্থানীয় রীতি অনুসারে উচ্চনীচক্রমে বর্ণের নামের তালিকা ছাপা হইত। গত ১৯১১ সালের আদমসুমারী গ্রহণের সময়ে পূর্বের এই ব্যবস্থার প্রতিবাদ করিয়া চারিদিক হইতে আবেদন আসিতে থাকে; সকলেরই প্রতিপাদ্য বিষয় এই যে 'তাহারা' জাতে বড়। এই আবেদনের ওজন হইতেছিল দেড় মণ। নীচু হইতে উপরে উঠিবার চেষ্টা সর্বত্র সমভাবে চলিতেছে; কিন্তু সে চেষ্টা সফল হইতে এত সময় লাগিতেছে যে যাহারা নীচে পড়িয়া আত্মগ্লানি ভোগ করিতেছে তাহাদের পক্ষে ধৈর্য্য রক্ষা

করা কঠিন। সেই জন্য দাক্ষিণাত্যের অব্রাহ্মণ বর্ণ সমূহ মরিয়া হইয়া ব্রাহ্মণদের শত্রুতা আরম্ভ করিয়াছে।

মাদ্রাজ ও বঙ্গে হিন্দুসমাজের মধ্যে দুইটি মাত্র বর্ণ আছে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র। বাংলাদেশে যে ব্রাহ্মণ নয় সেই শূদ্র এইরূপ ধারণা প্রাচীনদের মধ্যে চলিত। কিন্তু মাদ্রাসের উচ্চ ও নীচ বর্ণের মধ্যে যে প্রকার ভেদ এখনো বিদ্যমান ভারতের আর কোথাও এরূপ দেখা যায় না। সেখানকার ব্রাহ্মণগণ অব্রাহ্মণ কাহারও হাতে কিছু আহার করেন না। পঞ্চম বা অন্ত্যজেরা ব্রাহ্মণের গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না; বহুদূর হইতে ব্রাহ্মণকে দেখিলেই তাহাদিগকে পথ ছাড়িয়া দিয়া যাইতে হয়। সমাজে কোন বর্ণের কিরূপ অবস্থা তাহা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। বর্ত্তমানে ইংরাজী শিক্ষার ও খৃষ্ট ধর্ম প্রচারের ফলে এই সকল অন্ত্যজ জাতির মধ্যে আত্মশক্তি প্রকাশ পাইতেছে। নীচবর্ণের উচ্চে উঠিবার প্রথম ধাপ হইতেছে আহার ও বিবাহ সম্বন্ধে উচ্চ বর্ণের প্রথা মানিয়া চলা, বাল্য-বিবাহ প্রবর্ত্তন, বিধবা-বিবাহ সমর্থন না করা। উচ্চবর্ণের অনুকরণে নিম্নবর্ণের মধ্যেও কুলীন প্রথা, শ্রেণী-বিভাগ, উত্তর-রাঢ়ী, দক্ষিণরাঢ়ী, বারেন্দ্র প্রভৃতি ভেদও প্রবেশ করিয়াছে। বর্ত্তমানে সমস্ত বর্ণ উপবর্ণের মধ্যে আপনাকে বড় বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা দেখা দিয়াছে। সকলেই ব্রাহ্মণের শক্তিকে হ্রাস করিতে ব্যস্ত; মাদ্রাজে কোথায়ও কোথায়ও ব্রাহ্মণ ব্যতীত ক্রিয়া কর্ম করিবার প্রয়াস চলিতেছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তাহাদের নিম্নস্থ বর্ণ যখন মাথা তুলিতে চায় তখন তাহারাই উহাদের সব চেয়ে বড় শত্রু হয়; এই পরস্পর পরস্পরকে নীচে রাখিয়া নিজে বড় হইবার ইচ্ছা প্রত্যেক বর্ণ ও উপবর্ণের মধ্যে এত অধিক যে তাহাতে কাহারও উন্নতি পূর্ণমাত্রায় হইতেছে না।

ইংরাজ আগমনের পর শিক্ষা বিস্তার, রেল ও বাণিজ্য বিস্তারের সঙ্গে

সঙ্গে বর্ণের গোঁড়ামী অনেকটা ফিকে হইয়া আসিয়াছে। উপবর্ণের মধ্যে ভেদ ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে; রাঢ়ী বারেন্দ্রের ভেদ ক্রমেই হ্রাস পাইতেছে; এবং পাটেলের সর্ব বর্ণের মধ্যে বিবাহ সিদ্ধ হইবার প্রস্তাব উপস্থাপিত ও সমর্থিত হইবার মত সাহস যে হিন্দুসমাজের ভিতর হইয়াছে তাহার কারণ সে ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে স্বীকার করিতে ইচ্ছুক।

৪। জ্ঞান-বিস্তার।

পশ্চিমের নিকট হইতে ভারতবর্ষ বহু জিনিষের জন্য ঋণী; ইহার মধ্যে মুদ্রাযন্ত্রই প্রধান। মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে শিক্ষা, ধর্মভাব, জাতীয় ভাব সমস্তই দেশমধ্যে প্রচারিত হইয়াছে। ১৭৭৮ সালে স্যর চার্লস্ উইল্‌কিন্স হুগলী হইতে বাংলা অক্ষরে হলহেড্ সাহেবের "Grammar of the Bengali Language" নামে পুস্তক বাংলা অক্ষরে প্রকাশ করেন। উইলকিন্সের উপদেশে পঞ্চানন কর্মকার নামক হুগলীর এক ব্যক্তি কাঠের বাংলা অক্ষর প্রস্তুত করিয়াছিল। বাংলার ছাপার অক্ষরের ইহাই মূল।

বাংলা মুদ্রাযন্ত্র

প্রাচীন ভাষায় কবিদিগের শেষ রত্ন ভারতচন্দ্রের পর বাংলায় ভাল সাহিত্য বহুকাল সৃষ্ট হয় নাই। য়ুরোপীয়েরা আসিয়া বাংলাদেশে লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক কাহাকেও দেখেন নাই। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বাংলা সাহিত্যে চারিটি ধারা দেখা যায়। ভট্টাচার্য্য পণ্ডিতগণ বাংলা জানিতেন না, সংস্কৃতই তাঁহাদের লেখ্য ভাষা ছিল; যে বাংলা তাঁহারা লিখিতেন তাহা সংস্কৃতের বাড়া। ইহার নমুনা মৃত্যুঞ্জয়ের "প্রবোধ চন্দ্রিকা।" ২য় আদালতী ভাষা; ফার্সী ভাষা রাজ-

সাহিত্যের চারিটী ধারা

ভাষা ছিল; কায়স্থ লেখকেরা এই ভাষার সহিত বাংলা ভাষা মিশাইয়া এমন একটি দুর্বোধ্য খিচুড়ী ভাষা করিয়াছিলেন যে তাহা সাধারণে বুঝিতে পারিত না। ফার্সী ভাষার প্রভাব কবিকঙ্কনের চণ্ডীর মধ্যেও দেখা যায়। ৩য় চল্‌তি ভাষা ও সাহিত্য। গ্রাম্য চল্‌তি ভাষায় কবিওয়ালারা সাহিত্য রচনা করিতেন। ঈশ্বরগুপ্ত বাংলার এই গ্রাম্য চল্‌তি ভাষার শেষ কবি। বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছিলেন "খাঁটি বাংলা কথায় বাঙ্গালীর মনের ভাব ত' খুঁজিয়া পাই না। তাই ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছি।" ৪র্থ—য়ুরোপীয় লেখক। পাশ্চাত্যদের মধ্যে পর্টুগীজগণই বাংলা ভাষার প্রথম লেখক। ইহাদের লেখার নমুনাও পাওয়া গিয়াছে। তারপর শ্রীরামপুরের বিখ্যাত মিশনারী মহাত্মা কেরী, মার্শমান, ওয়ার্ড বাংলা ভাষার যে কি পরিমাণ উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন তাহা বাঙ্গালী মাত্রেরই অবিদিত নহে। য়ুরোপীয়গণ দুই কারণে বাংলা ভাষা শিক্ষা করেন। প্রথমতঃ বাঙ্গালীদের সহিত কাজকর্ম চালাইবার জন্য বিদেশী বণিকগণ বাংলা ভাষা শিখে এবং তন্নিমিত্ত এই ভাষায় ব্যাকরণ ও দুই চারিখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। দ্বিতীয়তঃ পাদরীগণ এদেশের ভাষা শিক্ষা করিয়া খৃষ্ট ধর্ম প্রচার করেন। ১৮০০ সালে ইংরেজ সিভিলিয়ান্‌দিগকে দেশীয় ভাষা শিক্ষা দিবার জন্য কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম্‌ কলেজ স্থাপিত হয়। মিশনারীগণ বাংলা গদ্যে নানাবিধ পুস্তক রচনা করিয়া সর্বপ্রথমে প্রচার করেন। ১৭৪৩ সালে সর্বপ্রথম গ্রন্থ 'ব্যাকরণ ও অভিধান' মুদ্রিত হয়। পর্তুগীজ বণিকেরা চট্টগ্রামের কথ্যভাষায় ইংরেজী অক্ষরে এই গ্রন্থ রচনা করেন। ১৭৬৭ সালে বেণ্টো 'প্রার্থনা মালা' ও 'প্রশ্নমালা' নামে দুই গ্রন্থ লণ্ডন সহরে মুদ্রিত করেন। ১৭৭৮ সাল হইতে এদেশে পুস্তক ছাপান আরম্ভ হয়। ১৭৪৩ হইতে ১৮১৮ সাল পর্য্যন্ত ৮২ খানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছিল। ইহার মধ্যে অধিকাংশই খৃষ্টান পাদরীদের

সাহিত্যের আলোচনা

লিখিত। বাঙ্গালীদের মধ্যে রামরাম বসু, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়, রাজা রামমোহন রায়ের নাম উল্লেখযোগ্য।

১৮১৬ সালে বাংলার প্রথম সাময়িক পত্রিকা বাহির হয়। অনেকের ধারণা খৃষ্টান পাদরীগণই ইহার প্রবর্ত্তক; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। ইংরাজী প্রথম সাময়িক পত্রিকা হিকির বেঙ্গল গেজেট ১৭৮০ সালে, প্রকাশিত হয়; সেই হইতে অনেক ইংরেজী পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছিল। ইংরেজী পত্রিকার অনুকরণে গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য নামক জনৈক বাঙ্গালী "বেঙ্গল গেজেট" নামে পত্রিকা বাহির করেন। এক বৎসরের মধ্যে ইহা লোপ পায়। সে যুগে কলিকাতার বাহিরে পত্রিকা বা পুস্তক যাইত না; সুতরাং ইহার প্রভাব দেশের উপর কিছুই হয় নাই। তা ছাড়া ইহাতে বিদ্যাসুন্দর, বেতাল পঁচিশ প্রভৃতি কাব্য ছবিসহ মুদ্রিত হইত; সাময়িক পত্রিকায় কোন বিশেষত্ব ছিল না।

প্রথম সাময়িক পত্রিকা

'বেঙ্গল গেজেট' উঠিয়া গেলে ১৮১৮ সালে এপ্রিল মাসে শ্রীরামপুরের বিখ্যাত পাদরী পণ্ডিত মার্শম্যান "দিগ্‌দর্শন" নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই সময়ে গভর্ণমেণ্টের নিকট মুদ্রিতব্য বিষয়ের পাণ্ডুলিপি পরীক্ষার জন্য প্রেরিত হইত। এই প্রথার জন্য কতকগুলি ইংরাজ সম্পাদক দায়ী। ১৭৮০ সালে হিকির 'বেঙ্গল গেজেট' প্রথম প্রকাশিত হয়। তখন মুদ্রাযন্ত্র বিষয়ে কোনো আইন না থাকাতে লোকের যাহা খুসী তাহা লিখিত; বিশেষত উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের ব্যক্তিগত বা পারিবারিক জীবনের ইতিহাস লইয়া কুৎসা ও সমালোচনা ইহাদের প্রধান অঙ্গ ছিল। ওয়ারেন হেষ্টিংস 'হিকির গেজেট' উঠাইয়া দেন। লর্ড কর্ণওয়ালিশ ১৭৯৩ সালে আইন করেন যে গভর্ণমেণ্টের কোনো কার্য্য সম্বন্ধে সমালোচনা পত্রিকাতে প্রকাশিত হইলে সম্পাদকে শাস্তি পাইবেন। কিন্তু ব্যক্তিগত সমালোচনা শ্লেষ রীতিমত প্রকাশিত হইতে থাকিল। এই সময়ে কলিকাতার

ইংরাজী মুদ্রাযন্ত্রের সংখ্যা খুবই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। ১৭৯৩ সালে "কলিকাতা ম্যাগাজিন" "ওরিয়াণ্টাল মিউজিয়ম" ১৭৯৪ সালে "ইণ্ডিয়ান্ ওয়ারল্ড," "কলিকাতা মন্থলি জার্ণাল" ১৭৯৫ সালে "বেঙ্গল হরকরা" "ইণ্ডিয়ান্ এপোলো" "এসিয়াটিক মিরার", "কলিকাতা কুরিয়ার," 'টেলিগ্রাফ', প্রভৃতি কতকগুলি পত্রিকা বাহির হইয়াছিল। অসংযত ভাষার জন্য "ইণ্ডিয়ান ওয়ারল্ডের" সম্পাদক, "টেলিগ্রাফের" সম্পাদক, "এশিয়াটিক মিরারের" সম্পাদক নির্বাসিত হন। অবশেষে ১৭৯৯ সালে লর্ড ওয়েলিস্‌লী পাণ্ডুলিপি পরীক্ষা ও সংবাদ পত্র পরিচালন বিষয়ে বিশেষ কতকগুলি আইন প্রণয়ন করেন। পরীক্ষকগণ আপত্তিকর অংশগুলি কাটিয়া দিতেন। এইরূপ লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া অনেক সম্পাদকের পত্রিকা প্রকাশ করিবার সখ কমিয়া আসিল।

ইংরাজী খবরের কাগজ

শ্রীরামপুরের মিশনারীরা "দিক্‌দর্শন" ও 'সমাচার দর্পণ" নামে দুই-খানি কাগজ বাহির করেন; মারকুইস অব্ হেষ্টিংস "সমাচার দর্পনের" অনুবাদ পড়িয়া খুব প্রীত হইয়াছিলেন। হেষ্টিংস সাধারণের মতকে খুব শ্রদ্ধা করিতেন; সেইজন্য তিনি পত্রিকার পাণ্ডুলিপি পরীক্ষা বিষয়ক আইনের কঠোরতা কমাইয়া দিলেন।

"দিগ্‌দর্শন" সমাচার দর্পণ

"দিগদর্শনে" রামমোহন রায় প্রবন্ধাদি লিখিতেন। কিন্তু ১৮১৯ সালে কলিকাতাস্থিত নব-প্রকাশিত "গস্পেল ম্যাগাজিন" পত্রিকায় হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে লিখিতে থাকিলে রাজা রামমোহন রায় "সংবাদ কৌমুদী" নামে একখানি সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র ও ১৮২১ সালে "ব্রাহ্মণ সেবধি" নামে মাসিক পত্র বাহির করিয়া মিশনারীদের উত্তর দিতে লাগিলেন। এই সময় হইতে রাজা রামমোহন রায় তাঁহার বেদান্ত প্রতিবাদ্য একেশ্বরবাদ প্রচার করিতে আরম্ভ করেন ও সতীদাহের বিরুদ্ধে ও লৌকিক হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে লিখিতে থাকেন।

রামমোহন রায়

তখনই তাঁহার শক্র বৃদ্ধি হইল; রাধাকান্ত দেব হিন্দুসভার পক্ষ হইতে "সমাচার চন্দ্রিকা" নামে এক সাপ্তাহিক পত্রিকা বাহির করিলেন। এই দেলাদলিতে সাহিত্যক্ষেত্রে অনেক পুস্তক পুস্তিকা ও পত্রিকা প্রকাশিত হইল। রামমোহনের সমর্থনে "বঙ্গদূত" হিন্দু সভা ও "চন্দ্রিকার" সমর্থনে "সংবাদ তিমিরনাশক।". দশ বৎসর কাল উভয় দলের তর্কযুদ্ধ চলিল। ১৮৩১ সালে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সুপ্রসিদ্ধ 'সংবাদ প্রভাকর" সাহিত্যজগতে আবির্ভূত হইয়া বঙ্গসাহিত্যকে রস সিঞ্চিত করিল। ঈশ্বরগুপ্ত ধর্ম কথার বাদ প্রতিবাদে যোগ দেন নাই; তিনি কবিতা লিখিয়া সকল সমাজকে ব্যঙ্গ করিতে লাগিলেন। সাহিত্য বলিতে যাহা বুঝায় তাহা এই সময় হইতে আরম্ভ। প্রভাকরের হাস্য ও ব্যঙ্গ রসের লেখাই ছিল লোকের আকর্ষণ। ঈশ্বরগুপ্ত একদল লেখক সৃষ্টি করিয়া গেলেন। অক্ষয়কুমার দত্ত, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্কিম, দীনবন্ধু সকলেই এই পত্রিকাতে তাঁহাদের হাতের লেখা মক্স করেন। দেখিতে দেখিতে প্রভাকরের অনুকরণ করিয়া ২০।২৫ খানি সাময়িক পত্রিকা প্রকাশিত হইল।

ঈশ্বরগুপ্তের প্রভাকর

সেই সময়কার সাহিত্যিক আন্দোলন কলিকাতার মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। মফঃস্বলে শিক্ষার অবস্থা খুব শোচনীয় ছিল। শিক্ষার ইতিহাসে সে বিষয়ে সবিস্তার আলোচনা হইয়াছে। ১৮৩৫ স্যর চালস্ মেটকাফ অস্থায়ীভাবে গবর্ণর-জেনারেল হইয়া মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা দান করিলেন। এই স্বাধীনতা দানের জন্য আমরা তৎকালীন আইন সদস্য লর্ড মেকলের নিকট ঋণী; তাঁহারই অদম্য চেষ্টায় ভারতবাসীরা এই অধিকার পায়।

মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা

মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রদত্ত হইলে বঙ্গীয় মুদ্রাযন্ত্রগুলি অবিশ্রাম পত্রিকা

প্রকাশিত করিতে লাগিল। ১৮৩৭ সালে মহারাণী ভিক্টোরিয়া ইংল্যাণ্ডের রাজ্যভার গ্রহণ করিলে ঐ অব্দে বাংলাভাষা আদালত সমূহে পার্শি ভাষার পরিবর্ত্তে দ্বিতীয় রাজভাষা রূপে গৃহীত হইল। গভর্ণমেণ্ট ১৮৪১ সালে বাংলাদেশে ১০১টি বঙ্গ-বিদ্যালয় খুলিয়া বাংলা ভাষার উন্নতি সাধনে সহায়তা করিলেন।

এই সময়ে বঙ্গীয় সমাজের রুচি খুবই নীচগামী হইয়াছিল। বড় কবি দেশে ছিল না। অল্প শিক্ষিত লোকে কবির লড়াই, নিম্ন শ্রেণীর লোকে খেউড়, তরজা প্রভৃতির গান শুনিয়া তুষ্ট হইত। পাঁচালী ও যাত্রা সাধারণ লোকের নিজস্ব সম্পত্তি ছিল। আমরা যে পর্বের কথা বলিতেছি সে যুগে হরু, নিতাই বৈরাগী, রাম বসু, নীলু, রামপ্রসাদ ঠাকুর, আণ্টুনী সাহেব, ঠাকুরদাস সিংহ, ঠাকুরদাস চক্রবর্ত্তী, ঠাকুরদাস দত্ত, গঙ্গাধর মুখোপাধ্যায় ও ঈশ্বর গুপ্ত কবিওয়ালা বলিয়া খ্যাত ছিলেন। এছাড়া আরও অনেকের নাম ও কবিতা পাওয়া যায়। অশ্লীল গালাগালি, কবির লড়াই, চুটকী খেউড় সাধারণের পাঠের ও উপভোগের সামগ্রী ছিল। সুতরাং 'প্রভাকর' 'ভাস্কর' 'রসরাজ' 'পাষণ্ড পীড়ন' প্রভৃতি পত্রিকা খুবই লোকপ্রিয় হয়; এবং ইহার সম্পাদকগণ দুইপয়সা করিতেও পারিয়াছিলেন। অন্যান্য কাগজ দুই এক বৎসরের মধ্যে লোপ পাইত; কেননা কাগজ চালানো লোকশানের ব্যাপার ছিল। প্রভাকর ও ভাস্কর প্রভৃতিতে ভাল জিনিষও থাকিত; কিন্তু দেশের শিক্ষিত দল বাংলা পড়াকে ইতরতা মনে করিতেন। হিন্দু কলেজের ছাত্রেরা চাল চলন, খাওয়া দাওয়া প্রভৃতি সকল বিষয়ে ইংরেজদের চেলা হইয়া উঠিলেন। রাজনারায়ণ বসু, দেওয়ান কার্ত্তিকেয় চন্দ্ররায়, রামতনু লাহিড়ী প্রভৃতির জীবনী পাঠে আমরা সেই সময়ের খুবই সুন্দর চিত্র পাই। মোটকথা বাংলার উচ্চ-শিক্ষিত লোকদিগের অনেকেই বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্যের প্রতি দৃষ্টি দিতেন না।

তৎকালীন সাহিত্য

১৮৪৩ সালে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'তত্ত্বোবোধিনী' পত্রিকা প্রকাশ করেন। তত্ত্বোবোধিনী সভা প্রতিষ্ঠিত হইবার ১৬ বৎসর পূর্বে রাজা রামমোহন রায় কর্তৃক ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হয়। তত্ত্বোবোধিনী প্রচারের পর বঙ্গের শিক্ষিত যুবকগণ একে একে বঙ্গসাহিত্যে মন দিলেন। অক্ষয় কুমার দত্ত ইহার সম্পাদকতার ভার গ্রহণ করেন। লোকে বুঝিল গম্ভীর জিনিষও বাংলা ভাষায় প্রকাশ করা যায়।

তত্ত্বোবোধিনী সভা ও পত্রিকা

ব্রাহ্মসমাজ হইতে তত্ত্বোবোধিনী বাহির হইলে হিন্দুসমাজ হইতে 'নিত্য ধর্মানুরঞ্জিকা,' 'ধর্মরাজ,' 'হিন্দুধর্ম চন্দ্রোদয়' 'হিন্দু বঙ্গ' প্রভৃতি অনেক-গুলি পত্রিকা বাহির হয়। এই সকল পত্রিকার কাজ ছিল ব্রাহ্মসমাজ ও খৃষ্টান সমাজের বিরুদ্ধে প্রবন্ধ প্রকাশ। এই সময়ে সাময়িক উত্তেজনার বিষয় অনেক ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা-বিবাহ বিষয়ক আন্দোলন ও স্ত্রীশিক্ষার আলোচনা সমাজে বিপ্লব সৃষ্টি করিতেছিল। ১৮৪৯ সালে বেথুন বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপিত হয়; সে সময়ের রক্ষণ-শীলদলের প্রতিবাদ ও শ্লেষ সাময়িক-সাহিত্যকে অন্ধকারময় করিয়া তুলিয়াছিল। ১৮৫৬ সালে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা সম্বন্ধীয় আইন পাশ হয়। সুতরাং লোকের আন্দোলনের বিষয়ের অভাব হইল না। এই সময়ের পত্রিকাগুলির নামের তালিকা দিতেই অনেকখানি স্থান লাগিবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই রাশি রাশি মাসিক পত্রিকার মধ্যে ব্রাহ্মসমাজ পরিচালিত 'তত্ত্বোবোধিনী পত্রিকা' মহিলাদের পত্রিকা 'বামাবোধিনী' ও 'ধর্মতত্ত্ব' নববিধান সমাজের পত্রিকা মাত্র এখন জীবিত আছে।

সমাজ-বিপ্লব ও সাহিত্য সৃষ্টি

১৮৫৬ সাল হইতে বাংলার সাময়িক-সাহিত্য নূতন পথে চলিতে আরম্ভ করিল। 'এডুকেশন গেজেট' গভর্ণমেণ্টের সাহায্যে বাহির হইল।

এডুকেশন গেজেট

মিঃ ওব্রায়ান ইহার সরকারী সম্পাদক; কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার সহকারী ছিলেন। ১৮৬৬ সালে প্যারীচরণ সরকারের হাতে এই কাগজ খুব উন্নতি লাভ করে। প্যারীচরণের সহিত সরকারের মত মিলিল না বলিয়া দুই বৎসর পরে ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 'এডুকেশন' গেজেটের সম্পাদক হন। ভূদেবের সমস্ত বিখ্যাত প্রবন্ধরাজি, হেমচন্দ্রের অনেক কবিতা এই পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। এখনো এই পত্রিকা চলিতেছে—কিন্তু বর্ত্তমানে ইহার সে রচনা সম্পদ বা বিশেষত্ব নাই।

১৮৫৮ সালে আর একখানি পত্রিকা বাংলা দেশে প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ ইহার প্রথম সম্পাদক। বিদ্যাসাগর মহাশয় ও বিদ্যাভূষণ মহাশয় বাংলা ভাষায় বহুবিধ বিষয় অলোচনা করিতে লাগিলেন। প্রভাকর প্রভৃতি পত্রিকার রুচি ও ভাষার স্থানে এই নূতন পত্রিকাখানি নবযুগ সৃষ্টি করিল।

১৮৬৮ সালে যশোহর হইতে শিশির কুমার ঘোষ "অমৃত বাজার পত্রিকা" নামে এক বাংলা পত্রিকা প্রকাশ করান। তাঁহার আর দুই ভাই হেমন্ত কুমার ও মতিলাল তাঁহার প্রধান সহায় ছিল। ১৮৭২ সালে

অমৃতবাজার পত্রিকা

'অমৃত বাজার' কলিকাতায় উঠিয়া আসে। ইহার লেখার ভঙ্গি, ভাষা ও তেজস্বীতার জন্য গ্রাহক সংখ্যা খুব হইয়াছিল। সরকারের সকল প্রকার ব্যবহারে ত্রুটি ধরিতে 'অমৃত বাজার' গোড়া হইতেই সিদ্ধহস্ত। ১৮৭৯ সালে লর্ড লীটনের দেশীয় মুদ্রাযন্ত্র সম্বন্ধে বিল পাঠ করিয়া শিশির কুমার বুঝিলেন 'পত্রিকা' ইহার মধ্যে পড়িবে। ১৪ই মার্চ তিনি বিল সম্বন্ধে পড়িলেন ও পর সপ্তাহে তাঁহারা তিন ভায়ে মিলিয়া, নিজেরাই কম্পোজ করিয়া, ছাপাইয়া, ইংরাজীতে 'অমৃত বাজার পত্রিকা' বাহির করিলেন। প্রথম ১১ বৎসর

পত্রিকা বাংলা ভাষাতেই প্রকাশিত হইয়াছিল ; তারপর হইতে ইংরাজীতে বাহির হইতেছে। "অমৃত বাজার" এখন পর্য্যন্ত স্বদেশের প্রচুর কল্যাণ সাধন করিতেছে ; সমস্ত অন্যায়ের প্রতিবাদ 'পত্রিকা' তীব্রভাবে করেন। সর্বসাধারণেরই ইহা খুব প্রিয়।

সুলভ-সমাচার

১৮৭০ সালে কেশবচন্দ্র সেন 'সুলভ সমাচার' নামে এক পয়সা মূল্যের পত্রিকা প্রকাশ করেন ; ইহার মত সস্তা ও সুন্দর কাগজ সে সময়ে আর ছিল না ; সাধারণের মধ্যে নানা প্রকারের জ্ঞান প্রচারের পক্ষে ইহার কাজ নিতান্ত কম নয়।

বঙ্গদর্শন

বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাবে বাঙ্গালা সাময়িক-সাহিত্যে যুগান্তর হইল। ১৮৭২ সালে "বঙ্গদর্শন" নামে বিখ্যাত মাসিক পত্রিকা তাঁহার তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত হইল। এই সময় হইতে বাংলার গদ্য-সাহিত্যের স্বর্ণময় যুগ আরম্ভ বলা যায়। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, অক্ষয় সরকার প্রভৃতি সেই সময়কার একদল যুবক বঙ্কিমচন্দ্রের পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বঙ্কিম সাহিত্যে নূতন রুচি, নূতন বিষয় প্রবর্ত্তিত করিলেন। বঙ্কিমের সবচেয়ে বড় কাজ হইল সাহিত্যের ক্ষেত্র হইতে সকল প্রকার নীচতা, অশ্লীলতা দূর করা। সমালোচনা সাহিত্যের নূতন অঙ্গ হইল।

ইহার পর চুঁচুড়া হইতে অক্ষয় সরকারের "সাধারণী" ঢাকা হইতে কালীপ্রসন্ন সিংহের "বান্ধব" পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ১৮৭৭ সালে 'ভারতী' ঠাকুর পরিবার হইতে প্রকাশিত হয়। মাসিক পত্রিকার মধ্যে 'সাধনা' বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য। রবীন্দ্র নাথের অনেক গুলি উৎকৃষ্ট গল্প ও প্রবন্ধ প্রথমে ইহাতেই প্রকাশিত হয়। বর্ত্তমান সময়ে এত মাসিক পত্রিকা বাহির হইতেছে যে তাহাদের নাম উল্লেখ করাও সম্ভব নয়। তবে বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য, প্রবাসী। রাজনীতি ও সমাজনীতি সম্বন্ধে ইহার সুযুক্তিপূর্ণ তীব্র সমালোচনার জন্য

সম্পাদক দেশপূজ্য হইয়াছেন। "ভারতবর্ষ" তাহার বৈচিত্র ও গল্পের জন্য বিখ্যাত হইয়াছেন। এছাড়া মুসলমানসমাজে সাহিত্যের নূতন জাগরণ হইয়াছে। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে কয়েকখানি উৎকৃষ্ট কাগজ ইহাদের দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে। গত কয়েক বৎসর 'সবুজপত্র' শিক্ষিত চিন্তাশীল যুবকদের মধ্যে বিশেষ ভাবে কাজ করিতেছে।

সংবাদ পত্রের মধ্যে'বঙ্গবাসী'সবচেয়ে পুরাতন ইহার পরেই 'সঞ্জীবনী'। 'হিতবাদী,' 'বসুমতী।' এই সব সংবাদ পত্রের দ্বারা দেশের প্রভূত কল্যাণ হইয়াছে। নিতান্ত ক্ষুদ্র গ্রামেও দুই একখানি খবরের কাগজ যায়। ইহাদের সবচেয়ে বড় কাজ উপহারের মধ্যে দিয়া সাহিত্য প্রচার। বঙ্গবাসী প্রাচীন হিন্দু ধর্মশাস্ত্র মূল ও অনুবাদসহ প্রচার করিয়াছেন; হিতবাদী ও বসুমতী অনেক বড় বড় সাহিত্যিকদের গ্রন্থাবলী উপহার দিয়াছেন। সুলভে এই সকল গ্রন্থরাজি প্রচারের জন্য দেশ তাঁহাদের নিকট যে কতখানি ঋণী তাহা বলা যায় না।

দেশের জ্ঞানবিস্তারের আর যে সকল প্রতিষ্ঠান সাহায্য করিয়াছেন আমরা সংক্ষেপে সে গুলি নির্দেশ করিব।

ভারতবর্ষের ইতিহাস উদ্ধার, প্রাচীন ভাষা ও লেখ আবিষ্কার, প্রাচীন সাহিত্য প্রচারের জন্য ভারতবাসী য়ুরোপীয়দের নিকট ঋণী।

এশিয়াটিক সোসাইটি

স্যর উইলিয়ম জোন্স্ নামে জনৈক ইংরেজ কর্মচারী ওয়ারেন হেষ্টিংসের শাসনকালে এদেশে ১৭৮৩ সালে আসেন। তিনি সংস্কৃতে পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহারই অনূদিত শকুন্তলা সর্বপ্রথমে য়ুরোপে প্রচারিত হয়। ১৭৮৪ সালে ১৫ই জানুয়ারী তারিখে জোন্সের উৎসাহে ৩০ জন ইংরাজ ভদ্রলোক এশিয়াটিক্ সোসাইটি (Asiatic Society) স্থাপন করেন। মানুষ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে গবেষণা করাই ইহার মোটামুটি উদ্দেশ্য ছিল। প্রথম সকল সভ্যই য়ুরোপীয় ছিলেন। দেশীয়দের মধ্যে দেশের ইতিহাস অনুসন্ধান

করার মত বিদ্যাবুদ্ধি তখন কাহার ছিল না। ইঁহারা ধীরে ধীরে নানা স্থান হইতে শিলালিপি, প্রাচীন মুদ্রা, প্রাচীন পুথি প্রভৃতি সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। ১৮১৪ সালে এই সমিতি একটি ছোট খাটো মিউজিয়াম্ খোলেন। কিন্তু এসব কার্য্য সরকারী সাহায্য ব্যতীত পরিচালন করা অসম্ভব। ১৮৩৯ সালে সোসাইটি বিলাতের কোর্ট অব ডিরেক্টারের নিকট হইতে টাকা সাহায্য পাইলেন। ১৮৬৬ সালে সরকার ইহার সম্পূর্ণ ব্যয়-ভার বহন করিয়া স্বয়ং দায়ীত্ব গ্রহণ করেন; যাদুঘর ভারতের প্রধান প্রধান সহরে খোলা হইয়াছে। লোক শিক্ষার পক্ষে ইহার মূল্য যে কত তাহা বলা যায় না। ভারতের অনেক প্রাচীন কীর্ত্তি যাদুঘরে রক্ষিত হইতেছে। দুঃখের বিষয় আমরা জিনিষ চিনিতে ও আদর করিতে জানি না বলিয়া বহুমূল্য অনেক জিনিষ ও পুঁথি এখন লণ্ডনের বৃটীশ মিউজিয়মে, অক্সফোর্ডের বোডলেন লাইব্রেরীতে, প্যারিসের লুভেরে, বার্লিনে, বষ্টনে, হার্ভড়ে রহিয়াছে।

মিউজিয়ম্

এশিয়াটিক সোসাইটি ১৭৯০ হইতে ১৮৩৯ সাল পর্য্যন্ত বড় বড় ২০ খণ্ড প্রবন্ধ ও কার্য্যাবলীর বিবরণ প্রকাশিত করেন। য়ুরোপে এই সব গ্রন্থ পৌছিলে সেগুলির খুবই আদর হয়, ফরাসী ভাষায় ইহার অনুবাদ পর্য্যন্ত হয়। ১৮৩২ সালে প্রিন্সেপ সাহেব এশিয়াটিক সোসাইটি হইতে মাসিক জর্ণাল বা পত্রিকা প্রকাশ আরম্ভ করেন। প্রিন্সেপ সাহেব অশোকের শিলালিপি আবিষ্কার করিয়া অমর হইয়াছেন। এই সোসাইটি ১৮৪৮ সাল হইতে ভারতীয় সাহিত্যাদি মুদ্রিত করিতে আরম্ভ করেন। ইহাতে দেশময় সংস্কৃত, পার্শী গ্রন্থ প্রচারিত হইতে থাকে। এশিয়াটিক সোসাইটি ভারতের ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, প্রাণী-বিজ্ঞান প্রভৃতি নানা কোঠায় জ্ঞান-বিস্তারে যে কতটি সহায়তা করিয়াছে তাহা বিশেষজ্ঞ ছাড়া সাধারণের হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন।

সোসাইটির কাজ

ভারতবর্ষের অন্যান্য জ্ঞানোন্নতি সমিতির মধ্যে 'বঙ্গের রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটি' বাঁকিপুরের 'বিহার উড়িষ্যা রিসার্চ সোসাইটি' পঞ্জাব, উত্তর পশ্চিম প্রদেশের ঐতিহাসিক সভা (Historical Society), হায়দ্রাবাদের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ,, মৈশূরের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ, পুণার ভাণ্ডারকার রিসার্চ ইন্‌সটিটিউট্, বোম্বাইয়ের পার্শীদের কামা ইন্‌সটিটিউট, উত্তর বঙ্গের বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি, বঙ্গীয় সাহিত্য পারিষদ্‌এর নাম উল্লেখ যোগ্য।

অন্যান্য সমিতি

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইতেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতি ছাত্রগণ আজ সাহিত্যে, শিল্পে, ইতিহাসে, প্রত্নতত্ত্বে, বিজ্ঞানে, সর্ব বিষয়ে নাম করিয়াছে। কলিকাতা য়ুনিভার্সিটির বাহিরে স্যর জগদীশচন্দ্র বসুর "বসু মন্দির" বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য। এ ছাড়া 'সায়েন্স এশোসিয়েসন' বিজ্ঞান সমন্ধে আলোচনাদি করিয়া অনেক কাজ করিয়াছেন। কিন্তু এই সমিতির সব চেয়ে বড় কাজ এদেশ হইতে উপযুক্ত ছাত্রদের বিলাত পাঠাইয়া বিজ্ঞান ও শিল্প বিষয়ে পারদর্শী করিয়া আনা। বহুশত যুবক এই এসোশিয়েশনের কল্যাণে উচ্চ-শিক্ষা পাইয়াছেন। কলিকাতা হাইকোর্টের স্বর্গীয় বিচারক চন্দ্রমাধব ঘোষের পুত্র শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ ঘোষের অদম্য উৎসাহের জন্য এই কল্যাণকর প্রতিষ্ঠানটি চলিতেছে।

ভারতের নানাস্থানে আজ কাল এত প্রকার সমিতি ও জ্ঞান বিস্তার ও আত্মোন্নতির জন্য এত নূতন নূতন পত্রিকা, সংবাদ পত্র প্রকাশিত হইতেছে তাহা লিপিবদ্ধ করা অসম্ভব।

ভাবে সারি সারি খাড়া আছে যে, সেখান দিয়া কাহারো প্রবেশ সহজ নহে। পূর্বদিকে থাকে-থাকে পাহাড় উত্তর-দক্ষিণে লম্বা হইয়া বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। পশ্চিমদিকে হলা স্থলেমান প্রভৃতি পর্ব্বতশ্রেণী আফগনিস্থান ও বেলুচিস্থানের মধ্যে দাঁড়াইয়া আছে। ভারতের দক্ষিণে ভারত-মহাসমুদ্র, সে সমুদ্রের কূল নাই ; প্রত্যক্ষভাবে কোনো রাষ্ট্রের সহিত ইহার যোগ না থাকিলেও পরোক্ষভাবে জলপথ দিয়া সকল জাতির সহিত যোগাযোগ সম্ভব হইয়াছে।

ভারতবর্ষকে বাহিরের পৃথিবী হইতে প্রকৃতি দুই উপায়ে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। ভারতের উত্তরাংশ তিনদিক হইতে পর্ব্বতের দ্বারা এমনভাবে বেষ্টিত যে, হঠাৎ কোনো জাতির পক্ষে সেদিক দিয়া প্রবেশলাভ সহজসাধ্য নহে। দাক্ষিণাত্য অসীম সাগর দিয়া ঘেরা,—বাহির হইতে সমুদ্রপথে কাহারও আসা বহু শতাব্দী পর্য্যন্ত স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। সমুদ্রের দিক্ হইতে ভারত যে নিরাপদ নয়, য়ুরোপীয়দের আগমনের পর হইতে তাহা বুঝা গিয়াছে।

ভারতের প্রাকৃতিক অবস্থা

ভারতের ভূপ্রকৃতিকে আমরা তিন ভাগে ভাগ করিয়া তাহাদের আলোচনা করিব। ১। পর্বত। ২। উপত্যকা। ৩। মালভূমি।

ভারতের উত্তরস্থিত হিমালয় পর্বত মাত্র একটা পাহাড় নয় ; অসংখ্য পাহাড় থাকে-থাকে উঠিয়া গিয়াছে, ইহার মাঝে মাঝে প্রকাণ্ড উপত্যকা ; সে সকল উপত্যকায় য়ুরোপের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুই একটি দেশ থাকিতে পারে। এই সকল উপত্যকায় যে জাতিরা বাস করে তাহাদের রীতিনীতি, ধর্ম-বিশ্বাস, ভাব, ভাষা সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান নিতান্তই পরিমিত। হিমালয় পূর্ব পশ্চিমে প্রায় দেড় হাজার মাইল, প্রস্থেও গড়ে প্রায় দুইশ' মাইল। ইহার উচ্চতাও সব জায়গায় সমান নহে। ইহার পাদমূলের উচ্চতা ৫০০ ফিটের উপর নয়

হিমালয়

—কিন্তু সর্বোচ্চ শিখর ২৯ হাজার ফিট উচ্চ। ইহার তলদেশে তরাইএর বিখ্যাত বন—উপরে তৃণশূন্য প্রাণিশূন্য চিরতুষার। সুতরাং এত বড় পাহাড়ের নানা অংশে যে নানারূপ জলবায়ু, নানারূপ উদ্ভিদ্ ও প্রাণী থাকিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি। সেইজন্য শীতপ্রধান স্থানের বৃক্ষাদি ও জীবজন্তু এবং মধ্য আফ্রিকার ন্যায় উষ্ণ প্রধান স্থানের প্রাণীসমূহ হিমালয়ে দৃষ্ট হয়। তরাইএর বনের প্রধান বৃক্ষ, শাল, শিশু, খদির, আব্‌লুস এবং কার্পাস। হিমালয়ের পূর্বাংশে হস্তী, গণ্ডার বন্য মহিষ, হরিণ, নানা প্রকার পক্ষী, কীট পতঙ্গ ও নানা প্রকার সরীসৃপ বাস করে। পশ্চিমাংশে পাইন, অর্জ্জুন, সেগুণ এবং দেবদারু বৃক্ষ প্রচুর পরিমাণে জন্মে। হিমালয়ের উর্দ্ধ অংশে চামরী গরু, কস্তুরিকা মৃগ, বন্য ছাগ ও মেষ, ভল্লুক ও নানাপ্রকার শিকারী পক্ষী দৃষ্ট হয়।

হিমালয় ভারতের আর্য্যসভ্যতাকে মোঙ্গলীয় প্রভাব হইতে রক্ষা করিয়া যুগযুগান্তর ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে; তথাচ নূতন মানুষের সঙ্গ পাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া এই পর্ব্বতপ্রমাণ বাধা কাটাইয়া বহু পথিক উপত্যকা দিয়া গতায়াত করিয়াছে। তিব্বত হইতে উঠিয়া শতদ্রু নদ যেখানে ভারতে প্রবেশ করিয়াছে—সেইখান দিয়া একটি গিরিসঙ্কট আছে। ইহারই সম্মুখে শিমলাশৈল—ভারতসাম্রাজ্যের শাসনকেন্দ্র। দ্বিতীয় পথ আলমোরা ও নৈনীতালের নিকটবর্ত্তী। সুতরাং রাজনৈতিক দিক হইতে ঐ দুটি স্থানের বিশেষত্ব খুব অধিক। তৃতীয় পথ শিকিমের ভিতর দিয়া বাংলাদেশে আসিবার জন্য। এখান দিয়া তিব্বতের রাজধানী লাসাতে যাওয়া যায়। এই পথের সম্মুখে দার্জ্জিলিং। দার্জ্জিলিং যে কেবল মাত্র বায়ু-পরিবর্ত্তনের স্থান তাহা নহে, রাজনৈতিক দিক হইতে ইহার বিশেষত্ব সমধিক। হিমালয়ের এই তিনটি প্রধান গিরিসঙ্কট বর্ত্তমানে খুবই সুদৃঢ়; এই সকল স্থানে সর্ব্বদাই অনেক সৈন্য থাকে। সুতরাং সে পথ দিয়া কোনো বিপদের সম্ভাবনা নাই।

ভারতের পশ্চিমসীমান্ত ইতিহাসে চিরবিখ্যাত। এখানকার পাহাড়গুলি তৃণশূন্য বারিশূন্য মরুভূমিসদৃশ, পূর্বদিকের একেবারে বিপরীত। আফগনিস্থানের বন্ধুর ও পার্বত্যভূমি হইতে দুই একটি মাত্র নদীর ধারা ভারতে প্রবেশ করিয়াছে। যেখানে কাবুল নদী পাহাড় ভেদ করিয়াছে, সেখানে 'থাইবার' গিরিসঙ্কট। পশ্চিম হইতে অনেকেই এই পথে ভারতে প্রবেশ করিয়াছে। এই গিরিসঙ্কট ভেদ করিয়া বোধ হয় আর্য্যগণ ভারতে প্রবেশ করিয়াছিলেন; এই দ্বার দিয়াই শক্, হুন, যুকি গ্রীক্‌গণ আসিয়াছিল। এই পথ দিয়া পাঠান আসিয়া ভারতে নূতন ধর্ম দিয়াছে, মোগল আসিয়া নূতন সভ্যতা সৃষ্টি করিয়াছে। সুতরাং ইতিহাসে পশ্চিম সীমান্ত সুপরিচিত। সেইজন্য ভারত সরকার এই দ্বারটিকে সুদৃঢ় করিবার জন্য বহু কোটি টাকা ব্যয় করিয়াছেন ও এখনো প্রতি বৎসর করিতেছেন। এই পথ ব্যতীত আরও কয়েকটি পথ আছে। তাহাদের মধ্যে 'বোলন' গিরিসঙ্কট সমধিক বিখ্যাত। কিন্তু বোলন-পথ ভারতে প্রবেশের পক্ষে আদৌ অনুকূল নহে। ইহার কারণ তাহার উভয় দিকে মরুভূমি—একদিকে বেলুচিস্থানের মরু, অপর দিকে সিন্ধু ও রাজপুতানার 'থর'; আসিবার পথে মরুভূমি, গিরিসঙ্কট পার হইয়া ভারতে প্রবেশ করিয়াও আবার মরুভূমি; সুতরাং বাহিরের শত্রুর লোভ করিবার মত এপথে কিছুই নাই। নানা কারণে ভারতের সীমান্ত বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। এখন বেলুচিস্থানের মালভূমিতে সীমান্ত রক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে।

পশ্চিম সীমান্ত

ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সীমান্ত দুরারোহ পর্ব্বত দ্বারা বেষ্টিত না হইলেও দুর্ভেদ্য অরণ্য ও অসভ্য জাতির দ্বারা সম্পূর্ণরূপে রুদ্ধ। পূর্বদিকে পাহাড়গুলি উত্তর হইতে দক্ষিণে সমান্তরালে বিস্তৃত। মানচিত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে বেশ বুঝা যাইবে যে, তিব্বতের পূর্বপশ্চিমে লম্বা-পাহাড়গুলি পৃথিবী সৃষ্টি হইবার সময়ে যেন

পূর্ব্ব সীমান্ত

মোচড় খাইয়া বাঁকিয়া বর্মাদেশে উত্তর-দক্ষিণে লম্বা হইয়া গিয়াছে। সমগ্র উত্তর বর্মা পাহাড়ে পরিপূর্ণ; এ ছাড়া পূর্বদিকে খুব বৃষ্টি হয় বলিয়া এখানকার পাহাড়গুলি বনে পরিপূর্ণ। এখানকার গহনবন ও দুর্লঙ্ঘ্য পর্বতশ্রেণী পার হইয়া ভারতবর্ষের মধ্যে প্রবেশ লাভ করা কঠিন ব্যাপার; সেইজন্য দেখা যায়, ভারত-ইতিহাসে যাহাকে দেশ-আক্রমণ বলে তেমন ব্যাপার পূর্বদিক হইতে কখনো হয় নাই। তবে মোঙ্গলীয় পীতজাতির অনেকগুলি শাখা ছাঁকুনীর ভিতর দিয়া দুই চারিটা কণার মত বাংলাদেশে প্রবেশ করিয়াছিল। মণিপুরী, তিপ্‌রা, লুশাই, খাশিয়া, নাগা, গারো, প্রভৃতি তাহাদের নিদর্শন। আসামের উত্তরপূর্ব কোণ সম্বন্ধে ইংরাজ সরকারের জ্ঞান বহুকালাবধি নিতান্তই কম ছিল, অথচ সেইখানেই চীন সাধারণতন্ত্রের রাজ্য আরম্ভ হইয়াছে। কয়েক বৎসর পূর্বে সেখানকার 'আবর' নামে এক আদিমজাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান পাঠাইয়া ব্রিটীশরাজ এই পুঞ্জীভূত অন্ধকার দূর করিয়াছিলেন।

বহুকাল পূর্বে—কত লক্ষ বৎসর পূর্বে তাহা কেহই জানে না— হিমালয় সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত ছিল। শিমলার নিকটস্থ শিবালিক পাহাড়ে যে অসংখ্য সামুদ্রিক প্রাণীর কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে, তাহার অনেকগুলির নিদর্শন কলিকাতার যাদুঘরে আছে। দাক্ষিণাত্য তখন উত্তরভারত হইতে পৃথক। অনেকে অনুমান করেন, আফ্রিকার সহিত তখন ইহার যোগ ছিল। হিমালয়-পাহাড়ধোয়া মাটি ক্রমে ক্রমে সাগর ভরিয়া পঞ্জাব, সিন্ধু, গঙ্গা-উপত্যকা ও আসামকে ধীরে ধীরে গড়িয়া তুলিয়াছে।

সমতল ভূমি ও নদী

হিন্দুস্থানের নদীগুলি দেশগঠন ও ধ্বংসের কার্য্য একাধারে করিতেছে। এখানকার নদীগুলি উচ্চ পর্বতের মধ্য হইতে উঠিয়া ভীমবেগে সমতল ক্ষেত্রে নামিয়া আসে। আসিবার সময়ে পাথর গুঁড়া করিয়া মাটি ধসাইয়া প্রচুর মৃত্তিকা নদীজলের সঙ্গে ধুইয়া আনে। সিন্ধুনদ হিমালয়ের উত্তরে উঠিয়াছে;

ইহার ১৮০০ মাইল দৈর্ঘ্যের মধ্যে ৮৬০ মাইল পাহাড়েই অবস্থিত; এই পথ আসিতে সিন্ধু ১৪০০০ ফিট নামিয়াছে এবং তাহার পরে অবশিষ্ট ৯½ শত মাইল ২০০০ ফিট্ মাত্র নামিয়াছে। পঞ্জাবে সিন্ধুনদের সংহারমূর্ত্তি—সিন্ধুপ্রদেশের বদ্বীপে তাহারই সৃজনমূর্ত্তি দেখা যায়। আলিকজেণ্ডারের সময়ে সিন্ধুর মোহনা যেখানে ছিল, এখন সমুদ্র সেখান হইতে অনেক দূরে। সিন্ধুর অন্যান্য উপনদীগুলিও সিন্ধুর ন্যায় ধ্বংসকার্য্য করিতে নিপুণ বটে তবে গড়িবার শক্তি ইহাদের নাই। এইজন্য পঞ্জাবে প্রাচীন আর্য্যদের কোনো কীর্ত্তিচিহ্ন এখন দেখিতে পাওয়া যায় না, সমস্তই নদীগর্ভে বিলীন হইয়াছে।

হিন্দুস্থানের একটি পর্বত উত্তরভারতের নদীপথের ধারা বদলাইয়া দিয়াছে। শিবালিক পর্বত মধ্যে থাকায় শতদ্রু ও গঙ্গা খুব কাছাকাছি স্থান দিয়া প্রবাহিত হইয়াও বিভিন্ন দিকে গতি লইয়াছে। হিমালয়ের দক্ষিণ হইতে গঙ্গা ও যমুনার উৎপত্তি। পাহাড়ের মধ্যে প্রথম ১৮০ মাইল পথ আসিতে গঙ্গা প্রায় ১৩ হাজার ফিট্ নামিয়াছে। তাহার পরই সমতল ভূমি; সেই ১৩৭০ মাইল পথে গঙ্গা হাজার ফিট নামিয়াছে। সেইজন্য এখানে ইহার গতি মন্দ; বাংলাদেশে আসিয়া প্রতি মাইলে ৪ ইঞ্চি মাত্র নামিয়াছে। এবং কলিকাতার দক্ষিণে সে বেগ আরও হ্রাস পাইয়াছে। গঙ্গার পলিতে দক্ষিণ বঙ্গ গঠিত হইয়াছে ও আজও সুন্দর (সুঁদোর) বনের বদ্বীপ নির্ম্মিত হইতেছে। বাংলাদেশের এই গঠনকার্য্যে আরও অসংখ্য নদীর মধ্যে ব্রহ্মপুত্রের স্থান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিব্বত হইতে এই নদী উঠিলেও জলপথে তিব্বত হইতে এদেশে আসা-যাওয়া করা যায় না। ইহার কারণ তিব্বত অতি উচ্চ মালভূমি; সেখান হইতে আসামের কোণে যখন ব্রহ্মপুত্র প্রবেশ করে তখন সেখানকার জলস্রোত খুবই প্রখর হয়। এই নদী প্রচুর মৃত্তিকা আনিয়া বঙ্গদেশকে গড়িয়া তুলিতেছে। কিন্তু গঙ্গা একদিকে যেমন গড়িতেছে সঙ্গে সঙ্গে পদ্মা ও মেঘনা উভয় তীরের অনেক নগরগ্রাম গ্রাসও করিতেছে। ব্রহ্মপুত্রের

বিশাল জলরাশিতে গঙ্গার ক্ষীণ ধারা পড়াতে গঙ্গার বেগ কিয়ৎপরিমাণে বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে ও ফলে ইহার পলিমাটি বাংলাদেশের অন্যান্য ছোট খাটো নদনদীর গর্ভ ভরাট করিয়া জলের পথ বন্ধ করিয়া দিতেছে। ইহার ফলে বাংলায় জল চলাচলের প্রাকৃতিক পথগুলি বন্ধ হইয়া আসিতেছে।

হিন্দুস্থানের সকল নদীই যে হিমালয় হইতে উঠিয়াছে তাহা নহে মধ্য-ভারতের মালভূমি হইতে অনেকগুলি নদী গঙ্গা ও যমুনায় আসিয়া পড়িয়াছে। তবে তাহাদের প্রকৃতি অন্যরূপ; বৎসরের অধিকাংশ সময়েই ইহাদের অদৃশ্য জলধারা বালুরাশির মধ্য দিয়া বহিতে থাকে; বর্ষাকালে চারিদিকের মৃত্তিকা-মিশ্রিত জলরাশি লইয়া ইহারা ক্ষিপ্রবেগে ছুটিয়া চলে। এই সকল নদী নৌতার্য্য নহে, কারণ বর্ষাকালেই ইহাদের স্রোত প্রবল, অন্যান্য সময়ে জল এত অল্প থাকে যে হাঁটিয়া নদী পার হওয়া যায়।

হিন্দুস্থানের নদীগুলি কৃষির খুব বড় সহায়। অনেক নদী বর্ষাকালে কূল ছাপাইয়া বহুদূর পর্যান্ত ভিজাইয়া দেয়; অন্য অনেকগুলি হইতে কৃত্রিম উপায়ে জল ক্ষেত্রে সিঞ্চন করা যায়। এই সকল নদীর মৃত্তিকা পাহাড় হইতে আসে বলিয়া খুব তাজা সারের কাজ করে। এছাড়া হিন্দুস্থানের বিশেষতঃ বাংলা দেশের নদীগুলি বড় রাজপথ বিশেষ। গঙ্গার প্রায় হাজার মাইল (কাণপুর পর্য্যন্ত) নৌকা করিয়া যাওয়া যায়। কিন্তু সিন্ধুর মোহনা হইতে চার মাইল মাত্র নৌতার্য্য। এদিকে ব্রহ্মপুত্র বাহিয়া ডিব্রুগড় পর্য্যন্ত নৌকা এমন কি বড় বড় জাহাজও যাইতে পারে।

এক কালে এই সকল নদীই ছিল ভারতের বাণিজ্যের পথ। ছোটখাটো বণিক ব্যাপারীরা গ্রামের জিনিষ সংগ্রহ করিয়া ছোট নৌকা বা পান্‌শী করিয়া নিকটস্থ হাটে যাইত; আবার বড় বড় ব্যবসায়ীরা গঙ্গা-তীরস্থ তীর্থস্থান ও রাজধানীগুলিতে বাণিজ্যসম্ভার লইয়া উপস্থিত হইত। বর্ত্তমানকালে নদীপথে যে বাণিজ্য চলে তাহা নিতান্ত সামান্য না হইলেও সমগ্র বাণিজ্যের তুলনায় তুচ্ছ। এখন রেলপথেই অধিক বাণিজ্য

চলে। নদীপথের প্রধান অসুবিধা (১) ব্যবসায় কারবারী আকারে করিতে গেলে ছোট ছোট নৌকা করিয়া জিনিষপত্র আনা-লওয়া পোষায় না, অথচ বড় বড় ষ্টীমার অধিকাংশ নদীতে চলে না। (২) নদীগুলির পথ ঠিক থাকে না, ইহারা প্রায়ই পথ পরিবর্ত্তন করে।

আর্য্যবর্ত্তের ভূ-প্রকৃতি ও ইতিহাস

প্রাচীন হিন্দুস্থানের সভ্যতার কেন্দ্র পঞ্চনদ না হইয়া আর্য্যাবর্ত্ত কেন হইল, একথা অনেকের মনে উদিত হইতে পারে। ইহার একটী ভৌগলিক কারণ আছে। পঞ্জাবে দুই কারণে কোন জিনিষ চিরস্থায়ী হইতে পারে না। প্রথমটি প্রাকৃতিক—সেখানকার নদী সমূহের অস্থিরতা। দ্বিতীয় হইতেছে রাজনৈতিক। 'খাইবার' গিরিসঙ্কট সুরক্ষিত না থাকায় জাতির পর জাতি এখান দিয়া প্রবেশ করিয়াছে ; পঞ্জাব ছিল তাহাদের শিবির ও রণক্ষেত্র। কিন্তু আর্য্যাবর্ত্ত বা গঙ্গা-উপত্যকায় প্রবেশ করা সহজ নহে ; এখানকার প্রবেশদ্বার সঙ্কীর্ণ। রাজপুতনার মরুভূমি ও আরাবল্লীর পাহাড় একেবারে দিল্লীর উপকণ্ঠ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ; অপর দিকে শিবালিক দক্ষিণে বহুদূর পর্য্যন্ত নামিয়া আসিয়াছে ; সুতরাং ইহার মাঝখানে যে জায়গাটি আছে তাহা নিতান্তই সঙ্কীর্ণ। এইস্থানটীই প্রাচীন ইন্দ্রপ্রস্থ—বর্ত্তমান যুগের দিল্লী। যুগে যুগে এইখানে যিনি রাজা হইয়াছেন তিনি বাহিরের শত্রুকে বাধা দিতে সমর্থ হইয়াছেন ; লোকেও তাঁহাকে রাজচক্রবর্ত্তী বলিয়া মানিয়া লইতে কুণ্ঠা বোধ করে নাই। এই দিল্লীর পতনের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুস্থানের পতন হইয়াছে। ইহারই নিকটে ভারতের বিখ্যাত যুদ্ধগুলি হইয়াছে। কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, ফতেপুর শিকৃরি, পানিপথের তিনটি যুদ্ধ সবগুলিই দিল্লীর নিকটে। সেইজন্য মুসলমানরা আসিয়া দিল্লীতে রাজধানী করিয়াছে, ইংরাজও অবশেষে সেখানে রাজধানী উঠাইয়া লইয়া গিয়াছেন। প্রাকৃতিক ভূগোলের সহিত ভারতের ইতিহাসের সম্বন্ধ যে অচ্ছেদ্য ইহাই তাহার অন্যতম উদাহরণ।

দাক্ষিণাত্য খুব প্রাচীন দেশ। এখানকার উচ্চতা গড়ে প্রায় তিন হাজার ফিট্‌। এই উচ্চতা ক্রমেই দক্ষিণের দিকে বেশী। তিনটী পর্বত-শ্রেণী এখানকার ভূপ্রকৃতির সবচেয়ে বড় বিশেষত্ব।

দাক্ষিণাত্য

বিন্ধ্যাচল ভারতের কটিবন্ধের ন্যায় দাঁড়াইয়া দাক্ষিণাত্যকে আর্য্যাবর্ত্ত হইতে সম্পূর্ণ পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। পূর্ব ও পশ্চিমঘাট নীলগিরি পাহাড়ে গিয়া মিশিয়াছে। এখানে একদিক হইতে আর একদিকে যাইতে হইলে পালঘাটের গিরিসঙ্কট দিয়া যাইতে হয়।

মোটের উপর দাক্ষিণাত্য বন্ধুর ও পার্বত্য। পশ্চিমঘাট পূর্বঘাট অপেক্ষা অনেক উচ্চ। এখানে বৃষ্টি কম, ও দেশ বন্ধুর বলিয়া নদীগুলিও তেমন ভাল হইতে পারে নাই। নর্মদা ও তাপ্তী ব্যতীত গোদাবরী কৃষ্ণা, কাবেরী প্রভৃতি সমস্ত নদীই বঙ্গ সাগরে গিয়া পড়িয়াছে। এখানকার নদীগুলি প্রস্রবণ রূপে নিম্নভূমিতে পড়াতে এই বিপুল শক্তিকে কাজে খাটাইবার চেষ্টা হইতেছে। মহীশূর রাজসরকার কাবেরী জলপ্রপাতের সাহায্যে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন করিয়া তাহা বহুবিধ কাজে লাগাইতেছেন।

দাক্ষিণাত্যের মালভূমি কৃষির পক্ষে অনুপযোগী হইলেও খনিজ পদার্থে সম্পদবান। কিন্তু শিল্পোন্নতি কেবল খনিজের উপর নির্ভর করে না; খনিগুলি সহজে মনুষ্যাগমনোপোযোগী স্থানে অবস্থিত হইবারও প্রয়োজন আছে। কিন্তু দাক্ষিণাত্যের প্রধান অসুবিধা এই যে খনিগুলি সমুদ্র উপকূল হইতে অনেকদূরে; তারপর নিকটে বড় নদী নাই এবং নৌতার্য্য খাল করিবারও সুবিধা কম। রেলওয়েই একমাত্র পথ; কিন্তু জমি বন্ধুর ও সমগ্র দেশ পার্বত্য বলিয়া রেলপথ নির্মাণের খরচ খুব বেশী পড়িয়া যায়। এ সকল অঞ্চলে লোকজনের বাস কম ও অন্যান্য প্রকারের কারবার না থাকায় খরচের সমস্ত চাপ খনিদারদের উপর পড়ে; সেই জন্য লাভের ভাগ খুব কমই থাকে। এছাড়া আর একটী অসুবিধা এই যে ভারতের খনিগুলি তেমনভাবে দেশের নানা স্থানে ছড়াইয়া নাই—একস্থানেই

আবদ্ধ ; যেমন—ভারতের কয়লার শতকরা ৯০ ভাগ রাণীগঞ্জ ও ঝরিয়াতে আছে। এইরূপ অসামঞ্জস্য শিল্পোন্নতির খুবই অন্তরায়।

সমুদ্রোপকূল থাকা না থাকা বহুকাল আমাদের পক্ষে অবাস্তব ছিল। য়ুরোপীয়দের আগমনের পূর্বে সমুদ্র হইতে বিপদের আশঙ্কা কেহ কখনো করে নাই। ভারতের উপকূল নিতান্ত অল্প নহে, কিন্তু ভাল বন্দর হইবার মত স্থান সেখানে খুবই কম। উপকূল থাকিলেই যে তাহা বন্দর নির্মাণের অনুকূল হইবে তাহা নহে। বাংলা দেশের দক্ষিণে সমুদ্রের উপকূল থাকিলেও উপযুক্ত বন্দর নাই। চট্টগ্রাম একটী বড় বন্দর বটে ; কিন্তু বাংলা দেশের এক কোণে থাকাতে তাহার সম্পূর্ণ সুবিধা ব্যবসায়ীরা পাইতে পারে না। সুন্দরবনের নদীনালা দিয়া সমুদ্রগামী জাহাজ আসিতে পারে না ; এমন কি কলিকাতার বন্দরেও বড় বড় জাহাজ প্রবেশ করিতে কষ্ট পায়। গঙ্গানদীর মোহনায় অত্যন্ত চর পড়ে বলিয়া সেখান দিয়া আসা-যাওয়া খুব কঠিন। বিশেষজ্ঞ ব্যতীত সমুদ্রগামী জাহাজগুলিকে পথ দেখাইয়া কেহই আনিতে পারে না। এছাড়া পূর্বে বলিয়াছি বাংলাদেশের নদনদীগুলিতে বালি পড়িয়া ভরিয়া আসিতেছে। গঙ্গার এই অসুবিধার সঙ্গে রাতদিন সংগ্রাম করিতে হইতেছে ও ড্রেজিং মেশিন দিয়া জল ঘুলাইয়া নদীগর্ভকে ঠিক রাখিতে হইতেছে। এই সব কারণে কলিকাতার বন্দর রক্ষা করা খুব ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। এসব ছাড়া বঙ্গোপসাগরের ঝড়ও উত্তম বন্দর হইবার পক্ষে বড় রকম অন্তরায়।

সমুদ্রোপকূল

মাদ্রাজের করমণ্ডল উপকূলে ঝড়ের উৎপাতে ভাল বন্দর নির্ম্মাণ করা সুকঠিন। মাদ্রাজের উপকূল ক্রমশঃ সাগরের মধ্যে প্রবেশ করাতে বহুদূর পর্য্যন্ত সাগরের জল অত্যন্ত কম ; সেইজন্য জাহাজ তীরে আসিতে পারে না।

পশ্চিম উপকূলে পশ্চিমঘাট পাহাড় সাগর হইতে প্রায় খাড়া হইয়া

উঠিয়াছে। এই উপকূলে যাওয়া-আসার সুবিধা কম। বর্ত্তমানকালে কেবলমাত্র বম্বে ও প্রাচীনকালে বরোচ বা ভৃগুকচ্ছ ও সুরাট বন্দর বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছে।

২। জলবায়ু

ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে বিচিত্র জলবায়ু দেখা যায়। পৃথিবীর আর কোথাও এমন বৈচিত্র্য দেখা যায় কিনা সন্দেহ। বৎসরের একসময়ে হিন্দুস্থানের এক অংশের ক্ষেত, খাল, বিল জলে ভরিয়া উঠে, অপর অংশে সপ্তাহের পর সপ্তাহ মাসের পর মাস বৃষ্টির মুখ দেখা যায় না। বর্ষার সময়ে পার্বত্য প্রদেশে ও সমুদ্রতীরে বায়ু জলকণায় পূর্ণ হয়; আর গ্রীষ্ম বা শীতকালে শৈত্যের নাম গন্ধ পাওয়া যায় না।

ভারতের ঐশ্বর্য্য ও সম্পদ দক্ষিণের সমুদ্র হইতে যে হাওয়া আসে তাহার উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে। মৌসুম বায়ু বৎসরে দুইবার দুইদিক হইতে ভারতে বহিয়া আসে। ইহার মধ্যে উত্তরপূর্ব দিকের বায়ু শীতকালে বহে। তখন হাওয়া অত্যন্ত শুষ্ক এবং বৃষ্টির পরিমাণও নিতান্ত অল্প হয়। শীতের বৃষ্টি পঞ্জাবের শস্যের পক্ষে খুব প্রয়োজনীয়; মাদ্রাজেও বৎসরে এই একসময়েই বৃষ্টি হয়। দক্ষিণে-বাতাস ফাল্গুন মাস হইতে এদেশে বহিতে আরম্ভ করে। কিন্তু জলকণাসমেত বায়ু আসিতে আরও তিন মাস কাটিয়া যায়। সেইজন্য বৃষ্টি আরম্ভ হয় আষাঢ় মাসে। এই বর্ষা ও দক্ষিণে-হাওয়া প্রায় আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত চলে। সেই সময় হইতে হাওয়া দক্ষিণ পথ ছাড়িয়া উত্তর পথ দিয়া আসিতে সুরু করে; এই পথপরিবর্ত্তনের সময়ে আশ্বিনে-ঝড় হয়। এবং শীতকাল হইতে

মৌসুমবায়ু

বর্ষাকালে বায়ুর গতিপরিবর্ত্তনের সময়ে বাংলাদেশের বিখ্যাত কালবৈশাখী ঝড় হয়।

দক্ষিণের মৈসুম বায়ু দাক্ষিণাত্যে লাগিয়া দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। ইহার একভাগ আরব সাগর দিয়া বম্বে অঞ্চলে প্রবেশ করে, অপরভাগ বঙ্গোপসাগর দিয়া বঙ্গদেশে ও বর্মাতে প্রবেশ করে। বাংলাদেশে যে-হাওয়া প্রবেশ করে তাহা কোণাকুণিভাবে প্রবেশ করিয়াই সম্মুখের খাশিয়া পাহাড়ে আসিয়া ধাক্কা পায়। প্রথম ধাক্কা সেখানে লাগে বলিয়া চেরাপুঞ্জীতে এত বৃষ্টি হয়। এই জায়গাটিতে বৎসরে গড়ে ৪৬০ ইঞ্চি বৃষ্টি হয়। ১৮৬১ সালে ৮০৫ ইঞ্চি বৃষ্টি হইয়াছিল; এখানে একদিনে ২৫ ইঞ্চি বৃষ্টিও হইয়াছে। এখান হইতে বৃষ্টির হাওয়া ধাক্কা খাইয়া পশ্চিম দিকে চলিতে থাকে—এবং উত্তরবঙ্গ, বিহার, যুক্তপ্রদেশ, পঞ্জাব প্রভৃতি স্থানে যায়। মৈসুমবায়ু যতই পশ্চিম দিকে যায় বৃষ্টির পরিমাণ ততই কমিতে থাকে। ইহাতে বঙ্গদেশে ৮০।৯০ ইঞ্চি, বিহারে ৫০ ইঞ্চি, যুক্ত প্রদেশে ৪০ ইঞ্চি, পঞ্জাবে ২৩ ইঞ্চি ও সিন্ধুতে ৬ ইঞ্চি মাত্র বারিপাতের ফল দাঁড়ায়।

বৃষ্টি

বাংলা দেশে বৃষ্টি নামিবার প্রায় দুই সপ্তাহ আগে বম্বের পশ্চিমঘাটে বর্ষা নামে। এখানে বর্ষার চারি মাসে প্রায় ১০০ ইঞ্চি বৃষ্টি হয়। দাক্ষিণাত্যে আরব সাগর হইতে মৈসুম বায়ু যতই পূর্ব্ব দিকে বহিতে থাকে বৃষ্টির পরিমাণ ততই কমিতে থাকে। আরব সাগরের বায়ু কিয়ৎপরিমাণে গুজরাটে যায় এবং আরও উত্তরে পাঞ্জাবের দিকেও যায়। সেইজন্য পঞ্জাবের ও রাজপুতানার পূর্ব্বদিকটাতে বঙ্গোপসাগরের ও আরব সাগরের উদ্বৃত্ত হাওয়া মিলিত হইয়া যে বর্ষণ করে, তাহা নিতান্ত কম নয়। ভারতের বার্ষিক বৃষ্টির শতকরা ৯০ ভাগ এই চারি মাসে পাওয়া যায়।

ভারতের কোথায় কোন্ সময়ে বর্ষা নামে তাহার তারিখ নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

মালাবার	৩রা জুন		বাংলা	১৫ই জুন
বোম্বাই	৫ ,,		বিহার	১৫ ,,
দাক্ষিণাত্য	৭ ,,		সংযুক্ত প্রদেশ	
মধ্য প্রদেশ	১০ ,,		(পূর্ব্বাঞ্চল)	২০ ,,
মধ্য ভারত	১৫ ,,		(পশ্চিমাঞ্চল)	২৫ ,,
রাজপুতানা	১৫ ,,		পূর্ব্ব পঞ্জাব	৩০ ,,

এই বৃষ্টির উপর ভারতের ধনপ্রাণ নির্ভর করিতেছে। ভারতের কৃষি সম্পূর্ণরূপে বর্ষার উপর নির্ভর করে। কিন্তু এই বারিপাতের পরিমাণ বৎসর হইতে বৎসরান্তরে অত্যন্ত তফাৎ হইতে থাকিলে কৃষির বিশেষ ক্ষতি হয়। ইহাতে শস্যগুলি অসময়ে ধুইয়া যায়, নতুবা পুড়িয়া নষ্ট হয়। বৃষ্টি যদি না থামিয়া কিছু কাল ধরিয়া পড়িতে থাকে, তাহাতেও চাষের সর্বনাশ হয়, শস্য পচিয়া যায়; আবার কয়েক সপ্তাহ বৃষ্টি না হইলেও শস্য পুড়িয়া যায়। সেইজন্য বৃষ্টি হইলেই কৃষির উন্নতি হয় না—যথাসময়ে ও যথাপরিমাণে না হইলে কৃষকের সর্বনাশ।

ভারতের প্রদেশগুলির মধ্যে গুজরাট ও দাক্ষিণাত্যে বৃষ্টির পরিমাণ সাধারণতঃ কম; তার উপর সকল বৎসর সমান পরিমাণ হয় না। এই কারণে এই দুইটি প্রদেশ অন্নাভাবে ও দুর্ভিক্ষে সবচেয়ে বেশী ভোগে। প্রদেশসমূহের মধ্যে বাংলা ও বর্মা কথঞ্চিৎ নিরাপদ এবং এই দুই দেশে প্রয়োজনের অনেক অতিরিক্ত বারিপাত হয়। ভারতবর্ষের কোথায় কিরূপ বৃষ্টি হয় তাহার একটা তালিকা পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল।

১৯১৮ সালে ভারতের সর্বত্র বৃষ্টি খুব কম হইয়াছে; স্বাভাবিক বৃষ্টিপাত হইতে ইহা প্রায় ৯ ইঞ্চি কম। কিন্তু ১৯১৭ সালে বাংলাদেশে প্রায় ২½ ইঞ্চি বৃষ্টি কম হয় এবং ভারতের আর সর্বত্রই বৃষ্টির পরিমাণ ৬½ ইঞ্চি বেশী হয়।

বর্ষার পূর্বে ও শীতের পূর্বে দুইবার মৈসুম বায়ুর গতি পরিবর্ত্তনের সময় ভারতবর্ষে ঝড় হয়; কালবৈশাখী ও আশ্বিনে-ঝড় বাংলা দেশের খুবই সুপরিচিত। ১৯১৮ সালে ঢাকা ও পূর্ববঙ্গের সর্বনাশের কথা ত' সকলেই কাগজে পাঠ করিয়াছেন।

ঝড় ঝঞ্ঝা।

১৮৭৭ সাল হইতে ১৯০১ সাল পর্য্যন্ত বঙ্গসাগরে ও আরব সাগরে কতকগুলি ঝড় হইয়াছে তাহার একটি তালিকা নিম্নে দিতেছি; ইহা হইতে বুঝা যাইবে যে বঙ্গসাগরেই ঝড় বেশী হইয়া থাকে।

	জান	ফে	মা	এ	মে	জুন	জু	আ	সে	অ	ন	ডি
বঙ্গ সাগর	০	০	১	৪	১৩	২৮	৪১	৩৬	৪৫	৩৪	২২	৮
আরব সাগর	০	০	০	২		১৫	২	০	১	১	৫	০

ভারতবর্ষের জলবায়ুর এই বিচিত্রতা ইংরাজগণ বহুকাল হইতে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আসিতেছেন। ১৭৯৬ সালে প্রথমে মাদ্রাজে জলবায়ু পর্য্যবেক্ষণ আরম্ভ হয়। ইহার পর এক এক প্রদেশে এক এক সময়ে এই পর্য্যবেক্ষণ সুরু হইয়াছে। ১৮৭৪ সালে ভারত সরকার যাবতীয় বীক্ষণাগারগুলিকে একসূত্রে বাঁধিয়াছিলেন এবং প্রতিদিন ভারতের কোথায় কিরূপ তাপ, বাতাসের চাপ ও গতি, ঝড়ের সম্ভাবনা, কোন্‌দিকে, বৃষ্টির পরিমাণ কত প্রভৃতি লিপিবদ্ধ করিয়া প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। ভারতে চারটি প্রথম শ্রেণীর ও ২৩১টি দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর বীক্ষণাগার আছে। এছাড়া সাম্রাজ্যের নানাস্থানে আড়াই হাজার বৃষ্টি মাপিবার যন্ত্র প্রতিষ্ঠিত আছে। এই সকল কেন্দ্র হইতে বারিপাত পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাহার ফল প্রতিদিন আটটার সময়ে ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী শিমলায় প্রেরণ করেন। সেখানে প্রতি দিন ভারতের মানচিত্রে ইহা মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়। কলিকাতার আলিপুরে একটি প্রথম শ্রেণীর বীক্ষণাগার আছে। এ ছাড়া বে-সরকারী বীক্ষণাগারের মধ্যে কলিকাতা সেণ্ট জ্যাভিয়ার কলেজের যন্ত্রপাতি বিখ্যাত।

———

জলবায়ুর পরিশিষ্ট।

১

ভারতবর্ষের কোন্ মাসে কত খানি বৃষ্টি হয় ঃ—

জ্যৈষ্ঠ	...	...	২·৬ ইঞ্চি
আষাঢ়	...	...	৭·১ „
শ্রাবণ	...	...	১১·২ „
ভাদ্র	...	...	৯·৫ „
আশ্বিন	...	...	৬·৭ „
কার্ত্তিক	...	...	৩·১ „

২

অতিবৃষ্টির দেশ—

নিম্ন ব্রহ্মদেশ	..	...	১২৩ ইঞ্চি
পশ্চিম উপকূল (মালাবার)	...	...	১২৭ „
পশ্চিম উপকূল (কোঙ্কন)	...	...	১০৯ „
আসাম	...	...	৯৮ „
বাঙ্গালা (দক্ষিণ)	...	...	৯২ „
পূর্ব বাঙ্গালা	...	...	৮৫ „

প্রচুর বৃষ্টির দেশ—

পশ্চিম বাঙ্গালা	...	...	৫৯ „
উড়িষ্যা	...	...	৫৭ „
ছোটনাগপুর	...	...	৫৩ „
মধ্য প্রদেশ (পূর্ব)	...	...	৫৩ „
বিহার	...	...	৫০ „

মাঝামাঝি বৃষ্টির দেশ—

উত্তর বর্মা	...	...	৪২ ইঞ্চি
মধ্য প্রদেশ (পশ্চিম) } মধ্য ভারত (পূর্ব) }	...	...	৪৫ „
মধ্য ভারত (পশ্চিম)	...	...	৩৫ „
মাদ্রাজ (উত্তর)	...	...	৪০ „
সংযুক্ত প্রদেশ	...	...	৩৯ „
বেরার	...	...	৩১ „
গুজরাট	...	...	৩৩ „
বম্বে (দাক্ষিণাত্য)	...	...	৩১ „
হায়দ্রাবাদ	...	...	৩৫ „
মৈশূর	...	...	৩৬ „

সামান্য বৃষ্টির দেশ—

মাদ্রাজ (দাক্ষিণাত্য)	...	...	২৪ „
রাজপুতানা (পূর্ব)	...	...	২৪ „
পাঞ্জাব (পূর্ব্ব ও উত্তর)	...	...	২৩ „
রাজপুতানা (পশ্চিম)	...	...	১২ „
পাঞ্জাব (দক্ষিণ পশ্চিম)	...	...	৯ „
সিন্ধু	...	...	৬ „
বেলুচিস্থান	...	...	২ „

Imperial Gazetteers Vol. I. Chapters I. II.
T. H. Holland India *Oxford* 1904.
L. S. S. O' Malley—Bengal, Bihar. Orissa. Sikkuin—
Cambridge 1917
G. Patterson Geography of India. London.. 1909
Sarcar—Economics of British India (Chap. I)

৩। উদ্ভিদ্

ভারতবর্ষের ন্যায় বড় দেশ পৃথিবীতে অনেক আছে, কিন্তু সেগুলির ভূমির প্রাকৃতিক অবস্থা কতকটা একঘেয়ে রকমের, কাজেই সে সকল দেশের উদ্ভিদ্ ও প্রাণীদের মধ্যে অধিক বৈচিত্র্য দেখা যায় না।

ভারতবর্ষের পাহাড় পর্বত এবং শিলামৃত্তিকাতে সে রকম একঘেয়ে ভাব প্রায় নাই বলিলেই হয়; বিভিন্ন জাতীয় উদ্ভিদ্ এবং প্রাণী ভারতে যত দেখা যায়, অন্য কোথাও সেরূপ দেখা যায় না। এখানে ১৭৬ শ্রেণীর সপুষ্পক উদ্ভিদের সতেরো হাজার জাতীয় বৃক্ষ উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিদ্‌রা আবিষ্কার করিয়াছেন। কিন্তু এগুলির সমস্তই যে ভারতের আদিম উদ্ভিদ্ তাহা বলা যায় না। বিদেশের সহিত ভারতবর্ষের বহুকাল হইতে যোগ আছে। এই যোগসূত্রে তিব্বত, সাইবেরিয়া, চীন, জাপান, আরব, এমন কি আফ্রিকা এবং য়ুরোপ হইতেও অনেক উদ্ভিদ্ ভারতে আসিয়া বংশ বিস্তার করিতেছে বলিয়া মনে হয়।

যাহা হউক, উদ্ভিদের প্রকৃতি-হিসাবে বৈজ্ঞানিকগণ সমস্ত ভারতবর্ষকে পূর্ব-হিমালয়, পশ্চিম-হিমালয়, সিন্ধু প্রদেশ, গাঙ্গেয় প্রদেশ, মালব, দাক্ষিণাত্য এবং ব্রহ্মদেশ,—এই সাতটী ভাগে ভাগ করিয়া থাকেন।

হিমালয় এই কথাটী শুনিলে একটা বড় পর্বতের কথা আমাদের মনে পড়ে। তখন মনে হয়, ইহার সকল অংশেরই প্রাকৃতিক অবস্থা বুঝি একই। কিন্তু তাহা নয়, হিমালয়ের পূর্বাংশে বৎসরে প্রায় একশত ইঞ্চি বারিপাত হয়। পশ্চিমের বারিপাত কদাচিৎ ৪০ ইঞ্চির বেশি হয়। সুতরাং একই পর্বতের এই দুই অংশে একই রকমের উদ্ভিদ্ না থাকারই কথা। অনুসন্ধান করিলে তাহাই দেখা যায়। পূর্ব-হিমালয়ে অর্কিড জাতীয় উদ্ভিদ্ এবং মালয়দেশ-সুলভ গাছপালাতে পূর্ণ। পশ্চিম-হিমালয়ে

এগুলির প্রায়ই সন্ধান পাওয়া যায় না। সেখানকার বন জঙ্গল য়ুরোপীয় উদ্ভিদ্ এবং বাঁশ ও ঘাস জাতীয় গাছপালাতে পূর্ণ। লার্চ, ওক্, লরেল্, ম্যাপেল প্রভৃতি অনেক য়ুরোপীয় উদ্ভিদই সেখানকার জঙ্গলের প্রধান বৃক্ষ। পশ্চিম-হিমালয়ে এই সকল উদ্ভিদ্ কিছু কিছু থাকিলেও সেখানে দেবদারু, সিডার প্রভৃতিরই প্রাচুর্য্য বেশি।

সিন্ধু-প্রদেশকে মরুভূমি-বিশেষ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইহার পূর্বদিকেই রাজপুতানার মহামরু অবস্থিত। কাজেই সিন্ধু-প্রদেশে বৃষ্টি নিতান্ত অল্প হয় এবং ইহার ফলে সেখানে কেবল মরুভূমি-সুলভ গাছপালাই অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। বড় গাছের মধ্যে দীর্ঘপত্রী পাইন্ এবং শালই প্রধান। তা ছাড়া শিমুল, লজ্জাবতী, কয়েক জাতি বাঁশও স্থানে স্থানে জন্মে। জলসেচনের সুব্যবস্থা করিলে সিন্ধু প্রদেশে সুখাদ্য ফলের গাছ জন্মানো কঠিন হয় না।

ভারতবর্ষের যে অংশটী গাঙ্গেয় ভূখণ্ড বলিয়া প্রসিদ্ধ সেখানে শীতাতপের বৈচিত্র্যের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক স্থানেই বিচিত্র গাছপালা দেখা যায়। ইহার পূর্বাংশে বৎসরে প্রায় ৭৫ ইঞ্চি বারিপাত হয়, কিন্তু পশ্চিমের বারিপাত ১৫ ইঞ্চির অধিক হয় না। বঙ্গদেশের শুষ্ক স্থানে গ্রীষ্মকালে অনেক গাছেরই পাতা ঝরিয়া যায়, এমন কি ঘাস পর্যন্ত শুকাইয়া যায়। ভূমি ক্ষারবহুল বলিয়াই উদ্ভিদের এই দুর্দশা। বঙ্গদেশের পশ্চিম প্রান্ত হইতে যতই পূর্বদিকে যাওয়া যায়, সরস ভূমিতে উদ্ভিদের প্রাচুর্য্য ততই লক্ষিত হয় এবং শস্যক্ষেত্রের শ্যামলতা দর্শকমাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আম বট ও তাল জাতীয় উদ্ভিদ্ এবং বাঁশই এই সকল স্থানের প্রধান বৃক্ষ। চাঁপা, শিমুল প্রভৃতি জাতীয় অনেক বৃক্ষ এবং নানাজাতীয় গুল্ম বঙ্গদেশে প্রচুর দেখা গেলেও সেগুলি এদেশে আদিম বৃক্ষ নয় বলিয়াই উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্গণ মনে করেন। এই সকল বৃক্ষ ভারতের অপর অংশেও দেখা যায়।

সুন্দরবন নামক জঙ্গলাকীর্ণ প্রকাণ্ড ভূভাগ বঙ্গদেশেরই দক্ষিণ সীমান্তে অবস্থিত। সমুদ্রতীরবর্ত্তী বলিয়া এখানকার ভূমি জোয়ারের জলে ডুবিয়া যায় এবং এখানে বারিপাতও বেশি হয়। কাজেই সুন্দর বনের ভূমি খুবই সরস। সুঁদ্‌রি প্রভৃতি গাছ সুন্দরবনেই জন্মে। সুঁদরিই কাঠ আমাদের খুব কাজে লাগে। কয়েকটি তাল জাতীয় বৃক্ষও এখানে জন্মে। গোলপাতার গাছ তাল জাতীয় বৃক্ষ। ঘর ছাইবার জন্য গোলপাতার ব্যবহার হয়। তা ছাড়া মাদার গাছ এবং নানাজাতীয় বড় ঘাসও এখানে প্রচুর উৎপন্ন হয়।

মালবার প্রদেশের ভূভাগ খুব সরস। নানাজাতীয় তাল এবং বাঁশই এই দেশের প্রধান উদ্ভিদ্। তা ছাড়া অর্কিড্ জাতীয় গাছও সর্ব্বত্র দেখা যায়। নীলগিরি পাহাড়ের উচ্চতা প্রায় নয় হাজার ফুট। এই পাহাড় এককালে নানাজাতীয় উদ্ভিদে আচ্ছন্ন ছিল। এখন আগুনে পুড়াইয়া ও গোরুবাছুর দিয়া খাওয়াইয়া লোকে এই জঙ্গল ধ্বংস করিতেছে।

যে সকল গাছের পাতা শীতকালে ঝরিয়া যায় এ প্রকার বৃক্ষের বন দাক্ষিণাত্যের মধ্যস্থলে প্রচুর আছে। সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী স্থানে চিরশ্যামল গাছেরই প্রাচুর্য্য অধিক। সেগুণ, পীত-শাল, টুন্, চন্দন প্রভৃতিই দাক্ষিণাত্যের প্রধান বৃক্ষ। এই প্রদেশের যে সকল স্থানে কৃষ্ণবর্ণের মৃত্তিকা আছে সেখানে প্রচুর কার্পাশ উৎপন্ন হয় এবং সর্বত্রই বাবলা গাছ দেখা যায়।

ব্রহ্মদেশের বৃক্ষাদির পরিচয় আজও সম্পূর্ণ পাওয়া যায় নাই। দেশটী যেমন বড় সেখানের ঋতুর বৈচিত্র্যও তেমনি অধিক। অনেক পাহাড় পর্বতে দেশ আচ্ছন্ন হইলেও ইহার ভূমি খুবই উর্ব্বর। ব্রহ্মদেশে প্রায় ছয় হাজার জাতির পুষ্পক উদ্ভিদ্ আবিষ্কৃত হইয়াছে। এখানে সুটীপ্রদ উদ্ভিদ্ এবং অর্কিড্ অনেক দেখা যায়। কাছাড় শ্রীহট্ট প্রভৃতি আসামের পার্বত্য অংশের এবং চট্টগ্রাম বিভাগের অবস্থা অনেকটা ব্রহ্মদেশেরই মত।

গর্জ্জন, সেগুণ এবং মেহগনী জাতীয় বৃক্ষ এই সকল স্থানের জঙ্গলে পাওয়া যায়। গর্জ্জন গাছগুলির উচ্চতা প্রায় দুইশত ফিটের উপরে হয়, সেগুলির গুঁড়ির বেড় ১৫ ফিট পর্য্যন্তও হইয়া দাঁড়ায়। বেত এবং বাঁশ ব্রহ্মদেশে যেমন অনায়াসে উৎপন্ন হয়, এমন কোনো দেশেই হয় না।

আমাদের দেশে যে সকল উদ্ভিদ্ বিশেষ কাজে লাগে, তাহাদের নাম উল্লেখ করিতে গেলে বাঁশের কথাই সর্ব্বাগ্রে মনে পড়ে। তাল জাতীয় অর্থকরী উদ্ভিদের মধ্যে খেজুর এবং সুপারী প্রধান। এক যশোহর জেলাতেই প্রতি বৎসরে একুশ লক্ষ মণ গুড় উৎপন্ন হয়। বাখরগঞ্জ জেলাতেই ২৭০০০০০০ সুপারীগাছ আছে। নারিকেল ভারতবর্ষের আর একটি অর্থকরী বৃক্ষ। সাধারণ তাল গাছের কাঠ অনেক স্থানে নানাকাজে লাগানো হয়।

ছোটনাগপুরের শাল এবং মহুয়া বৃক্ষ হইতে অনেক উপকার পাওয়া যায়। শাল কাঠে সুন্দর ও দৃঢ় কড়ি বরগা হয়। রেল লাইনের উপরকার কাঠও শালে প্রস্তুত। ছোটনাগপুর এবং হিমালয়ের পার্বত্য প্রদেশ হইতে ইহা আমদানি হয়। মহুয়ার ফল এবং ফুল উভয়ই দরিদ্রের খাদ্য, ইহার ফলের বীজ হইতে যে তৈল পাওয়া যায়, তাহা জ্বালানির জন্য ব্যবহৃত হয়। খেদ নামক গাছ কাঠের জন্য বিখ্যাত,—ইহার সারালো অংশই আবলুস্ নামে পরিচিত। পলাশ গাছের কাঠ অব্যবহার্য্য হইলেও, ইহা লাক্ষাকীটকে আশ্রয় দেয় বলিয়া আমাদের আদরণীয়। আসান গাছে তসরের পোকা জন্মিয়া গুটি উৎপন্ন করে। শিমুল এবং সবাই ঘাসও আমাদের কম উপকারী নয়। শিমুলের তুলা আমাদের কাজে লাগে। সবাই ঘাসে খুব শক্ত দড়ি প্রস্তুত হয়, তা ছাড়া ইহা কাগজ প্রস্তুতের উপাদান স্বরূপেও ব্যবহৃত হয়। রাজমহল অঞ্চলে এই ঘাস প্রচুর জন্মে। ভারতবর্ষের ফলপ্রদ বৃক্ষাদির মধ্যে আম, কাঁটাল, কলা, আতা, পেয়ারা, আনারস, লিচু, তেঁতুল, কমলালেবু এবং তরমুজ জাতীয় উদ্ভিদই উল্লেখযোগ্য।

৪। প্রাণী

ভূমির প্রাকৃতিক-সংস্থান এবং আবহাওয়ার বৈচিত্র্যে ভারতবর্ষে যত বিভিন্ন জাতীয় প্রাণী দেখা যায়, পৃথিবীর কোনো স্থানে সে প্রকার দেখা যায় না। য়ুরোপ অপেক্ষা ভারতবর্ষ অনেক ছোট, কিন্তু ভারতীয় প্রাণীর সংখ্যা য়ুরোপের প্রাণিসংখ্যার তুলনায় অনেক অধিক। পঞ্জাব, সিন্ধু, রাজপুতানা প্রভৃতি স্থানে যে সকল প্রাণী বাস করে, সেগুলিকে উত্তর আফ্রিকায় এবং দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়াতেও দেখা যায়। ব্লাণ্ডফোর্ড সাহেবের গণনায় ১২২৯ জাতীয় মেরুদণ্ডযুক্ত প্রাণী ভারতবর্ষে আছে এবং এ গুলির আবার ৪১০০ উপজাতি আছে। এই ১২২৯ জাতি প্রাণীর মধ্যে প্রায় ১৩৩ জাতি স্তন্যপায়ী পর্যায়ভুক্ত।

বানর জাতীয় প্রাণীর সংখ্যা ভারতবর্ষে অত্যন্ত অধিক। আসাম ও বর্মার জঙ্গলে অনেক উল্লুক বাস করে। প্রায় বারো উপজাতির হনুমান সমস্ত ভারতবর্ষে ব্যাপ্ত আছে। বাংলাদেশের হনুমানের দেহ ছেয়ে রঙের লোমে আবৃত থাকে। অন্যান্য স্থানে হনুমানের রঙ খুব ঘোরালো রকমের। নীলগিরিতে সম্পূর্ণ কালো রঙের হনুমানও দেখিতে পাওয়া যায়। মর্কটও এক বাংলাদেশ ব্যতীত ভারতের সর্বত্র দেখা যায়। বর্মাতে প্রায়-লাঙ্গুলহীন এক প্রকার বানর আছে। হিমালয়ের তুষারাবৃত অত্যুচ্চ স্থানও বানরবর্জিত নয়।

বানরজাতি

বিড়ালের সতেরোটি উপজাতি ভারতে বর্তমান। লিঙ্‌স্‌ কেবল হিমালয় প্রদেশেই দেখা যায়। শিকারীদের উপদ্রবে সিংহ ভারতবর্ষে দুর্লভ হইয়াছে। ভারতবর্ষের উত্তরপশ্চিম প্রান্তের জঙ্গলে এখন দুই চারিটি সিংহ দেখা যায়। ব্যাঘ্র এখনো অনেক স্থানে পাওয়া যায়, কিন্তু শিকারীদের উপদ্রবে এবং দেশে

বিড়ালজাতি

নূতন নগর ও গ্রামের পত্তনের সঙ্গে সেগুলি দেশ ছাড়িয়া পলাইতেছে। কিছু দিন পরে ইহাও সিংহের ন্যায় দুর্লভ হইবে। হিমালয়ের নয় হাজার ফুট উচ্চ স্থানেও ব্যাঘ্র দেখা গিয়াছে।

চিতা বাঘ ভারতবর্ষের সর্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা নরখাদক নয়। ইহাদের মধ্যে কয়েক উপজাতি অনায়াসে গাছেও উঠিতে পারে। কালো চিতা বাঘ বঙ্গোপসাগরের পূর্বদিকস্থ দেশে দেখিতে পাওয়া যায়। হিমালয়ের উচ্চ দেশে এক রকম সাদা চিতা আছে, ইহারা তুষারাবৃত স্থানেই বাস করে।

ভারতবর্ষের প্রায় সকল গভীর জঙ্গলে বন-বিড়াল দেখা যায়। পূর্ব্বে এক জাতীয় বন-বিড়াল নদীর ধারে ঝোপে জঙ্গলে বাস করিত। নদীর মাছই ইহাদের আহার ছিল।

নকুল অর্থাৎ বেজি, বিড়ালজাতীয় প্রাণী। ইহারা খুব সাহসী ও মাংসাশী প্রাণী; বড় বড় সাপকে আক্রমণ করিয়া মারিয়া ফেলে।

সমগ্র ভারতবর্ষে কেবল এক জাতীয় হায়েনা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা গর্তে বাস করে এবং শৃগালের মত জীবজন্তুর মাংস আহার করে।

কুকুরজাতি

হেঁড়েল (wolf) এবং শৃগাল, কুকুরজাতিরই অন্তর্গত। বঙ্গোপসাগরের পূর্বদিকের দেশে হেঁড়েল দেখিতে পাওয়া যায় না। বেহার অঞ্চলে ইহাদের উৎপাত অতি ভয়ানক। সুবিধা পাইলে ইহারা মানুষ আক্রমণ করিতেও ছাড়ে না। ভারতের উত্তরপশ্চিম সীমান্তে এবং তিব্বতে অনেক হেঁড়েল দেখা যায়।

উত্তরে তিব্বত হইতে আরম্ভ করিয়া বর্মা পর্য্যন্ত সকল স্থানে বন্য কুকুর দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা দলবদ্ধ হইয়া বাস করে; হরিণ প্রভৃতি বন্য প্রাণীর মাংসই ইহাদের আহার্য্য। তিব্বত প্রদেশই মাষ্টিফ্ নামক প্রসিদ্ধ কুকুরের জন্মস্থান। ইহাদের বংশ এখন তিব্বত হইতে নানাস্থানে বিস্তৃত হইয়াছে।

খেঁকশেয়ালের পাঁচটি উপজাতি ভারতবর্ষে বর্ত্তমান। ধূসর রঙের সাধারণ খেঁকশেয়াল নিশাচর প্রাণী। শৃগাল ভারতের সর্বত্রই দেখা যায়, কেবল পূর্ব্ব অঞ্চলে ইহার সংখ্যা হ্রাস হইয়া আসিতেছে। শিকারী কুকুর দ্বারা আক্রান্ত হইলে, ইহারা মরার ভান করিয়া নিস্তব্ধভাবে পড়িয়া থাকে। চতুরতায় শৃগাল সকল প্রাণীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ব্যাঘ্র বা অপর হিংস্র জন্তু নিকটে থাকিলে, ইহারা বিকৃত স্বরে চীৎকার আরম্ভ করে। ইহাতে শিকারীরা শিকারের সন্ধান পায় এবং লোকে সাবধান হইতে পারে।

ভল্লুক

চারি উপজাতির ভল্লুক ভারতবর্ষে দেখা যায়। ছোটনাগপুর, বাঁকুড়া প্রভৃতি স্থানের জঙ্গলে যে সকল কালো ভল্লুক আছে, তাহারা ফল, মূল, মধু এবং মহুয়ার ফুল খাইতে ভালবাসে। ইহারা মানুষের বিশেষ অপকার করে না। হিমালয়ের নানাস্থানে অপর ভল্লুক বাস করে। এই পর্বতের ১২০০০ ফুট উচ্চ স্থানেও ভল্লুক দেখিতে পাওয়া যায়। ভল্লুক মাত্রেরই ঘ্রাণশক্তি অত্যন্ত প্রবল কিন্তু ইহাদের দৃষ্টিশক্তি অত্যন্ত ক্ষীণ। এইজন্য অনেক শিকার ইহাদিগকে ফাঁকি দিয়া পলাইতে পারে।

পতঙ্গ খাদক প্রাণী

ছুঁচো এবং সজারুই ভারতবর্ষের প্রধান পতঙ্গখাদক প্রাণী, আরসুলা প্রভৃতি ছোটো ছোটো পতঙ্গই ছুঁচোর প্রধান খাদ্য, রাত্রিই ইহাদের আহার-অন্বেষণের সময়। বাদুড় ফলমূলভোজী হইলেও পতঙ্গও ইহাদের গ্রাস হইতে উদ্ধার পায় না; ভারত-বর্ষে প্রায় ৯৫ উপজাতির বাদুড় আছে।

ছেদক প্রাণী

ভারতবর্ষে ছেদকপ্রাণীদিগের মধ্যে ইঁদুর, খরগোস, কাঠবিড়ালী প্রধান। ভারতের বড় জাতের ইঁদুরই প্লেগের বাহন। খরগোসের আটটি উপজাতি নানাস্থানে দেখা যায়। হিমালয়ের অত্যুচ্চ স্থানও শশকবর্জ্জিত নয়। কাঠবিড়ালীদের মধ্যে

যাহাদের গায়ে কালো ডোরা থাকে, তাহারাই গ্রামের ভিতরে নির্ভীকভাবে বাস করে।

খুরযুক্ত প্রাণী ভারতবর্ষে অনেক আছে। হস্তী, গণ্ডার, উষ্ট্র, হরিণ-ঘোড়া, শূকর, গাধা, মেষ, ছাগল, গরু, মহিষ সকলই এই শ্রেণীভুক্ত।

খুরযুক্ত প্রাণী

কচ্ছ ও বিকনিরের মরুভূমিবৎ স্থানে বন্য ঘোটক ও গাধা আজও দেখিতে পাওয়া যায়। তিব্বতের জঙ্গলেও ইহারা বাস করে। তরাইয়ের এবং উড়িষ্যার জঙ্গলে হস্তীরা দলবদ্ধ হইয়া বাস করে, কিন্তু ইহাদের সংখ্যা ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে। একশৃঙ্গী এবং দ্বিশৃঙ্গী দুই উপজাতির গণ্ডার ভারতবর্ষে দেখা যায়। আসাম ও নেপালের জঙ্গলে আজও ইহারা বাস করে। এক সময়ে সুন্দরবনে প্রচুর গণ্ডার বাস করিত; আজকাল প্রায়ই দেখা যায় না। ভারতবর্ষের যে সকল স্থান উষ্ণ এবং নীরস কেবল সেখানেই উষ্ট্র দেখিতে পাওয়া যায়। গায়াল, গৌরী, মহিষ প্রভৃতি গোজাতীয় অনেক বন্য প্রাণী ভারতবর্ষের জঙ্গলে আছে। বন্য মেষও দুর্লভ নয়। তিব্বতে বৃহৎ শৃঙ্গযুক্ত মেষ অনেক দেখা যায়। পাহাড়ের উপরে ইহারা এত অনায়াসে লাফাইয়া চলে যে দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। হিমালয়ের বন্যছাগও খুব লম্ফনপটু। তিব্বত অঞ্চলে নীল-গাই প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা শস্যক্ষেত্রের ভয়ানক অনিষ্ট করে; ইহাদের শৃঙ্গ দীর্ঘ হয় না। হরিণ ভারতের সকল জঙ্গলেই আছে। হিমালয়ের পাদমূল হইতে মধ্য প্রদেশ পর্য্যন্ত স্থানে এক শ্রেণীর দীর্ঘশৃঙ্গ হরিণ দেখা যায়। ইহাদের শৃঙ্গে দশ হইতে কুড়িটি পর্য্যন্ত শাখা থাকে। জলা ভূমিতেই ইহাদের বাস, সম্বর নামক হরিণ ভারতবর্ষ ও বর্মার প্রায় সকল পার্বত্য জঙ্গলে প্রচুর পাওয়া যায়। হরিণ জাতির মধ্যে ইহারাই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। গায়ে চক্রাকার চিহ্নযুক্ত চিতা হরিণ দেখিতে অতি সুন্দর। বঙ্গোপসাগরের পূর্বদিকের কোন দেশেই ইহাদিগকে পাওয়া যায় না। শৃঙ্গহীন কস্তুরী মৃগ হিমালয়ের জঙ্গলে বাস করে; পুরুষ হরিণের

নাভির নিকটে মৃগনাভি সঞ্চিত থাকে। একফুট উচ্চ একপ্রকার হরিণ বর্মা এবং দাক্ষিণাত্যে দেখা যায়। দূর হইতে দেখিলে ইহাদিগকে বড় ইঁদুর বলিয়াই ভ্রম হয়।

তিন উপজাতির বন্য শূকর ভারতের নানাস্থানে দেখা যায়। বঙ্গদেশের শূকর বিশেষ শস্যহানিকর। ইহারা মানুষকেও আক্রমণ করে এবং সহজে ভয় পায় না।

অদন্ত জাতীয় প্রাণী ভারতবর্ষে অধিক নাই। "বন-রুই" নামক প্রাণীই আমাদের সুপরিচিত। ইহাদের দেহ মৎস্যের আঁইসের ন্যায় আবরণে আচ্ছাদিত থাকে। পিপীলিকা প্রভৃতি ছোট পতঙ্গই ইহাদের প্রধান আহার।

অদন্ত

বঙ্গোপসাগরে তীমি কখন কখন দেখা যায়। গঙ্গা এবং ব্রহ্মপুত্রের জলে 'শুঁশক' বাস করে।

তীমি জাতি

ব্লাণ্ডফোর্ড সাহেব ভারতীয় পক্ষী সমূহকে ৫৯৩ জাতিতে বিভক্ত করিয়াছেন। ইহাদের উপজাতির সংখ্যা ১৬১৭! দাঁড়কাক ও পাতিকাক এবং হাঁড়িচাঁচা ভারতের সর্বত্রই দেখা যায়। বুল্‌বুল্‌ও সকল স্থানেই পাওয়া যায়। শালিক, চড়াই, ফিঙে, বাবুই, তালচোঁচ, ছাতারে প্রভৃতিকেও ভারতের সাধারণ পক্ষী বলা যাইতে পারে। টুন্‌টুনি প্রভৃতি ছোট পাখীও সর্বত্র নজরে পড়ে।

সাধারণ পক্ষী

নীলকণ্ঠ, কাঠঠোক্‌রা এবং মাছরাঙার বহু উপজাতি ভারতবর্ষে আছে। ইহাদের পালকের সৌন্দর্য্য অত্যন্ত মনোরম। টিয়া জাতীয় বহু পক্ষী ভারতবর্ষে ও বর্মায় দেখা যায়। ভারতীয় পেচকের সংখ্যাও নিতান্ত অল্প নয়। কোকিল জাতীয় পক্ষীর প্রায় ত্রিশটী উপজাতি এদেশে বর্ত্তমান। পাপিয়া এই জাতিরই অন্তর্গত।

চিল, শকুন, হাড়্‌গিলা এবং বাজ শিকরেল প্রভৃতিই ভারতীয় মাংসাশী

পক্ষীদের মধ্যে প্রধান। ইহারা মৃত প্রাণীর মাংস আহার করে এবং সুবিধা পাইলে দুর্বল প্রাণীদিগকে আক্রমণ করিয়া হত্যা করে।

শিকারী পক্ষী

কাদাখোঁচা জাতীয় পক্ষীর অনেক উপজাতি আছে। এই পক্ষীরা একস্থানে বাস করে না, শীতের শেষে ইহারা হিমালয় প্রদেশ হইতে ভারতের সমতল ভূভাগে আশ্রয় লয়। স্নাইপ্ নামক সুখাদ্য পাখী এই জাতিরই অন্তর্গত। তা ছাড়া খঞ্জন জাতীয় অনেক পক্ষী শীত পড়িলেই এদেশে আসে এবং বর্ষায় অন্যত্র বাস করে।

কাদা খোঁচা

এই তিন জাতীয় পক্ষীর মধ্যে অনেকেই ভারতবর্ষের একস্থানে স্থায়িরূপে বাস করে না। ইহারা ঋতুভেদে সুবিধাজনক স্থানে চলিয়া যায়।

হংস, বক ও সারস

ভারতবর্ষে ১৫৩ জাতীয় সর্প আছে। ইহাদের উপজাতির সংখ্যা ৫৫৮। ব্যাঘ্রাদি জন্তুদের উৎপাতে বৎসরে যত লোক ক্ষয় হয়, তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক লোক সর্পাঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। পাহাড়ে চিতা প্রায় কুড়ি ফুট পর্য্যন্ত দীর্ঘ হয়। ইহারা কখন কখন গাছে ঝুলিয়া থাকে, দেহের গুরুত্বের জন্য দ্রুত চলিতে পারে না। হরিণ প্রভৃতি বৃহৎ জন্তুকেও ইহারা ধরিয়া আহার করে। ঢ্যাম্না বা ঢাড়স্ সাপও ছয় সাত ফিট লম্বা হয়। কিন্তু ইহারা নির্বিষ; ইন্দুর ব্যাঙ প্রভৃতিই ইহাদের আহার। ভারতের নিকটবর্ত্তী সমুদ্রে ও জলাশয়ে নানাজাতীয় সর্প দেখা যায়। সামুদ্রিক সর্পমাত্রই বিষাক্ত। স্থলভাগের সর্পের মধ্যে গোক্ষুরা, কারাইত, বরজ সাপ প্রভৃতির দাঁতে ভয়নক বিষ থাকে।

সর্প

ভারতবর্ষে তিন জাতীয় কুম্ভীর দেখা যায়। নদীতে যে সকল কুম্ভীর

দেখা যায় তাহারা মৎস্যাহারী, সুবিধা পাইলে মানুষকেও আক্রমণ করে। ইহারা হস্তী এবং ব্যাঘ্র প্রভৃতিকেও আক্রমণ করে।

কুম্ভীর ও কচ্ছপ

ভারতবর্ষের জলে ও স্থলে নানা জাতীয় কচ্ছপ দেখা যায়। স্থলের কচ্ছপ আকারে প্রায়ই বৃহৎ হয় না। ইহাদের মাংস সুস্বাদু।

টিক্‌টিকি এবং গিরগীটি ভারতের প্রধান সরীসৃপ। গোসাপও সরীসৃপ জাতীয় প্রাণী। সাপের মত দ্বিধা-বিভক্ত জিহ্বা আছে বলিয়া অনেকে মনে করে গোসাপের বিষ আছে। বীরভূম প্রভৃতি অঞ্চলে গাছে এক রকম বড় গিরগিটি দেখা যায়; ডিম্ব প্রসবের সময় উপস্থিত হইলে ইহাদের মস্তকের কিয়দংশ লাল হইয়া পড়ে। লোকে ইহাদিগকে বহুরূপী বলে, কিন্তু তাহা নয়। গির্‌গিটির বিষ নাই।

সরীসৃপ

হাঙ্গর শঙ্কর মৎস্য বঙ্গোপসাগরে এবং সুন্দরবনের নদীতে প্রচুর দেখিতে পাওয়া যায়। সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী লোণা জলে যে সকল মৎস্য পাওয়া যায়, তাহাদের মধ্যে ইলিস্ ভেট্‌কি এবং তপ্‌সিই প্রসিদ্ধ। নদীর জলে রুই ও বোয়াল জাতীয় নানা প্রকার মৎস্য পাওয়া যায়। কই জাতীয় মৎস্য জল হইতে দূরে চলাফেরা করে। হিমালয়ের পার্বত্য নদীতে মহাশির নামে একপ্রকার বৃহৎ মৎস্য পাওয়া যায়; এগুলির ওজন কখন কখন এক মণেরও অধিক হয়। বঙ্গদেশের নদীতে "টেঁপামাছ" নামে একপ্রকার অদ্ভুত মৎস্য পাওয়া যায়; ইহাদের পেটের তলায় একটী বাতাসের থলি থাকে, এই থলিতে বাতাস পুরিয়া ইহারা জলের ভিতরে উঠানামা করে।

মৎস্য

পতঙ্গ ক্ষুদ্র প্রাণী হইলেও মানুষের লাভক্ষতি অনেকটা পতঙ্গের উপরে নির্ভর করে। পঙ্গপাল শস্যক্ষেত্রের প্রধান শত্রু। তা ছাড়া বিশেষ বিশেষ পতঙ্গ বিশেষ বিশেষ গাছ আক্রমণ করিয়া মানুষের বহু অনিষ্ট

করে। আমাদের উপকারী পতঙ্গ ভারতবর্ষে অনেক আছে। পতঙ্গ-জাতীয় প্রাণীই গুটি বাঁধিয়া তসর ও গরদের রেশম প্রস্তুত করে। বঙ্গদেশ এবং যুক্ত প্রদেশে তুঁতগাছে গুঁটিপোকা লাগাইয়া রেশম উৎপন্ন করা হয়। লাক্ষাকীট পতঙ্গজাতীয় প্রাণী। মধ্যভারত এবং বঙ্গদেশের কোনো স্থানে এই কীট কয়েকজাতীয় গাছে লাগাইয়া পালন করা হয়। প্রতি বৎসরে ভারতবর্ষ হইতে প্রায় দুই কোটী টাকার লাক্ষা বিদেশে রপ্তানি হইতেছে।

পতঙ্গ

৫। জাতি-তত্ত্ব

বাংলা ভাষায় জাতি শব্দ নানা অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে; সুতরাং ভারতবর্ষের জাতিতত্ত্ব আলোচনা করিতে হইলে জাতির অর্থ টি প্রথমে স্পষ্ট করিয়া বুঝিবার প্রয়োজন আছে। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ আবার বাউরী, ডোম, হাড়ি প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামাজিক সমষ্টিকে সাধারণতঃ বাংলা ভাষায় জাতি বলা হয়; কিন্তু ইহার যথার্থ সংজ্ঞা 'বর্ণ' লৌকিক ভাষায় প্রায়ই ব্যবহৃত হয় না। আবার ইংরাজ, ফরাসী, বাঙ্গালী প্রভৃতি 'নেশন'কেও জাতি শব্দে অভিহিত করিতে সর্বদা দেখা যায়। 'নেশন' শব্দ ক্রমে বাংলা ভাষায় ও সাহিত্যে চলিয়া আসিতেছে। কোল, ভীল, সাঁওতাল প্রভৃতি উপজাতিকে আমরা জাতিই বলিয়া থাকি; ইংরাজিতে ইহাদিগকে Tribe বলে। ব্যবসায় অর্থে জাতিশব্দের প্রয়োগের উদাহরণ—কামার, কুমার, তাঁতি, ছুতার। ইংরাজিতে যাহাকে Race বলে তাহারও অনুবাদ আজকালকার সাহিত্যে জাতি দিয়া চলিয়া থাকে। আর্য্যজাতি, মোঙ্গলজাতি, নীগ্রোজাতি race অর্থে ব্যবহৃত হয়।

'জাতি' শব্দের বিভিন্ন অর্থ

আমরা প্রথমে ভারতের races বা মহাজাতিগুলির তত্ত্বালোচনায় প্রবৃত্ত হইব; কিন্তু ভারতের এই নৃতত্ত্ব আলোচনা করিবার পূর্বে পৃথিবীর মধ্যে প্রধান প্রধান জাতিগুলির বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা প্রয়োজন। পণ্ডিতগণ সাধারণতঃ সমগ্র মানবজাতিকে শ্বেত, পীত ও কৃষ্ণকায় এই তিন বর্ণতে বিভক্ত করিয়াছেন। মোটামুটি ভাবে বিচার করিতে গেলে দেখা যায় যে এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণ ও পশ্চিমাংশ ব্যতীত অবশিষ্ট সমস্ত স্থান পীতবর্ণের মনুষ্যের আবাস। সুদূর সাইবেরিয়ার তুষারাবৃত তুন্দ্রা হইতে ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত, অপরদিকে কাশ্যপ (Caspian) হ্রদের ধূলিধূসর তীর হইতে জাপান প্রভৃতি দ্বীপমালা পর্য্যন্ত পীত জাতির বাসভূমি। আমেরিকার আদিম অধিবাসীদিগকে যদিও লোহিতকায় বলা হয় তথাচ অনেকে ইহাদিগকেও বিরাট পীতজাতির অন্তর্গত বলিয়া মনে করেন। এই লোহিতকায় মানুষদের সহিত পীতকায় চীনাদের যে কিছু সাদৃশ্য আছে তাহা পণ্ডিতেরা স্বীকার করেন। অনেক পরিব্রাজক উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় প্রথম পদার্পণ করিয়া এই সাদৃশ্য দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছেন।

পীত

দ্বিতীয় মহাজাতি শ্বেতকায়। ইহারা য়ুরোপে, এশিয়ার পশ্চিমে ও ভারতের উত্তর অঞ্চলে বাস করে। কিন্তু শ্বেতকায় জাতি সকলেই যে এক মূল হইতে উঠিয়াছে তাহা নহে; শ্বেতকায়দের মধ্যে প্রধান দুটি বড় ভাগ হইতেছে সেমেটিক ও আর্য্য। আরব প্রভৃতি পশ্চিম-এশিয়াস্থিত কয়েকটি জাতি সেমেটিক মহাজাতির অন্তর্গত। তাহাদের সহিত আর্য্যদের আকার প্রকার আচার ব্যবহার ও ভাষা সমস্তেরই সম্পূর্ণ অমিল। আর্য্য জাতির বাস য়ুরোপেই অধিক; দুই একটি ক্ষুদ্র উপজাতি ছাড়া সমগ্র য়ুরোপই একপ্রকার আর্য্য। এশিয়াতে কেবলমাত্র পারস্য ও ভারতবর্ষে আর্য্যদের বাস দেখা যায়। তৃতীয় মহাজাতি কৃষ্ণকায়। ইহারাও একটি জাতি নহে; ভারতের দ্রবিড়, অষ্ট্রেলিয়ার

শ্বেতকায়

আদিম অধিবাসী, আন্দামান নিকোবরের অসভ্য বাসিন্দা, ও সুবিশাল আফ্রিকা মহাদেশের নীগ্রো, কাফ্রি জুলুগণ একই জাতির অন্তর্গত নহে। মোটামুটি ইহাদের সকলকেই কৃষ্ণকায় মানবশ্রেণীর মধ্যে ধরা হয়। এই তিন বর্ণের জাতি হইতে সমস্ত মানবের উৎপত্তি কিনা, তাহাদের আদিম বাস কোথায়, ইত্যাদি সহস্র প্রশ্নের উত্তর এখন পর্য্যন্ত কেহ দিতে পারেন নাই।

কৃষ্ণকায়

ভারতবর্ষের নৃতত্ত্ব লইয়া য়ুরোপের সুধীসমাজে বহুকাল হইতে আলোচনা হইতেছে—বহুমতামত লিপিবদ্ধও হইয়াছে। সকলেই এই মহাদেশের জাতি-বৈচিত্র্য দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছেন এবং যাঁহারা য়ুরোপের জাতিবিশ্লেষণে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন তাঁহারা ভারতবর্ষের জনসমুদ্রের আবর্ত্তে পড়িয়া দিশাহারা হইয়াছেন। ইহার একটি কারণ ভারতবর্ষ কোনো একটি বা দুইটি জাতির সংমিশ্রণে গড়িয়া উঠে নাই। এখানকার ইতিহাসের সহিত এদেশের জাতিতত্ত্ব অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত। ভারতবর্ষের ইতিহাসে দেখা যায় যে যুগে যুগে নানা বর্ণের নানা জাতি এদেশে প্রবেশ করিয়াছে, কিন্তু কোথাও তাহাদের চিহ্ন মাত্র নাই। এ দেশে আর্য্যদের প্রবেশের পূর্ব্বেও লোক বাস করিত; দ্রবিড়গণ এদেশের অধীশ্বর ছিলেন এবং তাঁহাদের অপেক্ষা অসভ্য জাতিদেরও বাস এখানে ছিল। আর্য্যেরা একসঙ্গে ও একবারেই ভারতে প্রবেশ করেন নাই। বহু শতাব্দী ধরিয়া দলের পর দল নিজ নিজ গোত্রপতির নেতৃত্বাধীনে ভারতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। পরে শকজাতি ভারতের বিভিন্ন স্থানে উপনিবেশ ও রাজ্য স্থাপন করে; য়িউচিরা বহুকাল ভারতের পশ্চিমে রাজত্ব করিয়া বৌদ্ধধর্ম ও ভারতীয় নাম গ্রহণ করিয়াছিল; হূন ও গ্রীকগণ এদেশে আসিয়াও উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল তাহাও ইতিহাস সাক্ষ্য দিতেছে। কিন্তু আজ তাহা-

ভারতের নৃতত্ত্বে জটিলতা

বহু জাতির উপনিবেশ ও সংমিশ্রণ

দের বাছিয়া বাহির করা যায় না। ভারতবর্ষের বিপুল হিন্দু সমাজের অসংখ্য স্তরের মধ্যে কোথায় কোন্ Tribe একটি caste বা 'জাতে' পরিণত হইয়া মিলিয়া মিশিয়া রহিয়াছে তাহা বিশ্লেষণ করা অসম্ভব। কবির এই উক্তি "হেথায় আর্য্য, হেথা অনার্য্য, হেথায় দ্রবিড় চীন, শক হুন দল মোগল পাঠান এক দেহে হলো লীন" অনেক পরিমাণে সত্য।

ভারতবর্ষের সমগ্রজাতিকে মোটামুটি ভাবে সাতটি ভাগে বিভক্ত করা হয়। কিন্তু এই বিভাগের প্রধান বিপদ হইতেছে যে, কোনো দুই জাতির মধ্যে কোনো সুস্পষ্ট রেখা টানিয়া বলা যায় না এইখান হইতে অমুক জাতি আরম্ভ।

সাধারণত মানুষের শারীরিক আকৃতি, ভাষার-চিহ্ন, ধর্ম ও সামাজিক আচার ব্যবহার দেখিয়া তাহার জাতি নির্ণয় করা হয়। ইহার মধ্যে

জাতি নির্ণয়ের সাধারণ উপায়

শারীরিক চিহ্নই সবচেয়ে বড় প্রমাণ; কেন না মানুষের ভাষা বদলাইয়া যায় এমন দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল নয়; যেমন আমেরিকায় নিগ্রোগণের ইংরাজীই এখন মাতৃভাষা; কিন্তু তাহাদের আকৃতি অপরিবর্ত্তনীয়। বাংলা দেশেও অনেক অনার্য্য জাতির ভাষা সম্পূর্ণরূপে বাংলা হইয়া গিয়াছে যেমন কোচ, চাকমাদের ভাষা। সুতরাং শারীরিক চিহ্নই জাতিবিশ্লেষণের একমাত্র উপায় বলিয়া পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ কেহ এখনো পর্য্যন্ত মনে করেন। শারীরিক চিহ্নের দ্বারা বিচার করিবার দুইটা উপায় আছে; প্রথমটি চোখে যাহা ধরা পড়ে তাহার দ্বারা বিচার। চীনা, জাপানী, বর্মনের গোঁফ দাড়ি অল্প, চোখ ছোট, চোয়ালের হাড় উঁচু, মাথার চুল খাড়া ইত্যাদি সকলেরই চোখে পড়ে এবং আমাদের সঙ্গে তাহাদের পার্থক্য কোথায় তাহা সহজেই বুঝিতে পারি। শারীরিক পরীক্ষার দ্বিতীয়

খর্পর-বিদ্যা

উপায় হইতেছে খর্পর-বিদ্যা। এই বিদ্যার দ্বারা মাথার মাপ, নাকের মাপ, চোখের রঙ, চুলের রঙ

প্রভৃতি বিচার করা হয় ও তাহাই বিশ্লেষণ করিয়া পণ্ডিতেরা কয়েকটি মূল জাতির স্বাভাবিক মাপ পাইয়া থাকেন। সেই স্বাভাবিক মাপ হইতে ভারতের বিভিন্ন স্থানের অধিবাসীদের পার্থক্য কোথায়, কোন কোন জাতির সংমিশ্রণে তাহাদের খর্পর ও নাসিকার গঠন বদলাইয়াছে, বর্ণ কৃষ্ণাভ হইয়াছে তাহা বিচার করিয়া ভারতের সমগ্র জন-সংখ্যাকে সাত ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। ১৮৮৬ সালে ভারতে এই খর্পর বিদ্যার সাহায্যে নূতন তথ্য নিরূপণের চেষ্টা আরম্ভ হয়। নিম্নে সেই বিভাগের একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া গেল।

১। তুর্ক-ইরাণী শাখা—ভারতের পশ্চিম সীমান্তবাসী আফগন, বেলুচি, ও উত্তর পশ্চিমসীমান্ত বাসীদের এই শাখার অন্তর্গত করা হয়।

২। হিন্দু-আর্য্যশাখা—পঞ্জাব, রাজপুতানা, কাশ্মীর প্রভৃতির অধিবাসীগণ যথার্থ আর্য্য বলিয়া পরিগণিত। এখানকার লোকেদের আকৃতি তুর্কইরানীদের হইতে যে পৃথক তাহা দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। এখানকার উচ্চ নীচবর্ণের মধ্যে মাপের দিক হইতে পার্থক্য সামান্য।

৩। শক-দ্রবিড় শাখা—বোম্বাইএর মহরষ্ঠা ব্রাহ্মণ, কুনবীরা ও দক্ষিণ ভারতের কুর্গগণ এই শাখার অন্তর্গত। ইহারা অপেক্ষাকৃত খর্ব; ইহাদের খর্পর প্রশস্ত। দ্রবিড়গণের সংমিশ্রণে ইহাদের আকৃতি আর্য্যগণ হইতে একটু পৃথক হইয়াছে।

৪। আর্য্য-দ্রবিড় বা হিন্দুস্থানী—সংযুক্ত-প্রদেশ ও বিহারের আর্য্যগণের সহিত আদিম দ্রবিড় অধিবাসীগণের সংমিশ্রণ হইয়াছিল। উচ্চবর্ণের মধ্যে মিশ্রণ কম হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়, কেননা তাঁহাদের খর্পর নিম্ন শ্রেণীর চামার মুসারদের খর্পর হইতে অনেক পৃথক।

৫। মোঙ্গলদ্রবিড় বা বাঙ্গালী—বাঙ্গালীর আকার প্রকার ভারতবর্ষে সমস্ত জাতি হইতে যে কিঞ্চিৎ পৃথক তাহা দেখিলেই বুঝা

যায়। উচ্চবর্ণের মধ্যে আর্য্যশোণিত কিয়ৎ পরিমাণে প্রবাহিত; কিন্তু সাধারণ লোক মোঙ্গল ও দ্রবিড় জাতির সংমিশ্রণে উদ্ভূত বলিয়া মনে হয়। বাংলাদেশের মানচিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে হিমালয় ভেদ করিয়া উত্তরের মোঙ্গলীয় জাতি এদেশে প্রবেশ করিয়াছিল। নেপালী, ভুটানী, লেপ্চা, আক্কা, আবর, মিশ্মী, প্রভৃতি জাতি সকলেই বিরাট পীত-মহাজাতির অন্তর্গত। ভারতের পূর্ব প্রান্তে মোঙ্গলীয়দের বহুশাখা বাস করিতেছে। টিপ্রা, কুকী, মণিপুরী, নাগা, প্রভৃতি জাতি আমাদের কাছে খুবই সুপরিচিত। দক্ষিণের শ্রীহট্ট ও কাছাড়ের বাঙ্গালীদের ও উত্তরের অসমীয়াদের সহিত খাসিয়া জয়ন্তিয়াদের মেলা-মেশা আছে; ত্রিপুরাবাসীরা এখন বাঙ্গালী হিন্দু, মণিপুরীরা বৈষ্ণব, চাকমারা বাংলাভাষাভাষী হিন্দু। বাংলাদেশের অধিবাসীদের মধ্যে জাতিতে জাতিতে মেলামিশা যথেষ্ট হইয়াছে; কিন্তু একটা কথা আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে। সেইটি এখনকার জলবায়ু। তিন চারি পুরুষ পূর্বে যে সকল উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের দ্বিবেদী, ত্রিবেদী, পাণ্ডে, মিশ্র, অথবা মহরট্টা দেশীয় দক্ষিণী ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন, এখন তাঁহাদের বংশধরগণের কাহাকেও আর দশজন বাঙ্গালী হইতে বাছিয়া বাহির করা দুঃসাধ্য। বাংলা দেশ সম্বন্ধে যেমন জলবায়ুর প্রভাবের কথা খাটে অন্য দেশ সম্বন্ধেও সে কথাটা ভুলিলে চলিবে না।

৬। মোঙ্গলীয় শাখা—পূর্বেই বলিয়াছি ভারতবর্ষের উত্তরে হিমালয়ের উপত্যকায় ও পাদমূলে এবং ভারতের পূর্ব দিকে ব্রহ্মদেশে মোঙ্গল জাতির বাস। দারজিলিঙের লেপ্চা, নেপালের লিম্বু, মুরমী, গুরুঙ্গ, আসামের আদিম অধিবাসী অহোম, বোদো, পূর্ববঙ্গের কতকগুলি জাতি এবং উত্তর-বঙ্গের কোচগণ এই মহাজাতিরই অংশ।

৭। দ্রবিড়—দ্রবিড়গণকেই ভারতের আদিম অধিবাসী বলিয়া অনেকে মনে করেন। সিংহল হইতে আরম্ভ করিয়া মধ্য-ভারত পর্য্যন্ত

দেশ দ্রবিড়গণের বাসস্থান। তামিল, তেলেগু, কর্ণাটী, মালায়লাম এখানকার প্রধান জাতি। মুণ্ডা, খন্দ, প্রভৃতি অসভ্য জাতিদেরও এই দ্রবিড় জাতিদের মধ্যেই ফেলা হয়। তবে তাহাদের পরস্পরের মধ্যে পার্থক্য এত অধিক যে তাহাদিগকে এক জাতীয় বলিয়া সহসা বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না। দ্রবিড়গণ কৃষ্ণবর্ণ; ইহাদের খর্পর লম্বা ও চোয়াল উঁচু।

ইংরাজীতে যাহাকে Tribe বলে বাংলায় আমরা তাহাকে উপজাতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিব। সাঁওতাল, কোল, ভিল এক একটি উপজাতি।

উপজাতি

এখনো এইরূপ কতকগুলি জাতি হিন্দু সমাজের বাহিরে রহিয়াছে। কিন্তু বহুযুগ হইতে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বর্গ বিপুল হিন্দুসমাজের এক এক কোণে আপনার স্থান করিয়া লইয়াছে। এই সকল উপজাতি এখন এক একটি বর্ণ বলিয়া পরিগণিত। নানা উপায়ে এই সকল অনার্য্য জাতি ধীরে ধীরে হিন্দুসমাজের মধ্যে প্রবেশলাভ করিয়াছে।

১। কোনো বর্গের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা প্রাচীনকালে কোনো উপায়ে ভূম্য-ধিকারী হইয়া সম্মান পায়। তখন হইতে তাহারা আপনাদিগকে রজপুত বলিয়া প্রকাশ করিতে থাকে; এদিকে ব্রাহ্মণগণ তাহাদের জন্য পুরাণ হইতে বংশ-তালিকা প্রণয়ন করিতে সদাই তৎপর বলিয়া সমাজের একটা স্তরে আসন পাতিয়া লইতে তাহাদের বিলম্ব হয় না। দুই এক পুরুষের মধ্যে তাহারা কোনো এক শ্রেণীর ক্ষত্রিয়রূপে পরিচিত হয়।

২। কতকগুলি অনার্য্যজাতীয় লোক বৈষ্ণব, রামাৎ বা লিঙ্গায়েৎ প্রভৃতি মধ্যযুগের উদার ধর্ম্মমত গ্রহণ করিয়া সেই সম্প্রদায়-অনুমোদিত আচার-অনুষ্ঠান অনুসরণ করিয়া শীঘ্রই হিন্দু বলিয়া অভিহিত হইয়াছিল।

৩। এক একটি বর্গ একেবারে নূতন নাম নূতন প্রথা লইয়া হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিয়া থাকে। বাংলা দেশের উত্তরস্থিত কোচগণ যে অনার্য্য ও মোঙ্গলীয় জাতি সম্ভূত তাহা তাহাদের আকৃতি ও পূর্ব ইতিহাস হইতে

সকলেই জানিতে পারেন। কিন্তু বর্ত্তমানে তাহারা আপনাদিগকে রাজবংশী বলে এবং কোন্ এককালে পরশুরামের সময়ে তাহারা এদেশে পলায়ন করিয়া আসিয়াছিল ইত্যাদি বলিয়া আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া অভিহিত করে। এইরূপে টিপরাগণ ক্ষত্রিয় হইয়াছে। যদিও তাহারা সম্পূর্ণরূপে বাঙ্গালী হইয়া গিয়াছে, তথাচ পাহাড়ের মধ্যে যাহারা বাস করিতেছে তাহাদের আচার-ব্যবহার ভাষা যে মোটেই ভারতের অন্যান্য স্থানের ক্ষত্রিয়দের ন্যায় নহে, তাহা দেখিলে বুঝা যায়।

৪। কোনো কোনো বর্গের কতকগুলি লোক হিন্দু আচার, রীতি, নীতি, দেবদেবীর পূজাপদ্ধতি গ্রহণ করিয়া আপন বর্গ হইতে পৃথক হইয়া পড়ে ও দুই এক পুরুষের মধ্যেই হিন্দুসমাজের মধ্যে প্রবেশ করিয়া একটি জাতি বলিয়া পরিচিত হয়। এই সকল উপ-জাতি দেখিতে দেখিতে উপরিস্থিত ব্রাহ্মণ, কায়স্থদের প্রথা অনুকরণ করে। তাহাদের ন্যায় ইহারাও ক্রমে ক্রমে কৌলীন্য, থাক, উচ্চনীচ ভাগ করিতে থাকে। বীরভূম ও সাঁওতাল পরগণায় কোড়া নামে এক জাতি আছে; তাহাদের ভাষা সাঁওতালীর অপভ্রংশ, কিন্তু তাহারা এখন হিন্দুনাম, গোত্র, আচার গ্রহণ করিয়া পৃথক হইয়া আসিতেছে। এইরূপে সংযুক্ত প্রদেশের আহীর, ডোম, দোসাদ পঞ্জাবের গুজর, জঠ, মিও জাতি, বম্বের কোলি, মহার ও মহরাঠাগণ, বাংলাদেশের বাগ্দী, হাড়ি, ডোম, চণ্ডাল, কৈবর্ত্ত, পোদ, রাজবংশী কোচ, টিপ্রাগণ ও মান্দ্রাজের মাল, নায়ার, বেল্লাল, পারিহা প্রভৃতি উপ-জাতি হিন্দুসমাজের মধ্যে প্রবেশলাভ করিয়া এক একটি 'জাত' হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

হিন্দুসমাজের বাহিরে এখনো অনেকগুলি অনার্য্যবর্গ দাঁড়াইয়া আছে; তাহারা এখনো তাহাদের ভূত প্রেত পূজা ত্যাগ করিয়া হিন্দু দেবদেবীর পূজা আরম্ভ করে নাই ও ব্রাহ্মণ পুরোহিতের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়া তাহাদের আচারব্যবহার মানিয়া লয় নাই;—যাহারা হিন্দুসমাজে প্রবেশ করি-

য়াছে তাহাদের সকলেই যে ব্রাহ্মণ পুরোহিত নিযুক্ত করে তাহা নহে, যেমন মুসাহার, ডোম। ইহারা প্রকৃতির উপাসক। ইহাদের এক একটি উপজাতি বহু উপবর্গে বিভক্ত এবং প্রত্যেক উপবর্গ কোনো না কোনো বিশেষ জন্তু বা বৃক্ষকে পবিত্র বলিয়া মানে। সেই জন্তুকে তাহারা আহার বা প্রহার করে না এবং সেই গাছের ফল খায় না বা ডাল ভাঙে না; এবং যে জাতি সেই জন্তু বা বৃক্ষকে শ্রদ্ধা করে, তাহাদের সহিত বিবাহাদি সম্বন্ধে আবদ্ধ হয় না।

হিন্দু ধর্ম চিরকাল বাহিরের অনার্য্য জাতিকে সমাজের মধ্যে গ্রহণ করিয়াছে। ব্যক্তিগত দীক্ষাপ্রথা ছিল কিনা বলা কঠিন, তবে কোনো কোনো স্থলে সমস্ত বর্গ ধীরে ধীরে হিন্দুসমাজের অন্তর্গত হইয়াছে; তাহার দৃষ্টান্তই ভারতের সামাজিক ইতিহাস।

৬। আয়তন ও জনসংখ্যা

ভারতবর্ষ যে কত বড় দেশ তাহা বাংলাদেশের গৃহকোণে বসিয়া, কেবলমাত্র ভূগোলবিবরণ পড়িয়া ও মানচিত্র দেখিয়া আদৌ হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। সংখ্যা দিয়া বুঝাইতে হইলে বলিতে হয় এই বিশাল দেশের পরিমাণফল ১৮ লক্ষ ২ হাজার বর্গ-মাইল; কিন্তু ইহাতে কি ইহার বিশালত্ব অনুভব করা যায়? এদেশ উত্তর হইতে দক্ষিণে প্রায় দুই হাজার মাইল লম্বা এবং পূর্ব হইতে পশ্চিমেও প্রায় তত। পায়ে হাঁটিয়া এই মহাদেশ পার হইতে প্রায় সাড়ে তিন মাস লাগে। য়ুরোপের সহিত তুলনা করিলে আমরা বুঝিব এদেশ কত বৃহৎ। রুশিয়া বাদে সমগ্র য়ুরোপ ভারতের সমান। একা ব্রহ্মদেশই অষ্ট্রিয়া হাঙ্গেরীর সমতুল্য; বঙ্গের সহিত স্পেনের তুলনা চলে; মাদ্রাজ, পঞ্জাব, বেলুচিস্থান

আয়তন

মধ্যপ্রদেশ ও বেরার এবং রাজপুতানা—প্রত্যেকটিই বৃটীশ দ্বীপপুঞ্জ হইতে বৃহৎ। ইতালি আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশ ও বিহার-উড়িষ্যা হইতে ক্ষুদ্র; নিজামের হায়দ্রাবাদ ও কাশ্মীররাজ্য গ্রেট্‌ব্রিটনের সমান। এমনি করিয়া তুলনা করিলেই আমরা বুঝিতে পারি ভারতবর্ষের আয়তন কত বড়।

ভারতবর্ষের জন সংখ্যা ১৯১১ সালের আদমসুমারী অনুসারে ৩১ কোটি ৫১ লক্ষ ছিল—সমগ্র পৃথিবীর জনসংখ্যার এক পঞ্চমাংশ। অর্থাৎ পৃথিবীর প্রতি পাঁচজনের মধ্যে ভারতবাসী একজন। রুশ ব্যতীত অবশিষ্ট য়ুরোপের জনসংখ্যা ভারতের সমান, এবং আমেরিকার মার্কিন-দেশের জনসংখ্যার প্রায় তিনগুণ; যুক্তপ্রদেশ ও বাংলা-দেশের জনসংখ্যা বৃটীশদ্বীপেরই সমান; বিহার-উড়িষ্যার জনসংখ্যার সহিত ফ্রান্সের, বম্বের সহিত অষ্ট্রিয়ার, পঞ্জাবের সহিত স্পেন-পর্টুগালের, আসামের সহিত বেলজিয়ামের তুলনা চলে।

জনসংখ্যা

বৃটীশ-শাসিত ভারতের আয়তন ১০ লক্ষ ৯৩ হাজার বর্গ মাইল; অর্থাৎ সমস্ত ভারতের শতকরা ৬৩ ভাগ। জনসংখ্যা ২৪ কোটি ৪২ লক্ষ অর্থাৎ সমগ্র সংখ্যার শতকরা ৭৭½ অংশ। দেশীয় নরপতি-গণের রাজ্য সমগ্র ভারতের শতকরা চব্বিশ ভাগ, জনসংখ্যা ৭ কোটি ৯ লক্ষ।

দেশীয় রাজ্য

ভারতে লোকের বসতি ও জনসংখ্যা সর্বত্র সমান নহে। মোটামুটি ভাবে ভারতের প্রতি বর্গ মাইলে গড়ে ১৭৫ জন লোকের বাস ধরা হয়। বৃটীশ-অধিকৃত ভারতে ২২৩ জন ও দেশীয় রাজ্যে ১০০ জন গড়ে প্রতিবর্গ মাইলে বাস করে। কিন্তু স্থানবিশেষে ইহার তারতম্য অত্যন্ত অধিক দেখা যায়।

ভারতের লোক বসতি

প্রদেশ-হিসাবে দেখিতে গেলে বাংলা দেশেরই লোক-বসতি অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় অধিক। এখানে প্রতি বর্গ-মাইলে ৫৫১ জন লোক

বাস করিয়া থাকে। ইহা হইতেছে সমগ্র বাংলার কথা; আরও এইটু ক্ষুদ্র স্থান লইলে অনেক পার্থক্য চোখে পড়িবে। যেমন ঢাকা ও হাওড়ায় দুইটি বড় বড় সহর থাকায় এখানকার জনবসতি বর্গ মাইলে ১০৬৬ হইয়াছে। আবার চট্টগ্রাম পার্বত্য বলিয়া সেখানে মাত্র ৫৬ জন লোক বর্গ মাইলে বাস করে।

বাংলা দেশ

আসামের মধ্যে তিনটি বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিভাগ পড়ে। ব্রহ্ম-পুত্রের অপ্‌বহিকাতে আহোম রাজগণের রাজ্য ছিল; উহারই দক্ষিণে খাশিয়া পাহাড়; সেখানে নানা অর্দ্ধ সভ্য জাতির বাস। সেখানকার লোকবসতি বর্গমাইলে ১৫।১৬ জন মাত্র। ইহারই দক্ষিণে সুরমা নদীর উপত্যকা-অন্তর্গত সিলেট ও কাছাড় জিলা। এই জেলা দুটির অধিবাসীরা অধিকাংশই বাঙ্গালী। এস্থানটি নদীবহুল ও উর্বর, সেইজন্য এখানকার জনবসতি বর্গমাইলে ৪০৬ জন।

আসাম

বাংলা দেশের পশ্চিমে বিহার-উড়িষ্যা প্রদেশ। তিনটি বিভিন্ন প্রাকৃতিক অংশ লইয়া এই প্রদেশটি গঠিত। ইতিহাসের মিথিলা মগধ ও গঙ্গা-গণ্ডকীর পলিপাড়া দেশকে বিহার বলে; এখানে জনবসতি বর্গমাইলে সাড়ে ছয় শত। দ্বিতীয় প্রাকৃতিক ভাগ সমুদ্রের তীরে অবস্থিত। উড়িষ্যা দেশে লোকবসতি বর্গ মাইলে ৫০০। এই দুই ভূখণ্ডের মধ্যবর্ত্তী পার্বত্য মাল-ভূমিকে ছোট নাগপুর বলে। এখানে বৃষ্টি কম, জমি বালুকাময়; জনসংখ্যা কম, বর্গ-মাইলে মাত্র ১৮৬ জন লোক বাস করে। তবে গিরিধি প্রভৃতি স্থানে যেখানে কয়লা ও অভ্রের কাজের জন্য নানা শিল্পব্যবসায় জাগিয়া উঠিয়াছে, সে সব স্থানে লোক বসতি ও বৃদ্ধি পাইয়াছে।

বিহার-উড়িষ্যা।

অযোধ্যা-আগ্রার সংযুক্ত প্রদেশ আয়তনে ষষ্ঠ হইলেও জনসংখ্যায় শ্রেষ্ঠ। এখানকার অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় পাঁচ কোটি। সমগ্র প্রদেশের

প্রতি বর্গমাইলে লোকবসতি ৪৮৭; কিন্তু জলবায়ু, বৃষ্টির পরিমাণ ও জমির উর্বরতার পার্থক্যহেতু সব জায়গার লোকসংখ্যা সমান নহে; দক্ষিণে বুন্দেল-খণ্ডের অপেক্ষাকৃত বারিশূন্য শুষ্ক স্থানে লোকবসতি বর্গ-মাইলে ২১১ জন; আবার হিমালয়ের পাদমূলে পার্বত্য প্রদেশে কৃষিকার্য্য যেখানে সহজে হয় না, সেখানে লোক বসতি খুব পাত্‌লা—বর্গ-মাইলে ৯৬ জন মাত্র। হিন্দু বৌদ্ধ ও মুসলমান শাসনকালে গঙ্গাযমুনার এই উপত্যকাই সভ্যতার কেন্দ্র ছিল; সেই জন্য এখানে যতগুলি প্রথমশ্রেণীর সহর আছে, ভারতের আর কোনো প্রদেশে তত নাই।

সংযুক্ত প্রদেশ

পঞ্জাবে প্রায় ২২ কোটি লোকের বাস, আয়তনে গ্রেটব্রিটেনের চেয়ে বড়। সুতরাং জনসংখ্যা বাড়িবার মতো স্থান এখনো আছে। তবে সেখানে বৃষ্টি প্রচুর হয় না, এবং জমি সর্বত্র কৃষির উপযোগী নহে বলিয়া জনসংখ্যা বাড়িবার পক্ষে অনুকূল নহে। কিন্তু সম্প্রতি সরকার বাহাদুর কয়েকটি খাল খনন করিয়া মরুময় প্রদেশকে কৃষিক্ষেত্রে পরিণত করিয়াছেন; বিশ বৎসর পূর্বে যে জেলায় কয়েক ঘর যাযাবর লোক ঘুরিয়া বেড়াইত এখন সেখানকার লোকবসতি বর্গমাইলে ২৭৪ জন।

পঞ্জাব

উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ ১৯০১ সালে গঠিত হয়। ইহার আয়তন য়ুরোপের বুলগেরিয়ার মত; কিন্তু জনসংখ্যা মাত্র ২২ লক্ষ। বর্গমাইলে লোকবসতি ১৬৪ জন মাত্র। বৃটীশ অধিকৃত স্থানে জনসংখ্যা ক্রমেই বাড়িতেছে; বৃটীশ-শাসনের সুখ-শান্তির লোভে ও সরকারের জলসেচনাদির সুন্দর ব্যবস্থা দেখিয়া দুর্দও আফরিদী, জাকাখেল প্রভৃতি জাতির লোকেরা এখানে উপনিবেশ স্থাপন করিবার জন্য দলে দলে আসিতেছে।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ

বঙ্গে প্রদেশ বলিতে পাঁচটি বিভিন্ন প্রাকৃতিক ভাগ বুঝায়। বঙ্গে

বিভাগটি পার্বত্য,—পশ্চিমঘাট ও আরব সাগরের উপকূল বরাবর বিস্তৃত; এখানে বৃষ্টি প্রচুর পরিমাণে হয়। স্থানের অনুপাতে বম্বে প্রদেশে জনসংখ্যা কম; গুজরাট, সিন্ধু প্রদেশের অধিবাসী লইয়া বম্বে প্রেসিডেন্সি; জনসংখ্যা ২ কোটি ৭০ লক্ষ ছিল। সিন্ধু প্রদেশটীর সহিত বম্বের ভাষায়, জাতি-তত্ত্বে কোনো বিষয়ে কোনো মিল নাই। এখানকার জলবায়ু অত্যন্ত শুষ্ক: বৃষ্টিপাত বৎসরে ২ ইঞ্চি হইতে ১০ ইঞ্চির মধ্যে হয়। এখানে কৃত্রিম জল-সেচনের দ্বারা কৃষি নির্বাহিত হয়। বম্বের লোকবসতি বর্গমাইলে ১৭ হইতে ৩৮০।

বম্বে

মধ্যপ্রদেশ সব দেশেরই একটু একটু খণ্ড লইয়া গঠিত। পশ্চিমাঞ্চলের মহরাট্টা, উত্তরের হিন্দীভাষাভাষী, পূর্বের ওড়িয়া তেলেগু ও প্রাচীন খন্দ জাতি প্রভৃতি সবকে মিলাইয়া এই প্রদেশটী তৈয়ারী হইয়াছে। ১৯০৩ সাল হইতে বেরার হায়দ্রাবাদের নিকট হইতে খাস বৃটীশ-শাসনাধীনে আসিয়াছে। এখানকার জনসংখ্যা ১ কোটি ৩৯ লক্ষ।

মধ্যপ্রদেশ

দেশীয় রাজ্য সমূহ লইয়া মান্দ্রাজের জনসংখ্যা ৪ কোটি ৬২ লক্ষ অর্থাৎ বর্গমাইলে ৩০২ জন করিয়া লোক বাস করে—দেশীয় রাজ্য সমূহ বাদ দিলে লোক বসতি ২৯১ দাঁড়ায়। এ দেশের জলবায়ু ও জন বসতি সর্বত্র সমান নয়। পশ্চিম উপকূলের বৃষ্টির পরিমাণ ১১০ ইঞ্চি ও পূর্ব্ব উপকূলে ৩৪ ইঞ্চি। এখানকার বৃষ্টির অভাব খালখনন ও বাঁধ-নির্মাণের দ্বারা পূরণ হইয়াছে। তাঞ্জোর নামে একটি জেলার বৃষ্টিপাত ৪৪ ইঞ্চি, কিন্তু পয়োপ্রণালীর সুব্যবস্থা থাকাতে প্রতি বর্গমাইলে ৬৩৫ জন করিয়া লোক এখানে বাস করিয়া থাকে।

মান্দ্রাস

করদরাজ্য ভারতের সর্বত্রই আছে। ইহার মধ্যে হায়দ্রাবাদই সবচেয়ে

বড় — জনসংখ্যা দেড় কোটির সামান্য বেশী। এ দেশটি আয়তন বাংলা দেশের মত হওয়া সত্ত্বেও জনসংখ্যায় নিতান্ত কম। লোক বসতি গড়ে বর্গমাইলে ১৬২ জন মাত্র।

করদরাজ্য

জনবহুলতায় দক্ষিণের কোচীন রাজ্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; এখানকার লোকবসতি ৬৭৫ জন, তুইটি তহঁশিলে ১৮০০ করিয়া লোক বর্গমাইলে বাস করে। রাজপুতানার মরুভূমিতে ২১টি রাজ্যে মাত্র ১কোটি ৫ লক্ষ লোকের বাস। বর্গমাইলে গড়ে ২৮২ জন লোক বাস করে; কিন্তু সব জায়গায় সমান নয়— জশল্মীরে লোকবসতি ৫ জন ও ভরতপুরে প্রায় ৩০০ জন।

ভারতবর্ষের লোকবসতির এই বৈচিত্রের কারণ কি? য়ুরোপের সভ্যতা ও সহরে প্রতিষ্ঠিত; সেখানকার অধিকাংশ লোকের জীবন ফাক্টরী, খনি, জাহাজ, রেল প্রভৃতি স্থানে কাটে। আমাদের দেশের প্রাণ প্রতিষ্ঠিত ছিল গ্রামে। এখানকার শতকরা ৭০ জন লোক কৃষিজীবি; বৃষ্টি-প্রধান স্থান ও সমতল ভূমিতে সেইজন্য লোকের ভিড় অধিক। কিন্তু এ নিয়ম সর্বত্র খাটে নাই। গুজরাট অপেক্ষা আসামে তিনগুণ বেশী বৃষ্টিপাত হওয়া সত্ত্বেও জনসংখ্যা গুজরাটেই বেশী; কাশ্মীরে ২৪ ইঞ্চি বৃষ্টি হইলেও পাহাড়ের জন্য লোকের বাস বর্গমাইলে ৩৭ জন মাত্র। সুতরাং বৃষ্টিই একমাত্র ঘন লোকবসতির কারণ নহে। যে সমতল ভূমিতে সহজে জল সেচনাদি করা যায়, যে দেশ পার্বত্য নহে সেখানে লোকের বাস বেশী। সেইজন্য ভারতের জনবসতি নদী-উপত্যকাতেই অধিক।

—

৭। নগর ও গ্রাম

সাধারণতঃ এক লক্ষের অধিক জনপূর্ণ স্থানকেই নগর বলিয়া ধরা হয়। আর প্রত্যেক ম্যুন্সিপালটিকে অথবা পাঁচহাজার লোকের বাস যেখানে আছে এমন স্থানকে সহর বলিয়া ধরা হয়। এই হিসাব অনুসারে ভারতের শতকরা ৯½ জন করিয়া লোক সহরের বাসিন্দা। ভারতে মাত্র ত্রিশটি নগর আছে। এই সকল নগরে সমগ্র দেশের এক শতজন লোকের মধ্যে ২'২ জন মাত্র বাস করে; পাশ্চাত্য দেশ সমূহের সহিত এইখানে ভারতের খুবই একটা পার্থক্য। ইংলণ্ডের শতকরা ৪৫ জন, জারমেনীর ২১ জন ও ফ্রান্সের ১৪ জন নগরে বাস করে। ভারতবর্ষে সহরের বৃদ্ধি ক্রমেই হইতেছে এবং গ্রামে খাদ্য, উপজীবিকা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা সবই দুর্লভ বলিয়া লোকে সুবিধা পাইলেই নগরে গিয়া বাস করিতেছে। নগরগুলির মধ্যে রেঙ্গুন, কারাচী, হাওড়া কয়েক বৎসরের মধ্যে আশ্চর্য্য উন্নতি লাভ করিয়াছে।

নগর ও সহর

কলিকাতার জন সংখ্যা ১০ লক্ষ ৪৩ হাজার; এখানকার অধিকাংশ লোকই বাহির হইতে আসিয়াছে; শতকরা ২৯ জন লোকও কলিকাতা তাহার জন্মভূমি বলিয়া দাবী করিতে পারে না। কলিকাতার প্রায় ২ লক্ষ ৯৪ হাজার লোকের বাড়ী বাংলার বাহিরে; ইহাদের মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যা খুবই কম। এক হাজার পুরুষের মধ্যে ৩৫৭ জন স্ত্রীলোক অর্থাৎ তিন জন পুরুষের জায়গায় একজন স্ত্রীলোক; ওড়িয়াদের মধ্যে বারোজনে একজন স্ত্রীলোক। ইহার ফল যে খুবই খারাপ হইয়াছে তাহা বলা বাহুল্য। এই সব শ্রেণীর মধ্যে দুর্নীতি ও ব্যাধি অত্যন্ত প্রবল।

কলিকাতা

গত কয়েক বৎসর হইতে দেখা যাইতেছে যে ভারতের গ্রামবাসীদের সংখ্যা কমিতেছে ও সহর-বাসীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহাতে দেশের যথার্থ উন্নতি হইবে কিনা তাহা ভাবিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। ভারতের শিল্পের উন্নতির সহিত এখানে বহুবিধ কারখানা সৃষ্ট হইতেছে। পূর্বের কুটীর-শিল্প নষ্ট হইয়া যাইতেছে এবং তাহার স্থানে সুবৃহৎ ফাক্টরী সমূহ স্থাপিত হইতেছে। এইরূপে বম্বে ও নাগপুরের দিকে সুতা ও কাপড়ের কল, কলিকাতার নিকট পাটের কল গড়িয়া উঠিয়াছে। কাণপুর, দিল্লী প্রভৃতি স্থানেও শিল্পকেন্দ্র হইয়াছে। কলিকাতা বম্বে ও অন্যান্য শিল্প-কেন্দ্রের চারিপার্শ্বের দরিদ্রদের জীবনের সমস্যা দিন দিন ভীষণ হইয়া উঠিয়াছে। শিল্পোন্নতি ও মানুষের মনুষ্যত্ব বজায় রাখার মধ্যে,—একহাতে সমস্ত ধন পুঁজি হওয়া ও নানা হাতে তাহা অনুপাত অনুসারে থাকার মধ্যে, কোন সামঞ্জস্য আছে কিনা তাহা ভাবিতে হইবে।

গ্রাম ও শিল্পকেন্দ্র

ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোকেই কুটীরে বাস করে; সে সব কুটীরের দশা কিরূপ তাহা যাঁহারা গ্রামে প্রবেশ করিয়াছেন তাঁহারাই জানেন; অধিকাংশ বাড়ীর একটি কি দুটি করিয়া ঘর। অবশ্য মধ্য-বিত্ত ও বড় লোকদের প্রয়োজনের অনেক বেশী কোঠা কামরা থাকে। একান্ন ভুক্ত পরিবারপ্রথা ক্রমেই ভাঙ্গিয়া আসিতেছে; গৃহ প্রতি কয় জন করিয়া লোক বাস করে তাহা নিম্নের তালিকা দেখিলে ইহা বুঝা যাইবে।

১৮৮১ সালে ৫·৮ জন বাড়ী প্রতি
১৮৯১ „ ৫·৪ „ „
১৯০১ „ ৫·২ „ „
১৯১০ „ ৪·৯ „ „

৮। জনসংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি

জনগণনাকে আদমসুমারী বলে। ১৮৭২ সালে সর্বপ্রথম আদমসুমারী গৃহীত হয়; তাহার পর ১৮৮১,১৮৯১,১৯০১ ও ১৯১১ জনগণনা হইয়াছে। আগামী বৎসর ১৯২১ সালে পুনরায় জনগণনা হইবে। আমরা ১৯১১ সালের আদমসুমারীর সহিত অন্যান্য বৎসরের তুলনা করিয়া ভারতের লোকসংখ্যারহ্রাস বৃদ্ধি হইয়াছে কিনা দেখিব।

সমগ্র ভারতের জন-সংখ্যাবৃদ্ধির হার

১৯০২ হইতে ১৯১১ পর্য্যন্ত সমগ্র ভারতের জনসংখ্যা শতকরা ৭·১ জন হারে বাড়িয়াছিল; [বৃটীশ ভারতে ৩·৯%; করদরাজ্যে-১২%] ১৮৯১ হইতে ১৯০১ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছিল ১·৫ হারে, [বৃটীশ ভারতে ৩·৯%; করদরাজ্যে ৬·৬%] মোটের উপর সমগ্র ভারতে ১৮৭২ হইতে ১৯১১ পর্য্যন্ত এই ৪০ বৎসরে জনসংখ্যা শতকরা ১৯%জন হারে বাড়িয়াছিল।

প্রদেশ হিসাবে এই জন-বৃদ্ধি কিরূপ হইয়াছে তাহা দেখিলে প্রথমেই আমাদের যুক্ত প্রদেশের অবস্থা চোখে পড়িবে। ১৮৯২ হইতে ১৯১১ সাল পর্য্যন্ত ২০ বৎসরে যুক্ত প্রদেশের জনসংখ্যা শতকরা আধ (০·৬) হারে বাড়িয়াছিল এবং ১৯০২ হইতে ১৯১১ সালের মধ্যে ১·৭ হারে কমিয়াছিল।

যুক্ত প্রদেশ ও পঞ্জাবের জনসংখ্যা হ্রাস

এই হ্রাসের কারণ প্লেগ জ্বর। বিহার-উড়িষ্যা প্রদেশে দশ বৎসরে ১½% হারে লোক-বৃদ্ধি হইয়াছিল। পঞ্জাবে ২০ বৎসরে জনসংখ্যা ৫ হারে বাড়িয়াছিল বটে, কিন্তু শেষ দশ বৎসর ম্যালেরিয়া ও প্লেগের উৎপাতে জনসংখ্যা শতকরা একের অধিক করিয়া কমিয়া গিয়াছিল; কোনো কোনো জেলার ১০ হারে লোকও হ্রাস পাইয়াছিল; প্লেগে ও জ্বরেই বেশী লোক ক্ষয় হইয়াছিল। বাংলাদেশের দুইটি জেলার লোকসংখ্যা হ্রাস পাই-

য়াছে, এবং কয়েকটিতে বৃদ্ধি হইয়াছে নাম মাত্র। এই বৃদ্ধি অন্যান্য দেশের তুলনায় খুব কম। ইংলণ্ড, জারমেনী, হল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে জনসংখ্যা যে পরিমাণে বাড়ে—ভারতের বৃদ্ধি তাহার অর্দ্ধেকেরও কম। (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)

জনসংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধির প্রধান প্রধান কারণগুলি নিম্নে নির্দেশ করিতেছি। (১) দেশের বিবাহিত নরনারীদের সংখ্যার অনুপাত; (২) বিবাহ সম্বন্ধে সমাজ ও ধর্মশাস্ত্রের মতামত, (৩) ও বিধবাবিবাহ। এক কথায় বিবাহ সম্বন্ধে নিয়ম নিষেধ, আচার প্রথা জনসংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধির প্রধান কারণ।

জনসংখ্যা হ্রাসবৃদ্ধির কারণ

আমাদের দেশের ধর্ম্মের অনুশাসনে, পরলোকের ও নরকের ভয়ে, ও সমাজের পীড়নে প্রায় প্রত্যেক নরনারীকে—সে সক্ষম হউক আর না হউক—বিবাহ করিতে হয়। হিন্দু পরিবারে কন্যার বিবাহ অতি অল্প বয়সে না দিলে সমাজে নিন্দা ও অবশেষে পতনের ভয় যথেষ্ট। মুসলমানদের ভিতর বিবাহ সম্বন্ধে কড়াকড়ি না থাকিলেও বিবাহ প্রত্যেককেই করিতে হয়। এক ব্রহ্মদেশ ব্যতীত ভারতের সর্বত্রই বিবাহ বাধ্যতামূলক একথা বলিলে ভুল হইবে না। আমাদের দেশে যাহার চালচুলা, অর্থ-পয়সা, বিদ্যাসামর্থ্য প্রভৃতি কোনো জঞ্জাল নাই—তাহার কিন্তু একটি পত্নী ও গুটি চার পাঁচ রুগ্ন, অনাহার-শীর্ণ, মলিন-ছিন্নকন্থা-পরিহিত শিশু আছে। সমগ্র ভারতের অধিবাসীর শতকরা ৪৯ জন পুরুষ ও ৩৪ জন নারী অবিবাহিত—৪৬ জন পুরুষ ও ৪৮ নারী বিবাহিত ও অবশিষ্ট ৫ ও ১৭ জন যথাক্রমে বিপত্নীক ও বিধবা। অবিবাহিতদের অধিকাংশই অল্প বয়সের। অবিবাহিত পুরুষের চারি ভাগের তিন ভাগের বয়স ১৫ এর কম ও অবিবাহিত মেয়েদের ইহার চেয়ে বেশী ভাগের বয়স ১০ এর কম। অধিক বয়স পর্য্যন্ত বিবাহ করে নাই এমন লোক খুব কম চোখে পড়ে।

ভারতের বিবাহিতের সংখ্যা

ধর্ম-অনুসারে বিবাহিতের সংখ্যা হিন্দুদের মধ্যেই সর্বাপেক্ষা অধিক।

ইহাদের মধ্যে সকল বয়সের একশত জন পুরুষের মধ্যে ৪৭ জন ও নারীদের মধ্যে ৫০ জন বিবাহিত। বাল্যবিবাহ এখনো দেশমধ্যে যথেষ্ট আছে; সমগ্র হিন্দুনারীর শতকরা ৮০ জন অবিবাহিত বালিকার বয়স ১০এর মধ্যে। ১৫ হইতে ৪০ বৎসরের যত নারী আছে তাহার শতকরা ৯৬ জন বিবাহিত; দ্বারভাঙ্গা জিলার ৫ হইতে ১০ বৎসরের বালকদের শতকরা ৪৮% জন ও মেয়েদের ৬২ জন বিবাহিত।

বিবাহিত হিন্দুর সংখ্যা

মুসলমানদের মধ্যে অবিবাহিতের সংখ্যা হিন্দুদের তুলনায় কম। মুসলমানদের মধ্যে শতকরা ৫৩ জন অবিবাহিত, বিবাহিত ৪৩ ও অবশিষ্ট ৪ জন বিপত্নীক; নারীদের মধ্যে শতকরা ৩৮ জন অবিবাহিত, ৪৭ বিবাহিত ও ১৫ জন বিধবা। বাল্য-বিবাহ হিন্দুদের অপেক্ষা ইহাদের সমাজে কম। পাঁচ হইতে দশ বৎসর বয়স্ক হিন্দু মেয়েদের শতকরা ১৩জন বিবাহিত, মুসলমানদের সেই জায়গায় ৬ জন।

বিবাহিত মুসলমানের সংখ্যা

আদিম জাতিদের মধ্যে খুব অল্প বয়সে বিবাহ হয় এবং বিবাহ সেখানেও বাধ্যতামূলক। কিন্তু বৌদ্ধদের মধ্যে বিবাহ অধিক বয়সে হয় ও না করিলে সমাজে পতন হয় না।

শিশু-বিবাহ ভারতে কমিতেছে কিনা তাহা বলা কঠিন; কোনো কোনো জাতির মধ্যে কমিতেছে, কোথায়ও পূর্বের ন্যায় এই প্রথা দৃঢ়ই রহিয়াছে। হিন্দুদের মধ্যে পাঁচ বৎসরের কম বয়সের শিশুদের দশ হাজারে ১৮ জন বিবাহিত; ৫ হইতে ১০ এর মধ্যে দশহাজার করা ১৩২ জন বিবাহিত; ১০—১৫ এর মধ্যে ৪৮৮ জন বিবাহিত। মুসলমানদের মধ্যে ৫ বৎসরের কম বয়সের শিশুদের বিবাহ হিন্দুদের তুলনায় কম—মাত্র দশহাজারে ৫ জন।

বাল্য-বিবাহ

পাশ্চাত্য দেশের মধ্যে কেবল ইংলণ্ডের সহিত তুলনা করিলেই আমরা

বুঝিব যে বিবাহের সংখ্যা এদেশে কিরূপ। সে দেশে ১৫ বৎসরের কম কোনো বালক বিবাহিত নাই; আমাদের দেশে শতকরা ৬ জন ঐ বয়সে বিবাহিত। ২০ বৎসরের হাজার জন লোকের মধ্যে ইংলণ্ডে কেবলমাত্র ২ জন বিবাহিত, আর সেই জায়গায় আমাদের দেশে ৩২১ জন বিবাহিত এবং অনেকে দুই একটি সন্তানের পিতা। ২৫ বৎসর বয়সের সময়ে দেখা যায় দশ হাজারে ১৪২ জন ইংরাজ ও ৫৯১ জন ভারতবাসী বিবাহিত। নারীদের মধ্যে এই পার্থক্য আরও সুস্পষ্ট। পনের বৎসরের নীচে ইংরাজ বিবাহিত বালিকা নাই বলিলেই চলে, আর আমাদের দেশে ঐ বয়সের শতকরা ২০ জন মেয়ে বিবাহ করিয়া সংসার পাতিয়া সন্তানের জননী হইয়া থাকেন। ২০ বৎসর বয়সের ইংরাজ বালিকা শতকরা ১২ জন ও ভারতবর্ষে শতকরা ৮০ জন বিবাহিত।

ভারতবর্ষের নারীদের আর একটি বিশেষত্ব তাহাদের বাধ্যতা-মূলক বৈধব্য। পুরুষদের মধ্যে শতকরা ৯ জন বিপত্নীক, কিন্তু নারীদের মধ্যে শতকরা ১৭ জন বিধবা। য়ুরোপে ৪০ বৎসরের নীচের নারীদের মধ্যে শতকরা ৭ জন ও ভারতে ৪০এর নীচেই ২৮ জন বিধবা। ইহাদের মধ্যে ১৫ বৎসরের অল্পবয়সী মেয়ের সংখ্যা তিন লক্ষের উপর; শতকরা ১·৩ জন মেয়ে বিধবা।

বিধবা

উচ্চ বর্ণের মধ্যে বিধবাদের বিবাহ সমাজে প্রচলিত নাই; অনেক নীচবর্ণের মধ্যে (স্যাঙা) 'সঙ্গ' প্রথা আছে; অনেক জাতি আপনাদিগকে বড় বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার জন্য উচ্চ বর্ণের প্রথাদি অবলম্বন করে। তবে আজকাল অনেক উচ্চ বর্ণের পণ্ডিত ও শিক্ষিত লোক বিধবা কন্যাদের বিবাহ দিতেছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবাবিবাহের জন্য যাহা করিয়াছিলেন তাহা প্রবাদগত। তাঁহারই চেষ্টায় এ বিষয়ে আইন হইয়াছে।

জনসংখ্যা-বৃদ্ধির কারণ বহুবিবাহ, বিধবাবিবাহ এবং হ্রাসের কারণ

বহু সন্তানের জন্ম, বৈধব্য ও বহুস্বামিত্ব। বহুস্বামিত্ব ভারতের সভ্য দেশে কোথায়ও নাই বলিলে চলে। তবে বহুবিবাহ বহুস্থানেই প্রচলিত আছে। যে দেশে বিবাহ বাল্যে হয় এবং বহু সন্তান জন্ম গ্রহণ করিতে থাকে সেখানে মৃত্যু-সংখ্যাও বেশী হয়। য়ুরোপ ও অন্যান্য দেশের সহিত তুলনায় দেখা যায় যে সে-সব দেশে বিবাহের সংখ্যা, জন্মের সংখ্যা সবই আমাদের দেশের চেয়ে কম—সেই সঙ্গে মৃত্যু-হারও কম। ভারতে জন্ম হয় খুবই বেশী, সেই সঙ্গে মৃত্যুও হয় অস্বাভাবিক রূপে অধিক ; ফলে যে জনসংখ্যা বাড়িতেছে তাহা অন্যান্য দেশের তুলনায় নিতান্ত কম।

জন্মের ও বৃদ্ধির হার আদিম জাতিদের মধ্যেই বেশী ; তার পরই মুসলমান ও হিন্দুদের। ১৯১১ সালে হিন্দু যেখানে শতকরা ৫% হারে

জন্ম মৃত্যুর বৃদ্ধির হার

বাড়িয়াছিল, মুসলমান বাড়িয়াছিল ৬½এর উপরে। ত্রিশ বৎসরে হিন্দুদের বৃদ্ধি শতকরা ১৫% ও মুসলমানদের ২৬% হারে হইয়াছিল। এই বংশবৃদ্ধির সহিত আয়ুর হ্রাসবৃদ্ধির যথেষ্ট সম্বন্ধ আছে। ইহার সত্যতা নিম্নের অঙ্কগুলি হইতে বুঝা যাইবে। হিন্দুদের মধ্যে সন্তান-সংখ্যা কম বলিয়া দীর্ঘায়ু তাহাদের মধ্যে অধিক। আদিম জাতিদের সন্তান খুব বেশী হয় বলিয়া শেষ পর্য্যন্ত তাহারা দুর্ব্বল হইয়া পড়ে ও অতি-বৃদ্ধ হইবার পূর্ব্বেই মরিয়া যায়।

ধর্ম্ম	১৯০১—১৯১১ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি	দশ হাজারে ৬০ বৎসর বয়স্ক ব্যক্তির সংখ্যা	বৃদ্ধি অনুসারে ক্রম	আয়ু অনুসারে ক্রম
হিন্দু	৫·০৪	৫৭৩	৩	১
মুসলমান	৬·৭	৪৯৭	২	২
আদিম	১৯·৯	৪৪৭	১	৩

আমাদের দেশের লোকের আয়ু অন্যান্য দেশ হইতে কম। পূর্বে শতায়ু লোকের অভাব ছিল না—এখন দুই একজনও চোখে পড়ে না।

ভারতে আয়ু-হ্রাস

ভারতবাসীদের আয়ু প্রতি বৎসরেই হ্রাস পাইতেছে। আমরা নিম্নে একটি তালিকা দিতেছি; ইহাতে দেখা যাইবে যে ইংলণ্ডে পুরুষদের আয়ুর আশা ৪৬ বৎসর ও আমাদের সেই জায়গায় ২২½ বছর; ইংলণ্ডের নারীদের ৫০ বৎসরের স্থানে আমাদের দেশের ২৩ বৎসর মাত্র। ইংলণ্ডের স্বাস্থ্য ও শিক্ষার গুণে লোকের আয়ু বৃদ্ধি পাইতেছে এবং এই দুইএর অভাবে আমাদের দেশে আয়ু হ্রাস পাইতেছে। আমাদের দেশের বড় বড় লোকেরা ক্বচিৎ পঞ্চাশ পার হয়েন আর য়ুরোপের লোকেরা তখন জীবনের বড় বড় কাজ আরম্ভ করেন। আমাদের গতি নিম্নাভিমুখে; সুতরাং কোথায় গিয়া দাঁড়াইব তাহা বলা কঠিন। এখন হইতে সচেষ্ট না হইলে আমাদের জাতীয় চিহ্ন বজায় রাখিতে মুষ্টিমেয় দুর্বল স্বল্পপ্রাণ মানুষও অবশিষ্ট থাকিবে না।

বয়স	পুরুষ					নারী				
	ভারতবর্ষ			ইংলণ্ড		ভারতবর্ষ			ইংলণ্ড	
	১৮৯১	১৯০১	১৯১১	১৯০১	১৯১১	১৮৯১	১৯০১	১৯১১	১৯০১	১৯১১
০	২৪·৫	২৩·৬	২২·৫	৪৪·	৪৬	২৫·৫	২৩·৯	২৩·৩	৪৭·৭	৫০
৩০	২৩·৬	২২·৯	২২·৪	৩৩	৩৫·২	২৪·৬	২৩·৮	২২·৯	৩৫·৪	৩৭·৮
৬০	১০·১	৯·৫	১৩·৯	১৮·৮	১৯·৮	১০·৮	১০	১০·১	১৪	১৪·৮
৯০	১·৬	১·২	১·১	২·৩	২·৩	১·৭	১·৬	১·১	২·৬	২·৫

ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডের অধিবাসীর পরমায়ুর তালিকা।

(জন্মিবার সময়ে ভারতবাসীর জীবনের আশা ২২½ বৎসর ; ৩০ বৎসর হইলে লোকের আরও ২২ বৎসর বাঁচিবার সম্ভাবনা হয় ; ইংলণ্ডে ৩৫ বৎসর। ইত্যাদি)

৯। অক্ষম ও অকর্মণ্য

ভারতে অক্ষম অকর্মণ্য লোকের সংখ্যা খুব বেশী। নিম্নে অকর্মণ্যদের একটি তালিকা প্রদত্ত হইতেছে :—

অকর্ম্মণ্য	১৯১১	১৯০১	১৮৯১	১৮৮১
উন্মাদ	৮১,০০৬	৬৬,২০৫	৭৪,২৭৯	৮১,১৩২
	লক্ষে ২৬	২৩	২৭	৩৫
মূকবধির	১,৯৯,৮৯১	১,৫৩,১৬৮	১,৯৬,৮৬১	১,৯৭,২১৫
	লক্ষে ৬৪	৫২	৭৫	৮৬
অন্ধ	৪,৪৩,৬৫৩	৩,৫৪,১০৪	৪,৫৮,৮৬৮	৫,২৬,৭৪৮
	লক্ষে ১৪২	১২১	১৬৭	২২৯
কুষ্ঠ	১,০৯,০৯৪	৯৭,৩৪০	১,২৬,২৪৪	১,৩৪,৯৬৮
	লক্ষে ৩৫	৩৩	৪৬	৫৭
মোট	৮,৩৩,৬৪৪	৬,৭০,৮১৭	৮,৫৬,২৫২	৯,৩৭,০৬৩
	লক্ষে ২৬৭	২২৯	৩১৫	৪০৭

অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতবর্ষে পাগলের সংখ্যা কম। ইংলণ্ডে লক্ষের মধ্যে ৩৬৪ জন উন্মাদ ও ক্ষীণ শক্তি বলিয়া গণ্য হয়। ভারতবর্ষে

উন্মাদ

ক্ষীণশক্তি বা নির্বোধদের এই পর্য্যায় ফেলা হয় না বলিয়া এখানকার এই সংখ্যা এত কম। স্নায়ুর দৌর্বল্য এই রোগের কারণ বলিয়া সভ্যতা বিস্তারের সহিত উন্মাদ রোগ বৃদ্ধি

পাইতেছে। সমগ্র ভারতের পাগলের সংখ্যা হ্রাস পাইতেছে ; কিন্তু যুক্ত প্রদেশ, সীমান্ত প্রদেশ ও দাক্ষিণাত্যের চারিটি করদরাজ্যে উন্মাদ রোগ বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহার কারণ স্পষ্টত বলা যায় না।

বোবা-কালা লোকের সংখ্যা অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতে বেশী নয়। সমগ্র দেশে লক্ষ করা ৭৪ জন পুরুষ ৫৩ জন স্ত্রী বোবা। দুঃখের বিষয় ইহাদের শিক্ষার জন্য যে ব্যবস্থা আছে তাহা নিতান্ত সামান্য।

মূক-বধির

অকর্মণ্যদের মধ্যে অন্ধদের সংখ্যাই বেশী, দশহাজারের মধ্যে ১৪৭ জন। য়ুরোপ ও মার্কিন দেশে সেই জায়গায় ৯এর অধিক নয়। কেহ কেহ বলেন গ্রীষ্ম-মণ্ডলে অন্ধতা বেশী ; কিন্তু রুশ দেশে দশহাজারে ১৯ করিয়া অন্ধ ; রুশ গ্রীষ্মমণ্ডলের মধ্যে নয়। অপুষ্ট আহার ও তৈলের অভাবে দেখা যায় অনেকে রাত কাণা হয় ; এরূপ লোকের সংখ্যা কত জানা যায় না।

অন্ধ

১৮৯১ সালের আদম-সুমারী অনুসারে ভারতে কুষ্ঠ মহাব্যাধি আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ২৬ হাজার ; ১৯০১ অব্দের লোক-গণনার সময়ে দেখা যায় কুষ্ঠের সংখ্যা কমিয়া ৯৭ হাজারে দাঁড়াইয়াছিল। ইহার কারণ ভারতে সেই দশ বৎসরে কয়েকটি ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয় এবং বহুলোক মরিয়া যায়। কিন্তু ১৯১১ সালের আদম-সুমারীতে দেখা যায় এই সংখ্যা প্রায় ১২ হাজার বাড়িয়াছে। এই বৃদ্ধির কারণ কি সে সম্বন্ধে শেষ কথা এখনো বলা হয় নাই ; তবে কেহ কেহ বলেন ছারপোকা নাকি ইহার বাহন এবং দারিদ্র্য, অনাহার, শীতের কষ্ট, দুশ্চরিত্রতা প্রভৃতি নানাকারণে ইহার প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। এই ব্যাধি সংক্রামক—তবে প্লেগ বসন্তের ন্যায় নয়। সাধারণত নিম্নশ্রেণীর মধ্যে এই ব্যাধির প্রকোপ দেখা যায়। বাংলাদেশে বাউরী, রাজবার, উড়িষ্যার বাগ্দী ও অজাতদের মধ্যে এই রোগাক্রান্ত

কুষ্ঠ

লোকের সংখ্যা অধিক। বাংলাদেশে বাঁকুড়া জেলায় কুষ্ঠের সংখ্যা দশ হাজারে ২০ হইতে ৩০ জন করিয়া; ইহার পরেই বীরভূম ও বর্দ্ধমান।

কুষ্ঠের সংখ্যা ১ লক্ষ ৯ হাজার—অথচ মাত্র ৫ হাজারের মত কুষ্ঠাশ্রম আছে। ইহার সংখ্যা ৭০টি; তন্মধ্যে ৪০টি খৃষ্টান পাদরীদের দ্বারা পরিচালিত; পাঁচ হাজারের মধ্যে সাড়ে তিন হাজার খৃষ্টানদের নিকট আশ্রয় পাইয়াছে। ইহারা কুষ্ঠদের ছেলেমেয়েদের পৃথক করিয়া রাখেন এবং যাহাতে সংস্পর্শ দোষে এই রোগ সন্তানাদির মধ্যে সংক্রামিত না হয় সেদিকে দৃষ্টি দেন। অবশিষ্ট এক লক্ষ চারি হাজার কুষ্ঠ ভারতের সর্বত্র নির্বিকারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; তাহাদের অবাধ ভ্রমণ সর্ব-সাধারণের ব্যবহার্য্য সামগ্রীর ব্যবহার, দূষিত শরীরের ক্লেদ যথা তথা ত্যাগ প্রভৃতির কোনো নিষেধ নাই। কোনো সভ্য-সমাজে কুষ্ঠেরা এমন অসহায় ভাবে জীবন কাটায় না। এ বিষয়ে সমাজ ও সরকারের দৃষ্টি দেওয়া নিতান্ত প্রয়োজন।

১০। উপজীবিকা

ভারতবর্ষের ৩১ কোটি লোক কেমন করিয়া কি ভাবে জীবনযাত্রা করে তাহা জানিবার প্রয়োজন আছে। ইংলণ্ডের একশত জন লোকের মধ্যে ৫৮ জন শিল্পকর্মে, ১৪ জন চাকুরী, ১৩ জন বাণিজ্য ব্যবসায়ে, এবং ৮ জন মাত্র কৃষিকার্য্যে ব্যাপৃত। ভারতবর্ষে সেই জায়গায় শতকরা ৭১ জন কৃষি গোচারণ প্রভৃতি কার্য্যে, ২৯ জন অন্যান্য কাজে নিযুক্ত। ইহার মধ্যে শতকরা ১২জন লোক শিল্পকর্মে, ২ জন জিনিষ পত্র স্থানান্তরিত করিবার কার্য্যে (যেমন মাঝি, গাড়োয়ান, রেলে), এবং কেবলমাত্র ৫জন ব্যবসায়ে রত রহিয়াছে। য়ুরোপের সহিত এই অসামঞ্জস্যের কারণ,

পশ্চিম শিল্প ও বাণিজ্যের যে প্রকার উন্নতি লাভ করিয়াছে ভারতবর্ষ তাহা এখনো পারে নাই। বরং ভারতীয় শিল্পের অধঃপতন হওয়ায় দেশের লোক কৃষির আশ্রয় লইয়াছে। ষাট বৎসর পূর্বে জারমেণীর অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবি ছিল ; কিন্তু শিল্প ও বাণিজ্যে ইহারা কি উন্নতি লাভ করিয়াছিল তাহা (যুদ্ধের পূর্বে) আমাদের চারিদিকের জিনিষ পত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝিতে পারিতাম।

পাশ্চাত্য প্রভাব দেশের হাড়ে হাড়ে প্রবেশ করিয়াছে ; পূর্বে গ্রাম গুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাধারণ তন্ত্র ছিল, আপনার মধ্যে আপনি আবদ্ধ, বাহিরের পৃথিবীর সহিত যে তাহার যোগ আছে তাহা সে কোনো কালে ভাবে নাই। গ্রামের চাষী সংলগ্ন ক্ষেতে চাষ করিতে, তাঁতি ঘরে কাপড় বুনিত। কামার লোহার ফাল, দা প্রভৃতি যে সামান্য দুই চারিটা জিনিষের প্রয়োজন হইত তাহাই নির্মাণ করিত ; ছুতার গ্রামের গো-শকট চালাইত, মুচী মৃত গরুর চামড়া পাইত এবং যে সামান্য জিনিষ করিত, তাহা গ্রামেই লাগিত ; কুম্ভকারকে তাহার দ্রব্য সম্ভার লইয়া বহুদূরে যাইতে হইত না,— নিকটের হাটে তাহার সামগ্রী বিক্রয় হইয়া যাইত। প্রতি গ্রামেই তিলি তেল করিত, ধোপা কাপড় কাচিত, নাপিত ক্ষৌর কর্ম করিত, ভুঁইমালী বা অন্য কোনো নীচজাতি পরিচ্ছন্নতার জন্য দায়ী থাকিত। এইরূপে গ্রামগুলি বেশ দিন কাটাইতেছিল ; সামাজিক ঘোঁট তাহাদের সব চেয়ে বড় রাজনৈতিক আলোচনা ছিল, পার্লেমেণ্টে কি হইতেছে, কংগ্রেস কি বলিতেছেন তাহা জানিবার কোনো উপায় ছিল না। কিন্তু এখন সে সমস্ত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে ; রেল পথ নির্মিত হওয়ায় বিদেশের জিনিষ গ্রামের দ্বারে, বিদেশের শিক্ষা ও হাবভাব গ্রামের অন্তরে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। পূর্বের দ্রব্য-বিনিময় উঠিয়া গিয়াছে, এখন আর কাপড় দিয়া তৈল বা তৈল দিয়া চাল পাওয়া যায় না। এখন অর্থের প্রচলন

প্রাচীন গ্রাম

সর্বত্র হইয়াছে। রেল হইবার পর হইতে ভারতের শান্ত জীবনের মধ্যে অকস্মাৎ এই পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে।

ভারতবর্ষ কৃষি প্রধান দেশ; সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ৭২ জন কৃষিকর্ম্মে লিপ্ত; অর্থাৎ ২১ কোটি ৭০ লক্ষ লোক কৃষির উপর নির্ভর করে; তাহার মধ্যে ৮০ লক্ষ জমিদার। ১৬ কোটি ৭০ লক্ষ নিজ নিজ জমি চাষ করে। ৪ কোটি ১০ লক্ষ চাকর বা দিনমজুর, ইহাদের নিজের কোনো জমি নাই। হাজার ৭৫ লোক নায়েব, গোমস্তা প্রভৃতি জমিদারী সংক্রান্ত কার্য্য করে।

কৃষি

গড়ে ভারতবর্ষের ১০০ জন কৃষি-উপজীবি ২৫ জন করিয়া দিনমজুর লাগাইয়া থাকে। কিন্তু প্রতি-প্রদেশের পৃথক পৃথক হিসাব করিলে দেখা যায়—আসামে গড়ে মাত্র দুই জন মজুর একশ জন কৃষকের কাছে কাজ করে ও বেরার-মধ্য-প্রদেশে ৫৯ জন। ইহার দুইটি কারণ; প্রথমতঃ যেখানে অস্পৃশ্য বা আদিমজাতির বাস অধিক সেখানে মজুরের সংখ্যা অধিক, কারণ তাহারা কৃষিকার্য্য জানে না—(যেমন সাঁওতাল ওরাঁও প্রভৃতি জাতি)। দ্বিতীয় কারণ দেশে জমির অভাব। জমি ভাগের পর ভাগ হইতে হইতে ঘরের মত নিতান্ত সামান্য এক টুক্‌রা হইয়াছে। শিল্পকর্ম প্রচুর পরিমাণে নাই বলিয়া সকলেই জমির দিকে ঝুঁকিয়াছে, এমন কি তাঁতি তিলি লোহার প্রভৃতি জাতি জাত-ব্যবসায় লাভজনক নয় বলিয়া ক্ষেত খামার করিতেছে; ফলে জমির অভাব হইয়াছে ও জমিহীন দিন-মজুরের সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। যাহাদের জমি নাই তাহারা মজুরী করে, সংস্কারবশতঃ যাহারা বাহিরে যাইতে পারে না, তাহারা অনাহারে মরে; যাহারা দেশের বাহিরে চলিয়া শিল্পকেন্দ্রে উপস্থিত হইতে পারে তাহারা বাঁচিয়া যায়।

কৃষি ব্যতীত মৎস্য-ব্যবসায় ও শিকার করিয়া অনেক লোক জীবন

ধারণ করে। প্রতি দশ হাজার লোকের মধ্যে ৬ জন এই কর্ম করে। সমগ্র ভারতের অর্দ্ধেক মৎস্য-ব্যবসায়ী বঙ্গদেশে ও মান্দ্রাজ প্রদেশে দেখা যায়। ভারতে মৎস্যের উন্নতির জন্য সরকার বাহাদুর নজর দিয়াছেন এবং আশা করা যায় এই ব্যবসায় ভারতের খালে বিলে নদীর ধারে ধারে শীঘ্রই উন্নতি লাভ করিবে।

সমগ্র ভারতবর্ষে ৫ লক্ষ ৩০ হাজার লোক অর্থাৎ প্রতি দশ হাজারের মধ্যে ১৭ জন খনিতে কাজ করে; ইহার মধ্যে বাংলাদেশের

খনি

কয়লা খনিতে ১ লক্ষ ১৫ হাজার ও বিহার উড়িষ্যায় ১ লক্ষ ২৭ হাজার লোক কাজ করে। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই কুলী; খনিতে সাধারণত সাঁওতাল, বাউরী, ভুঁইয়া, চামার, কোড়া, রাজবার, দোষাদ মুসাহার জাতির লোক কাজ করে। এছাড়া অন্যত্র খনিতে প্রায় একলক্ষ লোক কাজ করে; ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই মহীশূর রাজ্যের মধ্যে কাজে লিপ্ত।

দশ বৎসরের মধ্যে খনিজ কাজে লোক সংখ্যা ২,৩৫ হাজারের স্থানে ৫ লক্ষ ১৭ হাজার দাঁড়াইয়াছে। ১৯০১ সাল হইতে দশ বৎসরে ধাতুর খনিতে কাজ করিবার লোক ২½ গুণ বাড়িয়া গিয়াছে।

৩ কোটি ৫৩ লক্ষ লোকে শিল্প কাজের উপর নির্ভর করে; ইহার মধ্যে শতকরা ২½ এর উপরে লোক বয়ন শিল্পে নিযুক্ত; কেবল মাত্র তুলার

শিল্প

শিল্পে ৬০ লক্ষ লোক ব্যাপৃত। তুলার নানা শিল্প-কাজে পঞ্জাবে দশহাজারে ৩৭ জন লিপ্ত। বাংলা ও আসামের সব চেয়ে কম—দশ হাজারে কেবল মাত্র ৮।১০ জন মাত্র এই শিল্প-উপজীবি। রেশমের কাজে সমগ্র ভারতে মাত্র ১৩ হাজার লোক ও পশমের কাজে মাত্র ৭ হাজার লোক লিপ্ত। অথচ বিদেশ হইতে এই সকল সামগ্রী লক্ষ লক্ষ টাকায় আমদানী হয়। হাতে সুতা-তৈয়ারী দেশ হইতে ক্রমেই উঠিয়া যাইতেছে; ১৯০১ সাল হইতে বস্ত্র-শিল্পে শতকরা ৬ জনের

অধিক করিয়া লোক কমিয়া গিয়াছে; চরকারসুতা যে কেবল উঠিয়া গিয়াছে তাহা নহে তাঁতের কাজও প্রায় অর্দ্ধমৃত অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে।

চর্ম্মের ব্যবসায়ে যুদ্ধের পূর্বে অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় ছিল। ১৯০১ সালে চর্মকারদের যে সংখ্যা দেখা গিয়াছিল ১৯১১ সালে তাহার শতকরা ৬ জন করিয়া কমিয়া যায় দেশীয় চর্ম্মকারগণের দুর্দশার অন্ত নাই; বিদেশী রীতি-অনুসারে তাহারা চর্ম পরিষ্কার করিতে বা জুতা তৈয়ারী করিতে জানে না; ফলে তাহাদের ব্যবসায় প্রায় ধ্বংস লুপ্ত হইয়াছে এবং অনেকেই কল কারখানায় ও কৃষিকার্য্যে প্রবেশ করিয়াছে।

চর্ম ব্যবসায়।

পিতল-কাঁসার ব্যবসায়ের কথা পূর্বে অলোচিত হইয়াছে। ১৯০১ সাল হইতে দশ বৎসরে এই ব্যবসায়ের লোক শতকরা ৬½ হারের উপর কমিয়াছে। বিদেশ হইতে যে কেবল তামা-পিতলের চাদর আসিত তাহা নহে, অবশেষে জার্মানী হইতে পিতলের গ্ল্যাস বাটী ও আসিতে আরম্ভ করিয়াছিল। বিলাতী এনামেলের বাসন, এলুমিনিয়মের বাসন এবং আজ কাল জাপানী গালার বাসন ভারতীয় পিতল-কাঁসার সহিত প্রতিযোগীতা আরম্ভ করিয়াছে। ফলে এখানে যাহারা এই শিল্প অনুসরণ করিয়া অর্থ উপার্জন করিত তাহাদের সংখ্যা কমিতেছে।

ধাতু শিল্প

এ ছাড়া মাটীর কাজ যেমন, ইট, টালী, কুমারের কাজ, ঔষধাদি তৈয়ারী, খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত, পোষাক পরিচ্ছদ তৈয়ারী কার্য্যে কয়েক লক্ষ লোক নিযুক্ত আছে; কিন্তু এক্ষণে খেলনা বিলাত ও জাপান হইতে আসে; দেশীয় ঔষধের আদর কমিয়া গিয়াছে; দেশীয় সুগন্ধাদি এখন অনাদৃত; ফলে এই সকল শিল্প অধঃপাতে যাইতেছে ও লোকে এই সকল কর্ম ছাড়িয়া কৃষির দিকে ঝুঁকিয়াছে অথবা জমির অভাবে দিন-মজুর হইতেছে। বাণিজ্যের উপর প্রায়

বিবিধ

১ কোটি ৭৮ লক্ষ লোক নির্ভর করে। অর্থাৎ সমগ্র জন সংখ্যার ৫% জন। ইহার অর্দ্ধেকের উপর লোক প্রতিদিনের খাদ্যসামগ্রীর ব্যবসায় করে। প্রায় ত্রিশ লক্ষ লোক মুদীর দোকানে মিষ্টান্নের দোকান প্রভৃতি সামান্য সামান্য কারবার করে।

সরকারী কাজ ও অন্যান্য জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভাগে প্রায় ১ কোটী ৯ লক্ষ লোক নিযুক্ত। সমগ্র ভারতে ৭,১১৩টি ফাক্টরী আছে; সর্বসমেত ২১ লক্ষ লোক ইহাতে কাজ করে। ইহার মধ্যে ৮ লক্ষ ১০ হাজার বিশেষ বিশেষ শিল্পে, ৫,৫৮ হাজার বয়নশিল্পে ২,২৪ হাজার খনিতে, ১,২৫, হাজার বহনাদি কার্য্যে, ৭৪ হাজার খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুতে, ৭১ হাজার ধাতুর কার্য্যে, ৪৯ হাজার কাঁচ ও মাটির কলে; রাসায়নাদি কার্য্যে প্রায় অর্দ্ধ লক্ষ এবং বিলাসের সরঞ্জাম প্রস্তুত করিতে ৪০ হাজার লোক নিযুক্ত। বিশেষ শিল্পের মধ্যে চা, কফি, ধরা হইয়াছে।

ব্যবসায়ে ভারতবাসী ও সাহেব

ভারতবর্ষের বড় বড় অনেক গুলি কলকারখানা ও কারবার য়ুরোপীয় মূলধনে চলিতেছে। রেলওয়ে, ট্রাম কোম্পানী, পাট কল, সোনার খনি পশমের কল, মদ্য প্রস্তুতের কারখানা সম্পূর্ণরূপে বিদেশী অর্থে চলিতেছে; সুতরাং এ সমস্তের মধ্যে উচ্চ বেতনের কর্মচারী অধিকাংশ স্থলে সাহেব। এ ছাড়া কয়লার খনি, পেট্রোলিয়ামের কারখানা, চা-বাগিচা, ব্যাঙ্ক, চালের কল, কাটের চিরাই-কল, ময়দার কল, চিনির কারখানা, লোহার ও পিতলের ঢালাই কাজের কারখানা, নীলের চাষ প্রায়ই সাহেবদের হাতে; তবে ভারতবাসীদেরও সামান্য হাত কতকগুলিতে আছে। যেমন আসামের ৫৪৯টি চা-বাগিচা সাহেবদের ও ৬০টি ভারতবাসীর মূলধনে চলিতেছে। মান্দ্রাজ ও মহীশূরের কফি-বাগিচার অবস্থা ঐ রূপ। কাপড়ের কলে এখনো দেশীয়দের সংখ্যা বেশী; বম্বের ১০০টি কল ভারতবাসীদের, ২৫টির অংশীদার উভয়ে এবং ১৩টি সম্পূর্ণরূপে সাহেবদের হাতে।

১৯১১ সালের জনগণনায় ভারতের জনসংখ্যা ৩০ কোটি ছিল। ইহার মধ্যে ১,৯৯,৭৮৭ জন ছিল য়ুরোপীয় (তন্মধ্যে ৯১ হাজার সৈন্য বিভাগের লোক ও তাহাদের পরিবার); ১ লক্ষের কিছু অধিক ইঙ্গভারতীয় ছিল। মোটামুটি ধরা যাইতে পারে এই উভয় শ্রেণী হইতে প্রায় ২ লক্ষ ১০ হাজার লোক সরকারী কাজের উপযোগী। আংলোইণ্ডিয়ান ও দেশী খৃষ্টানরা আপনাদিগকে য়ুরোপীয় বলিয়া চালাইবার চেষ্টা বহুকাল হইতে করিতেছে। সমগ্র জনসংখ্যার তুলনায় তাহারা ১,৪০০তে ১ জন। ধরিয়া লওয়া যাউক ইহাদের সকলেই ও য়ুরোপীয় মাত্রেই লেখাপড়া ও ইংরাজী শিক্ষায় পাকা। তাহাতেও ভারতের শিক্ষিত সমাজের তুলনায় ইহারা অনেক নীচে পড়িয়া থাকে; ভারতীয় শিক্ষিতের সংখ্যা উহাদের চেয়ে ছয় গুণ বেশী।

সরকারী কাজে দেশীয়দের স্থান

স্থায়ী য়ুরোপীয় এদেশে খুব অল্পই বাস করে; য়ুরোপীয় ও ইঙ্গ ভারতীয়দের সংখ্যা সমগ্র জনসংখ্যার তুলনায় ১০ জনে ১ জন। কেবলমাত্র যদি ইঙ্গভারতীয়দের সহিত ভারতীয়দের তুলনা করা যায় তবে তাহাদের অনুপাত ৩,০০০ এ ১ জন দাঁড়ায় এবং ইংরাজী শিক্ষায় ১৩ জন ১ জন। এই সংখ্যাগুলি হইতে সহজেই বুঝা যাইবে যে য়ুরোপীয় ও ইঙ্গভারতীয়েরা যেসকল চাকুরী করে তাহা তুলনায় কত বেশী। বড় ১১,০৬৪টি চাকুরী সরকারের অধীন; ইহার মধ্যে ৬,৪৯১ অর্থাৎ ৫৮% হারে চাকুরী এই ক্ষুদ্র সমাজের লোকের মধ্যে আবদ্ধ। ৫০০৲ টাকার মাস-মাহিনা চাকুরীর সংখ্যা ৪৯৮৩; ইহার মধ্যে ৪,৫৪২ অর্থাৎ এক শতের মধ্যে ৮১টি সাহেবদের; ৮০০৲ টাকা ও তদূর্দ্ধ বেতনের কাজের সংখ্যা ২,৫০১, তাহার মধ্যে ২,২৫৯টি বা শতকরা ৯০% তাঁহাদের দ্বারা পূর্ণ। এই সকল সাহেব কর্মচারীদের মধ্যে দুই একজন ছাড়া আর কেহই দেশী ভাষা জানেন না; সেই জন্য প্রভিন্সিয়াল সার্ভিসে দেশীয় লোক

নিয়োগ করা হয়। কিন্তু আমরা উপর্যুক্ত ভারতীয় ও প্রাদেশিক সিবিল সার্ভিসের কথা ছাড়িয়া দিয়া অন্যান্য চাকুরীর অবস্থা দেখি। উক্ত কাজ দুটি ছাড়িয়া দিলে সরকারী ২৩টী বিভাগ বাঁকি থাকে। সেই বিভাগ গুলিতে ২০০৲, ৫০০৲, ৮০০৲, টাকার কাজ যথাক্রমে ৭,২৬১ ; ৩,০৭০ ; এবং ১,৬০১ ; ইহার মধ্যে সাহেবরা পূর্ণ করিয়া আছেন ৪,৯৭৪ ; ২,৭৪৬ ও ১,৪৯৯ অর্থাৎ ২০০৲ টাকার চাকরীর শতকরা ৬৯%, ৫০০৲ টাকার চাকরীর ৯০% এবং ৮০০৲ টাকার চাকুরীর শতকরা ৯৪% টি। দুইশত টাকাও তদূর্দ্ধ বেতনের য়ুরোপীয়, ইঙ্গ-ভারতীয় ও ভারতীয় যথাক্রমে শতকরা ৪৮.৭ ; ১৯.৪ ; ৩১। ৫০০৲ টাকার উপরের চাকুরীতে শতকরা ৮০ ; ৯.৭ ; ১০.৩ ; ৮০০৲ টাকা ও তদূর্দ্ধ বেতনের চাকুরীতে ৮৭ ; ৫.৯ ; ৬.৪। এই সংখ্যাগুলি হইতে বুঝা যাইবে ভারতীয়দের স্থান সরকারী চাকুরীতে কিরূপ। কিন্তু নূতন সংস্কারে ভারতীয়দের স্থান ও সম্মান উভয় বাড়িতেছে।

১১। স্থানান্তর ও দেশান্তর গমন

ভারতবর্ষের জনসংখ্যা সর্বত্র সমান নহে একথা পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। ভূপ্রকৃতি, স্থানীয় মৃত্তিকা, বৃষ্টির পরিমাণ, নদীবহুলতা, আর হাওয়ার তাপ ও বায়ুর চাপের উপর জনসংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি নির্ভর করে। সেই জন্য নদীবহুল বাংলাদেশে জনসংখ্যা সর্বাধিক এবং রাজপুতানার মরুভূমিতে সর্বাপেক্ষা কম। এখন যে সকল স্থানে জীবনযাত্রা নির্বাহ করা কঠিন সেই সকল প্রদেশ হইতে আসিয়া উর্বর দেশে অথবা বাণিজ্যকেন্দ্রে লোকে বাস বা কাজ করিতে যায়।

স্থানান্তরে গমনাগমন

সুতরাং কোনো দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি বা হ্রাস কেবল মাত্র জন্ম-মৃত্যুর হার হইতে বুঝা যাইবে না—সেখানকার কত লোক বিদেশে এবং বিদেশের কত লোক সেই দেশে বাস করিতেছে তাহা দেখিতে হইবে। ভারতবর্ষের এক প্রদেশ হইতে অন্য প্রদেশে গিয়া বাস করিলে প্রদেশ-বিশেষের জনসংখ্যার হ্রাস বা বৃদ্ধি হয়; কিন্তু সমগ্র ভারতের তাহাতে কোনো ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না। কিন্তু ভারতবর্ষের বাহিরে দেশান্তরে উপনিবেশ স্থাপন করিলে সমগ্রদেশের জনসংখ্যা হ্রাস পায়। য়ুরোপ হইতে লক্ষ লক্ষ লোক প্রতি বৎসর আমেরিকার নানা স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিতে যায়। এক ইতালি হইতে ১৯০০ সালে সাড়ে ছয় লক্ষের উপর লোক বিদেশে গমন করে। আমাদের দেশে এই প্রকার বহির্গমন খুবই কম; সে বিষয়ে আলোচনা পরে হইবে; এক্ষণে ভারতের অভ্যন্তরেই প্রাদেশিক গমনাগমন কিরূপ চলিতেছে তাহাই দেখা যাক্।

ভারতের মধ্যে চলা প্রদেশ সমূহের লাভ ও ক্ষতি

ভারতবর্ষের লোক অত্যন্ত গৃহপ্রিয়। ১৯০১ সালের আদমসুমারীতে দেখা যায় যে শতকরা কেবলমাত্র ৯ জন লোক নিজ জিলা ত্যাগ করিয়া বাহিরে বাস করিতেছিল। ১৯১১ সালে দেখা যায় এই সংখ্যা আর ও কমিয়াছে; শতকরা ৮ জন লোক নিজ-জিলার বাহিরে বাস করিতেছে এবং তাহার অধিকাংশই পার্শ্বের জিলা ছাড়িয়া যায় নাই। লোকে যে একস্থান বাঁধা পড়িয়া যুগযুগান্ত হইতে দারিদ্র্য দুঃখে কষ্ট পাইতেছে তাহার দুইটী কারণ; একটী সামাজিক অপরটী আর্থিক। সামাজিক বাধা অশিক্ষিত লোকের মধ্যে খুব বেশী; বাহিরে গেলে জাতি যায়, শুচিতা রক্ষিত হয় না;

বহির্গমনের বাধা

এই সকল ভয়ে লোকে দেশের বাহির হইল না। মৎস্য মাংসহারী বাংলা দেশে হিন্দুস্থানের বা মহারাষ্ট্র দেশের উচ্চবর্ণ লোক আসিতে ভয় পাইত। এ ছাড়া আমাদের দেশের শতকরা প্রায় ৮০ জন লোক কৃষি-উপজীবি। এক কৃষি কার্য্য

ছাড়া তাহারা আর কোন কার্য্য জানে না; সুতরাং বিদেশে গিয়া তাহারা কি করিবে? তাঁতির তাঁত বুনিয়া, বা কামারের লোহার জিনিষ প্রস্তুত করিয়া জীবিকা উপার্জ্জনের তেমন ভরসা নাই সুতরাং বাহিরে আসিতে সে ভয় পায়। এই জন্য অধিকাংশ লোকই কৃষি বা গ্রামের শিল্প লইয়া পড়িয়া আছে। অতি সামান্য সংখ্যক লোকই গ্রাম হইতে বাহির হইয়া পড়িয়া বড় বড় সহরের কলে কারখানায় খনিতে ও ডকে কাজ করিতেছে। রেলওয়ে বহুলোককে একস্থান হইতে অন্য স্থানে সহজে ও সুলভে লইয়া গিয়া ও তাহাদিগকে কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া তাহাদের জীবিকার পথ দুই দিক্ দিয়া করিয়া দিয়াছে।

চলাফেরার তিনটি ধারা

ভরতবর্ষের মধ্যে চলাফেরার তিনটি স্রোত আছে। (১) প্রথম স্রোত বিহার-উড়িষ্যা, এবং যুক্ত প্রদেশ হইতে বাংলা দেশের প্রধান প্রধান সহরে; (২) দ্বিতীয় স্রোত বিহার-উড়িষ্যা, বাংলা, যুক্ত-প্রদেশ হইতে আসামের চা বাগানে; (৩) তৃতীয় স্রোত মান্দ্রাজ, বাংলা ও যুক্ত প্রদেশ হইতে ব্রহ্মদেশাভিমুখে।

যুক্ত-প্রদেশ ও বিহার-উড়িষ্যার লোকেরা দেশান্তরে যাইতে বাধ্য হয়। দেশের সমগ্র ভূমি বিলি হইয়া রহিয়াছে, কৃষির উপযুক্ত স্থান নাই। ১৯১১ সালে যুক্ত-প্রদেশের সমগ্র জন-সংখ্যার শতকরা ৯½ জন লোক ভূমিহীন মজুর ছিল। বৎসরের অধিকাংশ সময় তাহাদের কাজ থাকে না; যাহাদের জমি-জমা আছে তাহাও নিতান্ত সামান্য; ভূমি অনুর্ব্বর, বৃষ্টি কম; এবং কাণপুর ব্যতীত অপর কোনো সহরেই কলকারখানা নাই। লোকের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের আদর্শ নিতান্ত নীচু হওয়া সত্ত্বেও লক্ষ লক্ষ লোক প্রতি বৎসর মহামারীতে মরে; কেবল মাত্র কৃষির উপর নির্ভর করিয়া লোকে আর দেশে থাকিতে পারে না। সুতরাং সামাজিক বাধা ছিন্ন করিয়া লোকে বাহির হইয়া পড়িতেছে। বিহারের অবস্থাও তদ্রূপ। এই উভয় দেশ হইতেই লোক আসিয়া বাংলাদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে। বাংলাদেশে শ্রমজীবির অতিশয় অভাব; এখানে আসিয়া পশ্চিমের লোকেরা

নানা কাজ পায়। পুলিশ, দ্বারবান্, ফিরিওয়ালা, মিস্ত্রি, মুচি, মাঝি, দোকানী, ব্যাপারী হিন্দুস্থানী এদেশে অনেক। অধিকাংশ হিন্দুস্থানী এদেশে স্ত্রীপুত্র আনে না। অর্থ উপার্জ্জন করিয়া দেশে পাঠাইয়া দেয় এবং দুই চারি বৎসর অন্তর দেশে যায়। এক যুক্তপ্রদেশ হইতে প্রায় ৮ লক্ষ করিয়া লোক প্রতি বৎসর কমে। বাংলা দেশে মজুরের অভাব ছোটনাগপুরের নিম্নশ্রেণীর হিন্দু ও সাঁওতালে পূর্ণ করিতেছে। বিহার-উড়িষ্যা প্রদেশে প্রায় ১০ লক্ষ লোক এই দেশান্তর গমনের জন্য হ্রাস পায়; ধান কাটার সময়ে প্রতিবৎসর সহস্র সহস্র লোক কাটিহার লাইন দিয়া রঙপুর দিনাজপুর পূর্ববঙ্গ প্রভৃতি স্থানে যায় এবং সাঁওতাল পরগণা হইতে দলে দলে লোক পশ্চিম বাংলায় কাজ করিতে আসে। বাংলাদেশের স্বাস্থ্যের সহিত ইহার যোগ যথেষ্ট। আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে মেলেরিয়ার বার্ষিক মড়ক আরম্ভ হয়। ঘরে ঘরে সুস্থ লোক শয্যাগত এবং পুরাতন রোগীরা মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অনেক যায়গায় লোকাভাবে ধান কাটা হয় না। সুতরাং এই জন-স্রোত বন্ধ হইলে বাংলা দেশের সমূহ ক্ষতি। তবে ব্যবসায় বাণিজ্যগুলি কেমন করিয়া মাড়োয়ারী পার্সী ও দিল্লীর মুসলমানের হাতে গেল এই সমস্যা বাঙালীকে জানিয়া তাহার মীমাংসা করিতে হইবে। বাংলা দেশে ১৯১১ সালে প্রায় ১৪ লক্ষ বিদেশী ছিল। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে মাড়োয়ারীরা বাংলা দেশের সকল প্রকার ব্যবসায় বাণিজ্যে কি প্রকার লাভবান হইয়াছে তাহা প্রত্যেকেই জানেন।

বাংলাদেশের কৃষি ক্ষেত্র

আসামের চা-এর বাগানে অনেক কুলি আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে। প্রতি বৎসর প্রায় অর্দ্ধ লক্ষের উপর লোক এখানে যায়। সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা ১২$\frac{১}{২}$ জন বিদেশী। ব্রহ্মদেশের জন সংখ্যা অল্প। অথচ সেখানকার কেরোসিনের ও অন্যান্য খনি ও ধান্য ক্ষেত্রে প্রতি বৎসর যথেষ্ট লোকের প্রয়োজন। বর্মনরা অনে-

আসামের চা বাগানে

কেই সঙ্গতিপন্ন এবং কঠিন শ্রমবিমুখ। এই জন্য ভারতবর্ষ হইতে লোকের টান সেখানে খুব। মান্দ্রাজ হইতে নিম্ন-জাতির সহস্র সহস্র কুলী প্রতি বৎসর সমুদ্রপথে ব্রহ্মদেশে যায়। ব্রহ্মদেশ জয় করিয়া জনশূন্য প্রদেশ সমূহে লোক বসাইবার জন্য ভারত সরকার প্রথম প্রথম সুব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু ভারতীয় মূলধনওয়ালা লোকে ব্যবসায় করিয়া সেখানে অর্থশালী হইতে লাগিল; বিহার উড়িষ্যা প্রভৃতি জনবহুল স্থান হইতে ঔপনিবেশিক গিয়া বাস করিবে সরকারের এই ইচ্ছা পূর্ণ হইল না। তখন বর্মন ব্যতীত কেহ আর জমিদার হইতে পারিবে না—এইরূপ ধরণের একটি আইন পাশ হইলে ভারতীয়দের পূর্বের প্রতিপত্তি দূর হইল। বর্ত্তমানে বর্মনদের নিজদের সংখ্যা যে প্রকার বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে তাহাদিগের গ্রামের কৃষি কাজে সঙ্কুলান হওয়া শীঘ্রই অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইবে; এবং ভারতবাসীরা সহরের কল কারখানায় ডকে যে সব কাজ পাইতেছে তাহা তখন পাইবে না। বোম্বাই প্রদেশের বাণিজ্য ও শিল্পোন্নতির জন্য সেখানকার লোকে কাজ পাইয়াই থাকে এবং বাহিরের লোকেও কিছু কম কাজ পায় না। সেই জন্য মহরাঠ্ঠা বা তদ্দেশায় অন্য জাতীয় লোক বাহিরে কুলী হইয়া খুব কমই যায়।

বর্মার কলে গমন

এই দেশান্তর গমনাগমনের ফলে কোনো দেশের জন সংখ্যা হ্রাস কোনো-টির বা বৃদ্ধি হয়। বাংলা দেশের মধ্যে বাহিরের জনসংখ্যা প্রতিবৎসরেই বাড়িয়া চলিতেছে। ইহার কারণ যে কেবল স্থানীয় কল কারখানার বৃদ্ধি তাহা নহে। বিশ বৎসর পূর্বে কলিকাতার সন্নিকটস্থ কলগুলিতে বাঙালী কুলিই ছিল পনের আনা; এখন সেই স্থানে ওড়িয়া বিহারীর সংখ্যা প্রবল। শ্রমসাপেক্ষ কাজে বাঙালীকে ডাকা হয় না; কয়েক বৎসর পূর্বেও কলিকাতা সহরে হিন্দু ছুতার অনেক ছিল; এখন মুসলমান ও চীনা মিস্ত্রী তাহাদের [illegible]ন পূর্ণ করিতেছে। জীবন সংগ্রামের নানা ক্ষেত্র হইতে বাঙ্গালী সরিয়া

কোথায় যাইতেছে জানি না। তবে ক্রমেই ব্যবসায় বাণিজ্য, কৃষি ধীরে ধীরে তাহাদের হস্তান্তর হইতেছে—ইহা নিশ্চিত কথা।

দেশান্তর গমনাগমন ব্যতীত আর একটি বিষয়ে আমাদের মনোনিবেশ করিতে হইবে। ভারতবর্ষের সভ্যতার কেন্দ্র গ্রামে, সহরে নয়।

জন বৃদ্ধির সমস্যা

ভারতবর্ষের প্রাণশক্তি এখনো গ্রামে, যেহেতু ভারতের শতকরা ৯১ জন লোক সেইখানে বাস করে। এইখানে সহর বলিতে আমরা ৫ হাজারের উপর যে-কোনো স্থান বুঝিতেছি। পাশ্চাত্য সভ্যতার আদর্শানুসারে সহর-বৃদ্ধি সভ্যতার একটি প্রধান অঙ্গ। ইংলণ্ডের শতকরা ৭৮ জন, জারমেনী শত করা ৪৫ জন সহরে বাস করে। ভারতের পশ্চিমাঞ্চলেই ক্রমে সহরের প্রসারও বৃদ্ধি হইতেছে। বর্ত্তমানে বোম্বাই প্রদেশের শতকরা ১৮ জন লোক নগরের বাসিন্দা কিন্তু আসামে ৩ জন মাত্র। ভারতবর্ষের ব্যবসায় বাণিজ্যের উৎপত্তির সহিত সহর বৃদ্ধি হইবে এবং তাহাতেই নাকি আমাদের সভ্যতার চরম আদর্শ লাভ হইবে বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। সে বিচারে আমরা এখানে প্রবৃত্ত হইব না। তবে সমগ্র ভারতের ২৫ কোটি লোককে গ্রাম হইতে টানিয়া আনিয়া পূতিগন্ধময় সহরের মধ্যে প্রবেশ করাইবার জন্য চেষ্টা না করিয়া গ্রামগুলিকে সহরের সুবিধা সুযোগ দিয়া তথাকার মুমূর্ষ শিল্প-বাণিজ্যের পুনরুত্থানের চেষ্টা করিয়া দেখিলে ফল বোধ হয় মন্দ হইবে না। পৃথিবীকে সহর করিবার চেষ্টা পশ্চিমে হইয়া গিয়াছে সুতরাং আমাদের দেখিয়া শেখাই ভাল। ভারতের শিক্ষা-কেন্দ্র তপোবনে ছিল, নালন্দা, তক্ষশিলা এবং আর ও কত অসংখ্য তপোবন—যাহার নাম ইতিহাসে নাই। ভারতবর্ষের সর্বত্রই গ্রাম ত্যাগ করিয়া সহরে যাইবার ঝোঁক খুব প্রবল। তাহার কারণ গ্রামে স্বাস্থ্য ভাল থাকে না। চিকিৎসার সুব্যবস্থা নাই, পুত্র-কন্যার শিক্ষার ব্যবস্থা নাই।

একলক্ষ লোক যেখানে বাস করে তাহাকে নগর বলিয়া গণ্য করা

হয়। এই রূপ নগর ভারতবর্ষে অধিক নাই, মাত্র ৩০টি। এই শ্রেণীর নগরে ইংলণ্ডের শতকরা ৪৫, জারমেনীর ২১, ফ্রান্সের ১৪ জন ও ভারতের শতকরা ২ জনের কিঞ্চিৎ অধিক লোক বাস করে। ১৮৭২ সাল হইতে ভারতের নাগরিক জনসংখ্যা প্রায় শতকরা ৪৩ বাড়িয়াছে।

সহর বৃদ্ধি

পূর্বোক্ত হ্রাস বৃদ্ধিতে সমগ্র ভারতের প্রদেশ বিশেষের কোনো ক্ষতি বৃদ্ধি হয় নাই, কারণ গমনাগমন দেশ মধ্যেই পর্য্যবেশিত ছিল। এই দেশান্তর আশ্রয় গ্রহণ ব্যতীত জন-সংখ্যা দেশের বাহিরেও যাইতেছে। ভারতের বাহিরে এশিয়ার নানা স্থানে, আফ্রিকা, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, ও অন্যান্য অনেক দ্বীপে ভারতের শ্রমজীবিগণ বাস করিতেছে। গ্রীষ্ম-মণ্ডলে পৃথিবীর নানা স্থানে য়ুরোপীয় জাতি সমূহের অনেকগুলি উপনিবেশ আছে। সে সকল স্থানে ইক্ষু, নানা ফল-মূল প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। কিন্তু দারুণ গ্রীষ্মে য়ুরোপীয়দের পক্ষে এখানে শারীরিক পরিশ্রম করা সম্ভব নয়। তাঁহারা চিরদিন মূলধন খাটাইয়া ব্যবসায় করিয়াছেন, কাজ করিত আফ্রিকার নিগ্রো ও কাফ্রিগণ। দাসপ্রথা উঠিয়া গেলে ১৮৬৪ সালে প্রথমে চুক্তিবদ্ধ কুলি বৃটিশ পশ্চিম ইণ্ডিস দ্বীপপুঞ্জে যায়। আমাদের গভর্ণমেণ্ট উদ্যোগ করিয়া নিজ তত্ত্বাবধানে এই সকল ব্যবস্থা করেন। সেই হইতে ভারতীয় কুলিরা প্রতিবৎসর দলে দলে নানা উপনিবেশ গিয়াছে। এই চুক্তিবদ্ধ প্রথা নানা কারণে মরিশাস দ্বীপে, ষ্ট্রেট্‌ সেটল্‌মেণ্টে, মলয় ষ্টেটে, এবং আফ্রিকার নাটাল প্রদেশে উঠিয়া গিয়াছে। এই সকল স্থানে এখনো বহু সহস্র ভারতবাসী স্বাধীনভাবে কাজ করিতেছে; অনেকে তথায় স্থায়ীভাবেও উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে।

দেশান্তর গমন

মহাত্মা গান্ধীর দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহের পর হইতে আমাদের দেশে বিদেশপ্রবাসী ভারতবাসী সম্বন্ধে লোকের কৌতুহল বৃদ্ধি হইয়াছে।

কয়েক বৎসর যাবৎ এসম্বন্ধে দেশে বিদেশে যথেষ্ট আন্দোলন হইতেছে, এই আন্দোলন ও বিতর্ক এখনও আসে নাই। ভারতে ও বিলাতে এই প্রথাকে অনেকে ক্রীতদাস প্রথার সহিত তুলনা করিয়া ইহার ঘোর বিরোধী। পাশ্চাত্য জগতে ক্রীতদাস প্রথা উঠিয়া যাইবার পরেই ভারতে চুক্তিবদ্ধ কুলী প্রেরণের প্রথা প্রচলিত হয় বলিয়া লোকের এই সন্দেহ। ভারতীয় কুলিকে উপনিবেশে লইয়া গিয়া বাগিচাওয়ালাদের সমিতি যে-বাগানে যত লোকের প্রয়োজন সেইখানে তাহা পাঠাইয়া দেন। পাঁচ বৎসরের মতো তাহার প্রভুকে সে সেবা করিতে বাধ্য। প্রভু যেমনই হউন্ সে বিষয়ে কুলির কোন মতামত বা আপত্তি প্রকাশের অধিকার থাকে না; এই কারণে ইংলণ্ডের অনেক উদারচেতা পুরুষ এই প্রথার অত্যন্ত নিন্দা করেন।

চুক্তিবদ্ধ কুলী

উপনিবেশ সমূহে দুইটী কারণে ভারতীয় কুলির স্বাধীন ভাবে উপার্জ্জন সম্বন্ধে আপত্তি হয়—(১) ভারতীয় কুলিদের জীবন যাত্রার আদর্শ অত্যন্ত হীন বলিয়া তাহারা অল্প পারিশ্রমিকে কাজ করিয়া বাজার দর কমাইয়া দেয়। এই জন্য স্থানীয় শ্রমজীবিদের ঘোর আপত্তি। (২) চুক্তি-উত্তীর্ণ কুলিদের মধ্যে অধিকাংশই স্বাধীনভাবে চাষবাস দোকান প্রভৃতি করে এবং দেশে ফিরিয়া আসে; যাহারা নানা কারণে পুনরায় চুক্তি-গ্রহণ করে তাহাদের সংখ্যা নিতান্ত কম। চুক্তি-বদ্ধ যাইয়া তাহার উপনিবেশ গুলি হইতে টাকা সংগ্রহ করিয়া দেশে চলিয়া আসে ইহা তদ্দেশীয় লোকের অসহ্য।

কুলীদের জন্য প্লান্টাররা গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া দেন। বাজারের দর অনুসারে তাহাকে মজুরী দিয়া থাকেন। গৃহ ও হাঁসপাতালে চিকিৎসার জন্য তাহাকে কোন অর্থ দিতে হয় না। তাহার সন্তানাদির জন্য অবৈতনিক বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা আছে। চুক্তি শেষে তাহাকে ভূমি দেওয়া হয়, ইচ্ছা করিলে সে সেখানে স্থায়ীভাবে থাকিতে পারে; অথবা দেশে ফিরিয়া

আসিতে চাহিলে তাহাকে বিনা ব্যয়ে আনা হয়। জমিদানের ব্যবস্থা দক্ষিণ আমেরিকায় ট্রিনিদাদ্ ও ব্রিটিশ গিয়েনায় আছে।

একটি বা কয়েকটি উপনিবেশের প্লানটাররা মিলিয়া ভারতবর্ষে মাহিনা করিয়া এজেণ্ট রাখিয়াছেন। ভারত-সরকার ইহাদিগকে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন; এই এজেণ্টদের অনেকগুলি সাব্-এজেণ্ট আছে। প্রত্যেক সব্-এজেণ্টের তত্বাবধানে অনেকগুলি করিয়া আড়কাটি আছে। ভারতের সর্বত্রই পুরুষ ও স্ত্রী আড়কাটি দৃষ্ট হয়, তাহারা লোকদিগকে বুঝাইয়া কুলীশ্রেণী ভুক্ত করিয়া লয়। ভারত-সরকারের তরফ হইতে এই সকল কুলীকে রক্ষা করিবার জন্য একজন কর্ম্মচারী প্রত্যেক প্রদেশে নিযুক্ত আছেন। আড়কাটিদের লাইসেন্স তিনি দেন; এই লাইসেন্স ছাড়া কেহ কুলী সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিলে দণ্ডনীয় হয়। প্রতিবৎসর জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট্ এই পত্র দেখিয়া অনুমতি দেন। উপনিবেশ হইতে এজেণ্টের হাতদিয়া সব্-এজেণ্টগণ প্রতিপুরুষ-কুলীর জন্য ২৫৲ ও স্ত্রী-কুলীর জন্য ৩৫৲ পাইয়া থাকে। এই টাকা হইতে আড়কাটিগণ ভাগ পায়। অনেক সময়ে অশিক্ষিত লোক দুষ্ট আড়কাটির হাতে পড়িয়া বিশেষ দুঃখ পায়, এরূপ কাহিনী মাঝে মাঝে শোনা যায়। সেইজন্য আমাদের দেশে আড়কাটি বলিতে লোকের এককালীন ঘৃণা ও ভয় প্রকাশ পায়। দেশের নানাস্থানে সব্ ডিপো আছে; সেইখানে প্রথমে কুলীদের আনা হয়; সেইখান হইতে প্রধান ডিপো সমূহে তাহাদের চালান করা হয়। এই ডিপো গুলি ভারত-সরকার হইতে নিযুক্ত কুলীরক্ষকগণের তত্বাবধানে থাকে; তাঁহারা দেখেন কুলীরা সর্ত্ত বুঝিয়া যাইতে ইচ্ছুক কিনা, যে জাহাজ উপনিবেশের এজেণ্টগণ ভাড়া করিয়া রাখিয়াছেন তাহাতে কতগুলি লোক ধরিবে এবং কুলীদের থাকিবার যথাযথ বন্দোবস্ত আছে কিনা,—জাহাজে চড়িবার পূর্ব্বে প্রত্যেক কুলীকে ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন কিনা ইত্যাদি।

কুলিচালান ও আড়কাটি

উপনিবেশের বন্দরে পৌঁছিলে ইমিগ্রেশান এজেণ্ট জেনারেল তাহাদের তদ্‌বির করেন। তিনি উপনিবেশের কর্ম্মচারী; ভারতের কুলী-রক্ষক যাহা করেন তাঁহার কর্ত্তব্যও তাই; এছাড়া বাগানে (Plantation) তাহাদের প্রতি কিরূপ ব্যবহার হয় তাহাও তিনি পরিদর্শন করেন। কোনো উপনিবেশের বাগানে কুলীদের মৃত্যু-সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে অথবা তাহাদের যথেষ্ট যত্ন না হইলে ভারত গভর্ণমেণ্ট সেখানে কুলী প্রেরণ বন্ধ করিয়া দেন। নাটালে কুলীদের প্রতি ব্যবহার সম্বন্ধে অভিযোগ উপস্থিত হইলে ভারত সরকার সেখানে কুলী-চালান বন্ধ করিয়া দিয়াছেন।

বর্ত্তমানে কলিকাতা, বম্বে, মাদ্রাজ ও করাচী বন্দর হইতে কুলীরপ্তানী হয়। ১৮৮৪ সাল পর্য্যন্ত ফরাসী-অধিকার পন্দিচেরী ও কারিকাল হইতে কুলী চালান হইত; মাঝে দুই বৎসর ছাড়া কুলীসংগ্রহ সেস্থানে বন্ধই ছিল। ১৯১২ সালে কুলীর শতকরা ৬৫ জন কলিকাতা হইতে চালান হয়; এখান হইতে যে ৮২০৮ জন কুলী গিয়াছিল তাহার মধ্যে প্রায় ৬৫০০ যুক্ত প্রদেশেরই লোক। কলিকাতা হইতে প্রধানত দক্ষিণ-আমেরিকায় ট্রিনিডাড্ ফিজি, ডেমেরারা, পশ্চিম ইণ্ডিস্ অন্তর্গত জামাইকা দ্বীপে কুলী চালান হয়। সমগ্র চালানের প্রায় শতকরা ২৯ জন মাদ্রাজ হইতে যায়। বম্বে অঞ্চল হইতে খুব সামান্যই লোক যায়; সেখানকার লোকে স্থানীয় কাপড়ের ও অন্যান্য কারখানায় কাজে লাগে। আফ্রিকার উগাণ্ডা রেলওয়ে অনেক লোকের প্রয়োজন হয়; কারাচী বন্দর হইতে পঞ্জাবী ও সিন্ধি অনেক লোক যায়।

ভারতবর্ষের এই কুলীদের বিদেশ গমন স্থানীয় অভাব বা দুর্ভিক্ষ প্রভৃতির উপর মোটেই নির্ভর করে না; এমনও দেখা গিয়াছে অজন্মার দিনে কুলীর চালান কম হইয়াছে। মোট কথা উপনিবেশ হইতে যেমন কুলীর প্রয়োজন হয় এখানকার এজেণ্টগণ সেইমত কুলী চালান করেন।

গত ২৭ বৎসরের গড়ে ১৫,৬৫১ জন লোক প্রতিবৎসর বিদেশে গমন

করে ও ৭,২৪২ জন দেশে ফিরিয়া আসে। মরিশাস দ্বীপেই বর্ত্তমানে সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক ভারতবাসীর বাস। ৩ লক্ষ ৬৯ হাজার অধিবাসীর মধ্যে ২, লক্ষ ৫৭ হাজার ভারতবাসী। এই দ্বীপে বহুকাল হইতে ভারতবাসী যাইতে সুরু করিয়াছেন। ১৮৩৪ সালে সর্বপ্রথম ভারতীয়-কুলী বিদেশে গমন করে। মরিশাসে ভারতবাসীদের সংখ্যা বেশ বৃদ্ধি পাইতেছিল। ইহাদের সম্বন্ধে স্থানীয়-আইন যথেষ্ট অনুকুল না হইলেও তাহারা অনেকে বাগিচার মানেজার এবং কেহ কেহ বা মালিক হইয়াছেন। ১৯১২ সালে উপনিবেশ সমূহের সচীব মরিশাসে কুলিগমন বন্ধ করিয়া দেন। তাহা না হইলে আর কয়েক বৎসরের মধ্যে মরিশাসের অধিকাংশ লোকই ভারতবাসী হইয়া দাঁড়াইত—এখনই শত-করা ৭০ জন এদেশীয় লোক। মরিশাসের পরেই জন-সংখ্যার হিসাবে মালয় ষ্ট্রেট্; বর্ত্তমানে প্রায় ২,১০,০০০ ভারতবাসী সেখানে নানাকর্মে লিপ্ত আছে।

মরিশাস দ্বীপ

নাটাল আফ্রিকার দক্ষিণ-পূর্বস্থিত একটি দেশ। ইংরাজ ও বুয়রগণ এখানকার সভ্য বাসিন্দা, আর সবই বন্য জাতি। স্থানীয় লোক কোনো প্রকার কাজ জানিত না। বর্ত্তমানে নাটালে ভারত বাসীর সংখ্যা প্রায় ১ লক্ষ ৩৩ হাজার; গত চল্লিশ বৎসরের মধ্যে এই জন-বৃদ্ধি হইয়াছে। সাধারণ শ্রমজীবির মাসিক ১৫৲আয় রেলওয়েতে কুলীরা ২০৲ টাকা পায়। ১৮৯১ সালে ৭৭৪ জন কুলী দেশে ফিরিবার সময়ে প্রায় ১৩,৩৮৭ পাউণ্ড আনিয়াছিল। টাকা আনাতেই ভারতবাসীদের সহিত স্থানীয় বাগিচাওয়ালা ও সরকারের বিবাদ বাধে।

নাটাল

দক্ষিণ-আমেরিকার উত্তরে ডেমেরেরা (ব্রিটিশ গিয়েনা) নামে এক উপ-নিবেশ আছে। ১৮৫১ সালে এইখানে প্রায় আট হাজার ভারতীয় কুলী ছিল, ও য়ুরোপীয় তখন দুই হাজারের অধিক ছিল না। ১৮৩৮ সালে প্রথম ৪০০ কুলী চালান হয়। বর্ত্তমানে ১ লক্ষ ২৯ হাজার ভারতবাসী ডেমেরেরাতে আছে। এখানে কাজ ফুরণে হয়;

ডেমেরেরা

কর্মিষ্ঠ কুলী প্রতিদিন ১॥০ দেড় টাকা রোজগার করিতে পারে। এখানে প্রায় ৬,৫০০ ভারতীয় ছাত্র বিদ্যালয়ে পড়ে, ধনী ভারতবাসীর সন্তানেরা জর্জ টউনের কলেজে পাঠ করিয়া কৃতি হইতেছে।

ব্রিটিশগিয়নোর উত্তরেই ট্রিনিডাড দ্বীপের সমগ্র জনসংখ্যার প্রায় এক তৃতীয়াংশ ভারতবাসী; বর্ত্তমানে প্রায় ১ লক্ষ ১৭ হাজার ভারতবাসী সেখানে বাস করিতেছে। এখানেও অন্যান্য স্থানের ন্যায় চুক্তির কাল পাঁচ বৎসর; কুলীদের দৈনিক আয় ১০।১২ আনা। চিনিই একানকার প্রধান কারবার। ভারতবাসীদের গমনের পর হইতে সেখানকার বাণিজ্য আশ্চর্য্য উন্নতিলাভ করিয়াছে। কুলীদের সম্বন্ধে আইন অন্যান্য স্থানের ন্যায়ই কঠিন ও নির্ম্মম। কোনো কুলী নিজ বাড়ীতে গরু রাখিতে পারে না! তবে সরকার ভারতবাসীকে অনেক জমি দিয়াছেন। অনেকে ক্রমে ক্রমে উন্নতি লাভ করিয়া উচ্চপদ ও সম্মানলাভ করিতেছে।

দক্ষিণ-আফ্রিকা ও ট্রান্সভালে ১৬ হাজার উপর ভারতবাসী। কয়েক বৎসর হইতে এই প্রদেশে ভারতবাসীদের সহিত স্থানীয় গভর্ণমেণ্টের বিরোধ চলিতেছে।

এই সকল উপনিবেশে ভারতবাসীদের দুর্গতির কথা কাহারও অবিদিত নয়। আজ কয়েক বৎসর ধরিয়া মহাত্মা গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকার ভারত-বাসীর দুরবস্থার কথা এদেশে ও বিলাতে আন্দোলন করিতেছেন। ট্রান্সভাল, কেপকলোনী পূর্ব-আফ্রিকা প্রভৃতি স্থানে এদেশীয় লোক পথে ঘাটে অপমানিত হয়।

বাহিরে ভারতবাসীর দুরবস্থা

এক প্রদেশ হইতে অন্য প্রদেশ যাইবার হুকুম নাই, অথবা যাইতে হইলে প্রচুর অর্থ দিতে হয়। সহরের ভিতরে তাহাদের থাকিবার স্থান দেওয়া হয় না, ব্যবসায়ীদের প্রতিবৎসর লাইসেন্স লইতে হয়; বৎসরান্তে সেই লাইসেন্স পাওয়া দুষ্কর। এছাড়া, রাস্তা দিয়া চলা সম্বন্ধে, গাড়ীতে চড়াসম্বন্ধে নিয়ম, রাত্রি ৯টার পর বাহির হওয়া সম্বন্ধে নিয়ম; মাদ্রাজে অস্পৃশ্য পারিহা জাতি

সম্বন্ধে যে সকল নিয়ম ভারতে প্রচলিত আছে এযেন সেইগুলিরই প্রতিরূপ। বহু বৎসরের আবেদন, নিবেদন, আলোচনার কোনো ফল হয় না। অবশেষে মিঃ গান্ধির প্ররোচনায় এদেশীয় ভারতবাসী হিন্দু-মুসলমান-সকলে গভর্ণমেণ্টের অযথা নিয়মের প্রতিবাদ-স্বরূপ সত্যাগ্রহ গ্রহণ করিলেন। মিঃ গোখলে দক্ষিণ-আফ্রিকায় গমন করিয়া সেখানকার হিন্দুমুসলমানগণের অবমাননা স্বচক্ষে দেখিয়া আসিলেন ও ১৯১০ সালে বড় লাটের সভায় এই পাপ-প্রথা উঠাইয়া দিবার জন্য প্রস্তাব করিলেন। তাঁহার চেষ্টায় নাটালে চুক্তিবদ্ধ কুলী প্রেরণ বন্ধ হইল। ১৯১২ সালে এই প্রথা একেবারে উঠাইয়া দিবার প্রস্তাবে গভর্ণমেণ্ট বাধা দিলেন। এ দিকে ভারতের নানাস্থানে এই প্রথা দাস-প্রথার সহিত তুলনা করিয়া লোকে ঘোর প্রতিবাদ করিতে লাগিল। দেশেও শিল্পোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শ্রমজীবির প্রয়োজন হইতে লাগিল। উপনিবেশ সমূহে চুক্তিবদ্ধ কুলির * আত্মহত্যার হার দেখিয়া, পুরুষের অপেক্ষা স্ত্রীর সংখ্যা অল্প হওয়ায় ভীষণ নৈতিক দুর্গতির কথা

---

* স্থানীয় মুক্ত-চুক্তি কুলীদের ও ভারতবর্ষের সাধারণ আত্মহত্যার অনুপাত উপনিবেশ সমূহে অনেক বেশী।

ট্রিনিডাডে—চুক্তিবদ্ধদের মধ্যে—১৫ লক্ষে		৪০০
মুক্তি চুক্তির —	”	১৩৪
বৃটিশ গিয়েনা—চুক্তিবদ্ধ —	”	১০০
মুক্ত-চুক্তি	”	৫২
সুরিনাম—চুক্তিবদ্ধ	”	৯১
মুক্ত চুক্তি	”	৪৯

জামাইকায় উভয়ে মিলিয়া ৩৯৬; পৃথক্ হিসাব পাওয়া যায় নাই। ভারতবর্ষের সহিত তুলনা করিলে বুঝিব যে উপনিবেশগুলির দশা কি ভয়ানক! বঙ্গে প্রদেশে ১০ লক্ষ প্রতি ২৯ জন, যুক্ত প্রদেশে ৬৬, ও মান্দ্রাজে ৪৫ জন আত্মঘাতী।

শুনিয়া—ও অনেক ভদ্র ঘরের মেয়েদের ভুলাইয়া বিদেশে লইয়া যাওয়ার গুজব শুনিয়া এদেশে ভীষণ প্রতিবাদ সূত্রপাত হইল।

কুলী প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন

স্যর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয়ের দুইজন ইংরেজ অধ্যাপক মিঃ সি, এফ, এণ্ড্রুস্ ও মিঃ পিয়ার্সন দক্ষিণ আফ্রিকায় গমন করেন। তখন সত্যগ্রহ পূর্ণ মাত্রায় চলিতেছিল। তাঁহারা সেখানে গিয়া এই বিরোধ মিটাইবার জন্য অনেক করিয়াছিলেন। এদিকে ১৯১২ সালে ভারত গভর্ণমেণ্ট একজন সাহেবও এক জন ভারতবাসীকে উপনিবেশগুলির অবস্থা পরিদর্শন করিবার জন্য নিযুক্ত করিলেন। তাঁহারা কুলীদের অবস্থা দর্শন ও সেই অবস্থার উন্নতি বিষয়ক প্রস্তাব করিবার জন্য অনুরুদ্ধ হইলেন। তাঁহারা প্রায় এক বৎসর ধরিয়া ট্রিনিডাড, ব্রিটিশ গিয়েনা, জামাইকা, ফিজি, সুরিনাম (ওলন্দাজ উপনিবেশ) প্রভৃতি স্থান ঘুরিয়া এক প্রতিবেদন প্রকাশ করেন। তাঁহারা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে কুলীদের প্রকৃত অবস্থা বর্ণন করিয়া বলেন যে যদিও অনেক নিন্দনীয় ঘটনা সেখানে ঘটিতেছে তথাচ এ দেশের অপেক্ষা সেখানে লোকে সুখে থাকে; সেইজন্য অধিকাংশ কুলি চুক্তি শেষেও দেশে না আসিয়া উপনিবেশ সমূহে বাগান করিতেছে।

প্রবাসী ভারতবাসীদের স্থান ও সংখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

	কুলী	স্থায়ী অধিবাসী
ট্রিনিডাড	১,১৭,১০০০	১,১৩,০০০
ব্রিটিশ গিয়েনা	১,২৯,৩৮৯	১,২৭,০০৮
সুরিনাম (ওলন্দাজগিয়েনা)	২৬,১১৯	
জামাইকা	২০,০০০	
ফিজি	৪৪,০০৮	৪০,০০০

রিউনিয়ান্	৩,০১২	
মরিশাস্	২,৫৭,৪৯৭	২,৫৭,০০০
কেপকলোনী	৬,৬০৬	
নাটাল	১,৩৩,০৩১	১,১০,০০০
ট্রান্সভাল	১০,০৪৮	
অরেঞ্জফ্রিষ্টেট্	১০৬	
মালয়	২,২০,০০০	
কানাডা	২,৫০০০ হইতে	৪,৫০০ (অনুমান)

ষ্ট্রেটসেটলমেণ্ট, রোডেশিয়া, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড প্রভৃতি স্থানেও ভারতবাসী আছে—কিন্তু তাহাদের সংখ্যা জানা নাই।

যুদ্ধের জন্য অনেক শ্রমজীবি প্রয়োজন হওয়াতে ১৯১৭ সালে ভারত হইতে কুলী চালান স্থগিত করা হয় এবং ভারত সচিব ভরসা দিয়াছিলেন যে ভবিষ্যতে বর্ত্তমানের-ন্যায় চুক্তিবদ্ধ প্রথায় কুলী বিদেশে চালান করা হইবে না। কিন্তু একেবারে কুলী ছাড়া উপনিবেশ সমূহের কার্য্য চলিবে না, সুতরাং পূর্ব্বের নিয়ম সমূহ শিথিল করিয়া নূতন আইন প্রবর্ত্তিত হইতেছে।

ভারতবর্ষের কৃষি ও শিল্প-বাণিজ্যের দশা যে প্রকার শোচনীয় এক্ষেত্রে এই বর্দ্ধিষ্ণু জাতির পক্ষে ভারতের কৃষিক্ষেত্র আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকিলে মৃত্যু অনিবার্য্য। কৃষির উপরে সকল শ্রেণীরই দৃষ্টি পড়িয়াছে। তাঁতি, কুম্ভকার, কামার প্রভৃতি নানা জাতীয় লোক শিল্প-পথ ছাড়িয়া কৃষি করিতেছে।

ভারতবর্ষের লোক যেমন বিদেশে আছে বিদেশের লোক তেমনি এখানে আছে। এক আফগানিস্থানের প্রায় ৯২,০০০ কাবুলী এদেশে বাস করে। প্রতিবৎসর শীতের সময়ে তাহারা হিন্দুস্থান ও বাংলাদেশের সহরে সহরে

গ্রামে গ্রামে দেখা দেয়। ৮০ হাজার চীনা ভারত-সাম্রাজ্যে বাস করে; ইহার অধিকাংশই ব্রহ্মদেশে—কিন্তু ক্রমেই বাংলাদেশে তাহাদের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইতেছে। প্রায় ২৩,০০০ আরব বম্বে অঞ্চলে বাস করে। এশিয়ার লোক ছাড়া য়ুরোপীয় নানাজাতি এখানে বাস করে—তবে অধিকাংশই অস্থায়ী। ১ লক্ষ ৪৬ হাজার বিদেশীর মধ্যে প্রায় ১ লক্ষ ৩২ হাজার য়ুরোপের লোক, তার মধ্যে ইংরাজই ১ লক্ষ ২৩,০০০। সৈন্ত-বিভাগে ৭৭ হাজারের কিছু বেশী ইংরাজ এদেশে থাকে; অবশিষ্ট গভর্ণমেণ্ট উচ্চ কর্ম্মচারী ব্যবসায়ী পাদরী শিক্ষক।

১২। স্বাস্থ্য, মৃত্যু ও চিকিৎসা

প্রকৃতির সহিত বিবাদ করিয়া তাহাকে জব্দ করিবার নিয়ত চেষ্টায় স্বাস্থ্য ভাল থাকে, না তাহার সহিত আপোষ করিয়া বাস করিলে স্বাস্থ্য বজায় থাকে এ তর্কের মীমাংসা এখনো হয় নাই। তবে মানুষ যখন জন্মগ্রহন করে তখন সে পূর্ব-পুরুষের সঞ্চিত কিছু শক্তি বা ব্যাধি লইয়া আসে এবং এখানকার অনুকুল ও প্রতিকুল পারিপার্শ্বিকের প্রভাবের মধ্যে বাড়িতে থাকে।

প্রকৃতি ও স্বাস্থ্য

দেশের প্রাকৃতিক অবস্থার সঙ্গে অধিবাসীর স্বাস্থ্যের সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ট। ভারতের জলবায়ু ও তাপ এখানকার মানুষকে স্বভাবতই শ্রমবিমুখ করিয়া তোলে। বাংলাদেশের গ্রীষ্মকালের পচানি গরমে বা পশ্চিমের নিদারুণ তাপের মাঝে মানুষের বাস করা খুব কঠিন। প্রকৃতির সহিত লড়াই করিতে করিতে সে হয়রাণ হইয়া পড়ে। যত বড় জোয়ানই এদেশে বাস করুন না কেন

কয়েক পুরুষের মধ্যে তাহাদের সন্তান সন্ততি নির্বীর্য্য হইয়া পড়ে; প্রাচীন অধিবাসীদের সহিত তাহাদের কোনোই ভেদ আর চোখে পড়ে না। ইতিহাসে একথার প্রমাণ পাওয়া যায়।

ভারতবর্ষের বৃষ্টি বৎসরের মধ্যে একবার হয় এবং বৎসরের অধিকাংশ সময় দেশের কোথায়ও একবিন্দু বারিপাত হয় না বলিলে চলে। জল সরবরাহ তিন ভাবে হয় :—১। পুষ্করণী ২। কূপ ৩। নদী। ভারতবর্ষের বড় নগর ছাড়া কোথায়ও গ্রামের বা সহরের দূষিত জল দূরে ফেলিবার ব্যবস্থা নাই। অতি-বৃষ্টির সময়ে এই সব দূষিত জল অধিকাংশ সময়ে নিকটের পুষ্করিণীতে আশ্রয় লয় বা চোঁয়াইয়া কূপের মধ্যে যায়। এইরূপেই আমাদের অধিকাংশ কূপগুলি নষ্ট হয়। এদিকে বৃষ্টির ফলে চারিদিকের খুব পরিবর্ত্তন সাধিত হয়; বড় বড় আগাছা উঠিয়া গ্রাম ছাইয়া ফেলে; বর্ষার আগে যেখানে খোলামাঠ ছিল বর্ষার পরে সেখানে মানুষের মাথা-সমান গাছ। দুই বৎসর না কাটিতে পারিলে সেখানে বন। এই সময়ে তাপেরও অকস্মাৎ পরিবর্ত্তন ঘটিতে থাকে; কিন্তু বস্ত্রাভাবে অধিবাসীদের অনেকেই খুব কষ্ট পায়। বাংলাদেশের প্রধান শস্য ধান; বর্ষাকালে এসব ক্ষেত হইতে জল ভাল রূপে বাহির হইতে পারে না; রেলপথ মাটি দিয়া উঁচু করার জন্যও দেশের জল সহজে চলাচল করিতে পারে না ইহা রেলে চড়িলেই বুঝা যায়। এইরূপে জল দূষিত হইলে বর্ষাকালের প্রথমেই দেশময় কলেরা বা উদরের নানা রকমের ব্যাধি দেখা দেয়। ইতিমধ্যে বন-বাদাড় হইতে ম্যালেরিয়ার মশা আসিয়া গ্রামবাসীদিগকে শয্যাশায়ী করিতে আরম্ভ করে। মোটামুটী জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত লোকের স্বাস্থ্য ও অবস্থা মন্দ থাকে না; কিন্তু ইহার পরই দেখা যায় মৃত্যুহার ভীষণ রূপে বাড়িয়া চলিয়াছে। কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত এইরূপ চলে।

অতি বৃষ্টির ফল

কিন্তু বৃষ্টি যদি কম হয় তবে যে বিপদ কিছু কম হয় তাহা নহে; গ্রামের

ছোট ছোট পুকুর ডোবা শুকাইয়া যায়, কূপেও জল থাকে না। তখন একই পুকুরের জলে পানীয়, স্নান, কাপড়-কাছা, গরু ঘোড়া স্নান প্রভৃতি সকল রকম কাজ হইতে থাকে; ইহার ফলে দেশমধ্যে অচিরেই নানারূপ ব্যাধি দেখা যায়।

অনাবৃষ্টির ফল

তাপের তারতম্য স্বাস্থ্য হানির অন্যতম কারণ। বাংলার স্যাঁৎসেঁতে স্থানে ছ্যাঁচার বেড়ার ঘরে লোক থাকে, পশ্চিমে মাটির ঘরে বাস করে। এই সব ঘরে বাতাস চলাচলের কোনো ব্যবস্থা নাই। এমন কি দারিদ্র্যবশত কোথায় একই ঘরে মানুষ ও পশু বাস করে। ইহার উপর আমাদের কতকগুলি সামাজিক প্রতিষ্ঠান এই দুঃখকে আরও বাড়াইয়া তোলে। একান্নবর্তী পরিবার-প্রথা প্রবর্ত্তিত থাকায় এই নিদারুণ গরমে ক্ষুদ্র ঘরে বহু লোকের শয়ন প্রথা এখনো বহু জায়গায় আছে। ইহার ফলে সান্নিবাতিক, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা নিমোনিয়া, যক্ষ্মা প্রভৃতি মারাত্মক ব্যাধির প্রসার হয়। সহরে এই ভিড় আরও বেশী। বম্বেতে ১৯০১ সালে ভাড়াটে বাড়ীর শতকরা ৮৭টীর মাত্র একটি করিয়া ঘর ছিল এবং এখানেই সমগ্র সহরের শতকরা ৮০ জন লোক বাস করিত; প্রত্যেকটি ঘরে গড়ে ৪ জনের উপর লোক থাকিত। এমন সব ঘর ছিল যেখানে দিনে সূর্য্যের আলোক প্রবেশ করিত না। ইহার ফলে উক্ত নগরীতে যক্ষ্মাতে প্রতি দশ হাজারে প্রায় ১০ জন করিয়া লোক মরিয়াছিল। একটি বিভাগের যেখানে ১ লক্ষ ৩০ হাজার লোক বাস করিত যক্ষ্মাতে সেখানে দশ হাজারে ১৬ জনের উপর লোক মরিতেছিল; কিন্তু লণ্ডনে দশ হাজারে দুইএর কম সংখ্যা এই মারাত্মক ব্যাধির কবলে পড়িত।

স্বাস্থ্যের উপর তাপ ও শৈত্যের প্রভাব

বোম্বাইএর বাড়ী ও ব্যাধি

বাল্যবিবাহ আমাদের দেশে সর্বত্রই প্রায় প্রচলিত। অপরিণত বয়সেই ভারতবর্ষের অধিকাংশ বালিকা মাতা হয়; এবং অল্পকালের মধ্যেই

তাহাদের স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়ে। ভারতবর্ষের মেয়েদের সন্তানাদি হয় আগে এবং সন্তান-হওয়া বন্ধ হয় আগে। পুরুষেরাও অনেক সময়ে

বাল্য বিবাহ

১৮।২০ বৎসরে পিতা হয় এবং এক শতাব্দীর মধ্যেই ৪।৫ পুরুষ জন্মগ্রহণ করে ও মরে। আমাদের দেশে সন্তান-প্রসবের সময়ে জননীদের জীবন-সঙ্কট হয়; অশিক্ষিত ধাত্রীদের জন্য, অশিক্ষিত জননী ও গৃহকর্ত্তৃদের জন্য অনেক শিশু ও বালিকা-জননী অসময়ে প্রাণত্যাগ করে।

অস্বাস্থ্যের আর একটি কারণ অপুষ্ট আহার। ভারতবর্ষের অধিকাংশ স্থানেই এবং বাংলাদেশে বিশেষ ভাবে—আহার্য্য বিষয়ে লোকের জ্ঞান

পুষ্টখাদ্যের অভাব

খুবই কম। দারিদ্র্য ইহার প্রধান কারণ হইলেও লোকের পুষ্টিকর আহার খাইবার দিকে রুচি কম। দেশে ভাল ঘি তেল কিছুই পাওয়া যায় না, মৎস্যাদির দুর্মূল্যতার জন্য লোকে তাহাও প্রচুর পায় না ও খায় না; ফলে লোকের শরীরের তেজ হ্রাস পায় এবং সহজেই তাহারা ব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত হয়। আমরা প্রচুর পুষ্টিকর খাদ্য চাই নতুবা বাঁচিবার আশা কম।

পুরুষ ও নারীদের মধ্যে সংখ্যায় অসামঞ্জস্য সর্বত্রই আছে। ভারতের পুরুষ অপেক্ষা নারীর সংখ্যা কম। ১৮৮১ সালে ১০০০ জন পুরুষের স্থানে ৯৫৪ জন নারী ছিল। ১৯০১ সালে তাহা বৃদ্ধি পাইয়া হাজারে ৯৬৩

নারীক্ষয়

দাঁড়ায়; কিন্তু ১৯১১ সালের আদমসুমারীতে এই হার পুনরায় নামিয়া ৯৫৪ হইয়াছিল। বাংলাদেশে ১৮৮১ সালে ১০০০ পুরুষে যেখানে ১০১৩ নারী ছিল। গত আদমসুমারীতে সেইখানে ৯৭০ দেখা যায়। এই নারী ক্ষয়ের ফলে সমাজের জনসংখ্যা হ্রাস হইতেছে। সমগ্র ভারতের নরনারীর মৃত্যুসংখ্যা হাজার-করা যথাক্রমে ৪০ ও ৩৮; অর্থাৎ মোটের উপর পুরুষদের মৃত্যুর হার অধিক। জন্মের প্রথম বৎসরে বালিকার চেয়ে বালকেরাই বেশী মরে। কিন্তু পরে

উহা বদলাইয়া যায়। ১৫ হইতে ২০ বৎসরের সময়ে এই পার্থক্য সব চেয়ে বেশী; এবং ৩৫ বৎসর পর্য্যন্ত মেয়েদের মৃত্যুসংখ্যা বেশী দেখা যায়। ইহার কারণ নারীদের সন্তান প্রসবের সময়ে তাহাদের মৃত্যুসংখ্যা সর্বাধিক। প্রত্যেক ৭৫ জন প্রসূতির মধ্যে একজন করিয়া জননী অযত্ন, বিনাচিকিৎসা ও অজ্ঞতা হেতু প্রাণত্যাগ করে। বিলাতে ২১২ জন প্রসূতির মধ্যে ১ জন মরে অর্থাৎ সেখানকার চেয়ে আমাদের নারীদের মৃত্যু হয় প্রায় তিনগুণ।

শিশু মৃত্যু

লোক ক্ষয়ের একটি প্রধান কারণ হইতেছে শিশু-মৃত্যু। অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিশুগণ জননীদের অপরিণত বয়সে জন্মগ্রহণ করে; ফলে তাহারা অল্প জীবনীশক্তি লইয়া ভূমিষ্ঠ হয়; এই জননীদের জীবন সঙ্কটময় করিয়া তোলে। ১৯০২—১৯১১ সাল পর্য্যন্ত দশ বৎসরের মধ্যে গড়ে ১০০০ জন্মের মধ্যে ২৫০টি শিশু বৎসর ঘুরিবার পূর্বেই যেখান হইতে আসিয়াছিল সেইখানে চলিয়া যায়। পৃথিবীর কোনো সুসভ্য দেশের এমন শোচনীয় অবস্থা নয়। হাজার জন শিশুর মধ্যে ইংলণ্ডে ১২৭, অষ্ট্রেলিয়া ৮৭, সুইডেন ৮৪, নিউজিল্যাণ্ড ৬৪; ফ্রান্স ১৩২, জারমেনী ১৮৬ জন প্রতিবৎসর মরিয়া থাকে। এইসব স্থানেই জন্মহার খুব কম এবং সেইজন্য মৃত্যু-হারও অধিক নহে; কিন্তু ভারতবর্ষ, রুশ, চীন প্রভৃতি স্থানে মৃত্যু-হার বিশেষতঃ শিশু-মৃত্যু-হার খুবই বেশী।

প্রতি-হাজার-জন্মে ভারতবর্ষের কোন্ প্রদেশে কত শিশু প্রতি বৎসর মরে তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

বাংলা—২৭০ পাঞ্জাব—৩০৬

মান্দ্রাজ—১৯৯ বম্বে—৩২০

বিহার-উড়িষ্যা—৩৬৪ ব্রহ্মদেশ—৩০২

যুক্তপ্রদেশ—৩৩২

সহরের শিশু-মৃত্যু-সংখ্যা ভয়াবহভাবে বাড়িয়া চলিয়াছে। বদ্ধগৃহে

বাস, দুধ বলিয়া বার্লি বা আয়ারুট পান, জননীদের শুষ্ক বক্ষ শোষণ, ও তাঁহাদের ঘন ঘন সন্তান-সম্ভবনা প্রভৃতি অনেকগুলি কারণ এই মৃত্যু-হার বৃদ্ধির কারণ। সহরের এই মৃত্যু-হার ক্রমেই যেন বাড়িয়া চলিয়াছে। কলিকাতায় ১৯০৯ সকলে ২,৭০০ শিশু এক মাস ঘুরিবার পূর্বে মারা যায়। বম্বেতে ১৯০০ সালের পাঁচ বৎসরের গড়ে হিসাবে দেখা যায় যে ১০০০ এর মধ্যে ৭১১ জন শিশু মরে।

গ্রাম ও সহরের অধিবাসীদের মধ্যে মৃত্যুহারের তারতম্য লক্ষিত হয়।

গ্রাম ও সহরের মৃত্যুহার

এখানকার শতকরা ৯০ জন লোক গ্রামে বাস করে; অথচ সেখানকার স্বাস্থ্য যে কি ভীষণ খারাপ তাহা কোনো বাঙালীর অবিদিত নহে। ১৯০১ সালে হাজার-করা লোকের মধ্যে সহরে ৩৯ জন ১৯১১ সালে ৩৩ জনের মৃত্যু হয়; কিন্তু গ্রামে উহা যথাক্রমে ২৮ হইতে ৩৩ দাঁড়াইয়াছিল। মাঝে ১৯০৮ সালে ৩৮ জন হয়। গত শতাব্দীর শেষ পাঁচবৎসরের মৃত্যুহারের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই গ্রামের যে অবস্থা ক্রমেই শোচনীয়তর হইতেছে তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে। সে সময়ের তালিকায় দেখা যায় যে গ্রামের মৃত্যু হার সর্বত্রই কম; পরে দেখা যাইতেছে যে এ হার বাড়িয়াই চলিয়াছে। সহর ও নগরের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য স্থানীয় মুন্সিপালটিগুলি যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করে। কয়েক বৎসর ধরিয়া কলিকাতাও বম্বে প্রভৃতি স্থানে সহরের উন্নতির জন্য খুব চেষ্টা চলিতেছে। দূষিত জল নানারূপ ব্যাধির কারণ; কতকগুলি সহরে বিশুদ্ধ পানীয় সরবরাহের জন্য এ পর্য্যন্ত প্রায় ৩½ কোটী টাকার উপর ব্যয়িত হইয়াছে; এবং এখানো আরও প্রায় ৩½ কোটি টাকা ব্যয়িত হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। কিন্তু সহরে ভারতের অধিবাসীর অতি সামান্য অংশই বাস করে। অধিকাংশ লোক গ্রামে বাস করে, তাহাদের পানীয়ের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। উদরের নানাপ্রকার পীড়ার কারণ এই দূষিত জল। আজকালকার গ্রামে যাহারা একবার প্রবেশ করিয়াছেন বা

যাঁহারা বাস করিতেছেন তাঁহাদের কাছে একথা অবিদিত নয়। গ্রামের বদ্ধজল নিকাশের পথ নাই; ডোবা, পুকুর ও গাছের গোড়ার জল মেলেরিয়া ও অন্যান্য ব্যাধির জীবাণুর বৃদ্ধির প্রধান স্থান। গ্রামে ড্রেণের উন্নতি না করিলে যে সেখানকার স্বাস্থ্যোন্নতি হইতে পারে না, একথা নিশ্চিত। গ্রামের চারিদিকে পয়োপ্রণালী খনন করিয়া উদ্বৃত্ত জল নিকাশের পথ তৈয়ারী করার দিকে সরকার বাহাদুরের দৃষ্টি অল্পকাল হইল পড়িয়াছে; কিন্তু তেমন করিয়া দেশব্যাপী চেষ্টা এখনো হয় নাই। ড্রেণ ছাড়া গ্রামের জঞ্জালও ব্যাধি বৃদ্ধি ও বিস্তারের অন্যতম কারণ।

তীর্থস্থানের অস্বাস্থ্য

তীর্থস্থানে অস্বাস্থ্যকর ব্যবস্থার ফলে সেখানে প্রতিবৎসর বহুসহস্র লোক ওলাউঠা ও বসন্ত রোগে প্রাণত্যাগ করে। প্রথমে অনাহারে বা অর্দ্ধাহারে ট্রেণে যাইতেই লোকের প্রাণ শক্তি অর্দ্ধেক কমিয়া যায়; ইহার পর তীর্থস্থানগুলিতে থাকিবার ব্যবস্থা আদৌ সুন্দর নহে একথা প্রত্যেকেই স্বীকার করিবেন। সরকার এবিষয়ে দৃষ্টিপাত করিতেছেন এবং পথ ঘাটাদির উন্নতির জন্য কিছু অর্থও ব্যয় করিতেছেন। এতদ্ব্যতীত গ্রামের ও সহরের অধিকাংশ লোকের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সামান্যও বোধ না থাকাতে এই সকল ব্যাধির প্রকোপ বাড়িয়া যায়।

লোকের অজ্ঞতা

গৃহের পার্শ্বে আবর্জ্জনা স্তূপ করা, গৃহের সন্নিকটেই মলমূত্রাদি ত্যাগ, গোশালার পাশেই গো-ময়ও মূত্রাদি মিশ্রিত খড় বিচালি জমা করা, সহরের বাড়ীর ড্রেণ ও পায়খানা যথোচিতভাবে পরিচ্ছন্ন না রাখা, খাদ্যাদি খোলা রাখা ও ঠাণ্ডা খাওয়া, রাত্রে শুইবার ঘর সিন্দুকের মত বন্ধ করিয়া ছিদ্রাদিতে কাগজ কাপড় এবং তুলা দিয়া বন্ধ করা (পাছে হিম আসে), সহরে খেলিবার ও মেয়েদের বেড়াইবার স্থানের অভাব ইত্যাদি দেশের স্বাস্থ্যঅধঃপতনের অন্যতম কারণ। এছাড়া এমন কতকগুলি বদ্অভ্যাস আমাদের মর্ম্মাগত হইয়াছে যে সেসব আর পাঁচজনের স্বাস্থ্যের কোনো ক্ষতি করিতে পারে

তাহা আমাদের মনে হয় না। ট্রেণে ও ট্রামের মধ্যে থুতু ও খাদ্যাদির উচ্ছিষ্টাংশ ত্যাগ, কলিকাতার ফুটপাতের উপর থুতু ফেলা এবং এক পা সরিয়া ড্রেণে ফেলিবার আলস্য, গৃহের জানালা হইতে আবর্জ্জনা রাস্তায় ফেলার ফলে রোগপ্রসার হয়।

প্রায় অধিকাংশ ব্যাধিই নিবারণ করা যায়। কিন্তু ভারতের অজ্ঞতা বশতঃ এখানে কয়েকটি ব্যাধি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছে; এই সমস্ত ব্যাধির মধ্যে প্রধান হইতেছে মেলেরিয়া, ওলাউঠা, বসন্ত, প্লেগ ও ইনফ্লুয়েঞ্জা; এছাড়া শ্বাসযন্ত্রের নানাবিধ রোগ ক্রমেই দেশে প্রবলতর হইয়া উঠিতেছে।

মেলেরিয়ার কথা বাঙালীকে বিশেষভাবে বলিতে হইবে না; এই ব্যাধিতে ভোগেন নাই এমন সৌভাগ্যশালী পুরুষ আজকাল নাই বলিলেই চলে। পূর্বে কেবল বাংলাদেশেই এ ব্যাধির প্রাদুর্ভাব ছিল এক্ষণে তাহা উত্তর-ভারতের সর্বত্রই বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। বাংলাদেশে গত-শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে মেলেরিয়া আরম্ভ হয়। সে সময়ের মহামারীর কথা আমাদের দেশের প্রবাদগত হইয়াছে। বহুজনাকীর্ণ গণ্ডগ্রাম সেই সময়ে উৎসন্ন যায়; এবং সেই হইতে ধ্বংসকার্য্য ধারবাহিক চলিয়া আসিতেছে। এখন বাংলাদেশে কেন—সমগ্র হিন্দুস্থানের কোথায়ও স্বাস্থ্যকর স্থান খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এককালে কলিকাতার লোকে নানারূপ ব্যাধিতে ভুগিয়া বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য হুগলি, বর্দ্ধমানে যাইত; কিন্তু আজকাল যাঁহারা সেখানে বাস করেন তাঁহারা আর কাহাকেও সেখানে আসিতে উপদেশ দেন না।

মেলেরিয়া

মোট মৃত্যুসংখ্যার শতকরা ৫৯ জন জ্বররোগে মরে। বাংলাদেশে শতকরা মৃত্যুর ৭০এর উপর মৃত্যুর কারণ জ্বর। প্রাচীনকালে বাংলাদেশে গ্রামের স্বাস্থ্যের অবস্থা কিরূপ ছিল সে কথা আলোচনার প্রয়োজন নাই। তবে এক শতাব্দী পূর্বেও বাঙালীর শারীরিক বল ও সুস্থতার কথা

বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়া তৎকালীন বড়লাট লর্ডমিণ্টো (১৮০৮) বলিয়া ছিলেন "আমি এরূপ সুন্দর জাতি দেখি নাই; ইহারা মান্দ্রাসের লোক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। বাঙালীরা দীর্ঘ, বলিষ্ঠ ও পালোয়ানের ন্যায় ইহাদের শরীরের গঠন।" কিন্তু বর্ত্তমানের অবস্থা যে কি তাহা বর্ণনা পাঠ করিয়া জানিতে হইবে না প্রত্যেক পাঠক নিজ নিজ শরীর ও চারিপার্শ্বের লোকের প্রতি দৃষ্টি দিলেই বুঝিবেন। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে বাঙালীদের যে চিত্র পাওয়া যায়, ভুঁইয়াদের যে বীরত্ব-কাহিনীর লুপ্ত ইতিহাস এখনো পাওয়া যায় তাহা হইতে বাঙালী ভীরু ও দুর্বল একথা প্রমাণিত হয় না।

প্রাচীন বাংলা দেশ

বাংলাদেশের গ্রামগুলি ক্রমশই জনশূন্য হইয়া আসিতেছে; গ্রামবৃদ্ধদের নিকট হইতে গ্রামের অতীত কাহিনী শুনিলে তাহা অলীক বলিয়া মনে হয়। তবে তাহাদের সমৃদ্ধিঅবস্থার চিহ্ন স্বরূপ ভীষণ বনের মাঝে বোসেদের বাড়ী, মিত্রদের বাড়ী, মুখুয্যেদের বাড়ী, সিংহদের বাড়ীর ভগ্নভিটা সেই করুণ কাহিনীর সাক্ষ্য দিতেছে। নদীয়া, যশোহর, বীরভূম, হুগলি প্রভৃতি কয়েকটি জেলার জনসংখ্যা মেলেরিয়ার উৎপাতে রীতিমত কমিতে আরম্ভ করিয়াছে দেখিয়া গভর্ণমেণ্ট সঙ্কিত হইয়াছেন।

১৯০৮ সালে উত্তর-পশ্চিম ও পঞ্জাব প্রদেশে মেলেরিয়া দেখা দেয়। এই ব্যাধির আক্রমণে বলিষ্ঠ পঞ্জাবী, জাঠ, পাঠানগণ হাজারে হাজারে মরিয়া যায়।

প্রতিবৎসর ভারতে কেবল মেলেরিয়া জ্বরেই ১০লক্ষ করিয়া লোক মরে; ইহাদের অধিকাংশই পরিণত বয়স প্রাপ্ত হইবার পূর্বেই দেহত্যাগ করে। যাহারা মরে না তাহারা ভুগিয়া ভুগিয়া এমন অকর্মণ্য হইয়া থাকে যে সকল প্রকার শারীরিক পরিশ্রমের তাহারা সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত হইয়া পড়ে। ধান-কাটার সময়ে বাংলাদেশে জ্বর দেখা দেয়। বাঙালীরা একাজ করিতে পারেনা, প্রথমত দেশে অত লোক পাওয়া যায় না; দ্বিতীয়ত ঐ সময়ে অধিকাংশ লোকই

পীড়িত থাকে। সেইজন্য বিস্তর পশ্চিমা ও সাঁওতাল ধান কাটিবার সময়ে বাংলাদেশে আসে।

মেলেরিয়ার হাত হইতে কেমন করিয়া দেশকে উদ্ধার করা যায় একথা গভর্ণমেণ্ট বহুকাল হইতে ভাবিতেছেন। বিখ্যাত রস্ সাহেব আবিষ্কার করেন যে একপ্রকার মশা এই রোগের বীজাণুর বাহক ও কুইনাইন উহার একমাত্র প্রতিশেধক। সেই হইতে সরকার বাহাদুর গ্রামে গ্রামে পোষ্টআফিসে কুইনাইন রাখিয়াছেন; বর্ত্তমানে ইহার দর অত্যন্ত বাড়িলেও কিছুকাল পূর্বেও খুব সস্তায় লোকে কুইনাইন পাইত। ১৯০৬ সালে এক বৈঠক বসে এবং তাঁহারা স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য নানারূপ প্রস্তাব করেন। ১৯০৮ সালে যুক্ত-প্রদেশে ভীষণভাবে মেলেরিয়া দেখা দেওয়ায় সরকার বাহাদুর সাড়ে তিন হাজার সের কুইনাইন বিনামূল্যে বিতরণ করেন। ১৯১৬ সালে ভারতে প্রায় ৯৩ হাজার সের কুইনাইন ব্যবহৃত হয়। গভর্ণমেণ্ট দার্জ্জিলিঙ ও নীলগিরি পাহাড়ে নিজের তত্ত্বাবধানে সিন্‌কোনা গাছের আবাদ করিয়াছেন; সরকারী ফ্যাক্‌টরী ও জেল খানায় কুইনাইন তৈয়ারী হয়। কিছুদিন হইতে ডাক্তার বেণ্টলী ও আমাদের লাট সাহেব লর্ড রোনাল্ডশে বাংলাদেশকে মেলেরিয়ার হাত হইতে উদ্ধার করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন; তাঁহাদের কার্য্য যে ভাল হইবে একথা বলাই বাহুল্য।

মেলেরিয়ার প্রতিকার

কুইনাইনের চাষ

মেলেরিয়া ছাড়া প্লেগ ভারতের লোকক্ষয়ের অন্যতম কারণ। ১৮৯৬ সালে বম্বেতে এই ব্যাধি প্রথম দেখা দেয় এবং সেখান হইতে ধীরে ধীরে ভারতবর্ষময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কলিকাতায় ১৮৯৮ সালে প্লেগ দেখা দেয়। সেই সময়কার প্লেগের চেয়ে প্লেগের চিকিৎসায় লোকের যে আতঙ্ক হইয়া ছিল তাহা অনেকেরই স্মরণ থাকিতে পারে। সেই হইতে প্রতি বৎসরই ভারতের

প্লেগ

কোনো না কোনো অংশে ইহা দেখা দেয়—বিশেষত বম্বে প্রদেশে প্লেগ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছে। সেখানে কেবল সহরে নয় গ্রামেও প্লেগে হাজার হাজার লোক প্রতিবৎসর মরিতেছে। ১৯০৭ সালেই ভারতে ১৩ লক্ষের উপর লোক প্লেগে মরে। ১৯১৫ সালে এই রোগে পঞ্জাবের মৃত্যু সংখ্যা ভীষণ হইয়া উঠিয়াছিল।

১৯০৪ সালে বিশেষজ্ঞদের লইয়া প্লেগের তত্ত্ব-নির্ণয়ের জন্য এক বৈঠক বসে। ১৯০৭ সালে এই ব্যাধির কারণ আবিষ্কৃত হইল। পণ্ডিতেরা বলিতেছেন প্লেগের বীজাণু ইন্দুরের শরীরে পুষ্টিলাভ করে; এক প্রকার মাছি এই বিষ এক শরীর হইতে অন্য শরীরে সঞ্চারিত করে। কোন বাড়ীতে ইন্দুর মরিতে আরম্ভ করিলে বুঝিতে হইবে যে প্লেগের বিষ সেখানে আছে এবং অবিলম্বে সেস্থান পরিত্যাগ করা বিধেয়। সেইজন্য সরকার বাহাদুর কোন স্থানে প্লেগ দেখা দিলেই সেখানকার ইন্দুর মারিবাব জন্য আদেশ দিয়া থাকেন। ১৮৯৬ সাল হইতে এপর্য্যন্ত কেবল প্লেগেই ৯৭।৯৮ লক্ষ লোক মরিয়াছে।

মহামারীর মধ্যে প্লেগের পরেই ওলাউঠা। বৎসরে ৩।৪ লক্ষ করিয়া লোক এই রোগে মরে। দূষিত জল, দুধ ও খাদ্য হইতে কলেরার উৎপত্তি।

কলেরা

দেশের জলকষ্টের কথা সকলেই জানেন। প্রতিদিনই খবরের কাগজ কোনো না কোনো স্থানে জলাভাবে কলেরার প্রাদুর্ভাবের কথা ও প্রজাগণের আকুল কণ্ঠে জমিদার ও সরকার বাহাদুরের নিকট হইতে কৃপা ভিক্ষার কথা প্রকাশিত হইতেছে।

বসন্ত রোগে প্রতিবৎসর গড়ে প্রায় ৮০ হাজার করিয়া লোক মরে। পূর্বে বাংলা-টীকা লইবার ব্যবস্থা ছিল। বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে টীকা

বসন্ত

দেওয়ার উন্নতি হইয়াছে। সমগ্র ভারতে প্রায় ছয় হাজার লোক টীকা দিবার জন্য নিযুক্ত আছে। প্রতি বৎসর প্রায় ১ কোটি করিয়া লোকের টীকা হয়। টীকার সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বসন্ত রোগীর সংখ্যা হ্রাস পাইতেছে।

এছাড়া ২ লক্ষ ৬০ হাজার লোক পেটের অসুখ আমাশা, ও শ্বাসযন্ত্রের রোগে দুই লক্ষ ও অন্যান্য ব্যাধিতে ১৭ লক্ষ লোক প্রতিবৎসর মরিয়া থাকে।

অন্যান্য ব্যাধি

গত তিন বৎসর হইতে পৃথিবীতে ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা রোগ মারাত্মক হইয়া উঠিয়াছে। ভারতবর্ষেরও এ রোগে কি পরিমাণে ক্ষতি করিয়াছে তাহা প্রত্যেকেই জানেন। এমন বোধ হয় একজনও নাই যাহার জানা শুনা দুই চারিজন লোক এই রোগে না মরিয়াছে। ১৯১৮ সালের জুন মাসে এই রোগ প্রথম দেখা হয়। সমগ্র ভারতের জন সংখ্যার শতকরা দুইজন লোক ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা রোগে মারা পড়িয়াছে।

ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা

ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার মৃত্যু সংখ্যা ১৯১৮ সালের শেষ পর্য্যন্ত

বঙ্গদেশ—	২,১৩,০৯৮	৪,·৭ হাজার করা
বিহার উড়িষ্যা—	৩,৫৯,৪৮২	১০·৩ „
মাদ্রাজ—	৫,০৪,৬৬৭	১২·৭ „
যুক্ত প্রদেশ—	১০,৭২,৬৭১	২২·৯ „
পাঞ্জাব—	৮,১৬,৩১৭	৪২·২ „
বোম্বাই—	৯,০০,০০০	৪৫·৬ „
দিল্লী—	২৩,১৭৬	৫৫·৬ „

ভারতের চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য-ব্যবস্থা ও পর্য্যবেক্ষণের জন্য একটি সরকারী বিভাগ আছে। এই বিভাগে ৭৬৮ জন চিকিৎসক আছেন; বিলাতের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইহারা এদেশে আসেন। ভারতের ইংরাজ ও দেশীয় সৈনিকদের চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যরক্ষাই ইহাদের প্রধান কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইত। এ ছাড়া ক্রমে ক্রমে নানারূপ কর্ত্তব্য ইহাদের কাজের সঙ্গে জড়িত হইতে

চিকিৎসা-বিভাগ

লাগিল, যথা সাধারণ হাঁসপাতাল ও বেসরকারী দাতব্য চিকিৎসালয়ের পর্য্যবেক্ষণ, জেল তত্ত্বাবধান ইত্যাদি।

১৭৬৬ সালে এই বিভাগ গঠিত হয়; তখন ইহার মধ্যে মিলিটারী ও সৈনিক এই দুইভাগ ছিল। ১৮৫৩ সালে ইহাতে দেশীয়দের প্রবেশ করিবার অধিকার দেওয়া হয়। প্রথম দেশীয় ডাক্তার যিনি মিলিটারী বিভাগে কাজ পান তিনি একজন বাঙালী; তাঁহার নাম গুডিভ চক্রবর্ত্তী। ১৮৫৫ হইতে ১৯১০ পর্য্যন্ত মাত্র ৮৯ জন ভারতবাসী এই বিভাগে কর্ম পাইয়াছেন। ইঁহাদের সকলের উপাধি সেনাপতিদের ন্যায় লেফ্‌টেনান্ট, কর্ণেল, মেজর ইত্যাদি। গত কয়েক বৎসর যুদ্ধের সময়ে অনেক ভারতবাসীকে অস্থায়ীভাবে এই বিভাগে নিযুক্ত করা হইয়াছিল।

সমগ্র চিকিৎসা বিভাগের পরিচালক ভারত গভর্ণমেণ্টের একজন কর্মচারী,—চিকিৎসা-বিভাগের পরামর্শ দাতা তিনিই। কর্মচারীদের প্রমোশন ও সাধারণ বিভাগের লোক নির্বাচন প্রভৃতি আপিষী কাজই তাঁহাকে বেশী করিতে হয়। তাঁহারই অধীনে ভারতের স্যানিটারী বা স্বাস্থ্য বিভাগ।

প্রত্যেক প্রদেশের চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য একজন করিয়া বড় ডাক্তার কর্মচারীর উপর ন্যস্ত; তিনি সমস্ত হাঁসপাতালের পরিদর্শক। স্বাস্থ্য বিভাগের জন্য একজন পৃথক কর্মচারী নিযুক্ত আছেন; তাঁহার অধীনে প্রায় প্রত্যেক জেলায় একজন করিয়া স্যানিটারী কমিশনর আছেন। ইঁহাদের কর্ত্তব্য হইতেছে তাঁহাদের অধীনস্থ ভূখণ্ডে কোথায় কোনো সংক্রামক ব্যাধি আছে কিনা তাহার সন্ধানকরা এবং কেমন করিয়া দেশকে উহার হাত হইতে রক্ষা করা যায় সে বিষয়ে স্থানীয় শাসন বিভাগকে পরামর্শ দান করা। জেলার সাধারণ হাঁসপাতাল প্রভৃতি পর্য্যবেক্ষণ করিবার ভার সিভিল সার্জেনের উপর। তিনি সাধারণত জেলার মধ্যে চিকিৎসা সম্বন্ধে সুপণ্ডিত। জেলার প্রধান সহরের সরকারী হাঁসপাতালে তিনিই

চিকিৎসাদি করেন। অনেক জেলায় তিনিই স্যানীটারী ইন্সপেক্টরের কার্য্য করেন।

বিলাত হইতে যাঁহারা ভারতীয় মেডিক্যাল বিভাগে কর্মচারী হইয়া আসেন তাঁহাদের সম্মান ও বেতন দুইই অধিক। লেফ্‌টনাণ্টরা ৫০০৲, ক্যাপ্টেনরা ৫০০৲ হইতে ৬৫০৲, মেজরেরা ৭০০৲ হইতে ৮০০৲ ও লেফ্‌টনাণ্ট-কর্ণেল ৯০০৲ হইতে ১৪০০৲ টাকা মাসিক বেতন পাইয়া থাকেন।

মিলিটারী উপাধিভূষিত চিকিৎসক ছাড়া সাধারণ বিভাগে ৩৫০ জন কর্মচারী আছেন; ইঁহারা ইন্সপেক্টর জেনারেল, স্যানিটারী কমিশনর, মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ ও অধ্যাপক, জেল সুপারিটেণ্ডণ্ট প্রভৃতির কাজ করেন। সকলের বেতন মাসিক হাজারের উপরই ১২০০৲ হইতে ২৫০০৲এর মধ্যে।

চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান ও হাসপাতাল

১৯১৬ সালের শেষে ভারতে ৩,০৫১ টি হাসপাতাল ও ডিসপেন্সারী ছিল। কিন্তু ভারতবর্ষের ন্যায় দরিদ্র ও রোগ-বহুল দেশের পক্ষে ইহা নিতান্তই কম। গ্রামের মধ্যে চিকিৎসার দুর্দশার কথা কাহার অবিদিত নাই। হাসপাতাল বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রোগীর সংখ্যা দিন দিন বাড়িয়া চলিতেছে। ১৯১৬ সালে ৩ কোটি ৪৪ লক্ষের উপর রোগী সরকারী ঔষধালয় হইতে ঔষধ লইয়াছিল।

ভারতে ৫টি সরকারী মেডিক্যাল কলেজ আছে— কলিকাতা, বম্বে, মান্দ্রাস, লাহোর ও লক্ষ্ণৌ। সব গুলি কলেজে ২০৯৬ জন বিদ্যার্থী পাঠ করিতেছেন; ইহার মধ্যে ৭৯ জন মহিলা। এ ছাড়া ১৭ টি মেডিক্যাল স্কুল আছে। এগুলিতে তিন হাজার ছাত্র পাঠ করে।

আমাদের দেশে খ্যাপা কুকুর ও শেয়ালে কামড়াইলে যে দেশীয় চিকিৎসা ছিল তাহা এখন প্রায় লুপ্ত হইয়াছে; সে সব প্রণালী সত্য কি

মিথ্যা তাহাও নির্দ্ধারিত হয় নাই। তবে বৈজ্ঞানিক পাস্তুরের অনুমোদিত পদ্ধতি অনুসারে শিম্‌লা শৈলের কসৌলী নামক স্থানে, মান্দ্রাজের কুন্নুরে, আসামের শিলংএ এবং বর্ম্মায় রেঙ্গুনে হাসপাতাল নির্ম্মিত হইয়াছে।

১৯১৬ সালে ভারতে ২১টি পাগ্‌লা গারদ ছিল। সব গুলিতে প্রায় ১০ হাজার রোগী আছে। বাংলাদেশের মধ্যে বহরমপুরের পাগ্‌লা গারদ বিখ্যাত। সমগ্র ভারতে প্রায় ২৫০০ করিয়া লোক প্রতি বৎসর পাগ্‌লা গারদে আশ্রয় গ্রহণ করে।

কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত লোকেদের জন্য খাঁটি সরকারী কাজ খুব কমই আছে। অধিকাংশই খৃষ্টান পাদরীদের দ্বারা পরিচালিত। মান্দ্রাজের সরকারী কুষ্ঠাশ্রম, বম্বের মাতুঙ্গ কুষ্ঠালয়, ত্রিবঙ্কুরের সরকারী কুষ্ঠাশ্রয়, ও কলিকাতায় কুষ্ঠগৃহ উল্লেখ যোগ্য। খৃষ্টানদের ৫০টি কুষ্ঠালয়ে সরকারী সাহায্য প্রচুর পরিমাণে প্রদত্ত হয়।

নারীদের বিশেষ ব্যবস্থা

পুরুষদের ন্যায় মেয়েদের জন্য ভারতীয় মেডিক্যাল বিভাগ খোলা হইয়াছে। এ দেশের নারীদের চিকিৎসা ও সেবা যাহাতে ভালরূপ হইতে পারে তাহার জন্য এই বিভাগের সৃষ্টি।

লেডী হার্ডিংজের (ভূতপূর্ব বড়লাট বাহাদুরের স্বর্গীয়-পত্নী) নাম অনুসারে দিল্লী সহরে ১৯১৬ সালে মেয়েদের একটি মেডিক্যাল কলেজ খোলা হইয়াছে। পুরুষদের সঙ্গে একত্র কলেজে পড়িবার অনেক অসুবিধা। দেশীয় রাজাদের অর্থেই ইহা স্থাপিত হইয়াছে; ইহার সংলগ্ন হাসপাতালে ১৬৮ টি রোগী রাখিবার ব্যবস্থা আছে। সেবিকার কাজও ভালরূপে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা এখানে আছে।

১৮৮৫ সালে তৎকালীন বড়লাট লর্ড ডাফ্‌রিনের পত্নীর উদ্যোগে ভারতের সর্বত্র মেয়েদের চিকিৎসা ও শুশ্রূষার জন্য এক প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। লেডী ডফ্‌রীন যখন ভারতে আসেন তখন মহারাণী ভিক্টোরিয়া

এদেশের নারীদের শোচনীয় অবস্থা দূর করিবার জন্য বিশেষ ভাবে তাঁহাকে অনুরোধ করেন। লেডী ডাফ্‌রিন ভারতে আসিয়া এই কার্য্যে ব্রতী হইলেন ও চারিদিক হইতে চাঁদা সংগ্রহ করিয়া একটি সমিতি গঠন করেন। তাঁহারই নাম অনুসারে ইহার নাম "ডাফরিণ ফাণ্ড" হয়। ভারতবর্ষে বাসকালে তিনিই ইহার নেত্রী ছিলেন। ভারতবর্ষময় এই সভার শাখা-সভা স্থাপিত হইল এবং তহবিলের ব্যবস্থা স্থানীয় লোকের উপর ন্যস্ত হইল। ইহার উদ্দেশ্য ১—চিকিৎসা শিক্ষাঃ ভারতীয় নারীরা যাহাতে চিকিৎসক, ধাত্রী ও সেবিকার কর্ম শিখিতে পারে তাহার ব্যবস্থা। ২—সেবা : স্থানে স্থানে হাসপাতাল ও ঔষধালয় খুলিয়া মেয়েদের চিকিৎসা বিশেষভাবে করিবার বন্দোবস্ত করা। কলিকাতার "ডাফরিণ হাসপাতাল" এই শ্রেণীর হাসপাতাল। ৩—শিক্ষিত ধাত্রী ও সেবিকা প্রয়োজনীয় স্থানে প্রেরণ করিবার ব্যবস্থা।

চারি বৎসরের মধ্যে ভারতের নানাস্থানে ১২ টি হাসপাতাল ও ১৫ টি ঔষধালয় স্থাপিত হয়। দেশীয় লোকের উৎসাহের অভাব অর্থের অনটন হয় নাই। এই অর্থ হইতে চিকিৎসা শিখিবার জন্য সেবিকার কার্য্যের জন্য ১২ টি ও হাসপাতালের সহকারীর কার্য্য শিখিবার জন্য ২ টি স্কলারশিপ্ মেয়েদের জন্য ব্যবস্থা হইয়াছিল।

বর্ত্তমানে এই সমিতির তত্ত্বাবধানে ১৫৮ টি হাঁসপাতাল, ওয়ার্ড ও বহু-শ্রেণীর ঔষধালয় আছে এবং বৎসরে ১½ লক্ষ স্ত্রীলোকের ঔষধাদি ও শুশ্রূষাদি করিবার মত ব্যবস্থা আছে। ইহা সরকারের নিজ তত্ত্বাবধানে চালিত হইতেছে।

রোগে মরা ছাড়া আরও নানা রকমেও লোক মরে, যথা আত্ম-হত্যা। "কেরোসিন তৈলে নারীদের আত্মহত্যা করার প্রথা কয়েক বৎসর হইল বাংলাদেশে অবলম্বিত হইয়াছে। এছাড়া আফিং সেঁকোবিষ প্রভৃতি খাইয়াও অনেকে প্রাণত্যাগ করে। নিদারুণ, অসহ্য, অপ্রতিবিধেয়

মানসিক ব্যাধিও অনেক সময়ে আত্মহত্যার কারণ, এবং এই মানসিক বিকৃতি কথন কথন দৈহিক ব্যাধি হইতে উৎপন্ন হয়। ১৯১৫ সালে বাংলাদেশে ১৪৫২ জন পুরুষ ও ২০১৮ জন স্ত্রীলোক আত্মহত্যা করে। পুরুষদের প্রায় দেড়গুণ অধিক স্ত্রীলোকের আত্মহত্যার বিশেষ কারণ আছে। বাংলাদেশেই যে আত্ম-হত্যার প্রাদুর্ভাব বেশী, তাহা চারিটি প্রদেশের স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় রিপোর্ট হইতে সংখ্যা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি।

অপমৃত্যু

	পুরুষ	নারী
মধ্য প্রদেশ—	৪৪১	৫২৩
বিহার উড়িষ্যা—	৬০৫	১১০৫
আগ্রা অযোধ্যা—	৬৬৪	১৭৯৯
বাংলা দেশ—	১৪৫২	২০১৮

"তালিকায় দেখা যাইতেছে যে চারিটি প্রদেশেই পুরুষ অপেক্ষা নারী অধিক আত্মঘাতী; এই সামাজিক ব্যাধির কারণ কি? বাঙ্গালীর মেয়েরা নিজেই নিজের প্রাণ নাশ করিলে আদালতে গৃহীত সাক্ষ্যে প্রায়ই দেখা যায় যে ঐ সব স্ত্রীলোকের বিবাহিত জীবন সুখের ছিল না। শাশুড়ী, শ্বশুর বা স্বামী, কিম্বা সকলেই যথেষ্ট যৌতুক না পাওয়ার জন্য, কিম্বা বধূ পরমা সুন্দরী নহে বলিয়া, কিম্বা তাহার কৃত গৃহকার্য্য সন্তোষজনক নহে বলিয়া, এইরূপ কোন না কোন অজুহাতে তাহার লাঞ্ছনা হয়। তাহাতে তাহার প্রাণের আশা থাকে না। কন্যা পিতামাতার দায় স্বরূপ হয়; সেই জন্য যে তাহকে গ্রহণ করে সে পিতাকে কন্যাদায় হইতে মুক্ত করে। এই দুরবস্থার প্রতিকার, নারীর ব্যক্তিত্বের ও স্বাধীন-জীবন যাপনের ক্ষমতার পূর্ণ বিকাশের উপর নির্ভর করিবে। সর্বত্রই সুশিক্ষা

আত্মঘাতী নারীর সংখ্যা

দ্বারা নারীর মনকে দৃঢ়তর করিবার, নারীর স্বাস্থ্যের উন্নতি করিবার, এবং নারীর পক্ষে দুঃখজনক সামাজিক প্রথা ও পারিবারিক ব্যবস্থার সংস্কার ও অন্যান্য উপায়ে নারীর জীবনকে অধিকতর আশা ও আনন্দ পূর্ণ করিবার প্রয়োজন হইয়াছে।"

বন্যজন্তুর উৎপাত

বন্যজন্তুর হাতে প্রতিবৎসর কয়েক সহস্র করিয়া লোক মরে। সর্পাঘাতে প্রতিবৎসরেই ২২।২৩ হাজার করিয়া লোক মরিয়া থাকে। ১৯১৭ সালের সর্পাঘাতের মৃত্যুসংখ্যা প্রায় ২৪ হাজার হইয়াছিল। বাঘ ভালুক প্রভৃতি হিংস্রজন্তুর হাতে প্রতিবৎসর দেড় হইতে দুই হাজার করিয়া লোক মরিয়া থাকে। ১৯১৭ সালে দুই হাজারের উপর লোক মরিয়াছিল। হিংস্রজন্তুর উৎপাতে নিরস্ত্র মানুষ কখনো আত্মরক্ষা করিতে পারে না। ৩১ কোটি লোকের বাস যেখানে সেখানে মাত্র ১ লক্ষ ৩৬ হাজারের বেশী বন্দুক নাই। এই সংখ্যা উত্তরোত্তর কমিতেছে।

১৯০৮ সালে	...	১,৯৭১০০ বন্দুক—
১৯১৩ ,,	...	১,৮২,৪১২ ,,
১৯১৭ ,,	...	১,৩৬,৭০৭ ,,

মৃত্যুসংখ্যা

বাংলা দেশে ১৯১০ সালে ২৯,৪০৬ টি বন্দুক ছিল, ১৯১৩ সালে ২৫, ৯৬১ টি ও ১৯১৭ সালে ৮,০৪২ টি মাত্র দাঁড়াইয়াছে। সংযুক্ত প্রদেশে প্রায় ২০ হাজারের স্থানে ৬৩৫৭টি, পাঞ্জাবে ১৩৮৭৫ টির স্থানে ৬২১৯টি ১৯১৭ সালে দাঁড়াইয়াছিল। এ অবস্থায় বন্যজন্তুর কবল হইতে অসহায় গ্রামবাসীদের প্রাণরক্ষা অসম্ভব। ১৯১১-১২সালে সমগ্র ভারতে প্রায় ৬ লক্ষ গ্রাম ছিল; প্রত্যেক চারিটি

বন্দুকের পাশ

গ্রামের মধ্যে তিনটি গ্রামে একজন লোকের কাছেও একটি বন্দুক ছিল না। এ কয় বৎসর লোক বাড়িয়াছে কিন্তু বন্দুকের সংখ্যা কমিয়াছে।

ব্যাধি ব্যতীত অনাহার জনিত অপমৃত্যুর সংখ্যা ভারতে খুব বেশী। লোকক্ষয়ের ইহা একটি প্রধান অঙ্গ; সুতরাং হিসাবের মধ্যে এটিকেও ধরিতে হইবে। ভারতে ইংরাজ আসিবার পর হইতে দুর্ভিক্ষ হইতেছে এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। পূর্বেও অনাহারে লোক মরিত তবে তাহা কেহ গণিয়া গাঁথিয়া লিখিয়া যায় নাই। ১৮৫৪ সাল হইতে ১৯০১ সাল পর্য্যন্ত এই ৪৭ বৎসরে প্রায় ২ কোটি ৮২ লক্ষ লোক অনাহারে প্রাণ-ত্যাগ করে। কেহ কেহ অনুমান করেন গত শতাব্দীর শেষ ২৫ বৎসরে অনাহার ও অনাহার-জনিত ব্যাধিতে প্রতি বৎসর ১০ লক্ষ করিয়া লোক মরিয়াছে। ভারতের জনসংখ্যা ১৮৯১ সালের আদমসুমারী অনুসারে ২৮ কোটি ৭২ লক্ষ, ১৯০১ সালে ২৯ কোটি ৪০ লক্ষ ছিল। যথার্থ অনুপাত অনুসারে এই বৃদ্ধি হইলে ১৯০১ সালেই ৩৩ কোটি লোক হইত। ১৯১১ সালের ফল দেখিয়াও সেই কথা বলা যাইতে পারে।

দুর্ভিক্ষ ও অনাহার

জন্ম মৃত্যুহার।

ভারতবর্ষের মৃত্যুহার।

			হাজার করা
১৯১৩	...	...	২৮·৭২
১৯১৪	...	...	৩০·০০
১৯১৫	...	...	২৯·৯৪
১৯১৬	...	...	২৯.১০
১৯১৭	...	..	৩২·৭২
১৯১৮	...	...	৬২·৪২
১৯১৯	...	...	*এখনো তৈয়ারী হয় নাই।*

অন্যান্য দেশ।

	জন্মহার ১৯১৭	মৃত্যুহার ১৯১৭	মৃত্যুহার ১৯১৯
ইংলণ্ড		১৫·৭	১৪·২
অষ্ট্রিয়া	৩১·৪	২১·৯	২০·৫
বেলজিয়াম	২০·৭	১৫·২	১৪·৮
বুলগেরিয়া	৪০·৩	২৬·৪	২১·৫
ডেনমার্ক	২৬·৭	১৩·৪	১২·৮
ফ্রান্স	১৮·৭	১৯·৬	১৯·৬
জার্মানী	২৯·৮	১৬·২	১৫·০
হাঙ্গারী	৩৪·৮	২৪·৯	২৩·৩
ইতালী	৩১·৫	২১·৪	১৭·৯
জাপান	৩৪·২	২১·৯	১৯·৫
হল্যাণ্ড	·	·	১২·৪
নিউজিল্যাণ্ড	২৬·৩	৯·৫	৯·১
নরওয়ে	২৫·৯	১৩·২	১৩·৩
রুমেনিয়া	৪৩·০	২৫·৭	২৩·৮
রুশিয়া	৪৬·৮	২৯·৮	২৮·৯
সার্বিয়া	৩৯·০	২২·৪	২১·১
স্পেন	৩১·৮	২৩·৭	২২·১
সুইডেন	২৩·৮	১৩·৮	১৪·৬
সুইজারল্যাণ্ড	২৫·০	১৪·১	১৩·৩

(Whitaker. Almn'sanack 1918. Hazell's Annual 1920.)